সিন্ধুপারের পাখি

প্রফুল্ল রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১/১ দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

ব্লক ও প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

নয় টাকা

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীকানাইলাল সরকার

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই উপন্যাসে কোন জাতি, ধর্ম বা ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। আমার দৃষ্টিতে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের চেয়ে মানুষ অনেক বড়, অনেক মহান্। মানুষের মৌল গুণগুলির উপর অটুট বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং আস্থা রেখে এ বই লিখতে চেষ্টা করেছি।

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি, এবং আনুষঙ্গিক কিছু কিছু বিষয় ছাড়া এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক। কোন চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রে সামান্য মিলও যদি থেকে থাকে, তবে তা নিতান্তই যোগাযোগ। এ সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব নেই।

'সিন্ধুপারের পাখি'কে দুটি পর্বে ভাগ করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রথম পর্বটি প্রকাশিত হল।

যাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এই উপন্যাস কোনদিনই লেখা সম্ভব হত না, তাঁরা হলেন অগ্রজপ্রতিম শ্রীকানাইলাল সরকার, পোর্টব্লেয়ারের ম্যাজিস্ট্রেট-বন্ধু শ্রীসাধন রাহা, আন্দামান-নিকোবরের এঞ্জিনীয়ার ও হারবার মাস্টার মিঃ স্যাণ্ডেল, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ পাল, উত্তর আন্দামানের শ্রীবিকাশ চক্রবর্তী এবং ডাণ্ডাস পয়েণ্টের থানাদার শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে আমার ঋণ অফুরন্ত।

এই উপন্যাসের নামকরণ করে দিয়েছেন অগ্রজপ্রতিম শ্রীসাগরময় ঘোষ। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মনে রেখে নিছক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য বলেই মনে করি।

কলিকাতা
২০শে ফাল্গুন ॥ ১৩৬৫

লেখক

এই লেখকের অন্যান্য বই-

পূর্ব পার্বতী (২য় মুদ্রণ)
নাগমতী
দূরের বন্দর
তাসের মিনার
অন্তরজ
রূপসীর মন
নতুন দিন
নোনা জল মিঠে মাটি (যন্ত্রস্থ)
নদীর মত (যন্ত্রস্থ)

কথামুখ

'Life is not a 'series of gig-lamps symmetrically arranged.'

পূর্বদেশীয় উপকথায় উল্লেখ আছে, এক অজ্ঞাতনামা সওদাগর দুস্তর সমুদ্রে সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে 'আন্ধারমাণিক্যে' পৌঁছেছিলেন। সম্ভবত এই 'আন্ধার মাণিক্য'ই আন্দামান।

অতীত-কথা মাত্রেই অমৃতসমান। কিছু মোহ, কিছু আবেশ এবং কল্পনার কিছু বিলাস মিশিয়ে চোখ বুঁজে যে অস্পষ্ট, ধূসর অতীতের ধ্যান করি, তা অতি রমণীয়। তার স্বাদ মধুর।

বঙ্গোপসাগরের দু-শ চারটি দ্বীপের সমষ্টি আন্দামান। তার অতীত কুহেলী-বিলীন। ইতিহাসের ফাঁকগুলি কল্পনা আর অনুমান দিয়ে রিফু করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আন্দামানের সঙ্গে 'কালা পানি' নামে একটা ভয়ানক শব্দ মিশে ছিল। আর এই 'কালা পানি'র সঙ্গে মিশে ছিল বিভীষিকা, নিগ্রহ, দ্বীপান্তর এবং কুখ্যাত সেলুলার জেল। কিন্তু এ তো মাত্র বিগত কয়েক দশকের ইতিহাস; তোমার আমার সকলেরই জানা। তোমার আমার জানাশোনার পিছনেও আন্দামানের একটা বিপুল অতীত আছে। বারো দেশ ছত্রিশ জাতি, নাবিক-বণিক-পরিব্রাজকের মুখে মুখে প্রচলিত হাজার রূপকথায়, কিংবদন্তীতে এবং উচ্চারণভঙ্গিতে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপমালার নাম জড়িয়ে রয়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ারের ফুঙ্গি চাউঙে বসে অনেক কথাই শুনেছিলাম।

মেঝো ফুঙ্গি লা ডিন ত্রিকালদর্শী পুরুষ। সে-কাল দেখেছেন, এ-কাল দেখছেন এবং যে বোধি থাকলে আগামী কালকে দেখা যায়, তা তাঁর আছে।

বিচিত্র মানুষ লা ডিন। প্রথম জীবনে সুমাত্রা-জাভা-বলিদ্বীপে, শ্যাম-কম্বোডিয়া-মালয়ে—পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরে বন্দরে নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আঠার-শ চুরাশি পঁচাশিতে তৃতীয় বার ইংরেজদের সঙ্গে

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ বাধে। হঠাৎ ব্রহ্মরাজ থিবোর পক্ষে লড়াই করে বন্দী হয়ে তিনি আন্দামান এসেছিলেন।

প্রথম জীবনের দুঃসাহসী পরিব্রাজক, মধ্য জীবনের সৈনিক, শেষ জীবনে কেমন করে ফুঙ্গি হলেন, সে কাহিনী অন্য। সে কথা অনেক পরের। তবে সত্তর বছরের জীবনে বহু দেখেছেন, বহু শুনেছেন লা ডিন। দেখা এবং শোনার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেছেন। বিশাল অভিজ্ঞতা আর বিরাট উপলব্ধির কথা সহৃদয় সমঝদার পেলে তিনি অনর্গল শোনান।

তাঁর কাছেই আন্দামানের অতীত-কথা শুনেছিলাম।

প্রথমেই লা ডিন বলেছিলেন, 'বাবুজী, ঐতিহাসিক টলেমি ভুল করে আন্দামানকে 'আগাথু ডাইমনস নেসস' (উত্তম আত্মার দ্বীপ) বলেছিলেন। আমার মনে হয়, ভুল তিনি করেন নি। খুব খাঁটি কথাই বলেছিলেন। এই দ্বীপে ইনসানিয়াতের বিচার চলছে। হাঁ বাবুজী, নয়া ইনসাফ। এই দ্বীপে একদিন মহান আত্মা জন্ম নেবে।'

বর্মী লা ডিনের মুখে হিন্দী এবং উর্দু একাকার হয়ে অদ্ভুত শোনায়। এই বিচিত্র ভাষার মহিমা অনেক পরে বুঝেছিলাম।

এবার আন্দামানের ইতিহাস দেখা যাক।

কোথায় যেন শুনেছিলাম পুরাবৃত্তের তুল্য সরস আখ্যান আর নেই। সময়ের মত কাহিনীকার মেলা দুষ্কর। গাল্পিক ঘটনা বুনে বুনে গল্প বানান। কিন্তু ইতিহাস হল জাত গল্প। প্রয়োজনের খাতিরে সেখানে ঘটনা ঘটে; চরিত্র সৃষ্টি হয়। সেখানে তাল-মান-মাত্রা বজায় রেখে নিটোল কাহিনী ফাঁদবার হাঙ্গামা নেই।

আন্দামানের ঐতিহাসিক কাহিনী অপূর্ব।

অনুমানের উপর নির্ভর করলে দেখা যায়, খ্রীষ্টজন্মের হাজার খানেক বছর আগে চীনা এবং জাপানীরা আন্দামানের কথা জানত। চৈনিক উচ্চারণে আন্দামান ইয়েঙ-তো-মাঙ হয়েছিল। জাপানীরা বলত আন্দাবান।

বঙ্গোপসাগরের নাবিকরা হাজার হাজার বছর ধরে যে রূপকথা বানিয়েছে, তাতে আছে, এক ঝাঁক সাগর-পাখি দিক ভুল করিয়ে দুজন আরব নাবিককে আন্দামানে নিয়ে এসেছিল। আন্দামানের মাটিতে বিদেশী মানুষের সেই বোধ

হয় প্রথম পদক্ষেপ। তারপর কত মানুষই না এল, কত দেশের কত জাহাজই না ভিড়ল।

পূর্বদেশীয় উপকথার সওদাগরই শুধু নন, সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় এবং আরব বণিকেরা, বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ও শ্রমণেরা বার বার পূর্ব সমুদ্রে পালের জাহাজ ভাসিয়েছেন। সমাপ্তিহীন বঙ্গোপসাগরের মধ্যপথে আরাম-বিরাম-খাদ্য আর স্বাদু জলের সন্ধানে আন্দামান দ্বীপমালায় তাঁদের বহর থেমেছে।

সে-সব দিনে মালয়ী ও চীনা জলদস্যুরা আন্দামানের উপকূলে হন্যে হয়ে ঘুরত। সুযোগ পেলেই এখানকার আদিম অধিবাসীদের ধরে নিয়ে শ্যাম, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোচীনের রাজদরবারে বিক্রি করে দিত।

আন্দামানের উপকূলে কত জাহাজ-ডুবি যে হয়েছে, এই সব দ্বীপের আদিম বাসিন্দাদের তীরে কত নাবিক যে প্রাণ হারিয়েছে, তার হিসাব কে রাখে? তবু নানা দেশ থেকে এখানে জাহাজ আসার বিরাম ঘটে নি। বিদেশী মানুষ এসে একদিন এই দ্বীপপুঞ্জ দখলও করে বসেছে।

লা ডিন বলেছিলেন, 'বাবুজী, আন্দামানের মিট্টিতে পঞ্চাশটা বছর কেটে গেল। এই দ্বীপের হরেক চীজ দেখলাম। জঙ্গল সাফ হয়ে শহর হল। সেলুলার জেল তৈরী হল। রস্ দ্বীপের রোশনি ফুটে উঠল, আবার নিবেও গেল। কত জাতের কত ধাতের মানুষই না দেখলাম। মোপলা দেখলাম, পাঠান-পাঞ্জাবী-কারেন দেখলাম, বর্মী-বাঙালী-চীনা দেখলাম।'

হ্যাঁ অনেক দেখেছেন লা ডিন। প্রিয়জন-পরিজন-হীন এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে দিনের পর দিন কাটিয়ে কয়েদী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। অতিষ্ঠ হয়ে কেউ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে হাঙরের দাঁতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। ভাগোয়া কয়েদী গভীর অরণ্যে পালিয়ে জারোয়াদের তীরে প্রাণ দিয়েছে। অত্যাচার আর পীড়ন সইতে না পেরে কেউ ছোট ডিঙিতে বিপুল সমুদ্র পাড়ি দিতে চেয়েছে। তারপর পাহাড়-প্রমাণ ঢেউয়ের মর্জিতে কোথায় ভেসে গিয়েছে, পৃথিবীর কেউ খোঁজ রাখে নি।

অনেক, অনেক দেখেছেন লা ডিন।

কয়েদীর রক্তে এখানে সড়ক তৈরী হয়েছে। কয়েদীর হাড় সাজিয়ে সমুদ্রের দেওয়াল বাঁধা হয়েছে। আন্দামানের মূক মাটিতে অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক লোহু, অনেক স্বেদ এবং অভিশাপ গোপন হয়ে আছে।

সবই জানেন লা ভিন।

লা ভিন বলেছিলেন, 'বাবুজী, দেখলাম তো বহুত, পেলাম কি ? পেয়েছি বাবুজী, বহুত পেয়েছি, একদিন আপনাকে বলব।'

কিন্তু পরের কথা অনেক আগে এসে গেল। এখন উজান ঠেলে না পিছিয়ে উপায় নেই।

বঙ্গোপসাগরের দু-শ চারটি দ্বীপের স্থানমাহাত্ম্য যত, নামমাহাত্ম্য তার চেয়ে তিল পরিমাণ কম নয়। কোথা থেকে আন্দামান নামের উদ্ভব, তার হদিস পাওয়া দায়। চীনাদের 'ইয়েঙ-তো-মাঙ', জাপানীদের 'আন্দাবান' না হয় বাদই দেওয়া গেল।

মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরে 'আঙ্গামানিয়ান' নামে দ্বীপমালা দেখেছিলেন। সপ্তম শতকে চৈনিক ভিক্ষু তি সিঙ এই দ্বীপে এসেছিলেন। সে সময় এর নাম ছিল 'আগদামান'। ক্লডিয়াস টলেমি এই দ্বীপকে 'আগমাটে' নামেও জানতেন। চোদ্দ-শ চল্লিশে পরিব্রাজক নিকলো কণ্টি আন্দামানকে 'স্বর্ণদ্বীপ' আখ্যা দিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকে মাস্টার ফ্রেডরিক নিকোবর থেকে পেগু পর্যন্ত এক সারি দ্বীপ দেখেছিলেন। এখানকার বন্য অধিবাসীরা তাদের এই দ্বীপপুঞ্জকে নাকি 'আণ্ডেমেওন' বলত। মালয়ীরা আন্দামানের আদিম বাসিন্দাদের বলত 'হণ্ডুমানী'।

এই নামাবলীর কোনটি থেকে 'আন্দামানে'র উৎপত্তি, কে বলবে ?

লা ভিন বলেছিলেন, 'বাবুজী, এই আন্দামান সহজ জায়গা নয়। কোতল-রাহাজানি-ডাকাতি না করলে এখানে আসা যায় না। যেদিকে তাকাবেন, যে মুখটি দেখবেন, হয় সে খুনিয়ারা, নয় লুঠেরা। সে জন্যে মনে ঘৃণা রাখবেন না। একটু দরদী হবেন। সকলের বুকে কান রেখে দিলের কথা শুনবেন; তারপর তাদের মুখের দিকে তাকাবেন। দেখবেন, তারা খুব খারাপ নয়। কয়েদীরাও মানুষ।'

মুগ্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

লা ভিন আবার শুরু করেছিলেন, 'বাবুজী, খুনিয়ারা লুঠেরা ছাড়া অন্য মানুষও আছে। ইণ্ডিয়ার আজাদের জন্য যে সিপাহীরা প্রথম লড়াই করেছিল, তাদের নিয়েই আন্দামানের বন্দী কলোনির পত্তন। বর্মাকে আজাদ রাখার

জন্তে রাজা খিবোর হয়ে যারা লড়েছিল, তাদেরও এখানে পাবেন। ইণ্ডিয়ার স্বদেশী বাবুদেরও খোঁজ নেবেন। সবারই সাধ ছিল, নিজের নিজের দেশকে আজাদ করবে। কিন্তু—'

হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন লা ডিন।

সামনেই বিরাট বুদ্ধমূর্তি। প্রসন্ন, ক্ষমাসুন্দর ভগবান তথাগত। তন্ময় দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন লা ডিন। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন। শুনতে পেলাম না।

আন্দামানের হাল আমল শুরু হল সতর-শ আটাশী সালের সেপ্টেম্বর মাসে। লর্ড কর্নওয়ালিস লেফটেনাণ্ট কোলব্রুক এবং লেফটেনাণ্ট ব্লেয়ারকে আন্দামান দ্বীপমালায় সার্ভের জন্য পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে একটি উপনিবেশ পত্তন করা।

ব্লেয়ার এবং কোলব্রুক সার্ভে রিপোর্ট পেশ করলেন। পরের বছরই সেটেলমেণ্টের কাজ আরম্ভ হল। কত কালের দুর্ভেদ্য অরণ্য সংহার করে চ্যাথাম দ্বীপে এবং বর্তমান পোর্ট ব্লেয়ারে কলোনি তৈরী হল। কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই সেটেলমেণ্টের কাজ উত্তরপূর্ব দিকের পোর্ট কর্নওয়ালিসে তুলে আনা হয়। বন্দর এবং সুরক্ষিত পোতাশ্রয়ের পক্ষে পোর্ট কর্নওয়ালিস মনোরম। কিন্তু এই দ্বীপটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং মৃত্যুর হার অস্বাভাবিক হওয়ায় চার বছরের মধ্যেই এখানকার কলোনি উঠে যায়।

পুরাতন নথিপত্রে পরবর্তী ষাট বছরের বিশেষ উল্লেখ নেই।

লা ডিন বলেছিলেন, 'বাবুজী, দুনিয়ার হরেক কিসিমের পাপীতাপীর আস্তানা এই আন্দামান। এখানে দেখবেন মদের নেশায় চুরচুর হয়ে কয়েদী নিজের আওরতকে অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে। এক রতি আফিমের জন্তে মানুষ এখানে চাকু চালায়। এখানে কথায় কথায় কোতল, কথায় কথায় ছোরাছুরি। তবু এই দ্বীপের একটা আত্মা আছে; বড় সুন্দর আত্মা। সেই আত্মাকে খুঁজবেন; তার খোঁজ না পেলে আপনার আন্দামান আসা বৃথা হবে।'

অবাক হয়ে লা ডিনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এই মানুষটিকে যতই দেখেছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি।

চোখ বুজে লা ডিন আবার শুরু করেছিলেন। তাঁর কথাগুলি সাজিয়ে নিলে এমন দাঁড়ায়।

সমুদ্রের অতল থেকে এই দ্বীপমালা কবে উঠেছিল, কবে যে নিবিড় অরণ্যের ঘাঘরায় নিজেকে সাজিয়েছিল, কে বলবে? সুদূর অতীতের, গহীন অরণ্যের, চারপাশের গর্জমান সমুদ্রের, পাপ-তাপ, আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষ, আলো-অন্ধকারের মধ্যে এই দ্বীপের সুন্দর আত্মাটি সঙ্গোপন হয়ে আছে। অতি সন্তর্পণে তাকে খুঁজে নিতে হবে। বার বার হয়তো ব্যর্থ হতে হবে। সে আত্মা ধরা দিয়েও দেবে না। তবু অসহিষ্ণু হলে চলবে না।

লা ডিন বলেছিলেন, 'বাবুজী, নিরাকাঙ্ক্ষ না হলে আত্মাকে ধরা যায় না। যোগী-সন্ত-ভিক্ষু নির্বাসনা হয়েই আত্মার মহিমা বুঝতে পারে।' আপনি লেখক, মনে মনে আপনিও তো সাধক—'

হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন লা ডিন।

পোর্ট কর্নওয়ালিসের কলোনি উঠে যাবার পর একটি একটি করে ছোট-বড়-মাঝারি অনেকগুলি কারণ জমেছিল। মালয়ী জলদস্যুদের উপদ্রব, জাহাজডুবি, নাবিকদের উপর দ্বীপবাসী আদিম মানুষগুলির আক্রমণ—এমনি অসংখ্য। সর্বপ্রধান এবং সর্ববৃহৎ কারণটি পাওয়া গেল আঠার-শ সাতান্নতে। এই বছরটা সিপাহী বিদ্রোহের বছর। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিদ্রোহীদের বহুদূরে নির্বাসন দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল।

আঠার-শ আটান্ন সালের চৌঠা মার্চ আন্দামানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় তারিখ। এই তারিখেই ডক্টর জে. পি. ওয়াকার দু শ জন বন্দী, একজন নেটিব ওভারসিয়ার, দুজন ডাক্তার এবং ওল্ড ন্যাভাল ব্রিগেডের পঞ্চাশটি রক্ষী নিয়ে 'সেমিরামিস' জাহাজে আন্দামান যাত্রা করলেন।

বঙ্গোপসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালায় স্থায়ী উপনিবেশ পত্তন সম্ভব হল। জীবনের সীমানা দীর্ঘ হল।

লা ডিন বলেছিলেন, 'ঐ যে বললাম বাবুজী, নিরাকাঙ্ক্ষ না হলে আত্মাকে ধরা যায় না। কথাটা মনে রাখবেন।'

বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে ছিলাম। সে দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, নিরাসক্ত এবং নির্লিপ্ত হয়ে আন্দামানের আত্মাকে খুঁজব। এ এক দুরূহ ভাবনা, বড়

কঠিন পরীক্ষা। জানি না বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপমালায় ঘুরে ঘুরে পাহাড়-বনস্পতি-সমুদ্র, মানুষ এবং নিসর্গের মধ্যে তার গহন গোপন আত্মাকে খুঁজে পেয়েছি কিনা।

সে দিন ফুঙ্গি চাউঙ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

মেঝো ফুঙ্গি লা ডিন তন্ময় হয়ে বুদ্ধপদ আবৃত্তি করছিলেন। তাঁর কণ্ঠের ঝঙ্কার অনেকক্ষণ ধরে আমার কানে বাজছিল।

ন নগ্‌গচরিয়া, ন জটা, ন পঙ্কা।
অনাসকা থণ্ডিলা সায়িকা বা।
রজোব জল্লং উক্কুটি কপ্পধানং,
সোধন্তি মচ্চুং অবিতিন্ন কঙ্ক্ষং।

আখ্যান

এক

উনিশ-শ এগারো সালের এক দিন।

আউটরাম ঘাট থেকে আড়াই শ কয়েদী নিয়ে একটি জাহাজ আন্দামানে পাড়ি দিল। জাহাজটির নাম এস. এস. এলফিনস্টোন।

কাল সমস্ত দিন হুগলী নদীর গৈরিক জল দেখা গিয়েছে। অস্পষ্ট হলেও দু-পারে তীররেখা ছিল। এক ঝাঁক সাগরপাখি মাস্তলের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে আসছিল। দুই তীরের বাঁধনে আকাশটা ছোট হয়ে গিয়েছিল। তাকে মাপা না গেলেও তার সম্বন্ধে ধারণা বিরাট ছিল না।

আকাশে শীতের রোদ ছিল, রোদে মধুর আমেজ ছিল। চক্ররেখায় ঘন কুয়াশার স্তর ছিল। নদীর ঢেউ ফুঁড়ে ফুঁড়ে বাতাস উঠছিল; বাতাসে হিম মিশে ছিল। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কনকনানি ছুটছিল।

কিন্তু শীতের এই রোদ, আকাশ, নদীতীর, কুয়াশা—সবই বড় চেনা। এই কনকনানির স্বাদ বড় পরিচিত।

তারপর?

তারপর একটি রাত্রির কারসাজিতে এমন বিস্ময় ঘটে গেল। এক ফুৎকারে পরিচিত পৃথিবীটা কোথায় অদৃশ্য হল। কোথায় পড়ে রইল রূপনারায়ণের মোহানা আর কোথায় রয়ে গেল সাগরদ্বীপ!

ডায়মণ্ড হারবার পেরিয়ে গৈরিক জল যখন সবুজ হল, তখনও শীতের বেলাশেষ নিবু-নিবু আলো দিচ্ছিল। একটু পরেই ছায়া-ছায়া অন্ধকার নেমেছিল। তারপর স্যাণ্ড হেডের মুখে এসে বৃত্তাকারে বাঁক নিয়ে নদী কখন সঙ্গমে মিশল, কখন সবুজ জল নীল হল, নীল কখন কালা পানি হয়ে নিঃসীম সমুদ্র হয়ে গেল—সে কথা আড়াই শ কয়েদী একবারও ভাবে নি। এমন বিপুল বিস্ময় তারিফ করার মত মনই নয় তাদের।

আজ আর পারাপার নেই; দিকচিহ্ন নেই। ভরসা দেবার মত আকাশের কোথাও একটা সিন্ধু-শকুনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কালকের চেনাজানা তীর, গৈরিক জলের নদী, কালকের আকাশ বাতাস আজ নেই, কোথাও নেই।

বিশাল সমুদ্র এখানে গর্জায়, গহীন সমুদ্র এখানে অবিরাম ফোঁসে। পাহাড়-প্রমাণ তরঙ্গমালা ফুলে ফুলে যেদিকে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে মিশেছে, বিচিত্র আক্রোশে সেদিকে ধাওয়া করে।

উপরে অবাধ আকাশ, নীচে অবারিত লবণ-সমুদ্র। আকাশ আর সমুদ্র এখানে পাল্লা দিয়ে দিগ্বিদিকে ছোটে।

এর নাম বঙ্গোপসাগর।

বঙ্গোপসাগর—গভীর, গম্ভীর, ভয়ঙ্কর, কখনও বা প্রমত্ত। মুহূর্তে মুহূর্তে এর রূপ বদলায়, মেজাজ বদলায়। এর হঠকারিতার অন্ত নেই; এর খামখেয়ালকে বিশ্বাস নেই। কখন যে কালা পানি মেতে উঠবে, ঝড় তুলবে, কখন যে ফুলে ফুলে জল আকাশ-সমান উঁচু হবে; আর কখন যে একান্ত অবলীলায় মহাকায় জাহাজ ডুবিয়ে অথৈ অতলে টেনে নেবে, আগে থেকে হদিস মেলে না।

বিরাট একটা কুকারী মাছের মত জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে এস. এস. এলফিনস্টোন। জাহাজ এখন দক্ষিণগামী।

অনেক আগেই দিন শুরু হয়েছে।

অগাধ সমুদ্র থেকে একটি আগ্নেয় গোলক একটু একটু করে আকাশ বেয়ে জাহাজের মাথায় এসে উঠেছে। দরিয়ার সূর্য—তার তেজ ভয়ানক।

নীল আকাশটা ঝকঝক করে। খণ্ড খণ্ড পাটল রঙের মেঘ উত্তর থেকে দক্ষিণে, আড়াআড়ি পাড়ি জমায়। নীচে লবণ দরিয়া ফুঁসতে থাকে। সমস্ত সমুদ্র জুড়ে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু কোটি কোটি ঢেউয়ের মাথা জ্বলে।

চার নম্বর হ্যাচের উপর তিনটি কয়েদী বসে রয়েছে।

মাঝখানের কয়েদীটির মাথা দু হাঁটুর মধ্যে গোঁজা। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশটা নগ্ন। পরনে লম্বা লম্বা কালো দাগকাটা ইজের। গায়ের রঙ পোড়া তামার মত। চওড়া কাঁধ, মজবুত গর্দান। বিরাট দেহে

থরে থরে কঠিন পেশী। মাথার চুল নিরপেক্ষ ভাবে ছোট এবং সমান করে ছাঁটা। দু পায়ে লোহার বেড়ি।

ডান পাশ থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'লখাই ভাই—'

লখাই মাথা তুলল। ঘোর ঘোর রক্তাভ চোখ; মণি দুটি ঈষৎ লাল। উদ্ধত চোয়াল, চোখের নীচে হনু দুটি অতি প্রকট। রোমশ বুক, চ্যাপ্টা নাক, মাংসল উদর। সমস্ত শরীরে মোটা মোটা শক্ত হাড়।

ডাইনে তাকাল লখাই। দেখল, তোরাব আলী সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

সারা মুখে হিংস্র ভঙ্গি ফুটল লখাইর। ভাঙা কর্কশ গলায় সে বলল, 'আঁই হারামী, কি কইচিস?'

'কালা পানি রে লখাই ভাই!' ফিসফিস স্বরে তোরাব আলী বলল। তার গলায় কাঁপুনি ধরেছে।

'হুঁ।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আবার দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজল লখাই।

আকারে প্রকারে তোরাব আলী লখাইর মত ভয়াবহ নয়। বেঁটে খাটো দোহারা দেহ। কিন্তু ছোট ছোট গোলাকার চোখ দুটো অতি ধূর্ত, অতি কুটিল। ঠোঁটের পাশ থেকে কান পর্যন্ত ডান গালে পুরু কাটা দাগ। এই দাগটা এবং ধূর্ত কুটিল একজোড়া চোখ তার মুখটাকে ভীষণ করে তুলেছে।

তোরাব আলী ডাকল, 'লখাই ভাই—'

লখাই জবাব দিল না।

আপন মনেই এবার তোরাব আলী বলতে লাগল, 'সমুন্দরের পার কূল নাই। দরিয়া দেখে বুকের লৌ যে পানি হয়ে যায়। হা আল্লা, কোথায় জন্ম দিলে আর কোথায় মারতে নিয়ে চলেছ। তোমার মর্জি বুঝি না।'

অনেকটা সময় কাটে।

লখাই কথা বলে না। এই বিপুল সমুদ্রের মতই আল্লার মর্জির পারকূল না পেয়ে চুপচাপ বসে থাকে তোরাব আলী।

জাহাজটা মুহূর্তের জন্য থামে না। ধক ধক অদ্ভুত শব্দ করে অবিরাম ছোটে। চাকার বাড়ি লেগে লবণসমুদ্র গেঁজে ওঠে। কালো দরিয়ায় পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারের মত সাদা ফেনা ফোটে।

চারিদিকে শুধু জল, কালো কুটিল জল। নিঃসীম অফুরন্ত বঙ্গোপসাগর।

বঙ্গোপসাগর তো কোনদিন শুকায় না, কোনকালে ফুরায় না। এর জলতলের মাটি কেউ কোনদিন দেখে নি ; চিরকাল গোপন হয়েই আছে।

তোরাব আলী হঠাৎ বলে, 'জবর তরাস লাগে লখাই ভাই—'

'তরাস লাগে !' দু হাঁটুর ফাঁক থেকে মুখ তুলে দেখে লখাই। বলে, 'কেন ?'

'দরিয়া দেখে, কালা পানি দেখে।'

লখাই ক্ষেপে ওঠে। রক্তাভ চোখজোড়া জ্বলতে থাকে। সে বলে, 'মানুষের খুন দেখে তরাস লাগে না, পানি দেখে তরাস লাগে ! চুপ মার কুত্তা ; এট্টুন ঘুমুতে দে।'

জাহাজের দোলানিতে কাল সারারাত এক দণ্ড ঘুমাতে পারে নি লখাই। কপালের দু পাশে সরু সরু রগগুলো যন্ত্রণায় ফুলে উঠেছে ; দাপাদাপি করছে। মোটা মোটা আঙুলে টিপেও তাদের বাগ মানানো যাচ্ছে না।

ভয়ানক চোখে তোরাব আলীর দিকে একবার তাকিয়ে আবার হাঁটুর ফাঁকে মাথা নামায় লখাই।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশ থেকে আর্তনাদ ওঠে।

চমকে তাকায় লখাই। লোকটা দু হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কাঁদছে আউটরাম ঘাটেই প্রথম দেখেছে ; লোকটা বর্মা মুলুকের। নামটাও জেনে নিয়েছে লখাই। মঙ চো।

ধারালো কনুইটা দিয়ে মঙ চো'র পাঁজরে সজোরে খোঁচা দিল লখাই। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'কি রে শালা, চিল্লাচ্ছিস কেন ?'

মুখ থেকে হাত নামায় মঙ চো। কুতকুতে চাপা চোখ দুটো কান্নায় বুজে গিয়েছে। মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছে। ভাঙা-ভাঙা গলায় দুর্বোধ্য ভাষায় হাউ-হাউ করে কি যে সে বলে, কিছুই বোঝা যায় না। হাত বাড়িয়ে বার বার সে সামনের সমুদ্র দেখায়।

লখাই চেঁচায়, 'হারামীটা কি বলে রে, এট্টুও বুঝি না।'

তোরাব আলী বলে, 'দরিয়া দেখে বুঝি ডর লেগেছে বর্মীটার !'

'ডরপোক !' বিদ্রূপে পুরু পুরু কালো ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল লখাইর। নীরোম ভ্রূর নীচে হিংস্র চোখজোড়া কোঁচকাল। লখাই গর্জে উঠল, 'কুত্তা কাঁহাকা ; ভাগ এখান থেকে। আমার পাশে বসে মাগীদের মত ফ্যাচর্ফ্যাচ করতে পারবি না।'

বলতে বলতে মণ্ড চো'র কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিল লখাই। আবার বলল, 'কাঁদলে অ্যায়সা কুস্থই হাঁকবো—'

মণ্ড চো কি বুঝল, সে-ই জানে। একবার লখাইর দিকে তাকাল। কাল জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিদারুণ কান্না জুড়েছে। এখনও থামে নি। পুরা একদিন সে কিছু খায় নি; শোয় নি। সমানে কাঁদছে। চোখ দুটো ফুলে উঠেছে।

মণ্ড চো'র ফোলা-ফোলা কুতকুতে চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটল। তার পরই দু হাতে মুখ ঢাকল সে। আর শব্দ করল না। শুধু শরীরটা থরথর কাঁপতে লাগল।

মণ্ড চো'র দিক থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে অনেক উঁচুতে তুলল লখাই। আশ্চর্য! একটা সাদা সাগরপাখি মাস্তলের ডগায় বসে রয়েছে।

লখাই বিরক্ত গলায় গজগজ করে, 'খালি ডর আর ডর। অতই যদি তরাস, তবে কালা পানি যেতে চেয়েছিলি কেন রে হারামীর বাচ্চারা! আঁই—'

একটু থামে লখাই। আবার শুরু হয়, 'সমুদ্দুর দেখেই মড়াকান্না লাগিয়েছিস! শালা আন্দামানে নেমে দম ফেটে খতম হয়ে যাবি। চোদ্দ বছর ঘানি ঘোরাবি কেমন করে!'

সময় যায়। রোদের তেজ বাড়ে। মাস্তলের ডগায় সাগরপাখিটা যেন জ্বলতে থাকে।

এবার মণ্ড চো'র কাঁধে হাত রাখে লখাই। নরম গলায় বলে, 'কাঁদবিই যদি, তবে খুন করেছিলি কেন? জানিস না, খুন করলে হয় ফাঁসি, নয় কালা পানি। ঐ সব কাঁদুনি ভুলে যা মণ্ড চো। আন্দামান হল জাহান্নাম জায়গা! সেখেনে কার কাছে কাঁদবি মানিক! ঘরের মাগ আছে সেখেনে!'

আরো অনেকটা সময় কাটে। কেউ শব্দ করে না। রোদের রঙ হলদে হয়ে আসে।

হঠাৎ তোরাব আলী বলে ওঠে। তার গলাটা বড় করুণ শোনায়, 'লখাই ভাই, তা হলে আমরা দ্বীপান্তরেই চললুম!'

ভারী গলায় লখাই বলে, 'হাঁ রে হাঁ। যাচ্ছিস আর মালুম পাচ্ছিস না!'

'শালার দিলটা জবর খারাপ হয়ে গেছে।'

লখাইর দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করে তোরাব আলী। চোখ দুটো চিকচিক করে।

লখাই বলে, 'কী হল আবার ?'

'বিবির কথা মনে পড়ছে।' ভাঙা-ভাঙা অদ্ভুত গলায় তোরাব আলী বলতে থাকে, 'বিবির পেটে ছানা রয়েছে। আসার সময় জাহাজঘাটে খুব একচোট কাঁদল সে, বলল, 'ছেলে জম্মে কুনোদিন তার বাপজানের মুখ দেখতে পাবে না।' একটু ছেদ, আবার, 'ঠিকই বলেছে বিবি, আন্দামান থেকে আর কুনোদিন ফিরতে হবে না। আর ছেলেও শালা বাপজানের মুখ দেখবে না।'

লখাই জবাব দেয় না। খুন খারাপি, রাহাজানি—দুনিয়ার সব রকম ভীষণতার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। লালসা, মত্ততা—এগুলির মহিমা সে পুরাপুরি বোঝে। কিন্তু বিষাদে মন যখন নরম হয়, তার মুখে পছন্দসই জবাব যোগায় না।

তোরাব আলী আবার বলে, 'দিলটা গোরস্থান হয়ে গেছে। কিছুই শালা ভাল লাগে না। খেয়ে শুয়ে বসে জুত পাই না। খালি বিবির পেটের ছানাটার কথা ভাবি।'

লখাইর গলাটা বিষণ্ণ শোনায়, 'আন্দামান যাচ্ছিস তোরাব। ঐ সব বিবি ছেলের কথা ভুলে যা। যত ভাববি, দিল তত বিগড়োবে।'

'ভুলতেই তো চাই। কিন্তুক, খোদা কি ভুলতে দেবে ? কোতল করেছি —হিসেব করে গুনাহ্‌র সাজা দেবে না?' একটু থামে তোরাব আলী। বড় বড় শ্বাস টানে। অল্প অল্প হাঁফায়। তারপর বলে, 'দরিয়ার এ-পারে থাকবে বিবি, অনেক ফারাকে দরিয়ার ও-পারে থাকব আমি। খোদার মতলব দিনরাত বিবির কথা ভাবিয়ে ভাবিয়ে আমাকে খতম করবে।'

এবার লখাই উত্তর দেয় না। স্থির দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। চোখের পাতা পড়ে না।

তোরাব আলী বলে, 'কি করি বল্ দিকি লখাই ভাই ? বিবির কথা ছেলের কথা ভেবে কুনো কালে তো দিলটা এমন বিগড়ে যেত না !'

বড় করুণ দেখায় তোরাব আলীকে। তার কুটিল, কদাকার মুখখানা এই মুহূর্তে তত খারাপ মনে হয় না।

দিলকে ফুর্তি দেবার মত একটি মাত্র অমোঘ প্রক্রিয়ার কথাই জানা আছে লখাইর। ভাঁড়ে ভাঁড়ে নির্জলা তাড়ি গিলে ভাড়া-করা কোন মেয়েমানুষের ঘরে একটি উন্মত্ত রাত্রি কাটানো। তাড়ির উগ্র ঝাঁজালো স্বাদে এবং তীব্র উত্তেজক নারীমাংসে যে মৌতাত জমে, তাতে একটি রাত্রি বুঁদ হয়ে থাকলে

বিগড়ানো দিল আপনিই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু আন্দামানগামী এই জাহাজে ঐ বস্তু দুটি নেহাতই নাগালের বাইরে। তা ছাড়া হঠাৎই লখাইর মনে হয়, দুনিয়ার সব মন খারাপের প্রতিকার বোধ হয় নেশায় এবং নারীমাংসে নেই।

বলি বলি করেও দিলকে ফুর্তি দেবার মত অমোঘ উপায়টার কথা তোরাব আলীকে বলতে পারে না। অদ্ভুত বিষাদে মনটা ভরে যায়। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে লখাই।

তোরাব আলী ডাকে, 'লখাই ভাই—'

আচমকা লখাই খেঁকিয়ে ওঠে, 'চুপ মার! সেই থেকে ঘ্যানঘ্যান লাগিয়েছে! শালা যেন একাই বিবি ছেড়ে এয়েছে—'

বঙ্গোপসাগরের ঢেউ ফুঁড়ে ফুঁড়ে জাহাজ ছোটে। বিপুল সমুদ্র পেরিয়ে কবে যে আন্দামানের কূল মিলবে, কে জানে?

তিনটে কয়েদী চার নম্বর হ্যাচের উপর নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে

দুই

আউটরাম ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়ার পর দু দিন পার হল।

ডেরিকের নীচে বসে সমুদ্র দেখছিল লখাই।

জাহাজের শব্দে উড়ুক্কু মাছগুলি জল ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছে। সাঁ করে খানিকটা উড়ে আবার সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাদের ফিনফিনে রুপালী ডানা রোদে চিকমিক করে।

দু দিন ধরে পাটল রঙের যে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ভাসছিল, আজ তারা বদলে গিয়েছে। কালো মেঘ দক্ষিণ আকাশে পাহাড়ের মত জমেছে। এতটুকু ফাঁক নেই, রন্ধ্র নেই। দরিয়ার এই মেঘ—নিরেট, কঠিন এবং ভয়ঙ্কর।

এখন বিকেল।

দক্ষিণ দিকের জমাট মেঘ ফুলতে শুরু করেছে। চতুর্দিকে তার শুঁড় বেরিয়েছে। বাকী তিন দিকের খণ্ড খণ্ড মেঘগুলিকে শুঁড় দিয়ে টেনে এনে মিলে মিশে একাকার হয়ে আকাশ ঘেরাও করছে।

সামনের মাস্তুলটার দিকে তাকাল লখাই। আশ্চর্য! সাগরপাখিটা উধাও হয়েছে। থেকে থেকে পাখিটা কোথায় যে পালায়, ঠিক করে উঠতে পারে না লখাই। তা ছাড়া পাখির ভাবনা ভাবার সময়ও এটা নয়। আর তেমন মনও নয় লখাইর।

পায়ের বেড়ি বাজাতে বাজাতে ভিখন আহীর এল। লোকটার মাথা এবং বাঁ গালটা সমেত একটা চোখ পোড়া। মাথায় একটি চুল নেই। বাঁ গালে কালো কালো পোড়া মাংস কুঁচকে রয়েছে। মুখটা বীভৎস দেখায়।

ভিখনের একটি মাত্র চোখ। সেই চোখটার উপর লালচে ভুরু। নাক নেই; দুটো গোলাকার গর্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালায়।

এমন ভয়ানক চেহারার ভিখন—কিন্তু তার গলার স্বর বড় সরু, বড় সুরেলা। সে বলল, 'কি করছিস লখাই?'

'দরিয়া দেখছি।' লখাইকে নির্লিপ্ত দেখায়।

লখাইর পাশে বসে পড়ে ভিখন। ফিসফিস করে বলে, 'এই দু রোজ পেটে কুছ পড়েছে?'

ভিখনের একটি মাত্র চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফোটে।

লখাই দু পাশে মাথা নাড়ে। মুখে বলে, 'না। জাহাজে ওসব পাব কোথায়? ডাঙায় নেমে খোঁজ করতে হবে।' একটু থেমে আবার শুরু করে, 'ও সব না পেলে শালা সমুদ্দুর সাঁতরেই আন্দামান থেকে ভাগবো।'

'আমার দিকে চা।' ভিখন আস্তে আস্তে বলে। তার মুখে মিটিমিটি রহস্যময় হাসি ফোটে।

লখাই ঘুরে বসে।

চারদিক ভাল করে দেখে নেয় ভিখন। খানিকটা সময় কাটে। কান সজাগ করে জাহাজের সমস্ত শব্দ শোনে। শব্দগুলির মর্ম বুঝবার চেষ্টা করে। তারপর নিঃসন্দেহ হয়। নাঃ, আশেপাশে কেউ নেই।

কোমরের খাঁজ থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে ভিখন। তীব্র মাদক গন্ধে স্নায়ুগুলো ঝিমঝিম করে ওঠে লখাইর। প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে। ঘোর কাটলে লাফিয়ে উঠল, মুহূর্তের মধ্যে ভিখনের থাবা থেকে মোড়কটা ছিনিয়ে নিল। উত্তেজনায় তার বিরাট দেহটা অল্প অল্প কাঁপছে। চোখদুটো চকচক করছে।

লখাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'আফিং, কোথায় পেলি?'

তালু এবং জিভের যোগাযোগে অদ্ভুত শব্দ করে ভিখন। তারপর বলে, 'সামাল দাদা, নেশা হাতে পেয়ে মাথা বিগড়ে গেল! চিল্লাচ্ছিস যে, লাল পাগড়িওলারা টের পাবে না!'

এখন পৃথিবীর কোন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই লখাইর। তার সব উৎসাহ, সব কৌতূহল এখন মোড়কটার মধ্যে। পরতের পর পরত কাগজ খুলে কালো রঙের আফিম বের করল লখাই; ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে গোলাকার পিণ্ড পাকিয়ে চক্ষের পলকে মুখে পুরে দিল।

চেয়ে চেয়ে সব দেখল ভিখন। হুস করে ফুসফুসে বাতাস টানল। পর মুহূর্তেই বাতাসটা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরুল।

কর্কশ মোটা জিভটা একবার বের করল ভিখন। ফাটা-ফাটা ঠোঁট দুটো চাটল। মুখেচোখে কেমন এক ধরনের আক্ষেপ ফুটল। ভাবল, আফিমের কথাটা লখাইকে না জানালেই হত।

চোখ বুঁজে আসছে লখাইর। আফিমের নেশা জমতে শুরু করেছে।

শিরায় শিরায় ঝিমঝিম উত্তেজনা মেতে উঠেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

আফিমের প্রথম আঘাত সামলে লখাই বলল, 'আফিং পেলি কোথায় ভিখন ?'

'তোকে বলেছিলুম না লখাই, আমি এই সমুন্দরেও সব চীজ জোটাতে পারি।'

'সত্যি ?'

'হাঁ, সচ।'

চোখ বুঁজেই লখাই তারিফ করে, 'তুই শালা আসলী হীরে। এই জন্যেই তো তোকে এত পেয়ার করি। কিন্তুক মানিক, আফিং কেমন করে জোটালি তা তো বললি না।'

'আমার দিকে চা।'

চোখের পাতা অল্প ফাঁক করে লখাই তাকায়। আর ভিখন অদ্ভুত কৌশলে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে একটা টাকা বের করে। বুড়ো আঙুলে ধাতু-মুদ্রাটি বাজায়। ঠং করে শব্দ হয়। সে বলে, 'ভেইয়া রে, এই চীজ হল রুপেয়া। এই চীজ তোর কাছে থাকলে, তুই দরিয়াতেই থাক আর আসমানেই থাক, দুনিয়ার হর চীজ তোর হাতে আসবে।'

'সত্যি ?'

'সচ।'

'সব চীজ ?'

'জরুর।'

মুহূর্তে লখাইর মনের কথাটা বুঝে নেয় ভিখন। একমাত্র চোখটা কুঁচকে ফিসফিস করে বলে, 'আওরত ভি মেলে।'

এবার পুরাপুরি চোখ খুলে ফেলে লখাই। আফিমের নেশা স্নায়ুতে স্নায়ুতে ঘা মারছে। কাঁপা তীব্র গলায় সে বলে, 'দরিয়ায় মেয়েমানুষ কোথায় মিলবে ?'

'মিলবে রে ভেইয়া, মিলবে।' চারদিকে তাকিয়ে ভিখন বলে, 'নগদা চৌআনি খসিয়ে হাবিলদারজীর কাছ থেকে খবরটা জুটিয়েছি। শালা হারামী বলতে কি চায় ?'

'কি খবর ?'

'বহুত বঢ়িয়া খবর।'

লখাইর কানে মুখটা গুঁজে তীক্ষ্ণ সরু গলায় ভিখন বলে, 'এই জাহাজে পঞ্চাশটা আওরত কয়েদী চলেছে।'

'সত্যি?' উত্তেজনায়, উল্লাসে চোখদুটো ঝিকঝিক করে লখাইর। সে বলে, 'ঠিক বলছিস?'

'জরুর ঠিক।'

অনেকটা সময় কাটে। কেউ কথা বলে না, শব্দ করে না। শুধু দুটো কয়েদীর তিনটে চোখ ধিকিধিকি জ্বলে।

হঠাৎ ভিখন বলে, 'তোকে আফিং জুটিয়ে দিলুম, আওরতের খবর বাতলে দিলুম। আমার কথাটা মনে আছে তো?'

'তোর আবার কি কথা?'

'সাবাস ভেইয়া, এর মধ্যেই ভুলে গেলি?'

পোড়া বীভৎস মুখখানা যতদূর সম্ভব করুণ করে ভিখন বলে, 'রোজ তোর খানা থেকে একটা করে রোটি দিবি বলেছিলি না?'

লখাই জবাব দেয় না। নির্বিকার ভঙ্গিতে সমুদ্র দেখতে থাকে। নেশাটা জমে ওঠার মুখে হঠাৎ যেন ফিকে-ফিকে লাগে।

ভিখন আবার বলে, 'আমার ভুখটা বড় হারামী; জেলের খানায় পেট ভরে না। শুনেছি আন্দামানে খানা থোড়া মেলে। রামজীর কসম লখাই, আন্দামানে তোকে রোজ নেশা জুটিয়ে দেব, লেকিন রোটি দিবি তো?'

'দেব।'

মুখে বলে বটে, কিন্তু মনে মনে লখাই ভাবে রুটির বদলে নেশার কথাটা ভিখনকে না বললেই হত।

রুটির বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলে ভিখন। বলে, 'ইয়াদ রাখিস লখাই, নইলে মরে যাব।'

'চুপ মার!' লখাই গর্জে ওঠে।

তবু ভিখন বিড়বিড় করে বকে, 'দু রোজ জাহাজে চিঁড়ে চিবিয়ে রয়েছি। তকদির বহুত খারাপ! রুপেয়া হলে জাহাজে নেশা মেলে, লেকিন খানা মেলে না। পেটে আগুন জ্বলছে। শালারা ভুখাই খতম করবে।'

এই দু দিন চিঁড়ে মরিচ আর সামান্য নিমক ছাড়া কিছুই জোটে নি

কয়েদীদের। খিদের তাড়নায় ভিখনের পোড়া কদাকার মুখটা হিংস্র দেখায়।

বিরক্ত চোখে তাকায় লখাই। চড়া গলায় বলে, 'কি কইছিস ?'

'ভুখাই মরব।'

'খালি ভুখ আর ভুখ। দুনিয়া খেয়ে ফেললেও ভুখ মিটবে না।' একটু থেমে লখাই বলে, 'শালা দ্বীপান্তরে গিয়ে আন্দামানটাকেই গিলে ফেলবে।'

ভিখন চুপচাপ বসে থাকে।

লখাই আবার বলে, 'রুপেয়া হলে তো হর চীজ মেলে। খানা জুটল না ?'

'জুটেছিল। লেকিন খেতে পারলুম না।'

'কেন ?'

'জাহাজীরা খানা পাকাচ্ছিল। ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সেখানে গেলুম। লাল পাগড়িওলারা টের পেয়ে আমাকে ধরে আনলে; হারামীরা খেতে দিলে না। অ্যায়সা রদ্দা হাঁকলে, এই ছাখ্ গর্দান চুরচুর হয়ে গেছে।' একটু থেমে দম নেয় ভিখন। তারপর চাপা ক্রুদ্ধ গলায় অশ্রাব্য খিস্তি করে।

অনেকটা সময় কাটে।

হঠাৎ মুলাইম গলায় লখাই ডাকে, 'এই ভিখন—'

'কি ?'

'মাগী কয়েদীগুলো কোথায় রে ?'

'জানি না।'

'ঠিক বলছিস ?'

'হাঁ।'

দু চোখের ফাঁদ পেতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে লখাই। নাঃ, ভিখনের মুখে ভাবান্তর ফুটছে না; তেমন কোন কারসাজিও নেই। তবু চড়া, কর্কশ গলায় সে বলে, 'ঝুটা বলবি না ভিখন; শালা কোতকা হাঁকবো—'

'ঝুট বলছি না।' মাপা আধ হাত জিভ কাটে ভিখন। কানে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'আওরত কয়েদীরা কোথায় আছে, হাবিলদারজী বাতায় নি। সচ বলছি, রামজী কসম।'

'যা, ভাগ এখান থেকে।' লখাই খেঁকিয়ে উঠল।

ভিখন চলে গেল।

তিন

প্রথমে খেয়াল করে নি লখাই। হঠাৎ আকাশ এবং সমুদ্রের চেহারা দেখে তার অন্তরাত্মা চমকে উঠল।

দক্ষিণ দিকের কালো জমাট মেঘ একটু একটু করে অর্ধেক আকাশটাকে কখন যেন ঢেকে ফেলেছে। তুফান উঠছে সাঁই সাঁই। উপরে কালো মেঘ ফুলছে, নীচে লবণ দরিয়া উথলে উথলে উঠছে; সমানে ফুঁসছে। পশ্চিমা বাতাস শূন্যে পাক খেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আকাশটাকে ফালাফালা করে ফেড়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। কড়কড় শব্দে বাজ গর্জায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রলয় ঘটে গেল।

সামনের ফোর মাস্টটা মড়মড় করে; যে কোন সময় সেটা ভেঙে পড়তে পারে। এলফিনস্টোন জাহাজটা বিরাট বিরাট ঢেউয়ের মর্জিতে একবার আকাশে উঠছে; পর মুহূর্তেই পাতালে নামছে। উন্মাদ দরিয়া দু পাশ থেকে তাকে এলোপাথাড়ি ঝাঁকাচ্ছে।

রোলিং এবং পীচিং শুরু হয়েছে।

আকাশের কোথাও এখন সূর্যটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথাও এতটুকু আলো নেই! কালো, কুটিল, ভয়ঙ্কর অন্ধকার আকাশ এবং সমুদ্রকে ঘিরে ফেলেছে।

বিপদ সঙ্কেত করে যে ঘণ্টাটা, সেটা অবিরাম বাজছে। দূরে যেন ডেকে, ব্রিজে, এঞ্জিন রুমে খালাসী-সারেঙ-সুখানিরা সমানে চিৎকার করছে। কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। মেঘ সমুদ্র আর কড়কড় বাজের গর্জন সব শব্দকে ঢেকে দিয়েছে।

কালা পানি মেতেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে আপার ডেকের উপর জল উঠছে। জাহাজের আলোগুলো একবার জ্বলছে, একবার নিবছে।

চারদিকে একবার তাকাল লখাই। যাত্রী বলতে এই জাহাজে একমাত্র কয়েদীরাই। ডেকের কোথাও তাদের চিহ্নমাত্র নেই। কি এক ভোজবাজিতে তারা উধাও হয়েছে। সদাব্যস্ত খালাসী, যারা কাজে অকাজে জাহাজময় ছোটাছুটি করে, তাদের একজনকেও দেখা গেল না।

জাহাজের এ অংশটা নির্জন। জাহাজীদের গোটা কতক কেবিন, একটা হ্যাচ, মাল তোলার একটা ডেরিক, ফ্ল্যাগ স্ট্যাণ্ড আর খোলা ডেক—এ ছাড়া কিছুই নেই।

ডেরিকের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল লখাই। কিন্তু পর মুহূর্তে তুফান আর বাতাসের বাড়ি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আবার উঠবার চেষ্টা করল; আবারও পড়ল। আর উঠল না লখাই।

সমুদ্র থেকে অবিরাম লবণ জলের ঝাপটা আসছে। জল আর বাতাসের যা জোর, উঠলে হয়তো সমুদ্রে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। তা ছাড়া পায়ে মোক্ষম বেড়ি পরানো। হাঁটলে একবারে বিঘত-খানেকের বেশি এগুনো অসম্ভব; বেশি হলেই বেড়িতে টান পড়ে।

পুলিস হাবিলদারের চোখ এড়িয়ে ডেরিকের নীচে এসে বসেছিল লখাই। দরিয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হল, না এলেই ভাল ছিল।

বসে থাকারও উপায় নেই। জল আর ঝড় ডেরিকের মোটা-মোটা লোহায় আছাড় মেরে গুঁড়িয়ে ফেলবে। এখান থেকে ডান দিকে কম পক্ষে শ-খানেক হাত যেতে পারলে তাদের লোয়ার ডেকের সিঁড়ি মিলবে। আর বাঁ দিকে হাত পঞ্চাশের মধ্যেই ছাদ-ঢাকা আর একটা ডেক, জাহাজীদের কেবিন।

মুহূর্তে স্থির করে ফেলল লখাই, বাঁ দিকেই যাবে। যেমন করেই হোক, সেখানে পৌঁছুতে হবে। আপাতত একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই।

দাঁতে দাঁত চাপল লখাই। তারপর উবু হয়ে শুয়ে পড়ল। অকারণ আক্রোশে চোখদুটো তার জ্বলছে।

জাহাজটা অবিরাম ভোঁ বাজিয়ে চলেছে। বিপুল সমুদ্রে নিজের অসহায় ক্ষীণ অস্তিত্বটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঝড় এবং তুফানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ছে।

আর খোলা ডেকের উপর বুকে হাঁটতে হাঁটতে জল আর বাতাসের সঙ্গে সমানে যুঝছে লখাই। শরীরটা ভিজে গিয়েছে। শীতে হাড়ের মধ্যে কাঁপন ধরেছে। বুকটা ছিঁড়ে খানে খানে চামড়া উঠেছে। তবু এগুবার বিরাম নেই।

পিছল ডেকে বুকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ভাল লেগে গেল লখাইর। এই উন্মাদ দরিয়ার সঙ্গে তার স্বভাবের কোথায় যেন একটা সাঙ্ঘাতিক মিল আছে।

একবার চোখ মেলবার চেষ্টা করল লখাই। পারল না। লোনা জলের ঝাপটায় চোখদুটো করকর করছে। আন্দাজে বুঝল, আর একটু যেতে পারলেই জাহাজীদের কেবিনগুলো পাওয়া যাবে।

সমুদ্রের মত্ততা বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডবও বাড়ছে। উত্তর থেকে যে বাতাস দক্ষিণমুখী ছুটছিল, মাঝ দরিয়ায় অসহায় জাহাজটাকে পেয়ে খুব একচোট নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছে। তুফান আর বাতাস একযোগে কারসাজি করেছে, জাহাজটা না ডুবিয়ে ছাড়বে না।

অনেকক্ষণ পর ছাদ-ঢাকা ডেকে এসে হাঁফাতে থাকে লখাই। এতক্ষণ উথল-পাথল দরিয়ার সঙ্গে প্রাণ বাঁচাবার উত্তেজনায় সমানে যুঝেছে। এখন ক্লান্তিতে শরীরটা কাহিল হয়ে আসছে। বুকটা তোলপাড় করে শ্বাস উঠছে, নামছে।

দু পাশে ক্রুদের কেবিন। মাঝখানের প্যাসেজে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল লখাই। জাহাজের এলোপাথাড়ি দোলানির সঙ্গে দু পাশের কেবিনে ক্রমাগত ঘা খেতে লাগল। নাক মুখ ফেটে তাজা রক্তের ফোয়ারা ছুটল। জাহাজের বাড়ি ঠেকাবার মত সামর্থ্যটুকু পযন্ত সে হারিয়ে ফেলেছে।

দু পাশের কেবিনে টাল সামলাতে সামলাতে একটা লোক প্যাসেজের মধ্য দিয়ে আসছিল। লখাইর কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল। ঝড়ের দরিয়ায় ডেকে লোক থাকে না। সকলকে জাহাজের হোলে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়াটা দস্তর। লখাইকে বাইরে দেখে লোকটা চমকে উঠল। বিস্মিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে রে?'

মাথা তুলবার চেষ্টা করল লখাই। দেখল, সামনেই ডাংরি-পরা একটা খালাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্জীব গলায় কি যেন বলতে চাইল লখাই, পারল না।

দুর্বোধ্য স্বরে তড়বড় করে অনেকগুলো কথা বলে গেল খালাসীটা। 'ছাইক্লোন' ছাড়া বাকী একবর্ণও বোঝা গেল না। তবে লখাই আন্দাজ করল, খালাসীটা ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছে।

উৎকর্ণ হয়ে লখাইর জবাব শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে রইল খালাসীটা। যখন জবাব মিলল না, তখন দু ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে তাকে প্যাসেজের শেষ মাথায় নিয়ে এল। এটা জাহাজের দক্ষিণ প্রান্ত। লোয়ার ডেকের দরজাটা খুলে ফেলল সে; মুহূর্তের মধ্যে লখাইকে ভিতরে ঢুকিয়ে আবার বন্ধ করে দিল।

লোহার খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে এসে পড়ল লখাই। অতি কষ্টে

একবার চোখ মেলল। নীচের এই পাতাল-লোকটাকে বুঝবার চেষ্টা করল। জাহাজের এই অংশটা একেবারেই অচেনা। পিছনের ডেরিকের নীচে এসে বসেছে কতবার; অথচ তারই পঞ্চাশ হাতের মধ্যে এমন একটা বিস্ময়কর তুনিয়া ছিল, গত তু দিনে কি একবারও ভেবেছিল লখাই?

পোর্ট হোলের কাচ সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। উইণ্ড ব্লোয়ার দিয়ে তীব্র বেগে বাতাস আসছে। বাতিগুলো একবার জ্বলছে, আবার নিবছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল, লোয়ার ডেকের এক কোণে অনেকগুলো মেয়েমানুষ জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে। ভীষণ চমকে উঠল লখাই। তবে তো পশ্চিমা ভিখনটা মিথ্যে স্তোক দেয় নি! পঞ্চাশ আওরত কয়েদী সত্যিই তবে আন্দামান চলেছে! এইটুকুই মাত্র ভাবতে পারল লখাই। এই মুহূর্তে এর বেশি ভাবার মত শক্তিই তার নেই। জাহাজের বাড়ি খেয়ে নাকমুখ ফেটেছে; উন্মাদ সমুদ্রের সঙ্গে যুঝে যুঝে শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। মাথার রগগুলো একসঙ্গে দাপাদাপি শুরু করেছে।

একসময় আপনা থেকেই চোখ বুঁজে এল লখাইর। লোয়ার ডেকের আলো, মেয়েমানুষ, সব নিরাকার, অদৃশ্য হয়ে গেছে। দরিয়ার গর্জন, মেঘের ফোঁসানি, কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে।

লখাই নিশ্চেতন হয়ে পড়ে রইল।

অনেকটা সময় কাটল।

সমুদ্র এখনও সমানে ফুঁসছে। কালো আকাশটাকে আড়াআড়ি ফেড়ে বিত্যুৎ চমকায়। ঝড়ের আক্রোশ ক্রমাগত বেড়েই চলে।

লবণ দরিয়া একবার ক্ষেপে উঠলে সহসা থামতে চায় না।

লখাইর জ্ঞান ফিরল।

পোর্ট হোলের কাচ এখনও সমুদ্রের নীচে তলিয়ে রয়েছে। বাতিগুলো জ্বলছে, নিবছে। নিবছে, জ্বলছে। জাহাজটা একবার বাঁ পাশে হেলছে; পরমুহূর্তেই ডান পাশে ঝুঁকছে। একবার বিপুল তরঙ্গের মাথায় উঠেই আবার অথৈ অতলে নেমে যাচ্ছে। কখন যে কালা পানি জাহাজটাকে গ্রাস করে ফেলবে, কে জানে?

জাহাজের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে লটবহর, বোঁচকা-বুঁচকি, বিছানা-গাঁটরি, হরেক কিসিমের মালপত্র ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

একপাশে গোটাকয়েক মুরগীর ঝুড়ি রয়েছে। নিরীহ প্রাণীগুলো দরিয়ার গর্জন শুনতে শুনতে একটানা ককিয়ে চলেছে।

হঠাৎ লোয়ার ডেকের এক কোণ থেকে কান্নার রোল উঠল।

একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে লখাইর। স্নায়ুগুলো এখনও বড় দুর্বল। মাথার রগগুলো কেউ যেন ধারালো নখে ছিঁড়ছে। শিরায় শিরায় অসহ্য যন্ত্রণা ছোটাছুটি করছে। একবার তাকাল লখাই ; সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুঁজে এল।

অনেকগুলো গলার কান্না একসঙ্গে তুমুল হয়ে উঠতে লাগল। কান্নার রোলটি তীব্র, করুণ এবং অসহায়।

কিছুক্ষণ পড়ে পড়ে দরিয়ার ফোঁসানির সঙ্গে মানুষের কান্নামেশা এক অদ্ভুত শব্দ শুনল লখাই। তারপর হাতের ভর দিয়ে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে উঠে বসল। মাথাটা টলছে। নাকমুখ ফেটে যে রক্ত ঝরেছিল, তা এখন জমে গিয়েছে। খোলা ডেকে বুকে হেঁটে আসার সময় ঘষে ঘষে চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল ; বুকটা এখন জ্বলছে।

লখাই তাকিয়ে রইল।

লোয়ার ডেকের এক কোণে যে মেয়েমানুষগুলো জড়াজড়ি করে বসে ছিল, তারা চিৎকার করে কাঁদছে। একটানা কান্নার বিরাম নেই, ছেদ নেই। উন্মাদ দরিয়ার তাণ্ডব দেখে ডুবে মরার ভয় জেগেছে। খুব সম্ভব সকলে মিলে ডাক ছেড়ে কেঁদে কেঁদে তারা মরার ভয় ঠেকাচ্ছে।

কি করবে, কি বলবে, হঠাৎ কিছুই ভেবে উঠতে পারল না লখাই। হতবাক হয়ে বসে রইল।

একটু পর কান্নার রোল ঝিমিয়ে এল।

একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'দরিয়া বাওরা হয়ে উঠেছে ; জানে মরে যাব। জরুর জাহাজ ডুবে যাবে।'

কান্নার রোল ঝিমিয়ে এসেছিল। আবার সেটা তুমুল হয়ে উঠল।

মেয়েমানুষগুলো ভয়ার্ত গলায় সমানে চেঁচাতে লাগল, 'জরুর জাহাজ ডুবে যাবে।'

'জরুর ডুবে মরব।'

'এ রামজী কিরপা কর।'

'এ খোদা দোয়া কর।'

একটা বিরাট ঢেউ ফুলে ফুলে আকাশের দিকে উঠছিল। তার মাথায় চড়ে জাহাজটাও অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। আচমকা সমুদ্রের কি খেয়াল হল, প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে জাহাজটাকে ঢেউয়ের চড়াই থেকে অথৈ উতরাইতে আছড়ে ফেলল।

লোয়ার ডেকের এই পাতাললোকে কেমন এক ধরনের ভয় ঘনিয়ে এল। আকাশ-বাতাস-বজ্র-বিদ্যুৎ—সব বাওরা হয়ে উঠেছে। উন্মত্ত সমুদ্র ফুঁড়ে সাজ্ঘাতিক এক ভয় ছুটে এসে জাহাজটাকে গ্রাস করল।

প্রকৃতি এখানে নিরাবরণ, নগ্ন। পারাপারহীন সমুদ্রের মত তার ক্রূরতার অন্ত নেই। কালা পানির হিংসা বড় ভীষণ।

নীচে গহীন দরিয়া, উপরে কালো কুটিল আকাশ। বিপুল অন্ধকারে কোথাও একবিন্দু আলো নেই, যাকে ভরসা করা যায়। এমন কোন লক্ষ্য নেই, যাকে বিশ্বাস করা চলে।

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাড়নায় এলফিনস্টোন জাহাজটা দিশাহারা হয়ে ছুটছে। কোথাও কূল নেই, পার নেই, দিক-চিহ্ন নেই। আলো নেই, নিশানা নেই। তবু জাহাজটা ছুটছে। ছোটার বিরাম নেই।

পোর্ট হোলগুলো একবার জলতলে ডুবছে, আবার ভেসে উঠছে। বিজুরীর আলোতে পোর্ট হোলের কাচে উথল-পাথল দরিয়া আর আকাশ দেখা যায়। ডাইনে বাঁয়ে হাজার দিকে আকাশময় চিড় ধরছে। আর সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে লিকলিকে বিদ্যুৎ চমকায়।

লোয়ার ডেকের এক কোণে গোটাকয়েক প্রাণী দলা পাকিয়ে বসে রয়েছে। এখন আর তারা কাঁদে না, শব্দ করে না। অপরিসীম ভয়ে শিরায় শিরায় ছুটন্ত রক্ত তাদের হৃৎপিণ্ডে প্রবল ঘা দিচ্ছে। নিথর, নিস্পন্দ হয়ে পোর্ট হোলের কাচের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে তারা।

লখাই হঠাৎ বলে উঠল। তার গলাটা বড় কাতর শোনায়, 'এট্টু জল, বড় তিয়াস—'

লোয়ার ডেকের ঐ কোনায় চাঞ্চল্য দেখা দিল। তীব্র তীক্ষ্ণ একটা গলা শোনা গেল, 'কৌন রে ?'

'আমি—'

'হামি কৌন রে হারামী ?'

নির্জীব গলায় লখাই সাড়া দিল, 'আমি লখাই। কয়েদী—'

টাল-মাটাল জাহাজ। দু পাশের বাঙ্কে টাল সামলাতে সামলাতে দুটো মেয়েমানুষ লখাইর সামনে এসে দাঁড়াল।

লখাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। একেবারে সামনে যে রয়েছে, তার চোখের সাদা অংশে দুটো আড়াআড়ি লাল দাগ; তারা দুটো কটা। গায়ের চামড়া মাজা কালো, মসৃণ এবং পিচ্ছিল। চিকন কোমরের উপর সুঠাম ছিপছিপে শরীর। ঘন রোমশ ভুরু দুটো জোড়া। ছোট চাপা কপালে গোলাকার শ্বেতির চিহ্ন। পরনে মোটা শাড়ি; দেহের ঊর্ধ্বাংশে নীল ধাড়ি-আঁকা কুর্তা।

বিবির বাজারের মোতি প্রায়ই একটা কথা বলত, কাল ভুজঙ্গী। মেয়েমানুষটাকে দেখতে দেখতে কেন যেন এই মুহূর্তে সেই কথাই মনে পড়ল লখাইর। তাকিয়েই রইল সে। চোখে পলক পড়ল না।

হিন্দী এবং উর্দু মেশানো কিম্ভূত ভাষায় মেয়েমানুষটা বলল, 'কি রে শালে, কি মতলবে এখানে ঢুকেছিস?'

'এট্টু পানি, বড় তিয়াস—'ঢোঁক গিলে এইটুকুই মাত্র বলতে পারল লখাই।

'হারামী, পানি গিলবার আর যায়গা পাস নি?' পিছন থেকে একটা কর্কশ, বাজখাঁই গলা শোনা গেল, 'কুত্তীকা বাচ্চা, জানিস না এখেনে আওরত কয়েদীরা রয়েছে! এই সোনিয়া হঠ্‌ তো—'

সোনিয়াকে ঠেলে, কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে যে মেয়েমানুষটা সামনে এগিয়ে এল, তার দিকে তাকিয়ে অমন দুর্দান্ত লখাইর অন্তরাত্মাও মুহূর্তের জন্য আঁতকে উঠল। মাপা পাঁচ হাত দীর্ঘ শরীর। গলাটা সেই অনুপাতে অস্বাভাবিক খাটো। হাত জানু ছাড়িয়ে নীচে নেমেছে। কোটরের মধ্যে গোল চোখ দুটো ঝিকঝিক করছে। চতুষ্কোণ মুখ; উদ্ধত চোয়াল। ভাঙা গালে হনু দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মাথার আধাআধি পর্যন্ত টাক; পিছন দিকে কয়েক গাছা খোঁচা খোঁচা তামাটে চুল।

পরনের কাপড়টা পায়ের পাতা পর্যন্ত নামে নি; হাঁটুর খানিকটা নীচে এসে ঝুলছে।

মেয়েমানুষটা আবার গমকে উঠল, 'আমরা আওরত—'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল।

বিড়বিড় করে লখাই বলে, 'তুমি শালী আওরত; তুমি আওরত হলে মরদকা বাপ কে!'

সন্দিগ্ধ চোখে লখাইর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েমানুষটা। তারপর বলল, 'কি রে শুয়ারকা বাচ্ছা, গালি দিচ্ছিস ?'

'না।'

'তবে কি বলছিস ?'

'এট্টু পানি মাঙছি।'

'উল্লু কাঁহিকা, এখানে পানি মিলবে না।'

'বড় তিয়াস—' করুণ গলায় বলে লখাই।

'সচ বলছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'তবে ঠার ; পানি নিয়ে আসছি।'

জলের সন্ধানে লম্বা মেয়েমানুষটা কোণের দিকে চলে গেল।

কাল ভুজঙ্গী এক দৃষ্টে লখাইর দিকে তাকিয়ে ছিল। মৃদু নরম গলায় এবার সে বলল, 'তোর নাম তো লখাই ?'

'হাঁ, তোর ?'

'সোনিয়া।'

'যে পানি আনতে গেল, ও কে ?'

'হাবিজা।' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল সোনিয়া। তারপর বলল, 'জোড়া খুন করে এয়েছে।'

পৌরুষে কোথায় যেন আঘাত লাগল। লখাই ফুঁসে উঠল, 'আমিও পাঁচ-পাঁচটা খুন করে এয়েছি।'

খানিকটা চুপচাপ।

কেউ স্তব্ধতা ভাঙে না। সোনিয়া আর লখাই মুখ ঘুরিয়ে টাল-মাটাল জাহাজের দেওয়ালে কি দেখে, কে জানে ?

হঠাৎ লখাই বলে, 'তুই কালা পানি এলি যে সোনিয়া ?'

সোনিয়ার কপিশ চোখের তারা দুটো জ্বলে উঠল। বিষাদ, হিংস্রতা এবং রোষমেশানো অদ্ভুত এক ভঙ্গি ফুটল মুখে। দাঁতে দাঁত চেপে সোনিয়া বলল, 'সে কথায় তোর কোন কাম ?'

শান্ত, নির্বিকার গলায় লখাই বলল, 'তুইও আন্দামানে যাচ্ছিস, আমিও যাচ্ছি। জানপয়চান হল। তাই জিগ্যেস করছিলুম। কসুর হল ?'

'না।' কঠিন গলায় সোনিয়া বলল, 'শুনতেই যখন চাস, তখন বলছি। কোতল করেছিলুম ; বিশ বরষের দ্বীপান্তর হয়েছে।'

লখাই হাসল, বলল, 'আন্দামান যেতে হলে খুন করে যাওয়াই ভাল। ওসব ডাকাতি-ফাকাতি, ছ্যাঁচড়ামি করে লাভ নেই। কি বলিস সোনিয়া?'

আচমকা ফুঁসে উঠল সোনিয়া। ছিপছিপে কালো শরীরটা ঈষৎ বাঁকিয়ে দাঁড়াল। মাথাটা অল্প অল্প দুলছে। চোখের তারা দুটো সাপিনীর মত ক্রূর হয়ে উঠেছে। সে ধমকে উঠল, 'চোপ হারামী—'

খিস্তি খেয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত লাফিয়ে তালুতে চড়ল লখাইর। মেজাজটা বদখত হয়ে গেল। রক্তচোখে সোনিয়ার দিকে তাকাল লখাই। দু হাতের বিরাট থাবায় গলাটা টিপেই ধরত সোনিয়ার, কিন্তু তার আগেই ঘটনাটা ঘটল।

দরিয়ার আক্রোশ এখনও পড়ে নি। জাহাজের দক্ষিণ প্রান্তে যে উঁচু মাস্তলটা আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, সেটায় চড়চড় শব্দে চিড় ধরল।

জাহাজটা প্রমাদ গনে ; ভয় পেয়ে প্রচণ্ড শব্দে ভোঁ বাজায়।

লোয়ার ডেকের কোণ থেকে মেয়েমানুষগুলো ডুকরে কেঁদে উঠল। লখাই চমকে সেদিকে তাকাল।

বিড়বিড় করে সোনিয়া বলে, 'কালা পানি বাওরা হয়ে উঠেছে ; ডর পেয়ে ওরা কাঁদছে।'

উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি শব্দ শুনল লখাই। তারপর বলল, 'তুইও তো এতক্ষণ কাঁদছিলি।'

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল সোনিয়া। বলল, 'ঝুট! আমি আর হাবিজা কাঁদি নি।'

'আমি যে দেখলাম।'

'জরুর নেহী।' সোনিয়া বলতে লাগল, 'পিছনের দু বরষে আমি একবারও কাঁদি নি। আমার আঁখোমে আঁশু কেউ দেখে নি।'

অনেকটা সময় চুপচাপ কাটে।

হঠাৎ লখাই বলে বসে, 'তোর মুল্লুক কোথায় সোনিয়া?'

'কয়েদখানায়।'

'কয়েদখানা কারো মুল্লুক হয়?'

'হয়।' কঠিন গলায় বলে সোনিয়া।

স্থূল মনোধর্মের মানুষ লখাই। কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ সে বোঝে না। যে বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণতা থাকলে সামান্য রহস্যও বোঝা যায়, সেটুকু পর্যন্ত তার নেই। জীবনে যা কিছু সরাসরি এবং স্থূল, একমাত্র সেগুলির মাহাত্ম্যই সে বুঝতে পারে। বিরাট দেহে মন তার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে ক্রিয়া করে।

তবু সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে তার সংশয় জাগে। ধীরে ধীরে লখাই বলে, 'ঠিক বল তো, দুনিয়ায় কে কে আছে তোর?'

'কেউ নেই, কুছু নেই।'

হঠাৎ লখাইর পাশে বসে পড়ে সোনিয়া। দু হাতে মুখ ঢাকে। সুঠাম শরীরটা ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকে।

লখাইর মুখে সহসা জবাব যোগায় না। অথৈ দরিয়া যখন মেতে উঠেছে, তখন আন্দামানগামী এই জাহাজে এমন এক তাজ্জবের নারীর দেখা মিলবে, এ কথা কি কস্মিনকালে ভেবেছিল লখাই?

লখাই শুধু এটুকুই বলতে পারে, 'তুই কাঁদছিস সোনিয়া?'

'হাঁ। দু বরষে এই পয়লা কাঁদলাম।'

'কেন?'

'দিল হল।'

সোনিয়া মুখ তুলল। বাইরে অশান্ত, অফুরন্ত লবণ-সমুদ্র; ভিতরে সোনিয়ার দু গালে লবণ-জলের দরিয়া। লখাই ভেবেই পায় না, যে নারী কোতল করে সাজা নিয়ে আন্দামান চলেছে, দু বছরে যার চোখ একবারও ভেজে নি, সে কেন কাঁদে?

বহুদিন পর লখাই যখন জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মহিমা বুঝতে শিখেছিল, মানুষের মনের গহন গোপন কথাটি পড়তে পেরেছিল, সেদিন সোনিয়ার কান্নার অর্থ বুঝেছিল। লখাই জেনেছিল, পশ্চিমের এক দেহাতী গাঁও থেকে নিজের মরদকে খুন করে সোনিয়া আন্দামান এসেছে। কিন্তু সে কথা অনেক, অনেক পরের।

হতবাক হয়ে সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল লখাই। সমস্ত জীবনে নারীর একটি মহিমাই সে জেনেছে। যে নারী তার কামাতুর দেহ দিয়ে পুরুষকে মাতিয়ে তোলে, ছলাকলা দিয়ে বিচিত্র এক নেশায় তাকে বুঁদ করে রাখে, একমাত্র তাকেই সে চেনে, বুঝতে পারে। কিন্তু যে নারী খুন করে

এসে দুবছর পর আন্দামানের জাহাজে দু চোখের আঁশুতে দরিয়া ভাসায়, তার দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য মন বোঝা লখাইর সাধ্য নয়। তাকে সে আদপেই বুঝতে পারে না।

একটু পরেই হাবিজা জল নিয়ে ফিরল। কর্কশ গলায় ডাকল, 'এই সোনিয়া—'

'কি ?' সোনিয়া চোখ তুলল।

'হারামীটাকে পানি গেলা।' সোনিয়ার দিক থেকে গোলগোল দুটো কোটর-চোখ লখাইর উপর এনে ফেলল হাবিজা। তীব্র গলায় বলল, 'এই শালে, তুই এখেনে ঢুকলি কেমন করে ?'

'একটা খালাসী দু ঠ্যাং ধরে ঢুকিয়ে দিলে যে—'

সন্দিগ্ধ চোখে একবার লখাইর দিকে তাকাল হাবিজা। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা তার পাঁজরে গিঁথে দিল। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'পানি গিলেই ভাগবি। নইলে শির ছেঁচে দেব।' সোনিয়াকে বলল, 'পানি গেলা হলেই কুত্তাটাকে ভাগাবি।'

লখাই রুখে উঠল, 'গালি দিবি না—'

কোটরের মধ্যে দুটো গোলাকার চোখ ঝিকিয়ে উঠল হাবিজার। চড়া ভীষণ গলায় সে বলল, 'শালে, আওরতের গায়ের গন্ধ শুঁকবে আর গালি খাবে না। সব অ্যায়সা অ্যায়সা, মাগনা—'

বদখত মুখটা হিংস্র হয়ে উঠল হাবিজার। জলের লোটাটা লখাইর মাথার উপর তুলে গর্জে উঠল, 'হাঁকবো—'

সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারত। কিন্তু তার আগেই সোনিয়া হাবিজার হাত থেকে লোটাটা ছিনিয়ে নিল। বলল, 'তুই ওধারে যা হাবিজা—'

'হারামীটার জন্যে তোর দেখি বহুত দরদ—'

'দরদ নেই। পানি গিলিয়েই ভাগাচ্ছি।' সোনিয়ার গলা শান্ত এবং কঠোর শোনায়।

হাবিজা এক মুহূর্ত কি ভাবল, সে-ই জানে। কপালে অসংখ্য প্যাঁচালো রেখা ফুটল। গলার একটা শির ফুলে ফুলে মোটা হতে লাগল। ভুরু দুটো কুঁচকে রইল। সে বলল, 'আচ্ছা, ইয়াদ রাখিস সোনিয়া, ওটাকে না ভাগালে তোদের দুটোকেই কোতল করব। আমি ওদিকে হটছি। দরিয়ার ঝাঁকানিতে মাগীগুলো বমি করতে শুরু করেছে। খিদমত করতে হবে।'

হাবিজা চলে গেল। কয়েক ঢোঁক জল গিলেই বমি করে ফেলল লখাই। পাকস্থলীতে যা ঢুকছে, জাহাজের অবিরাম দোলানিতে সব ঠেলে বেরিয়ে আসছে। নির্জীব, নিঃসাড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

একটু পর কাতর গলায় লখাই গোঙাতে থাকে, 'বড় যন্তন্না হচ্ছে। বুকের কাছটা বহুত দরদ; বুকটা চেপে ধর সোনিয়া! চেপে ধর—অঁ—অঁ—অঁ—'

লখাইর মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত দেখায়।

সোনিয়া বাঙ্কের রড ধরে পিছন দিকে ঘুরল। ডাকল, 'এই হাবিজা—'

'কি কইছিস?'

'ইধারে আয়।'

'উধার থেকেই বল্।'

'আদমীটার বুকে দরদ হচ্ছে।'

খিকখিক শব্দে তীক্ষ্ণ প্রখর হাসি হাসে হাবিজা। হাসলই শুধু; কথা বলল না। তার হাসিতে অনেক কিছু ছিল। হাসি দিয়েই অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল সে।

সোনিয়াও আর কথা বলল না। ঘুরে বসে লখাইর বুকটা দুহাতে চেপে ধরল। একদৃষ্টে লখাইর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে পলক পড়ল না। শুধু হাতের পাতায় কঠিন পাথুরে বুকের হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করে একটানা বাজতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর সোনিয়ার নরম হাতের ডলায় যন্ত্রণার বেগটা কমে এল লখাইর। চোখ বুঁজে ছিল, মেলল। ঘন ঘন শ্বাস টানল। তারপর টেনে টেনে বলতে লাগল, 'খুব যত্ন করলি, খুব খিদমত। সারা জন্ম তোকে মনে রইবে।'

সোনিয়া জবাব দিল না।

লখাই আবার বলতে লাগল, 'শুনেছি, আন্দামানের কয়েদখানায় এক-এক কয়েদীর এক-এক কুঠরি মেলে। তুই আমার পাশের কুঠরিতে থাকবি?'

সোনিয়া নিরুত্তর বসে রইল।

আরো খানিকটা পর দরিয়ার আক্রোশ পড়ল। উন্মাদ কালা পানি শান্ত হল। উমড়ঘুমড় মেঘের ডাক থামল। আকাশের মেঘ উড়ে উড়ে কোথায়

যেন উধাও হতে লাগল। রাশি রাশি তারা দেখা দিল। সমুদ্র জুড়ে, যে দিকে তাকানো যায়, এখন কোটি কোটি ঢেউয়ের মাথা ঝিকমিক করতে থাকে।

জাহাজের দোলানি থেমে এল।

এখন রাত কত, কে জানে?

হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় লোহার দরজাটা ঘটাং করে খুলে যায়। সিঁড়ি বেয়ে ভারী ভারী বুটের শব্দ নামতে থাকে। দুটো পুলিস আর একটা পাঠান হাবিলদার লোয়ার ডেকে ঢোকে। পিছনে পিছনে আসে ভিখন আহীর।

ভিখন অদ্ভুতভাবে হাসে। তার একমাত্র চোখটা ধিকিধিকি জ্বলে। সে বলে, 'কি হাবিলদারজী, বলেছিলুম না, লখাই ভেইয়া পরীস্তানে রয়েছে। বেফয়দা তামাম জাহাজ ঢুঁড়লেন।'

লখাইর দিকে তাকিয়ে ভিখন বলে, 'হাঁ ভেইয়া, বহুত তখলিফ দিলি। ইধারে দরিয়া ক্ষেপে উঠেছে, উধারে তুই ভাগলি। সিপাইজীরা আমাদের কথা বিশোয়াস (বিশ্বাস) করে না। খালি বলে, লখাই শালেকো কোথায় সরিয়ে দিয়েছিস, বল্! পিটিয়ে পিটিয়ে কয়েদীদের হাড্ডি চুরচুর করে দিল সিপাইজীরা। লেকিন আমরা বলব কেমন করে? তুই ভেইয়া এখেনে ভেগে এসেছিস!'

পাঠান হাবিলদারটা লখাইর পেটে ভারী বুটের ঠোক্কর দিয়ে বলল, 'এ জনাব, সারা রাত তো জন্নাতে কাটালেন, এবার চলিয়ে।' একটু থেমে আবার, 'শালে, বহুত ভুগিয়েছিস।'

করুণ চোখে একবার সোনিয়ার দিকে তাকাল লখাই। তারপরেই দৃষ্টিটা ভয়ানক হয়ে পাঠান হাবিলদারটার মুখে পড়ল।

একটা পুলিস টিপ্পনী কাটল, 'শালে, এর মধ্যেই জমিয়ে নিয়েছিস! এলেমদার আদমী। আভি ওঠ্, ওঠ্—'

দুটো পুলিস লখাইকে টেনে উপরে তুলল। একটু পর সকলে অদৃশ্য হল। ঘটাং করে লোহার গেটটা বন্ধ হয়ে গেল।

যতক্ষণ লখাইকে দেখা গেল, সেদিকে তাকিয়ে রইল সোনিয়া। চোখে পলক পড়ল না।

আচমকা লোয়ার ডেকের এই পাতাল-লোকটাকে চমকে দিয়ে তীক্ষ্ণ, ভীষণ একটা হাসির রোল উঠল। হাবিজা হাসছে। হাসির দমকে তার দীর্ঘ, কদাকার শরীরটা বেঁকে দুমড়ে একাকার হয়ে যেতে লাগল।

সোনিয়া শিউরে উঠল।

হাবিজা টেনে টেনে বলল, 'একটা আদমী কোতল করে কালা পানি এলি। আর একটা আদমী দিলের কাছে এসে ভেগে গেল। বহুত খারাপ তকদির।'

সোনিয়া সাড়া দিল না; নিরুত্তর বসে রইল।

ঝড়ের দরিয়ায় দিক ভুল করে জাহাজটা পুব দিকে চলে গিয়েছিল। এবার কোনাকুনি দক্ষিণমুখী পাড়ি জমাতে হল।

আরো দুটো দিন কাটল সমুদ্রে।

উনিশ-শ এগারো সালের আর-এক দিন।

আড়াই শ কয়েদী নিয়ে একটি জাহাজ আন্দামানে পৌছল। জাহাজটির নাম এস. এস. এলফিনস্টোন।

চার

ওদিকে 'রস' দ্বীপ, এদিকে এবারডীন জেটি। মাঝখানে নীল জলের উপসাগর, নাম সিসোস্ট্রেস বে। সিসোট্রেস বে অর্ধবৃত্তের আকারে ঘুরে সাউথ পয়েণ্টের পাশ দিয়ে নিঃসীম সমুদ্রে মিশেছে।

উপসাগরের জল এখন আশ্চর্য শান্ত।

খানিকটা আগেই সকাল হয়েছে। শীতের রোদ বড় স্নিগ্ধ, মনোরম। উপসাগরের ছোট ছোট ঢেউগুলি চিকমিক করছে।

সিসোস্ট্রেস বে-র নীল জলে সবুজ রঙের এলফিনস্টোন জাহাজটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফোরমাস্টের মাথায় এক ঝাঁক সাগরপাখি সমানে চক্র দিচ্ছে।

এবারডীন জেটি। পাথরের ছোট জেটিটা সরু হয়ে উপসাগরে ঢুকে গিয়েছে।

এলফিনস্টোন জাহাজটা সিসোস্ট্রেস বে'তে ঢুকে নোঙর ফেলেছে ভোরবেলায়। কাল বিকেলেই জাহাজ আসার খবরটা সমস্ত পোর্ট ব্লেয়ার, পোর্ট ব্লেয়ার ছাড়িয়ে ক্রুখসাবাদ, পাহাড়গাঁও, গারাচারামা—দূর দূর গাঁওয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল কয়েদী এবারডীন জেটিতে জমায়ত হয়েছে। জন দুই টিণ্ডাল এবং তিনটে পেটী অফিসার ধমকে চেঁচিয়ে তাদের সামাল দিয়ে রাখতে পারছে না।

একটা কয়েদী বলল, 'এবার দু মাহিনা বাদে জাহাজ এল।'

অনেকগুলো গলার সায় মিলল, 'হাঁ হাঁ—'

আর একজন বলল, 'দু মাহিনা মুল্লুকের খবর পাই না।'

এরপর সকলে মিলে হল্লা শুরু করল।

'মুল্লুকসে জরুর চিট্টি এসেছে।'

'লেড়কার বোখারের খবর এসেছিল আগের জাহাজে। জিন্দা আছে কিনা খোদা মালুম।'

'হামকো ভি খবর এসেছিল; বহুটা না কি কার সঙ্গে ভাগবার মতলব করছে। এই জাহাজের চিট্টিতে সব জানতে পারব। শালীকে পেলে—'

'বিবি লেড়কা ছোড়্ শালে, পঁচাশ আওরত কয়েদী এসেছে এ জাহাজে—' সমস্ত গলার স্বর ছাপিয়ে একটা কর্কশ লোলুপ গলা চড়তে থাকে, 'সব মাগী বাহারে গুল।'

শোরগোল যখন তুমুল হয়, একটা *টিণ্ডাল* ঘুরে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, 'অ্যাই উল্লুলোক, চিল্লাও মাত।'

কিছুক্ষণের জন্য হল্লা থামে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিগি লাইন, ডিলানিপুর, ফোনিক্স বে—পোর্ট ব্লেয়ারের নানা বস্তি থেকে, দূর দূর গাঁও—মোঙলুটন, হামফ্রেগঞ্জ, মিঠাখাড়ি থেকে, 'বিজন' এবং 'টাপু'গুলো থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কয়েদী এবারডীন জেটিতে আসতে লাগল।

প্রতিমাসে একবার জাহাজ আসে আন্দামানে। এ মাসে যদি কলকাতা থেকে আসে, পরের মাসে আসবে রেঙ্গুন থেকে, তার পরের মাসে মাদ্রাজ থেকে। কলকাতা থেকে এসে জাহাজটা সোজা রেঙ্গুনে পাড়ি জমায়। এক মাস পর আসে আন্দামানে। আন্দামান থেকে এবার মাদ্রাজে। মাঝখানে আর একটা মাস। তারপর আবার এখানে এসে কলকাতায় ফেরার পালা।

আন্দামানের জাহাজ; পারাবার পারাপারের বাহন। মেন ল্যাণ্ডের সঙ্গে একমাত্র যোগাযোগ।

বিপুল সমুদ্রের ওপার থেকে জাহাজ আসে। সেই সঙ্গে আসে রসদ; দেশ গাঁও মেন ল্যাণ্ডের খবর। আর আসে নতুন কয়েদী। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালায় মানুষ বাড়ে; জীবন বাড়ে।

জাহাজ আসা না আসার সঙ্গে এই দ্বীপের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, আশা উল্লাস মরা-বাঁচা জড়িয়ে থাকে। দরিয়ার ওপার থেকে যে জাহাজটা একমাস পর পর মাত্র কয়েকদিনের জন্য এখানে ভিড়ে, তার সঙ্গে এই দ্বীপের ভবিষ্যৎ জড়ানো। এই দ্বীপের ভাগ্য সে-ই নিয়ন্ত্রণ করে। আন্দামানের জীবনে জাহাজের ভূমিকা অসাধারণ।

জাহাজ আসার দিনের সঙ্গে আন্দামানের অন্য সব দিনের মিল নেই। এই দিনের স্বাদ-গন্ধই আলাদা। এই দিনটাই বিচিত্র।

এই দিনটিতে চাঞ্চল্য বাড়ে, ব্যস্ততা বাড়ে। দলে দলে কয়েদী জেটিতে এসে শোরগোল পাকায়। আন্দামানের ঢিমে তেতালা জীবনের বেগ দ্রুত হয়।

এই দিন সবাই আসে জেটিতে। যে কয়েদীর তামাম দুনিয়ায় কোথাও কেউ নেই; মেন ল্যাণ্ড থেকে চিঠি আসার কোন সম্ভাবনাই যার নেই; যার কোন কিছু সম্বন্ধে বিলকুল আগ্রহ নেই, সে-ও সকলের সঙ্গে আসে। এই দিনটাই যেন কেমন।

এই দিনটার জন্য কয়েদীরা উন্মুখ হয়ে থাকে। দেশ গাঁওয়ের কি খবর আসবে, নতুন কয়েদীরা কেমন মানুষ, কোন মুল্লুক থেকে আসছে—এ সব সম্বন্ধে একমাস ধরে জল্পনা চলে; জাহাজ আসার পর থামে। জাহাজ চলে যাবার পর আবার নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। এটুকুই তাদের বিলাস।

দিন যায়, মাস যায়। বছর কাটে। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়। মাসে মাসে নতুন কয়েদী আসার বিরাম ঘটে না। তারপর একদিনের নতুন কয়েদী আর একদিন পুরনো হয়। যাদের দ্বীপান্তরের দীর্ঘ মেয়াদ ফুরায়, তাদের কেউ কেউ ঐ জাহাজেই দেশে ফেরে। কেউ কেউ মেয়াদ ফুরালেও আন্দামানের মাটি আঁকড়েই পড়ে থাকে। বিয়েসাদি করে; সংসার পাতে। সন্তান-সন্ততিতে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের জীবন বাড়ায়।

তবু জল্পনা থামে না। জাহাজ আসাও বন্ধ হয় না। নতুন পুরনো, মেয়াদ-ফুরানো মেয়াদ না-ফুরানো—সব কয়েদীই এই দিনটিতে জাহাজঘাটে ভিড় জমায়। এই দিনটিকে ঘিরে উন্মাদনার শেষ থাকে না।

এই দিনটির মাহাত্ম্যই ভিন্ন।

এবার জাহাজ এসেছে দু মাস পর।

এই দু মাসে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মেন ল্যাণ্ড থেকে যে সব ভয়ঙ্কর খুনিয়ারা কয়েদী বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে দণ্ড ভোগ করতে আসে, তাদের মনেও আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। জাহাজ বুঝি আর আসবে না। দেশগাঁওয়ের খবর মিলবে না; সাজার মেয়াদ ফুরালেও ফেরা যাবে না। আন্দামানের দরিয়া দেখে দেখেই জিন্দগী ফৌত হয়ে যাবে।

কিন্তু জাহাজ এল।

অল্পবিস্তর ভয় সবার মনেই ধরেছিল। কিন্তু দুটো কয়েদীর বিন্দুমাত্র বিকার নেই। তাদের একজন পাঞ্জাবী; চান্নু সিং। অন্যটা বর্মী; মাউ খে।

এবারডীন জেটির একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তারা।

মাউ খে বলল, 'এ চান্নু—'

'কিয়া বাত ?'

'এই জাহাজে মঙ চো আসছে।'

'মঙ চো কৌন ?'

'তোকে কতবার বলি নি, আমার ভাই।'

মাউ খে'র বর্মাই উচ্চারণে হিন্দোস্তানী শব্দগুলো অদ্ভুত শোনায়।

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আমার এই ভাইটার চাকুর হাত খুব সাফ। আমাদের পেগু শহরে কত কোতল যে করেছে, এক ফায়া (বুদ্ধ) মালুম।'

খানিকটা কাটে।

এবারডীন জেটিতে ভিড় আরো বাড়ে। হল্লা তুমুল হয়ে ওঠে।

সূর্যটা মাঝ আকাশের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। তির্যক ধারালো রোদ এসে পড়েছে উপসাগরে। সিসোস্ট্রেস বে'র নীল জল জলতে থাকে।

মাউ খে আবার ডাকে, 'এ চান্নু—'

'কিয়া বাত ?'

মুল্লুকে ভাইটা ছাড়া কেউ ছিল না। বহুত ফিক (চিন্তা) ছিল। এবার আন্দামানে এক সাথ থাকব। মুল্লুক শালে জাহান্নামে যাক।' মাউ খে বিড়বিড় করে।

চান্নু সিং মাথা নেড়ে সায় দেয়।

একটু পর চান্নু সিং আবার খুব এক চোট মাথা নাড়ে। তার মুখে অদ্ভুত হাসি ফোটে। সে বলে, 'আঁই মাউ খে—'

'আ—ক্যা চান্নু ?'

'মুন্সীজীর কাছে বহুত আচ্ছা বাত শুনেছি। কাল বিকালে সে বাতালে—' বলতে বলতে চান্নু সিং থামে। তার চোখজোড়া ঝকমক করে।

মাউ খে'র ছোট ছোট চোখ দুটো পিটপিট করতে থাকে। আর একটু ঘন হয়ে দাঁড়ায় সে। ফিসফিস করে বলে, 'কি বাতালে মুন্সীজী ?'

'পঁচাশ আওরত কয়েদী এসেছে এই জাহাজে।'

কেমন এটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফোটে মাউ খে'র গোলাকার তামাটে মুখে। নিরাসক্ত গলায় সে বলে, 'বহুত পুরানা বাত ; ও বাত পুর্ট বিলাসের (পোর্ট ব্লেয়ারের) সব আদমী জানে। এগারচালানসে শুরু করে কাদাকাচাঙ— সব গাঁওয়ের সবাইকে পুছে ছাখ্।'

'ও বাত তো জানে। আউর এক রাত আছে ; সে বাত কেউ জানে না।'

'কি বাত ?'

'কারুকে যদি না বলিস, তবে বলব।'

'বিলকুল নেহী। কারুকে বলব না।'

'দুশমনি করবি না তো ?'

'না। ফায়া (বুদ্ধ) কসম।'

কাঠের চিরুনি দিয়ে লম্বা লম্বা চুল আঁচড়ায় চান্নু সিং। আর তেরছা নজরে মাউ খে'র মুখচোখের ভঙ্গি লক্ষ্য করে। তারপর বলে, 'এ শালে মাউ খে—'

'ক্যা—'

'মুন্সীজী পয়লা আমাকে বলেছে।'

'জরুর। লেকিন কি বলেছে ?'

'বিহার মালুম ? ইণ্ডিয়াকো বিহার ?'

'নেহী।'

'উল্লু কাঁহিকা !' মাউ খে'র অজ্ঞতায় কয়েক মুহূর্ত চোখে পলক পড়ে না চান্নু সিংয়ের। অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর খুব এক চোট গালিগালাজ করে। তারও পর বলতে থাকে, 'ইণ্ডিয়ার বহুত বড় গাঁও বিহার। বুঝলি মুরুখ ?'

মাউ খে মাথা নাড়ে।

চান্নু সিং আবার বলে, 'বিহার থেকে খুবসুরত এক আওরত এসেছে এই জাহাজে। বহুত খুবসুরত।'

চান্নু সিংয়ের চোখ বুঁজে আসে। খুব সম্ভব চোখ বুঁজেই সে খুবসুরতী আওরতের রূপ জরিপ করার চেষ্টা করে। একটু পর বলে, 'মুন্সীজী নাম ভি বলেছে ; সোনিয়া।'

মাউ খে বলে, 'উ আওরত কি কয়েদী ?'

চান্নু সিং খেঁকিয়ে ওঠে, 'বুদ্ধু কাঁহিকা ! কয়েদী না হলে কালা পানি আসবে কেন ?'

খানিকটা চুপচাপ।

ইতিমধ্যে 'বেলী' এবং 'রস' নামে দুটো মোটর বোট উপসাগরের জল কেটে কেটে এলফিনস্টোন জাহাজটার দিকে ছুটেছে। ভট ভট প্রলয়ঙ্কর

আওয়াজে জাহাজের চারপাশ থেকে সাগরপাখিগুলো উড়ে উড়ে মাউন্ট হ্যারিয়েটের দিকে পালাচ্ছে।

চান্নু সিং আবার শুরু করল, 'বুঝলি মাউ খে, আন্দামানে আমার দশ বরষ কাটল।'

মাথা নাড়ল মাউ খে। হাঁ কিংবা না, কিছুই বোঝা গেল না।

চান্নু সিং বলল, 'এক মাস হল আমি টিকিট (সেল্‌ফ্‌ সাপোর্টার্স টিকিট) পেয়েছি।'

'ও তো জানি।'

'সিরকার (সরকার) এবার আমাকে সাদি করতে দেবে।'

'জরুর।'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে মাউ খে। তার ছোট ছোট চাপা চোখে ধূর্ত নজর ফোটে। মাউ খে আবার বলে, 'লেকিন সাদি তো একবার করলি এতেয়োরীকে!'

চান্নু সিং খেঁকিয়ে ওঠে, 'ও শালীকে নিয়ে ঘর করা যায়! এতোয়ারী শালী সাত দিনে আমার জিন্দগী বেচাল করে দিয়েছিল! উঃ কুত্তীটা জেনানা না মরদানা, সাত দিনেও মালুম পাই নি। এই ত্থাখ মাউ খে লোটা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে আমার পিঠের হাড্ডি চুরচুর করে দিয়েছে। সাধে এতোয়ারীতে ভাগিয়েছি! গুরুজীর নামে তিন কসম, অ্যায়সা আওরত সাদি করব না। আমার পিঠটা ত্থাখ্‌ মাউ খে—'

কুর্তা খুলে উদোম পিঠটা দেখায় চান্নু সিং। আবার বলে, 'বহুত আপসোসের কথা, আমার এতগুলো রুপেয়া বরবাদ হয়ে গেল।'

চান্নু সিংএর আপসোসের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। মাস খানেক আগে সে সেল্‌ফ্‌ সাপোর্টার্স টিকিট পেয়েছিল। এবার সে সাদি করতে পারবে। সাদির জন্য ডেপুটি কমিশনারের অফিসে আর্জিও পেশ করেছিল। তারপর এক মঙ্গলবার সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় 'ম্যারেজ প্যারেড' হল। একপাশে দাঁড়াল জেনানা কয়েদীরা, আর একপাশে টিকিট-পাওয়া পুরুষ কয়েদীরা। এতোয়ারীর মনে ধরল চান্নু সিংকে; চান্নু সিংএর মনে ধরল এতোয়ারীকে।

এদিকে দাঁড়িয়ে ছিল মেম জেলার, সাহেব জেলার, ডাক্তার, টিণ্ডালান, [illegible] ওয়ার্ডারনীরা।

একটু দূরে একান্তে এতোয়ারীর সঙ্গে বাতচিত করেছিল চান্নু সিং।

খাটো খাটো করে ছাঁটা চুল, থ্যাবড়া নাক, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে; গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মস্ত হাঁ—এই হল পাঠান জেনানা এতোয়ারীর চেহারা নমুনা। তবু সেদিন দু চোখে নেশা লেগেছিল পাঞ্জাবী মরদানা চান্নু সিংএর। নারীসঙ্গহীন এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে দশ-দশ বছর কাটাবার পর এতোয়ারীকে বড় মুলাইম, বড় খুবসুরতী মনে হয়েছিল।

চান্নু সিং জিজ্ঞাসা করেছিল, 'নাম কি তোমার?'

'এতোয়ারী। তোমার?'

'চান্নু সিং।'

'বহুত বঢ়িয়া নাম। তোমার কে কে আছে মেনল্যাণ্ডে?'

'কেউ নেই।'

'বহুত আচ্ছা। আমারও বিলকুল কেউ নেই।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপর এতোয়ারীই শুরু করল, 'এ মরদানা?'

'হাঁ—'

'সাদি তো করবে। লেকিন আচ্ছা আচ্ছা কাপড়া আর গয়না দিতে হবে।'

'জরুর।' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চান্নু সিং বলেছিল, 'কয়েদখানায় আমি এখন দুধ জোগান দি। ভাবছি, হাবরাডীন (এবারডীন) বাজারে একটা চায়ের দোকান খুলব। অনেক রুপেয়া হবে।'

'বহুত ভাল হবে।' এতোয়ারীকে খুশী-খুশী দেখাচ্ছিল।

সাদির ব্যাপারে চান্নু এবং এতোয়ারী—দু জনেই রাজী-বাজী হয়ে যায়।

দিন কতক পর গোরুর গাড়ি নিয়ে এসেছিল চান্নু সিং। নয়া নয়া বাহারে কাপড় এনেছিল। রুপার টিকুলি, কাঙনা (কঙ্কণ), বিছা, মল এনেছিল। ডেপুটি কমিশনারের অফিসে টিপছাপ দিয়ে এতোয়ারীকে নিয়ে সিধা গারাচারামা গাঁওয়ে চলে গিয়েছিল। সেখানে খানাপিনা হল। আর আর কয়েদী, যারা সেখানে ঘরসতি করেছে, তারা এল। তামাম রাত ফুর্তিফার্তা, রং তামাশা চলেছিল। পয়লা রাতটা মজায় মজায় কেটে গিয়েছিল।

আন্দামানে কয়েদীদের সাদির কানুন অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারের অফিসে টিপছাপ দিয়ে জেনানা নিয়ে যাবার সাতদিন পর আবার আসতে হয় রস্ দ্বীপে, চীফ কমিশনারের অফিসে। এই সাতদিনে যদি জেনানা আর

মরদানায় বনিবনা না হয়, কারো যদি কোন অভিযোগ থাকে, তা হলে সেই সাদি বাতিল হয়ে যায়। জেনানা কয়েদীকে আবার ফিরে যেতে হয় সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায়।

পয়লা রাতটা মজায় মজায় কেটেছিল। কিন্তু তার পর দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। এতোয়ারী ঘরের কাজ করবে না। সারাদিন অন্য অন্য কয়েদীর সঙ্গে রংবাজি করবে, শরাব গিলবে। আন্দামান আসার আগে দু দুটো রেণ্ডিপাড়া চালাত এতোয়ারী। ঘর তার দিল বশ করবে কেমন করে?

দু রোজ দেখে দেখে চান্নুর মাথায় খুন চাপল। সে বলেছিল, 'আমি শালা পয়সা খরচা করে তোমায় খিলাব, কাপড় গয়না দেব, তুমি শালী দুসরা কয়েদীর সঙ্গে রংবাজি করবে! অ্যায়সা চলবে না।'

এতোয়ারীর দু চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়েছিল। পিতলের একটা বর্তন তুলে সে ছুঁড়ে মেরেছিল। বুক থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গিয়েছিল চান্নুর। এর পরেই হাতাহাতি, চুলোচুলি শুরু হয়েছিল। চান্নুর দাড়ি উপড়ে গিয়েছিল মুঠামুঠা, শির ফেটেছিল, খুন ঝরেছিল। এতোয়ারীর হাড্ডি ফেটেছিল, চামড়া ছিঁড়েছিল।

পাঁচ রোজ এমন তুমুল লড়াই চলেছিল চান্নু আর এতোয়ারীতে।

পাঠান এতোয়ারীর রক্তে ঘরের মোহ নেই, স্নেহ নেই। তার দিলে মমতা নেই। তার রক্তে রক্তে দিলে কলিজায় শুধু ক্রুরতা, হিংসা, আদিম মাতামাতি পিছল সরীসৃপের মত কিলবিল করে। সাদি না হলে জেনানা কয়েদী কয়েদখানার বাইরে আসতে পারে না। এতোয়ারী চেয়েছিল চান্নুকে সাদি করে কয়েদখানার বাইরে আসবে। তারপর শরাবে, পুরুষসঙ্গে, নেশায় তামাশায় চুরচুর হয়ে আন্দামান আসার আগের সেই বীভৎস জীবনের স্বাদ নেবে! নেশাহীন পুরুষসঙ্গহীন গারদখানার জীবন তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সাদির ছ দিনের মাথায় সাদি খারিজের আর্জি করল চান্নু সিং। এতোয়ারী চলে গেল সাউথপয়েন্ট কয়েদখানায়। যাবার আগে এতোয়ারী কেঁদেছিল, বলেছিল, 'মরদ, তোমার দিলে এই ছিল। ফের আমাকে গারদখানায় পাঠালে!'

চান্নু সিংএর দিল টলে নি। সে ভাবছিল, এতোয়ারী শালীকে সাদি করে তার এতগুলো টাকা বরবাদ হয়ে গেল।

বড় রকমের একটা শ্বাস ফেলে ভুরু কুঁচকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে মাউ খে'র দিকে তাকায় চান্নু সিং। ডাকে, 'এই মাউ খে—'

'হাঁ-হাঁ—'

'ভাবছি, হাবরাডীন (এবারডীন) বস্তিতে একটা চায়ের দোকান খুলে বসব।'

'বহুত আচ্ছা মতলব।'

'তুই বলছিস?'

'হাঁ—হাঁ—'

হঠাৎ চান্নু সিং বলে, 'লেকিন তার আগে সাদি করব।'

'এ তো ভাল কথা।'

মাউ খে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়।

কিছুক্ষণ খুবই চিন্তিত দেখায় চান্নু সিংকে। তারপর ধীরে ধীরে সে বলতে থাকে, 'সোনিয়াকেই সাদি করব। মুন্সীজী বলেছে, লেড়কী বড় খুবসুরতী।'

'ঠিক হায়।' বলতে বলতে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে মাউ খে, 'লেকিন এ সাদি তো এখন হবে না।'

'কাঁহে?' হিংস্র চোখে তাকায় চান্নু সিং।

'সোনিয়া তো আজ এখানে এসেছে। পাঁচ বরষ এখানে না কাটালে আওরত কয়েদী তো সাদি করতে পারে না।'

'ঠিক, ঠিক বাত। আমার ইয়াদ ছিল না।' চান্নু সিংকে বড় বিমর্ষ দেখায়। একটু পর বিষণ্ণ গলায় সে বলে, 'কালা পানিতে যে সব আওরত কয়েদী আসে, তারা জেনানা না মরদানা সমঝানো মুশকিল। মুন্সীজীর কাছে সোনিয়ার কথা শুনে দিল বিগড়েছে। কি করি বল তো মাউ খে?'

'পাঁচ বরষ বাদেই সাদি করিস।'

চান্নু সিং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। খানিকটা পর বলল, 'সোনিয়াকে তো চিনি না। ওর সঙ্গে জানপয়চান করি কেমন করে?'

'আওরত কয়েদীরা যখন জেটিতে নামবে, তখন সবাইকে নাম পুছে পুছে সোনিয়াকে বের করবি।'

'ও তো ঠিক বাত।'

মনে মনে মাউ খে'র খাসা বুদ্ধির তারিফ করে চান্নু সিং।

পাঁচ

সাউথ পয়েন্ট জেলখানার পাশে বাঁক ঘুরে একটা পথ চড়াই-উতরাইতে দোল খেতে খেতে করবাইনস্ কোভ, ক্রুখসাবাদের দিকে চলে গিয়েছে। বাঁকের মুখে একটা সাদা বিন্দু ফুটে বেরুল। একটু একটু করে বিন্দুটা স্পষ্ট হতে হতে এবারডীন জেটিতে এসে একটি মানুষের আকার নিল।

মোগলাই চেহারা। পরনে জরিদার তাজ, ঢিলে-ঢোলা কামদার শিলোয়ার, কলিদার কুর্তা, শুঁড়তোলা বাহারে নাগরা। খানদানী পোশাক-আশাক। ধবধবে ভ্রূ এবং দাড়ি পরম স্নেহে লালিত; সূচীমুখ গোঁফদুটিতে পরিচর্যার অভাব নেই। কানে সুগন্ধি তুলো গোঁজা। দাড়ি ও কান থেকে আতরের মৃদু খুসবু যুগপৎ তাঁর শৌখিনতা এবং রুচির পরিচয় দিচ্ছিল।

তাঁর নাম বন্দা নওয়াজ খান।

এবারডীন জেটিতে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কয়েদীরা সরে সরে পথ করে দিতে লাগল। বন্দা নওয়াজ খান জেটির শেষ মাথায় এসে দাঁড়ালেন।

চার পাশ থেকে কয়েদীরা সসম্ভ্রমে বলতে লাগল, 'আদাব, আদাব—'

দীর্ঘ ঋজু দেহটা সামনের দিকে ঈষৎ হেলিয়ে নওয়াজ খান জবাব দিতে লাগলেন, 'আদাব, আদাব—'

প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ ভরে রয়েছে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন নওয়াজ খান। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ এলফিনস্টোন জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা মোপলা টিণ্ডাল। নাম উলফৎ। সে ডাকল, 'খান সাহেব—'

'হাঁ—' অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন নওয়াজ খান।

'এবার দো মাহিনা বাদ জাহাজ এল।'

'হাঁ।'

একটু ইতস্তত করল উলফৎ। তারপর নওয়াজ খানের আরো কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'সুন্দর সাহেব কি এই জাহাজে আসছেন?'

'না।'

নওয়াজ খানের কণ্ঠে একটিমাত্র শব্দ ফুটল। আর এই একটি শব্দে অনেক বেদনা, হতাশা এবং অভিযোগ মিশে রয়েছে।

উলফৎ বুঝল। চমকে একবার নওয়াজ খানের দিকে তাকাল। দেখল, তাঁর সাদা ভ্রূ দুটির নীচে সুর্মারঞ্জিত দীর্ঘ চোখজোড়া চিকচিক করছে।

হঠাৎ উলফৎ বলে বসল, 'এই জাহাজে সুন্দর সাহেবের চিট্টি জরুর এসেছে।'

নওয়াজ খান জবাব দিলেন না।

'রস' এবং 'বেলী' এলফিনস্টোন জাহাজের গায়ে লেগেছে। মোটর বোটের শব্দে যে সিন্ধুশকুনগুলো মাউন্ট হ্যারিয়েটের দিকে পালাতে শুরু করেছিল, তারা আবার জাহাজের মাস্তুলে ফিরে আসছে।

নওয়াজ খান অন্য কথা পাড়লেন। একেবারেই ভিন্ন প্রসঙ্গ, যার সঙ্গে সুন্দর সাহেবের কিছুমাত্র যোগ নেই। নওয়াজ খান বললেন, 'শুনলাম, দরিয়া বাওরা হয়ে উঠেছিল; জাহাজ নাকি ঝড়ে পড়েছিল?'

আশ্চর্য! তাঁর গলার স্বরে একটু আগের ক্ষোভ বেদনা, কিছুই ছিল না।

উলফৎ বলল, 'হাঁ; বহুত ভারী তুফান উঠেছিল।'

'খোদার দোয়া, তাই জাহাজ ডোবে নি। এতগুলো কয়েদীর জান বেঁচে গিয়েছে।'

সত্তর বছর পেরিয়েছেন বন্দা নওয়াজ খান। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে এখনও ঝঙ্কার আছে। এমন সুললিত কণ্ঠ কদাচিৎ শোনা যায়। নওয়াজ খান আবার বলতে শুরু করলেন, 'এই ঝড় তুফান, এই জিন্দগী—বেবাক খোদার মর্জি। এই—'

ধীরে ধীরে তাঁর গলাটা ভারী হয়ে এল।

উলফৎ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ইতিমধ্যে কয়েদীদের মধ্যে আবার গুঞ্জন শুরু হয়েছে। গুঞ্জনটা একটু একটু করে একটা হল্লার রূপ নিল।

দুটো টিণ্ডাল আর একটা পেটি অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এ উল্লুলোক, চিল্লাইও মাত্—'

হল্লার রেশ ঝিমিয়ে এল।

নওয়াজ খান অস্ফুট গলায় বললেন, 'জাহাজটা দু মাস পর এল। এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম। একবার জেটিতে এলুম—'

উলফৎ উৎকর্ণ হয়ে ছিল। নওয়াজ খানের প্রতিটি কথা ঠিক ঠিক শুনে ফেলল।

উলফৎ জানে, উলফৎ কেন, এদিকে ক্রথসাবাদ, ওদিকে মোউলটন হামক্রেগঞ্জ, সেদিকে ভাইপার মিঠাখাড়ি বাম্বুফ্ল্যাট—পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের সবাই জানে। যে হাজার কয়েক কয়েদী দ্বীপান্তরের সাজা ভোগ করতে এই আন্দামানে এসেছে, তাদের প্রত্যেকে জানে, কিসের খোঁজে বন্দা নওয়াজ খান এবারডীন জেটিতে এসেছেন।

তারা জানে, পাঁচ বছর ধরে জাহাজ আসার দিনটিতে নওয়াজ খান সমানে জেটিতে আসছেন। তারা জানে, যতদিন সুন্দর খান আন্দামানে না ফিরবে, ততদিন তিনি জেটিতে আসবেন।

বিচিত্র মানুষ বন্দা নওয়াজ খান। এই দ্বীপের কে না চেনে তাঁকে? প্রতিটি মানুষ তাঁকে মান্য করে। ঋজু পুরুষটি যখন দীর্ঘ পদক্ষেপে পথ দিয়ে চলেন, দু পাশে সসম্ভ্রম গলা শোনা যায়, 'আদাব, আদাব—'

এই মানুষটি সম্বন্ধে আন্দামানের কয়েদীদের মনে কৌতূহলের অন্ত নেই। বন্দা নওয়াজ খানের হাল হকিকত সম্পর্কে তারা যতখানি ওয়াকিবহাল, তাঁর অতীত ততখানিই অজানা, দুর্জ্ঞেয়। এই দ্বীপে তিনি কবে এসেছিলেন, সাজার মেয়াদ কত বছর ছিল, কোথায় তাঁর মুল্লুক, কোতল রাহাজানি অ:দপেই করেছিলেন কি না; এ সব ব্যাপারে আন্দামানের যত কয়েদী, ঠিক ততগুলিই মত।

পাহাড় গাঁওয়ের উজাগর সিং, গারাচারামার সুলেমান মোপলা, বিগি লাইনের মনোহর আলী, মিয়া খান, এবারডীন বাজারের দিগিন্দর সাহা—এমনি পুরনো আমলের জন কতক কয়েদী বন্দা নওয়াজ খান সম্বন্ধে অনেক, অনেক কথাই জানে। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও বিশেষ সদুত্তর মেলে না।

হাল আমলের কয়েদী, যারা মাত্র দু দশ বছর এই দ্বীপের মাটিতে সাজা ভোগ করছে, তাদের কেউ বলে, নওয়াজ খানের মুল্লুক মুম্বই। কেউ বলে, তাঁর মুল্লুকই নেই। কেউ বলে, তাঁর নাকি বহুত ভারী ডাকাতের দল ছিল। কেউ বলে, খান সাহেব ডাকাতের সিরদার নন; পয়লা নম্বরের খেয়ালী মানুষ। মর্জি হয়েছে, তাই আন্দামানে এসে রয়েছেন। আজাদের জন্ত সাহেব লোকদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ার সিপাইদের লড়াই বেঁধেছিল। কেউ কেউ অনুমান করে, তিনি সেই যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

অদ্ভুত মানুষ বন্দা নওয়াজ খান। অমায়িক ব্যবহার, মধুর স্বভাব। দরিয়া দিল, দরাজ মেজাজ। মুখে সব সময় মৃদু প্রসন্ন হাসি লেগে থাকে।

রোজ পোর্ট ব্লেয়ার শহরটা একবার চক্কর দেন নওয়াজ খান। হ্যাডো, ডিলানিপুর থেকে 'রেণ্ডিবারিক' জেলখানা, ওদিকে নয়া গাঁও থেকে ফোনিক্স বে পর্যন্ত সবগুলো 'টাপু'তে আর 'বিজনে' ঘুরে ঘুরে কয়েদীদের খোঁজ খবর নেন। কুশল জিজ্ঞাসা করেন। মাঝে মাঝে ফোনিক্স বে থেকে লঙ ফেরিতে উপসাগর পেরিয়ে চলে যান ব্যাম্বু ফ্ল্যাট, ডাণ্ডাস পয়েণ্টে। আবার শহর ছাড়িয়ে যে পথগুলি গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কয়েদীদের গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে, সে সব দিকেও যান। চাষ-আবাদের খবর নেন, নতুন মসলি ধানটা কেমন ফলছে, সুপারি-নারকেলের চারাগুলি পাহাড়ী জমিতে কেমন বাড়ছে, জঙলী জারোয়ারা হানা দেয় কি না, তার খোঁজ নেন। সাজার মেয়াদ শেষ করে যে সব কয়েদী গৃহস্থ হয়েছে, তাদের নতুন নতুন রোজগারের ফিকির বলে দেন। তবিয়ত করে তাদের তামাকু টানেন; সুরতি চিবান; তাদের সঙ্গে খানা খান। তাদের পাতা বিছানায় আরাম করে চোখ বোঁজেন।

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালায় যে বন্দী উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, তার প্রতিটি কয়েদীর সঙ্গে তাঁর দিলের যোগ। পথ চলতে চলতে চোখ বুঁজে তাদের কথা ভাবেন। নওয়াজ খান তাদের মেহমানদারি এবং দিলের উত্তাপ অনুভব করেন।

নতুন যে কয়েদীটি এল, মুল্লুকে তার প্রিয়জন পরিজন কে কে আছে, পুরনো কয়েদীদের কার মেয়াদ বাড়ল, কার কমল, দীর্ঘ দিনের দণ্ডভোগ করে কে পরের জাহাজেই দেশে ফিরবে, কোন কয়েদী সেল্‌ফ্‌ সাপোর্টার্স টিকিট পেল, কে সাদির জন্য চীফ কমিশনার অফিসে দরখাস্ত করেছে, সব, সব হিসাব নওয়াজ খানের কণ্ঠস্থ।

নওয়াজ খান সম্বন্ধে সম্ভ্রম যতখানি, সংশয় তার তিলমাত্র কম নয়। কয়েদীদের 'টাপু'তে, 'বিজনে' আর গাঁওয়ে গাঁওয়ে ঘুরে তাদের দেহাত মুল্লুকের, হাল হকিকতের খবর নিয়ে এই রহস্যময় মানুষটা কোন দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিলের ফিকিরে আছে, কেউ জানে না।

নওয়াজ খান নামে এক দীর্ঘ ঋজু পুরুষ আন্দামানের বিস্ময়, কৌতূহল আর সংশয়ের মধ্যে মিশে রয়েছেন।

হাল আমলের কয়েদীদের কেউ জানে না, কিন্তু পুরনো দিনের উজাগর

সিং কি মিয়া খান, মুলেমান মোপলা কী দিগিন্দর সাহা অতীত-কথা জানে।

আঠারো-শ আটান্নর চৌঠা মার্চ ওয়াকার সাহেব যে দু শ জন বন্দী নিয়ে প্রথম আন্দামান এসেছিলেন, বন্দা নওয়াজ খান সে দলে ছিলেন। এখানে আসার আগে তিনি ছিলেন ঘোড়সওয়ার সিপাইদের রিসালদার।

দিল্লীতে সিপাইদের সঙ্গে ইংরেজের যে লড়াই বেঁধেছিল, সে লড়াইতে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ।

হঠাৎ পাশ থেকে মোপলা টিণ্ডাল উলফৎ ডাকল, 'খান সাহেব—'

এলফিনস্টোন জাহাজটার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন নওয়াজ খান। চমকে উঠলেন, 'অ্যাঁ, কী বললে ?'

একটু দ্বিধা করল উলফৎ; চনমন চোখে ইতিউতি তাকাল। দেখল, নওয়াজ খান তার দিকেই সরাসরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখ নামিয়ে উলফৎ বলল, 'কুছ নেহী খান সাহেব—'

জাহাজটার দিকে আবার চোখ ফেরালেন নওয়াজ খান।

মাস্তলের ডগায় সাগরপাখিগুলো সামনে চক্র দিচ্ছে। দেখতে দেখতে দিলটা কেন যেন উদাস উদাস লাগে নওয়াজ খানের।

খানিকটা পর উলফৎ আবার ডাকে, 'খান সাহেব—'

নওয়াজ খান ঘুরে দাঁড়ালেন।

উলফৎ বলল, 'জাহাজ ক রোজ থাকবে আন্দামানে ?'

'চার-পাচ রোজ থাকবে।'

'তারপর তো মাদ্রাজ যাবে ?'

'হ্যাঁ। কেন ?'

'বলছিলাম—থতমত খেল উলফৎ। গোটা কতক ঢোঁক গিলল। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'আপনি এই জাহাজেই ইণ্ডিয়ায় যান খান সাহেব-

সুর্মারঞ্জিত দীর্ঘ চোখে নওয়াজ খানের দৃষ্টিটা তীব্র, ভয়ানক হয়ে উঠল কঠিন গলায় তিনি বললেন, 'কিঁউ ?'

গলার স্বরটা কেঁপে গেল উলফতের, 'বলছিলাম, সুন্দর সাহেবকে যদি ইণ্ডিয়া থেকে খুঁজে নিয়ে আসতেন।'

ভীষণ গলায় ধমকে উঠলেন বন্দা নওয়াজ খান, 'চোপ রও বেয়াদব! বেতমিয়ত! দিল্লাগি করার আর লোক পেলে না!'

উলফৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশের কয়েদীরা চমকে উঠল। হল্লা থেমে গেল।

প্রসন্ন হাসিতে যে নওয়াজ খানকে সব সময় পীর দরবেশের মত সুন্দর দেখায়, সেই মানুষটাকে এমন ভীষণ হয়ে উঠতে আন্দামানের কেউ কোন দিন দেখে নি; এমন ভয়ঙ্কর গলায় ধমকে উঠতে কেউ কোন দিন শোনে নি।

ছয়

মোটর বোটে ডাক্তার এসেছিল।

খানিকটা আগেই কয়েদীদের ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।

খোলা ডেকে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল লখাই। পাশে সেই পাঠান হাবিলদারটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উপসাগরের নীল জলে এলফিনস্টোন জাহাজটা মৃদু মৃদু দুলছে।

হাবিলদারটা ভারী বুট দিয়ে লখাইর পাঁজরায় ঠোক্কর বসিয়ে দিল। রক্তাভ, ভীষণ চোখে তার দিকে তাকাল লখাই। বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় কি যে বলল, কিছুই বোঝা গেল না।

দু পা পিছিয়ে হাবিলদারটা খিঁচিয়ে উঠল, 'এ শালে, কুত্তিকা বাচ্চা, অ্যায়সা আঁখ দেখাবি না। অ্যায়সা বিজির বিজির মাত কর!'

লখাই জবাব দিল না।

খানিকটা পর হাবিলদারটা আবার ঘন হয়ে দাঁড়াল। লখাইর পিঠে একটা হাত রাখল। যে মানুষ বাকী জিন্দগীটা আন্দামানে দ্বীপান্তর ভোগ করবে, হয়তো তার জন্যে পাঠানের কঠোর নীরস মনে কিঞ্চিৎ মায়া জন্মে থাকবে। ঈষৎ নরম গলায় এবার সে ডাকল, 'এ লখাই—'

লখাই চোখ তুলল।

হাবিলদার দূরের জেটির দিকে আঙুল বাড়াল। বলল, 'ওটা হল হাবরাডীন (এবারডীন) জেটি। ওখানে তোদের নামতে হবে।'

'কেন?'

'সমুরাকা কোঠী যাবি না?'

খুব একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা করেছে, ভেবে মনে মনে নিজেকে তারিফ করল হাবিলদারটা। তারপর মোটা পাটকিলে রঙের জিভটা আধ হাত খানেক বের করে একচোট হেসে নিল। হাসির দমকে বিরাট দেহটা কাঁপতে লাগল। পাঠানের হাসি; একবার তোড়ে আরম্ভ করলে হঠাৎ থামে না।

সমুরাকা কোঠী! লখাইর কাছে রসিকতাটা নতুন নয়। দেশের কয়েদখানায় মেট, কালাপাগড়ি এবং সিপাইদের মুখে বহুবার শুনেছে।

তবু এই মুহূর্তে অদ্ভুত গলায় লখাই বলল, 'সম্বুরাকা. কোঠী! কোথায়?'

কোনাকুনি আঙুল বাড়িয়ে একটা টিলার মাথায় অনেকগুলো তিনতলা মোকাম দেখাল হাবিলদারটা। বলল, 'পাক্কা মোকাম, আরামসে থাকবি। তোদের তকদির বহুত আচ্ছা!'

একটু থামল। আর এক চোট হাসল। তারপর আবার শুরু করল, 'ঐ মোকামগুলোতে বিটিশ লোক (ব্রিটিশ লোক) শের পোষ মানায়। সমঝা?'

লখাই চুপচাপ দেখতে লাগল।

উপসাগরের নীল জল থেকে খানিকটা ভূখণ্ড বিরাট এক স্তূপের মত ফুঁড়ে বেরিয়েছে। তাকে পুরাপুরি টিলাই বলা চলে। টিলাটা নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ। গাছের ফাঁক দিয়ে চক্রাকার প্রাচীর দেখা যায়। প্রাচীরের মধ্যে লাল রঙের এক সারি বাড়ি মাথা তুলে রয়েছে।

পাঠান হাবিলদারটা বলল, 'ওটা হল আন্দামানের কয়েদখানা, উসকো নাম সেলুলার জেল। ওটার অন্দরমে এক হাজার কুঠরী আছে।'

লখাই বলল, 'আপনি সব জানেন হাবিলদারজী?'

'জরুর। হর মাহিনা তোদের মত মেহমান নিয়ে আন্দামানে আসছি। আর জানব না! সব কিছু জানি, আন্দামানের সব আমার জানপয়চান।'

হাবিলদারের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটল।

বিহ্বল চোখে সেলুলার জেলটার দিকে তাকিয়ে রইল লখাই।

ক দিন ধরে বঙ্গোপসাগরের কালা পানি সমানে দেখেছে সে। ঝড়ের সমুদ্র উন্মাদ হয়ে এলফিনস্টোন জাহাজটাকে এলোপাথাড়ি ঝাঁকিয়েছে। কিন্তু কালা পানি, ক্ষ্যাপা তুফান আর বাওরা বাতাস লখাইর বুকে তরাস ধরাতে পারে নি। দরিয়া দেখে অন্য কয়েদীরা যখন ডাক ছেড়ে কেঁদেছে, সে তাদের বিদ্রূপ করেছে, ধমকেছে। ডরপোকদের ভয় দেখে অশ্রাব্য খিস্তি করেছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে অনেক দূরের টিলার মাথায় লাল রঙের কয়েদখানাটা দেখতে দেখতে এমন দুর্দান্ত লখাইর অন্তরাত্মাও ছমছম করে উঠল। ভাবল, চিৎকার করে একবার কেঁদে ওঠে; কিন্তু পারল না। তালুটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। গলার মধ্যে একরাশ ধারালো কর্কশ বালি যেন খরখর করছে। ঢোঁক গেলা যাচ্ছে না।

হাবিলদারটা বলল, 'এইবার তোদের নামতে হবে। কুর্তা কম্বল গুছিয়ে নে।' বলেই ডান চোখটা কুঁচকে তাকাল। মুখে শয়তানী হাসি দেখা দিল। তারপর কর্কশ চড়া গলায় সুর তুলে গীত গাইল :

'নওজোয়ান আলি যাবে
সম্বরাকা কোঠি।
গোস্ত খাবে, খোবানি খাবে
আউর খাবে রোঠি।
আন্ধারা রাতমে মিলবে
সম্বরাকা বেটী।'

হাবিলদার মুলাইম স্বরে বলতে থাকে, 'বহুত আচ্ছা গানা! রোটি মিলবে, খুবানি মিলবে, গোস্ত মিলবে আউর আন্ধারা রাতে সম্বরাকা বেটী মিলবে। আলীর বরাত খুব ভাল, কি বলিস লখাই?'

হাবিলদারকে ডগমগ দেখায়। তেরছা নজরে সে লখাইকে লক্ষ্য করতে থাকে।

হঠাৎ লখাই বলে বসে, 'আচ্ছা হাবিলদারজী—'

'ফরমাইয়ে (ফরমাস করুন) জনাব—'

হাবিলদারের ভাবভঙ্গি দেখে প্রথমে দমে যায় লখাই। কিন্তু তার বোল-চালে কোথায় যেন খানিকটা আস্কারা রয়েছে।

লখাই উৎসাহিত হয়। ইতি-উতি তাকিয়ে সে বলে, 'ঐ কয়েদখানায় সব কয়েদী থাকে?'

প্রশ্নের রকমটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে হাবিলদার।

লখাই আবার বলে, 'বলছিলাম, মরদানা কয়েদী তো থাকে, আওরত কয়েদীও থাকে?'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে হাবিলদারটা। তারপর ডান চোখটা আরো কুঁচকে, শয়তানী হাসিটা আরো প্রকট করে ফিসফিস গলায় বলে, 'মরদানা জেনানা একসাথ থাকলে বহুত সুবিধা হয়, তাই না জনাব?'

লখাই জবাব দেয় না।

হাবিলদারটা বলতে থাকে, 'সবাই মিলে একেবারে জন্নাত (স্বর্গ বানানো যায়!'

লখাই একটা অস্ফুট শব্দ করল। কি যে সে বলল, ঠিক বোঝা যায় না।

এবার হাবিলদারটা লখাইর কানে মুখ গুঁজে দেয়। বলে, 'যে কুঠরিতে আপলোক থাকবেন জনাব, সেটার পাশের কুঠরীতে দিলের রোশনী থাকবে।'

'দিলের রোশনী কে ?'

লখাইর গলায় বিস্ময় ফোটে।

'যার খোঁজে জাহাজ ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে আওরত কয়েদীদের ডেকে ঢুকেছিলেন, সেই সোনিয়া।'

'সোনিয়া !'

'হাঁ জনাব।' হাবিলদার বলে, 'জনাবের মর্জি হলে জেলার সাহেবেকে বলে একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।'

লখাই মুখ তোলে।

হাবিলদার বলে, 'সোনিয়াকে পাশের কুঠরিতে না রেখে একেবারে জনাবের কুঠরিতেই রাখা হবে। ঘাবড়াইয়ে মাত্—'

বলতে বলতে কর্কশ গলায় খ্যা-খ্যা করে হাসে হাবিলদার। একটু পর সে চলে যায়।

হাবিলদারের কথাগুলি পুরাপুরি বিশ্বাস করতে লখাইর মন সায় দেয় না।

একবার উপর দিকে তাকাল লখাই। মাস্তুলের ডগায় সেই সাগরপাখিটা বসে রয়েছে। এতগুলি পাখির মধ্যে হুবহু সেই পাখিটাকে চিনে নিতে অসুবিধা হল না তার। ডানায় কালো দাগটা পরিষ্কার মনে আছে।

ঝড়ের দরিয়ায় পাখিটা কোথায় যে লুকিয়েছিল, কে জানে ? হুগলী নদী থেকে যে সিন্ধুশকুন জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে আন্দামান পর্যন্ত এসে পড়েছে, তার জন্য খুনিয়ারা লখাইর মনে খানিকটা মায়া হয়ে থাকবে।

সিন্ধুশকুন, দরিয়ার সঙ্গী। একদৃষ্টে পাখিটার দিকে তাকিয়ে রইল লখাই।

খানিকটা পর পায়ের বেড়ি বাজাতে বাজাতে ভিখন আহীর এল। ভিখনকে দেখে লখাই ক্ষেপে ওঠে। দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'আয় শালা, শুয়ারকা বাচ্চা, তোকে কোতল করি।'

পোড়া মুখের একটি মাত্র চোখ ঝিকিয়ে উঠল ভিখনের। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। তারপরেই বীভৎস মুখটা কাঁচুমাচু দেখাল। টেনে টেনে ভিখন বলতে লাগল, 'এ লখাই ভেইয়া, কি কসুর হল ? গালি দিচ্ছিস কেন ?'

আওরত কয়েদীদের ডেকে হাবিলদার সিপাইদের নিয়ে তাকে ধরিয়ে

দেবার পর এই দু-তিনটে দিন ভিখনের পাত্তা মেলে নি। এত বড় এলফিন-স্টোন জাহাজটার কোথায় যে হারামীটা লুকিয়ে ছিল, লখাই তার হদিস পায় নি।

কিছুক্ষণ রক্তচোখে ভিখনের দিকে তাকিয়ে রইল লখাই। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'সিপাইদের নিয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলি কেন?'

'ভেইয়া, এই জন্যে গোসা হবি না ভেইয়া। তোর গোসা দেখলে আমার ডর লাগে।' একটু থেমে ভিখন আবার শুরু করে, 'সিপাই আর হাবিলদারজীরা তোকে খুঁজে না পেয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে কয়েদীলোকের হাড্ডি চুর-চুর করে দিল। তা না হলে তুই ভেইয়া আওরত লোকের বেহেস্তে রয়েছিস; আরাম করছিস। তোকে ধরিয়ে দিতে পারি! জানিস না, তোকে কত পেয়ার করি! ডাণ্ডা আর রদ্দা খেয়ে খেয়ে যখন খুন গিরতে লাগল, তখন তো তুই কোথায় আছিস, বলে দিলুম।'

লখাই কথা বলে না। রাগে গরগর করে। উত্তেজিত হয়ে উঠলে তার গলায় একটা শির নাচতে থাকে।

লখাইর একটা হাত ধরে সমানে তোয়াজ করে ভিখন।

হঠাৎ লখাই বলে, 'তুই কেমন করে জানলি, আমি মাগী কয়েদীদের কাছে গিয়েছিলুম?'

পোড়া মুখে অদ্ভুত হাসি ফোটে ভিখনের। একমাত্র চোখটা বুঁজে তীক্ষ্ণ, রহস্যময় গলায় সে বলে, 'আমার দিলটা বহুত আজীব চীজ লখাই ভেইয়া। কোন শালে কয়েদী কোথায় ঢুঁড়ছে, কার মগজে কোন মতলব ঘুরছে, ঠিক ঠিক মালুম পাই। দাদা রে, তোর সঙ্গে মুল্লুকের কয়েদখানায় তিন বরষ কাটালুম। আর তোর দিলের মতলব বুঝব না! কি যে বলিস দাদা!' একটু থামে ভিখন। আবার শুরু করে, 'তোকে সেদিন আফিং জুটিয়ে দিলুম। আওরতের খবর বাতালুম। পেটে যখন তোর নেশা ঢুকেছে, তখনই জানি আওরত তোর চাই-ই। হ্বিক হ্বিক হ্বিক—'

তীক্ষ্ণ গলায় টেনে টেনে হাসে ভিখন।

খানিকটা সময় কাটে।

লখাই ফুঁসতে থাকে। উত্তেজিত হয়ে উঠলে তার গলায় একটা শির নাচে। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ, ভীষণ গলায় সে খেঁকিয়ে ওঠে, 'কুত্তীকা বাচ্চা।'

ভিখন বলে, 'গোঁসা হবি না লখাই। নগদ একটা দোআনি খসিয়ে খবর এনেছি।'

'কি খবর?'

পোড়া বীভৎস মুখটা কাচুমাচু করে ভিখন বলে, 'খবরটা ভাল না। শুনলে তুই আমাকে রদ্দা হাঁকবি।'

লখাই জবাব দেয় না। কিছুক্ষণ ক্রূর চোখে তাকিয়ে থাকে।

মাঝখানে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ভিখন সরে বসে। তারপর বলে, 'শুনলে তোর দিলের ধড়কানা বন্ধ হয়ে যাবে।'

লখাই গর্জে উঠল, 'বল শালে—'

'আওরত কয়েদীদের না কি আলাদা কয়েদখানা। মরদানা কয়েদীরা সেখানে ঢুকতে পারে না।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়ে লখাই। দুটো থাবা সামনের দিকে বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ভিখন বেড়ি বাজাতে বাজাতে ছুটে পালায়।

আক্রোশে রোষে এবং উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে লখাই। রক্তাভ চোখ দুটো থেকে ফুলকি ছোটে। দাঁত দিয়ে নীচের পুরু ঠোঁটটা ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ফেলতে সে চিৎকার করে, 'শালেকে আবার পেলে বাকী চোখটা উপড়ে নেব। আওরত কয়েদীদের আলাদা কয়েদখানা! দিল্লাগী করার—'

ফুঁসতে ফুঁসতে আবার ডেকের উপর বসে পড়ে লখাই। যেদিকে ভিখন উধাও হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে সমানে চিল্লায়।

ক-দিন অবিরাম জাহাজের দোলানি খেয়েছে। লখাইর মনে হয়, মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে আপনা থেকেই দুলছে, টলছে। জাহাজের দোলানিরও বিচিত্র এক নেশা আছে।

সেদিন ভিখন খানিকটা আফিম জুটিয়ে এনেছিল। এ ছাড়া জাহাজের এ কটা দিন পেটে এক বিন্দু নেশার চীজ পড়ে নি।

তবু শরীরটা ঝিমঝিম করে। টান-টান শিরায় রক্ত ঘন হতে থাকে। মগজের মধ্যে মৌতাত ঘনায়। কেমন এক বুঁদ-বুঁদ ভাব। জাহাজের দোলানি যে এমন সাধের নেশা ধরাতে পারে, লখাই কস্মিনকালে ভাবে নি। আমেজে দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গোঁজে সে।

জাহাজের চারপাশে সাগরপাখিরা চক্র দেয়। মাস্তুলের দখল নিয়ে তাদের বিবাদ মুহূর্তের জন্য থামে না। কোনক্রমে যে পাখিটি মাস্তুলের ডগায় গিয়ে বসে, অন্য হিংস্নক পাখির ধারালো ঠোঁটের ঠোকর খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দখল ছেড়ে দেয়। পাখিদের চেঁচামেচি চিৎকার থামে না। পাখনা ঝাপটিয়ে বাতাসে আবর্ত তুলে তারা একে অপরের উপর হানা দেয়।

কোনদিকে দৃকপাত নেই লখাই'র। হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে সে আকাশ-পাতাল ভাবে।

বিবির বাজারের মোতি, আউটরাম ঘাট, কালা পানির তুফান, সোনিয়া, ভিখন আহীর, সেসন কোর্ট, পাঠান হাবিলদার, নানা ভাবনা নানা মানুষ মগজে জটলা করে। সবগুলি একাকার হয়ে তালগোল পাকায়। মনে হয়, এক ভাবনার সঙ্গে অন্যটার তিলমাত্র মিল নেই, সঙ্গতি নেই, সামঞ্জস্য নেই। তবু কোথায় যে সোনিয়ার সঙ্গে কালা পানির, জাহাজের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের, বিবির বাজারের মোতির সঙ্গে ভিখন আহীরের, একের সঙ্গে অন্যের একটা দুর্বোধ্য রহস্যময় যোগাযোগ রয়েছে, ঠিক হদিস পায় না লখাই।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে লখাই'র। বিড়বিড় করে কি যেন সে বকে। সম্ভবত গালিগালাজই করে। মগজ থেকে দুর্বহ অসহ্য ভাবনাগুলি ঝাঁকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। কিন্তু যে ভাবনা হাজার থাবায় তাকে ঠেসে ধরেছে, তার হাত থেকে এত সহজে রেহাই মেলে না।

মোটর বোটের আওয়াজে মাথা তুলল লখাই। সামনের দিকে নজর পড়ল। আওরত কয়েদীদের নিয়ে মোটর বোটটা জেটির দিকে ছুটেছে।

হঠাৎ দৃষ্টিটা ভীষণ ভাবে চমকে উঠল লখাইর। চোখের চমক মুহূর্তে শিরা উপশিরা বেয়ে রক্তে রক্তে ছুটে গেল। মেরুদণ্ডটার মধ্য দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা কি একটা যেন সড়াত করে নেমে গেল। হৃৎপিণ্ডটা তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে ঝনঝন করে উঠল।

চিনতে ভুল হয় নি লখাইর। ঝড়ের সমুদ্রে একটা পুরা রাত্রি যে নারীর সান্নিধ্যে কাটানো যায়, যে নারীর কোমল হাতের ডলা বুকের তলায় শির-শিরানির লহর তোলে, সে কি দু দিনেই মন থেকে মুছে যায়!

সোনিয়াকে নিয়ে উপসাগরের নীল জলে সাদা ফেনার রেখা টানতে টানতে মোটর বোটটা দূরে, অনেক দূরে এবারডীন জেটিটার দিকে চলে গেল। এখান

থেকে অস্পষ্ট বিন্দুর মত দেখায় মোটর বোটটাকে। এতদূর থেকে সোনিয়াকে আর চেনাই যায় না।

একটু পর ডেরিকের পাশ থেকে পাঠান হাবিলদারের বিরাট মুখ দেখা দিল। চিকন গোঁফজোড়া সস্নেহে তোয়াজ করতে করতে সে বলল, 'এ জনাব, থোড়া মেহেরবানি করে উঠিয়ে। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। এবার পারে নামতে হবে।'

লখাই উঠে পড়ল।

সাত

কতকালের এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ!

ইতিহাসের সেদিন সৃষ্টিই হয় নি, যেদিন বঙ্গোপসাগরের অথৈ অতল থেকে দু-শ চারটি দ্বীপখণ্ড মাথা তুলেছিল। সেদিনের সাল তারিখের নজির কোথাও মেলে না। ভূতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেছেন, সুদূর অতীতে আন্দামান নিকোবর সুমাত্রা এবং ব্রহ্মদেশ মিলিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে এক অখণ্ড বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছিল। কালক্রমে সমুদ্রের খেয়ালে মাঝখানের যোগসূত্র-গুলি ছিন্ন হয়ে যায়। খণ্ড খণ্ড হয়ে আন্দামান ব্রহ্ম নিকোবর সুমাত্রা—পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

এশিয়া মহাদেশের মানচিত্রে দেখা যায়, বিপুল সমুদ্রবক্ষে কয়েকটি নগণ্য বিন্দুর মধ্যেই আন্দামানের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ। এই দ্বীপমালা ভূগোলের পৃষ্ঠায় অতি সামান্য স্থানই দখল করতে পেরেছে। পূর্বদেশের ইতিহাসে আন্দামানের উল্লেখ নেই বললেই চলে। থাকবেই বা কেমন করে?

এই দ্বীপপুঞ্জে মোগল-পাঠান কোনকালে তাঁবু ফেলে নি; শক-হূণ কোন দিন হানা দেয় নি। ওলন্দাজ-দিনেমার-ইংরেজ-ফরাসী—বিদেশী সওদাগর সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোন দিন এখানে বাণিজ্যপোত ভেড়ায় নি। আরমানী হার্মাদ লুঠেরারা সম্পদের লোভে আন্দামানের উপকূলে হন্যে হয়ে ঘোরে নি।

কোন দিগ্বিজয়ী এই দ্বীপে এসে পূর্বদেশের ভাগ্য নির্ধারিত করে যায় নি। কোনদিন এখানে সৃষ্টিছাড়া এমন কিছুই ঘটে নি, যার চমকে তামাম দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগবে।

কি আছে এই দ্বীপের যে ইতিহাসে গৌরবান্বিত অধ্যায় যোজনা করবে? কিছুই নেই। সম্পদ নেই, যার লোভে দেশ-দেশান্তর থেকে বীর যোদ্ধা আসবে; অশ্বারোহী সৈনিকের তলোয়ারের ফলায় বিজুরী চমকাবে। বৈভব নেই, যার খোঁজে বণিক সওদাগর এসে বন্দর সাজাবে।

এই দ্বীপের গরিমা নেই, মহিমা নেই, মাহাত্ম্য নেই। সভ্যতার কিংবা সময়ের উত্থান-পতনের কোন দুর্লভ কাহিনীও এখানে পাওয়া যাবে না।

যা আছে, তা হল ছোট-বড়-মাঝারি দু-শ চারটি দ্বীপ, দৈর্ঘ্যে দু-শ উনিশ মাইল, প্রস্থে বিশ মাইলের অধিক কোথাও নয়।

বিরাট অজগর-দেহের মত বঙ্গোপসাগরে নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে আন্দামান।

আন্দামানের পাহাড়ী টিলায় টিলায় গহন অরণ্য, হাজার বছরের দীর্ঘ বনস্পতি আর কূলে কূলে অশ্বক্ষুরের আকারে নীল জলের উপসাগর। দূরে নিঃসীম সমুদ্র ; নাম আন্দামান সী। সমুদ্রের বুকে কালো জলরাশি, পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ আর অবিরাম গর্জন।

আন্দামানের অরণ্য-উপসাগর, পাহাড়-সমুদ্রই শুধু নেই। মানুষও আছে। তোমার আমার জানাশোনা মানুষের সঙ্গে এই মানুষের মিল নেই। এই মানুষের রক্তে-মাংসে-অস্থিতে শুধু লালসা। কামে-মত্ততায়-প্রতিহিংসায় এই মানুষ কুটিল কঠোর, ভয়াল ভীষণ। মানচিত্রের কয়েকটি বিন্দুতে এই মানুষের অস্তিত্ব নেই। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই মানুষের উল্লেখ আছে, কিন্তু আদত পরিচয় নেই।

ভারত-ব্রহ্মের মূল ভূখণ্ড থেকে কয়েক শ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালা। প্রতি মাসে জাহাজ ভরে যাদের এখানে পাঠানো হয়, তারা দস্যু খুনিয়ারা, ঠগ লুঠেরা। তাদের কেউ কেউ মেয়াদী, আর কেউ কেউ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী।

এখানে সৎ ভদ্র সুস্থ মানুষ কস্মিনকালে আসে না। আন্দামানের নামে অনেক দূরের শান্ত মানুষের পৃথিবী শিউরে ওঠে।

ভয়ঙ্কর সব খুনিয়ারা। তাদের উপদ্রবে মানুষের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। আতঙ্কে লক্ষপতি শেঠের চোখে ঘুম ঘনাত না। আশঙ্কায় কোন সওদাগর রাত্রির দিকে বাণিজ্যবহর ভাসাত না। খুবসুরত কামিনী দিবারাত্রি ঘরে খিল দিয়ে থাকত। নারী এবং সম্পদের সন্ধানে তারা হন্যে হয়ে ঘুরত। শৃঙ্খলা এবং শান্তি ভেঙে ফেলার মধ্যেই তাদের যত উল্লাস ; সভ্য দুনিয়ার সব কানুন তছনছ করে অরাজকতা চালানোর মধ্যেই যত নেশা।

আইনের বিচারে জীবন থেকে তারা বাতিল হয়ে গিয়েছে। সৎ মানুষের আদালত তাদের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নির্বাসন দিয়েছে। অনেক দূরের সমুদ্রে তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তোমার আমার পৃথিবী নিশ্চিন্ত হয়েছে, স্বস্তি পেয়েছে।

আঠারো-শ আটান্ন সালে ডক্টর জে. পি. ওয়াকার সেই যে দু-শ কয়েদী নিয়ে আন্দামান এসেছিলেন, তারপর কত বছর পার হয়ে গিয়েছে। কত কয়েদীই না এসেছে! গহন অরণ্য নির্মূল করে এই দ্বীপে তাঁরা স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

আশ্চর্য! এই সব কয়েদীরও জীবন আছে। সে জীবনের একটা নির্দিষ্ট রীতিও আছে। আন্দামানের কয়েদীর জীবন তোমার আমার কি আর দশজন ভদ্রসন্তানের জীবন যে খাতে বয়, সে খাতে চলে না।

এ জীবন অদ্ভুত, বিচিত্র।

তোমার আমার অন্তরাত্মা যে জীবনের কল্পনায় শিউরে ওঠে, এ জীবন সে-ই। তোমার আমার পৃথিবীকে নিষ্কাশিত করে যে পুঞ্জীভূত ক্লেদ তলানির মত পড়ে থাকে, তা দিয়ে এই জীবনের সৃষ্টি।

এ জীবন যে খাত বেয়ে চলে, সেটি হল ক্ষুধার খাত; দৈহিক এবং জৈবিক ক্ষুধা। যে রীতি মেনে এ জীবন চলে, তা হল লালসা-কাম-মত্ততার রীতি।

তীব্রস্বাদ খাদ্যে, উগ্র উত্তেজক মদে চরসে, পিনিকে এবং কামাতুর নারীমাংসে এই জীবনের চরিতার্থতা। কিন্তু তেমন খাদ্য নেশা এবং নারীদেহ কোথায় মিলবে এই দ্বীপে? যে সামান্য কয়েকটি আওরত কয়েদী রয়েছে সাউথ পয়েন্ট জেলখানায়, সেখানে ঘেঁষার হুকুমও নেই, উপায়ও নেই; বিরাট বিরাট প্রাচীরের আড়ালে সিপাই শান্ত্রীর পাহারায় তারা থাকে।

এই দ্বীপের নেশাহীন নারীসঙ্গহীন নিরুৎসব জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। বছরের পর বছর নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে কেউ কেউ উন্মাদ হয়ে যায়, কেউ কেউ সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়।

ভারত-ব্রহ্মের মূল ভূখণ্ড থেকে এখানে দ্বীপান্তরের সাজা ভোগ করতে আসার পথে কয়েদী তার অতীত, তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি (যদি কিছু থেকে থাকে) দরিয়ার জলে ডুবিয়ে আসে।

এ এক নিদারুণ দ্বীপ! এখানে স্নেহ নেই, মায়া নেই, মমতা নেই। এখানে শুধু গ্লানি, আর নৃশংসতা।

শান্তির ঈশ্বর, ন্যায়ের ঈশ্বর, সততার ঈশ্বর কোন কালে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে আসে না। পৃথিবীর সব মাধুর্য, মমতা, প্রেম থেকে ছিন্ন হয়ে এই দ্বীপ অনেক, অনেক দূরে পড়ে রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের জলে মরশুমে মরশুমে কত বাত্যা বয়, কত তুফান ওঠে। তবু মাসে মাসে এখানে কয়েদী আসার বিরাম ঘটে না।

আর দিনের পর দিন এই দ্বীপ তোমার আমার মত সৎ এবং ভদ্র মানুষের মনে আরো বিভীষিকা আরো রহস্য ঘনায়।

নারী কয়েদী নিয়ে মোটর বোটটা এবারডীন জেটিতে এসে ভিড়ল। পুরুষ কয়েদীদের যে জটলাটা জেটির এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, হঠাৎ সেটা মিলে মিশে একাকার হয়ে মোটর বোটের ওপর হুড়মুড় করে পড়ল। একসঙ্গে অনেকগুলো শিশ বাজল।

তুমুল হল্লা শুরু হয়ে গেল। কনুই দিয়ে ঠেলে গুঁতিয়ে সবাই মোটর বোটটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

মোটা কর্কশ গলায় এক কয়েদী বলল, 'খুবসুরতী জেনানা—'

অন্য একজন বলল, 'উ আওরত মেরা দিলকে রানী—'

দুটো টিণ্ডাল আর তিনটে পেটি অফিসার হুমকে উঠল, 'উল্লুকা বাচ্চীলোক; চিল্লাইও মাত। হঠ্—হঠ্—'

অনেক, অনেকদিন পর এই দ্বীপে নারী কয়েদী এসেছে। এই দ্বীপের বাতাসে নারীদেহের গন্ধ নেই। এখানে নারী একান্ত দুর্লভ।

কতদিন যে এই সব কয়েদী নারীমাংসের স্বাদ পায় নি! যারা এই দ্বীপে দীর্ঘদিনের মেয়াদ খাটছে, তারা কেউ কেউ মেয়েমানুষ না দেখে দেখে তাদের চেহারা-নমুনাই ভুলতে বসেছে।

এই মুহূর্তে নারী কয়েদীদের দেখতে দেখতে তাদের শিরায় শিরায় এতদিনের বুভুক্ষু লালসা দাপাদাপি শুরু করে দিল। রক্তের কণিকাগুলি সরীসৃপের মত কিলবিল করে ছুটতে লাগল।

সকলেই মোটর বোটে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। হল্লা চিৎকার তুমুল হয়ে উঠতে থাকে।

পেটি অফিসার, টিণ্ডাল সমানে চিল্লায়, 'হঠ্ হঠ্ গাল্কেকো পাটঠে।—আওরত দেখলে শালেরা পাগলা বনে যায়।'

সত্যিই মেয়েমানুষ দেখলে তারা উন্মাদ হয়ে ওঠে। পেটি অফিসার আর টিণ্ডালদের ধমকে হুমকিতে তারা ইঞ্চি পরিমাণ হটে না।

কেউ কেউ আওরত কয়েদীদের দিকে হাত বাড়িয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি

করে। শিশ বাজায়। কেউ কেউ ডাকে, 'এই মেরে পেয়ারে, এই লম্বরদারনী—ইধার—হাঁ-হাঁ—'

'এ কয়েদানী, মেরে জান—মেরে দিলজ্বালানেবালী—'

এবারডীন জেটিতে খিস্তি-খেউড়ে, শিশে, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিতে অশ্লীল রস গেঁজে উঠতে থাকে।

রশিম্যান দড়িদড়া দিয়ে মোটর বোটকে জেটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল। বোটের সঙ্গে জেটির ফারাক আর নেই।

কয়েদীদের জটলাটাকে ভেঙে ছত্রখান করে একেবারে সামনে এগিয়ে এল চান্নু সিং। প্রথমে চিৎকার করে উঠল, 'ওয়া গুরুজীকা ফতে—'

চান্নু সিংএর চিৎকারে পুরুষ কয়েদীদের হল্লা মুহূর্তের জন্য থামল। মোটর বোট থেকে নারী কয়েদীরা চমকে তাকাল। দেখল, বিকট চেহারার এক পাঞ্জাবী এসে দাঁড়িয়েছে।

গুরুজীর নাম নেবার পর যতখানি সম্ভব গলাটাকে মুলাইম করে চান্নু সিং হাঁকল, 'কৌন রে সোনিয়া? সোনিয়া কৌন?'

সোনিয়া শিউরে উঠল। জবাব দিল না।

একের পর এক কয়েদিনীদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে চান্নু সিং হাঁকতে লাগল, 'তুই সোনিয়া? তুই? তুই?'

কেউ জবাব দেয় না। বসে বসে চান্নু সিংএর কাণ্ড দেখে। তাদের চোখের পাতা নড়ে না।

রোমশ বুক, বিরাট আকার, চওড়া কাঁধ, থলথলে মাংসল উদরের চান্নু সিং এবার উত্তেজিত, অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, 'শালীলোক কথা বলছিস না কেন? কৌন সোনিয়া, জলদি বাতাও। না বাতালে—'

শাসানিটা আর মুখ থেকে বের হল না চান্নু সিংএর। তার আগেই চিৎকার শুরু হল। 'পুলিস আ গিয়া—'

কয়েদীরা জটলা ভেঙে চতুর্দিকে ছুটতে লাগল।

উঁচু টিলার মাথায় কয়েদখানা। তার পাশেই লম্বা লম্বা ব্যারাক। এগুলি 'বিজন'। 'বিজন'গুলির পাশ দিয়ে ঢালু উতরাই বেয়ে জনকতক পুলিস আর একটা হাবিলদার এবারডীন জেটিতে এসে পড়ল।

কয়েদীরা দূরে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। ভাবগতিক সুবিধা বুঝলেই সামনে এগোবে।

চান্নু সিং এবং আরো দু-পাঁচজন কয়েদী, নারীমাংস সম্বন্ধে যাদের কোনকালেই উৎসাহের খামতি নেই, তারা জেটি ছেড়ে নড়ে নি।

হাবিলদার দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'বেশরম কুত্তীকা বাচ্চা, ভাগ এখান থেকে।'

দুর্বিনীত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল চান্নু সিং। রক্তাভ চোখজোড়া ঝকমক করে উঠল। ভাগবার কোন লক্ষণই সে দেখাল না।

হাবিলদার আবার হাঁকল, 'কুত্তীকা বাচ্চা, হঠ্ হিঁয়াসে—'

'না—'

'না! কিঁউ—' হিংস্র, ভীষণ দৃষ্টিতে তাকাল হাবিলদার।

'সোনিয়া এসেছে। আওরত কয়েদানী; উসীকো আমি সাদি করব। বহুত খুবসুরতী লেড়কী—'

'সাদি করবি!' পুলিসদের দিকে তাকিয়ে হাবিলদার গর্জে উঠল, 'শালার মুখ তোড় দো, ডাণ্ডা হাঁকিয়ে পাছা ঢিলা কর্ দো—'

পুলিসগুলো যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। হুকুম পাওয়ামাত্র চান্নু সিংএর পিঠে বুকে মাথায় ডাণ্ডা পড়তে লাগল।

কয়েকটা পুলিস চান্নু সিংএর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কুর্তার হাতা ধরে, কেউ গর্দান পাকড়ে, কেউ পায়জামার রশি ধরে টানতে টানতে তাকে জেটির বাইরে নিয়ে এল। গতিক গড়বড় বুঝে যে দু-পাঁচজন চান্নু সিংএর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল, চক্ষের পলকে নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়েছে।

চান্নু সিংএর কপাল থুতনি ফেটে রক্ত ঝরছে। রোমশ বুকটা ভিজে গিয়েছে। গলার মোটা হাড়টা ফুলে উঠেছে। ভুরুটা কেটে একপিণ্ড মাংস চোখের উপর ঝুলছে। হাউ-হাউ করে বিকট অঙ্গভঙ্গি করে কাঁদছে চান্নু সিং। আর সমানে অশ্রাব্য খিস্তি করছে, 'হারামী, তেরি—'

আরো খানিকটা পর সাউথ পয়েন্ট জেলখানা থেকে মেম জেলার এলেন।

এবার একে একে মেয়ে কয়েদীরা এবারডীন জেটিতে নামতে লাগল।

চান্নু সিং ছুটে লাফিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছিল। পুলিসের তিন ডাণ্ডা খেয়ে পিছু হটতে হল।

বন্দা নওয়াজ খান জেটির এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে কয়েদিনীদের কাছে এগিয়ে এলেন। একে একে সকলের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। মুলুকের খোঁজ নিলেন। কার সাজার মেয়াদ কত বছর,

দেশ-গাঁওয়ে স্বজন-পরিজন-রিস্তাদার, কার কে কে আছে, সব খবর জানলেন।

সিপাই হাবিলদার, টিণ্ডাল পেটি অফিসার, মেম জেলার—কেউ তাঁকে বাধা দিল না।

আঠারো-শ আটান্নতে ওয়াকার সাহেবের সঙ্গে যে ছু-শ কয়েদী এই দ্বীপে প্রথম এসেছিল, নওয়াজ খান সে দলে ছিলেন। আন্দামানের মাটিতে তাঁর তিপ্পান্নটা বছর কাটল। এই দ্বীপের সবাই তাঁকে খাতির করে, সম্ভ্রম করে।

মাসে মাসে জাহাজ ভরে যে সব কয়েদী এই দ্বীপে দণ্ড ভোগ করতে আসে, জেটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের নাম-ধাম-মুলুকের খোঁজ খবর নেন। সকলের সঙ্গে জানপয়চান করেন। তিপ্পান্ন বছরে অভ্যাসটা পাকা হয়ে গিয়েছে।

সূর্যটা সরাসরি মাথার উপরে এসেছে। উপসাগরের নীল জল ঝকমক করছে। কূলের কাছে উড়ুক্কু মাছগুলি জল কেটে কেটে খানিকটা ছুটেই সমুদ্রে অদৃশ্য হচ্ছে।

এক সময় সিপাই হাবিলদার, টিণ্ডাল পেটি অফিসারদের পাহারায় কয়েদীরা সাউথ পয়েণ্ট জেলখানার দিকে রওনা হল।

অর্ধবৃত্তাকার উপসাগর। কিনারে পাথরের পর পাথর গেঁথে সমুদ্র বাঁধা হয়েছে। সমুদ্র কি বশ মানতে চায়? অথৈ দরিয়া থেকে দুর্জয় তরঙ্গমালা ছুটে এসে পাথরের দেওয়ালে আছাড় খায়।

উপসাগরের পাশ দিয়ে পাথরভাঙা সড়ক। সড়কটা সোজা সাউথ পয়েণ্ট জেলখানায় ঢুকেছে।

কয়েদীরা চলেছে। তাদের পাশে পাশে সিপাই হাবিলদার, পেটি অফিসার টিণ্ডালরা চলেছে। আর চলেছে চান্নু সিং। অন্য কয়েদীরা একটু দূর দিয়ে চলেছে।

হঠাৎ চান্নু সিং মরিয়া হয়ে উঠল। পাহারাদারদের ঠেলে গুঁতিয়ে একেবারে কয়েদিনীদের কাছে এসে পড়ল।

পুলিস পেটি অফিসাররা টেনে হিঁচড়ে ধাক্কা মেরে, কোতকা হাঁকিয়ে তাকে এতটুকু হটাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত চান্নু সিংয়ের উপর ডাণ্ডা পড়তে লাগল। হাড্ডি ফাটল, নাক বাঁকল, শির ছেঁচল, কাঁধ তুবড়ে গেল। তবু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই চান্নু সিংএর।

দু হাত বাড়িয়ে ডাণ্ডা ঠেকাতে ঠেকাতে চান্নু সিং কয়েদিনীদের দিকে চোখ রেখে চিল্লাতে লাগল, 'এই, তোর নাম কি?'

'রূপীবাঈ।'

'না না, তুই না।' আর একজনের দিকে হাত বাড়াল চান্নু সিং। 'তুই, তুই কৌন?'

'মোতিবিন বিবি।'

এবার অন্য একজনকে চান্নু সিং বলল, 'জরুর তুই সোনিয়া—'

'নেহী। আমি প্রেমা—'

চড়া গলায় চান্নু সিং খেঁকিয়ে উঠল, 'শালী, তোকে কৌন মেঙেছে? সোনিয়া কৌন বাতিয়ে দে—'

মুখে চোখে সমানে ডাণ্ডা পড়ছে চান্নু সিংএর। চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত ছুটছে। তবু সে পিছু হটে না। কাঠের চিরুনি দিয়ে লম্বা লম্বা চুলগুলো সাপটে বাগানো ছিল। ডাণ্ডার বাড়িতে দুখণ্ড হয়ে গিয়েছে চিরুনিটা। এলোমেলো চুল বাঁধনমুক্ত হয়ে মুখের উপর লুটোচ্ছে। উন্মত্তের মত টলতে টলতে এগুচ্ছে চান্নু সিং।

এই মুহূর্তে একটা রক্তাক্ত জানোয়ারের মত দেখায় চান্নু সিংকে।

দেখেশুনে ঈষৎ নরম হল সোনিয়া। ধারীওয়ালা কুর্তার নীচে খুনিয়ারা কয়েদিনীর আওরতী দিলটা হঠাৎ যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

সোনিয়া বলে ফেলল, 'আমি, আমি সোনিয়া। কি দরকার—'

'তুই!'

গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করেই থেমে গেল চান্নু সিং। একদৃষ্টে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

চিকন মাজার উপর সুঠাম মাংসল শরীর। কালো মসৃণ চামড়ায় কেমন যেন চকমকানি; চোখে ধাঁধা লাগায়। সোনিয়ার চোখের সাদা অংশে আড়াআড়ি লাল দাগ। টান-টান ধনুকের মত ভুরু দুটো যেখানে এসে জোড়া লেগেছে, সেখানে শ্বেতির চিহ্ন।

মাজা বাঁকিয়ে-চুরিয়ে এগিয়ে চলেছে সোনিয়া।

সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছুই দেখছিল না চান্নু সিং। বুকের দু পিণ্ড টাটকা কঠিন মাংস আর সুডৌল পাছার দোলানির সঙ্গে তার চোখজোড়া সামনে পিছে ওঠানামা করতে লাগল। গালের দু কশ বেয়ে ফোঁটা

ফোঁটা রক্ত ঝরছে। ভাঙাচোরা কদাকার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। গলার মধ্য দিয়ে গোঙানির মত একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরুচ্ছে।

রক্তাক্ত বীভৎস মুখে হাসছে চান্নু সিং। অদ্ভুত হাসি; পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে হাসিতে যন্ত্রণা মিশে রয়েছে।

চান্নু সিং বলতে লাগল, 'হে-হে, মুন্সীজী ঠিক খবর দিয়েছে। তুই বহুত খুবসুরতী। আমি সিরকারের (সরকারের) টিকিট পেয়েছি। তোকে সাদি করব। জরুর—'

সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ডাণ্ডা পড়ল মুখে। নীচের পাটিতে একটা দাঁত কটাত করে ভেঙে গেল। গলগল করে রক্ত ছুটছে। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল চান্নু সিং।

সোনিয়ারা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। মুখে হাত চেপে চান্নু সিং উঠে পড়ল। ছুটতে ছুটতে মুহূর্তের মধ্যে নারী কয়েদীদের কাছাকাছি এসে গেল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সোনিয়া। বলল, 'কেন আসছ মরদ? ডাণ্ডা খেয়ে খেয়ে খতম হয়ে যাবে যে!'

কপাল ভুরু ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। মোটা পাটকিলে রঙের জিভ বের করে সেই রক্ত চাটতে চাটতে চান্নু সিং হাসল। সে হাসি বড় করুণ, বড় মুলাইম। যে হাসিতে তাজা গাঢ় রক্তের স্বাদ মিশে থাকে, তার রকমই আলাদা। চান্নু সিং হাসতে লাগল।

সোনিয়া আবার বলল, 'তুমি ফিরে যাও মরদ। আমার পিছু পিছু এসে ডাণ্ডা খেয়ে কোন ফায়দা?'

বিরাট আকারের চান্নু সিং বড় নরম গলায় বলে, 'বহুত ফায়দা সোনিয়া। সে তুই সমঝাবি না।'

চান্নু সিং হাসতেই থাকে।

সোনিয়া আর জবাব দেয় না।

চান্নু সিং আবার বলে, 'ইয়াদ রাখিস সোনিয়া, বিলকুল মনে রাখিস, তোর জন্যে আমি বহুত খুন দিলাম।'

সোনিয়া এবারও কথা বলে না। অন্য কয়েদিনীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে সাউথ পয়েন্ট জেলখানার দিকে এগিয়ে চলে।

এবারডীন জেটি থেকে সাউথ পয়েন্ট জেলখানায় যাবার সড়কটা ফুরিয়ে

এসেছে। সামনেই কয়েদখানার ফটক। হঠাৎ ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে চান্নু সিং। ডাকে, 'এ সোনিয়া?'

'ক্যা?'

'আমার সিরকারী টিকিট মিলেছে। এবার সাদি করতে পারব। তোকেই সাদি করব সোনিয়া।' একটু থামে চান্নু সিং। হাঁপায়। ঘন ঘন শ্বাস টেনে দম নেয়। বলে, 'সাদির প্যারিডের (প্যারেডের) সময় আমি আসব। আমার শিরে লাল সাফা (পাগড়ি) থাকবে। ইয়াদ রাখিস; চিনতে ভুল করিস না সোনিয়া। গুরুজী কসম, তোকে না পেলে আমার জান বরবাদ হয়ে যাবে।'

চান্নু সিংএর রক্তাক্ত বীভৎস মুখটা এই মুহূর্তে করুণ দেখায়।

সোনিয়া শব্দ করে না। তার ঠোঁট দুটো বিচিত্র হাসিতে বেঁকে যায়। চোখের কোণে কি যেন ঝিলিক হানে। যে নারী কোতল করে দ্বীপান্তরে এসে চান্নু সিংএর মত জবরদস্ত মরদের এত খুন আর কাতরতা দেখেও মুখ বুঁজে ঠোঁট টিপে হাসে, তার দুর্জ্ঞেয় দুর্বাধ্য দিল কি দিয়ে গড়া, কে বলবে? সোনিয়ার দিলে কি আছে কে জানে?

পুরুষ কয়েদীরা একটু দূর দিয়ে আসছিল। আচমকা তারা হল্লা বাধিয়ে দিল।

কয়েদিনীদের উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'এ আওরত, সাদির প্যারিডের সময় হামি ভি আসব। এই ছ্যাখ হামার হাতে পিত্তলকা আঙুটি; নীল পাথর।'

'এ মহব্বতকা পেয়ারী, আমিও আসব। আমার গোরে (পায়ে) থাকবে লোহার কঙ্গণ (কঙ্কণ)। ইয়াদ রাখিস।'

'হামি ভি আসব—'

'হামি ভি আসব—'

হল্লা তুমুল হয়ে উঠতে লাগল।

কয়েদীরা কয়েদিনীদের কাছাকাছি ঘেঁষে এসেছে। সিপাই পেটি অফিসাররা ডাণ্ডা হাঁকিয়ে তাদের হটিয়ে দিল।

একটু পর সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় ঢুকে গেল সোনিয়ারা। চান্নু সিংও তাদের সঙ্গে ফটকের মধ্যে চলে আসছিল। দুটো টিণ্ডাল আর তিনটে পেটি অফিসার হাত-পা-গলা ধরে টানতে টানতে তাকে বাইরে নিয়ে এল।

ফটকের পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। আগলাগা রক্তাক্ত চোখে সাউথ পয়েন্ট জেলখানার দিকে তাকিয়ে রইল চান্নু সিং।

আট

এ বেলা পুরুষ কয়েদীদের জাহাজ থেকে নামানো হবে না।

এবারডীন জেটি থেকে জটলাটা ভেঙে যেতে শুরু করল।

রোদের তেজ এখন সাংঘাতিক। উপসাগরের শান্ত জল ফুলতে শুরু করেছে। বিরাট বিরাট ঢেউগুলো ফুঁসতে ফুঁসতে পাথরের দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

দূরের এলফিনস্টোন জাহাজটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বন্দা নওয়াজ খান। সবুজ রঙের জাহাজটা উপসাগরের জলে মৃদু মৃদু দুলছে। ফোরমাস্টের মাথায় সাগর পাখিগুলোকে সাদা-সাদা বিন্দুর মত দেখায়।

বিশ বছর আগের আর একটা দিনের কথা ভাবছিলেন বন্দা নওয়াজ খান। আজ যেখানে এলফিনস্টোন জাহাজটা মৃদু মৃদু দুলছে, সেদিন ওখানেই নোঙর ফেলেছিল আর-একটা জাহাজ। নামটা নির্ভুল মনে আছে নওয়াজ খানের। এস. এস. ম্যাককয়। ম্যাককয় জাহাজের সাদা রঙটাও তিনি ভোলেন নি।

বিশ বছর পরও এস. এস. ম্যাককয় নওয়াজ খানের স্মৃতিতে অবিকল রয়েছে। এতটুকু বিবর্ণ হয় নি। না হওয়ারই কথা।

ঐ জাহাজেই সুন্দর খান আন্দামানে এসেছিল।

নওয়াজ খান সেই দিনটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। বিশ বছর আগের একটা অদ্ভুত দিন।

সেদিন উপসাগরের নীল জল আশ্চর্য শান্ত। মাস্তুলের মাথায় এক ঝাঁক সাগরপাখি নিয়ে মৃদু মন্থর গতিতে ম্যাককয় জাহাজ সিসোস্ট্রেস বে'র মধ্যে ঢুকে পড়ল। নোঙর ফেলার আগে উপসাগরটাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে ভেঁ বাজাল।

বিশ বছর আগে মাথার একটা চুলও পাকে নি নওয়াজ খানের। শরীরে বয়সের কুঞ্চন দেখা দেয় নি। অটুট মেরুদণ্ডের উপর ঋজু সুন্দর চেহারা। পরনে কলিদার কুর্তা, ঢোলা শিলওয়ার, সুর্মাআঁকা চোখ—দীর্ঘ শৌখিন নওয়াজ খান অভ্যাসবশে সেদিন এবারডীন জেটিতে এসেছিলেন।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। কে যেন পাশ থেকে ডাকল। নওয়াজ খান ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, হানিফ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হানিফ আবার ডাকল, 'আব্বাজান—'

'কি বলছ?'

'আম্মা আপনাকে ডাকছেন।'

'তুমি যাও, আমি পরে যাব।'

নওয়াজ খান আবার উপসাগরের দিকে তাকালেন।

এবারডীন জেটিটা এখন একেবারে নির্জন। নতুন কয়েদীদের দেখার জন্য যে সব পুরনো কয়েদী ভিড় জমিয়েছিল, কয়েদানীদের সঙ্গে সঙ্গে তারা সাউথ পয়েণ্ট জেলখানার দিকে চলে গিয়েছে।

পাথরের জেটিটার উপর বিরাট তুফান বিচিত্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। লোনা জল ছিটকে নওয়াজ খানের শিলওয়ার কুর্তা ভিজিয়ে দিচ্ছে। এখন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

পিছন থেকে হানিফ আবার ডাকল, 'আব্বাজান—'

আবার ঘুরে দাঁড়ালেন নওয়াজ খান। বিরক্ত ভীষণ গলায় বললেন, 'তুমি এখনও যাও নি?'

'না।'

'কেন?'

'আম্মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'তুমি বহুত বেতমিয়ত হয়েছ, নাও চল।' একটু থেমে নওয়াজ খান বড় করুণ গলায় বললেন, 'এ জিন্দগীতে আর শান্তি মিলবে না। সবই খুদার মর্জি।'

হানিফের পিছন পিছন বন্দা নওয়াজ খান চলতে লাগলেন।

যে সড়কটা অ্যাটলাণ্টা পয়েণ্টে বাঁক নিয়ে উপসাগরের পার দিয়ে সিধা ফোনিক্স বে'র দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে এসে পড়লেন দুজনে। বাঁ পাশে উঁচু টিলার মাথায় সেলুলার জেল। টিলার গায়ে নারকেল বন আর হাওয়াই বুটির জঙ্গল। সমুদ্র ফুঁড়ে ঝড়ো বাওরা বাতাস উঠে আসে; নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে সনসনিয়ে ছোটে। ডান পাশে পাথরের দেওয়াল সড়কের সঙ্গে সঙ্গে এঁকেবেঁকে ফোনিক্স বে'র দিকে চলে গিয়েছে।

উপসাগর মেতেছে। অনেক দূর থেকে মাথা উঁচু করে দুর্জয় তরঙ্গমালা

ছুটে আসে; পাথুরে দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লবণ জল ফেনিয়ে ওঠে।

অ্যাটলাণ্টা পয়েণ্টের এই পথটা নির্জন; নিরিবিলি উপসাগর এবং বাতাসের গর্জন ছাড়া কোন শব্দ নেই।

নওয়াজ খান সে দিনটার কথা ভাবছিলেন। যেদিন সুন্দর খান ম্যাককয় জাহাজে আন্দামান এসেছিল। বিশ বছর আগের সেই দিন।

নতুন কয়েদী এসেছে। এবারডীন জেটিতে সেদিনও বিরাট জটলা।

সিসোস্ট্রেস বে'তে জাহাজ ঢুকবার কিছুক্ষণ পরই নতুন কয়েদীদের নামানো হয়েছিল। সব পরিষ্কার মনে আছে নওয়াজ খানের।

বেড়ি বাজাতে বাজাতে নতুন কয়েদীরা সেলুলার জেলের দিকে চলেছে। অনেক দিনের অভ্যাস। নওয়াজ খান কয়েদীদের নাম ধাম দেশগাঁও মুল্লুক, সাজার মেয়াদ, কে কোন ধারার আসামী—সব খবর নিচ্ছিলেন।

মিছিলের মত সারি দিয়ে কয়েদীরা চলেছে।

সকলের পিছনে সেই কয়েদীটি এসেছিল। তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নওয়াজ খান। দৃষ্টি ফেরাতে পারেন নি।

টকটকে ঋজু চেহারা; থরে থরে পেশীগুলো সুন্দর ভাবে সাজানো। মজবুদ গর্দান, শক্ত কব্জি, একজোড়া দীর্ঘ চোখ, ধারালো নাক, চওড়া কপাল। খাড়া চোয়ালে দৃঢ়তা, থুতনিতে একটি মনোরম খাঁজ। কঠিন সুঠাম সুন্দর খান। যে চেহারা চোখকে সুখ দেয়, এ সেই চেহারা। কালা পানি পাড়ি দিয়ে যে সব দুর্ধর্ষ খুনিয়ারা আন্দামানে দ্বীপান্তরের মেয়াদ খাটতে আসে, তাদের সঙ্গে এ চেহারা আদৌ মেলে না।

মুখময় দাড়িগোঁফ; রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল। তবু দেখেই মালুম হল, খানদানী ঘরের জোয়ান।

নওয়াজ খান জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার নাম কি?'

'সুন্দর খান।'

'ক সালের মেয়াদে এসেছ?'

'তামাম জিন্দগীর।'

'কোন ধারার আসামী?'

'তিন-শ দো ধারার।'

একটু দম নিয়ে নওয়াজ খান বলেছিলেন, 'কোতল করে এসেছ?'

'না! কোতল আর করতে পারলাম কই?' সুন্দর খানের চোখজোড়া (ক করে জ্বলে উঠেছিল।

বিশ বছর পরও অ্যাটলাণ্টা পয়েন্টের এই পাথুরে পথ ধরে চলতে চলতে হুবহু স্মরণ করতে পারছিলেন নওয়াজ খান। স্মৃতিটা এতটুকু ফিকে হয়ে যায় নি।

হঠাৎ পিছন থেকে হানিফ ডাকল, 'আব্বাজান—'

নওয়াজ খান চমকে উঠলেন।

মৃদু, ভীরু গলায় হানিফ আবার বলল, 'ফজিরে রোশন বহীন কাঁদছিল।'

নওয়াজ খান একবার হানিফের দিকে তাকালেন। তারপরেই—মাথা নীচু করে এগুতে লাগলেন। ভগ্ন, জড়িত স্বরে কি বললেন, বোঝা গেল না।

হানিফ বলল, 'লুকিয়ে লুকিয়ে রোশন বহীন রোজ কাঁদে।'

নওয়াজ খান সব জানেন। তাঁর দিল মুচড়ে মুচড়ে অনেক দীর্ঘশ্বাস এই দ্বীপের বাতাসে মিশেছে। রোশনের চোখ থেকে অনেক আঁশু এই দ্বীপের মাটিতে ঝরেছে। তবু সুন্দর খান ফেরে নি।

নওয়াজ খান জানেন, একদিন আর তাঁর দিল মুচড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরুবে না, রোশনের আঁখ থেকে আঁশু ঝরবে না। সব দীর্ঘশ্বাস, সব আঁশু ফুরিয়ে যাবে। একদিন তাঁরা এই দ্বীপের মাটিতে মিশে যাবেন। সেদিনও সুন্দর খান ফিরবে না।

পাঁচ বছর আগে এই দ্বীপ ছেড়ে মেন ল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিল সুন্দর খান। তারপর কতবার জাহাজ এল, কতবার গেল, তবু সে ফিরল না। এই পাঁচ বছরে কোন খোঁজখবর মেলে নি সুন্দর খানের; আর মুহূর্তের জন্য রোশনের আঁখও শুকনো থাকে নি।

'সুন্দর জরুর ফিরবে—' নওয়াজ খান অনেক আশ্বাস দিয়েছেন রোশনকে, অনেক স্তোক দিয়েছেন। এই পাঁচ বছরে সিসোস্ট্রেস উপসাগরে যতবার জাহাজ এসে নোঙর গেঁথেছে, ততবার অনেক আশা নিয়ে এবারডীন জেটিতে ছুটে গিয়েছেন। প্রতি মাসে কত নতুন কয়েদী এসেছে, নতুন মানুষে এই দ্বীপ ভরে গিয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ সুন্দর খানের খবর দিতে পারে নি।

সব কয়েদী যখন কয়েদখানায় চলে গিয়েছে, যখন এবারডীন জেটিতে একটি মানুষও আর নেই; দুর্বল পায়ে টলতে টলতে নিঃশব্দে কুঠিতে ফিরেছেন নওয়াজ খান। কারো সঙ্গে একটি কথা বলেন নি। কপাট বন্ধ করে ছটফট করে কাটিয়েছেন। আর দিল নেই, দরদ নেই, ইমান নেই যে বেতবিয়ত

জানোয়ারটার ; তার কথা ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় যন্ত্রণায় ঘরময় ছুটাছুটি করেছেন। অথচ বিশ বছর আগে এই সুন্দর খানকে কি ভালই ন লেগেছিল তাঁর।

সেদিন নওয়াজ খান জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোতল করতে গিয়েছিলে কেন ?'

'যাব না!' পেশল গর্দান ঘুরিয়ে গর্জে উঠেছিল সুন্দর খান, 'আমার আব্বাজান ছিল রিসালদার সিপাহী। সিপাহীদের সঙ্গে ইংরাজদের লড়াই হয়েছিল, ইয়াদ আছে আপনার ?'

'আছে।'

নওয়াজ খানের মেরুদণ্ড বেয়ে বিজুরী ছুটে গিয়েছিল। চমকে তিনি সুন্দরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

সুন্দর খান বলেছিল, 'সিপাহী লড়াইয়ের পর ইংরাজরা আব্বাজানের গর্দানে রশি বেঁধে গাছের ডালে লটকে গুলি করে মেরেছিল। ইংরাজ কোতল করে তার শোধ নিতে গিয়েছিলাম। খুদার ইমান নেই। ইংরাজ মারতে পারলাম না। মগর তামাম জিন্দগীর দ্বীপান্তর হয়েছে আমার। সে জন্যে আপসোস নেই।'

এক সময় বেড়ি বাজাতে বাজাতে 'টাপু' আর 'বিজন'গুলোর পাশ সেলুলার জেলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সুন্দর খান। আর অ্যাটলান্টা পয়েন্টের টিলায় দাঁড়িয়ে কয়েদখানার বিরাট ফটকটা দেখতে দেখতে নওয়াজ খান ভাবছিলেন।

এই দ্বীপে মাসে মাসে কত কয়েদীই তো আসে। কিন্তু কেউ তাঁর কথা বোঝে না, বুঝবার চেষ্টা করে না। সেদিন নওয়াজ খানের মনে হয়েছিল ম্যাফকয় জাহাজে আজ এমন এক কয়েদী এসেছে, যে তাঁর দিলের জ্বালা বুঝবে। মনে হয়েছিল, যে বেদনা মেদ-মজ্জা-খুন আর বুকের মধ্যে এতগুলি বছর তিনি এই দ্বীপে কাটালেন, তার এক দরদী শরিক এসেছে।

অ্যাটলান্টা পয়েন্টের টিলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন নওয়াজ খান। কয়েক মুহূর্তের পরিচয়ে সুন্দর খান তাঁর দিলটাকে যেন কেমন করে দিয়েছে।

হানিফ ডাকল, 'আব্বাজান—'

বিশ বছর পিছনের অতীত থেকে অ্যাটলান্টা পয়েন্টের পাথুরে সড়কে ফিরে এলেন নওয়াজ খান। মৃদু গলায় বললেন, 'কি বলছ ?'

'মেন ল্যাণ্ডে গিয়ে একবার সুন্দর সাহেবকে খোঁজ করলে হয় না?'

'না।' খুব আস্তে অথচ কঠিন স্বরে নওয়াজ খান বলতে লাগলেন, 'যার ইমান নেই, দিল নেই, তাকে খুঁজে কি হবে? কোন লাভ নেই।'

বলতে বলতে প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

এবারডীন বাজারের মধ্য দিয়ে সরাসরি পথ রয়েছে। তবু কেন যে উপসাগরের পার দিয়ে ফোনিক্স বে ঘুরে ডিলানিপুরের কুঠিতে ফিরলেন নওয়াজ খান, তিনিই জানেন।

জানালার পাশে একটি করুণ বিষণ্ণ নারীমুখ চোখে পড়ল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নওয়াজ খান। তাঁরপরেই চোখ নামালেন। সে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সে মুখের বিষণ্ণতায় কোথায় যেন একটা কঠোর ক্ষমাহীন অভিযোগ রয়েছে।

ছুই বলে না রোশন। ধিক্কার দেয় না, অভিযোগ করে না। কিন্তু তার কঠিন নীরবতা যেন সব সময় চিৎকার করে বলে; সমস্ত অপরাধ, তার ওর জীবনটাকে বরবাদ করে দেবার সমস্ত কারসাজিই নওয়াজ খানের।

সুন্দর খান নামে যে যন্ত্রণাকে তিনি আর সকলের সামনে গোপন করে রাখেন, রোশনের দিকে তাকালে দিল ফালা-ফালা করে তা বেরিয়ে আসে। এই দ্বীপের সবাই জানে; নওয়াজ খান দৃঢ়, অবিচল পুরুষ। কোন আঘাতেই তাকে টলানো যায় না। কিন্তু তাঁর বিরাট কঠিন বুকের মধ্যে এই পাঁচ বছরে বিন্দু বিন্দু কত খুন যে ঝরেছে, সে খোঁজ কে রাখে? সে খবর কে জানে? ছিঁড়ে যে খুন ঝরে তা তো সবাই দেখে। দিল টুটে যে খুন ঝরে, তা দেখার চোখ ক-জনের?

অনেকটা সময় নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন নওয়াজ খান। তারপর কপাটটা খুলে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। রোশনকে বুকের মধ্যে টেনে মাথায় হাত রাখলেন। হাতটা থরথর কাঁপতে লাগল।

ভাঙা-ভাঙা, অস্থির অদ্ভুত স্বরে নওয়াজ খান বলতে লাগলেন, 'সব কসুর, সব দোষ আমার। তোর জিন্দগী আমিই বরবাদ করে দিলাম রোশন।'

নয়

নওয়াজ খান এ বেলা আসেন নি। এবারডীন জেটিতে জনকতক কয়েদ
ইতস্তত দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর আছে টিণ্ডাল, পেটি অফিসার, ফ্রি ওয়ার্ডা
পুলিস এবং হাবিলদার।

অশান্ত উপসাগর ঢেউয়ের মাথায় গর্জন নিয়ে পাথুরে দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে
পড়ছে।

এখন বিকেল। সিসোস্ট্রেস বে'র নীল জল ঝকমক করে। উড়ুক্কু
মাছগুলি ঢেউ কেটে কেটে তীরবেগে ছুটে যায়। যে হিংস্র হাঙরের দল
শিকারের খোঁজে পারের দিকে আসছিল, ক্ষয়িত পাথরের তটে বাড়ি খেয়ে
দূরে পালিয়েছে। উপসাগরের উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সিন্ধুশকুন চলেছে
এলফিনস্টোন জাহাজটার দিকে।

'রস' আর 'বেলী'—মোটর বোট দুটো ভরে এলফিনস্টোন জাহাজ থেকে
কয়েদীরা আসতে লাগল। একেবারে শেষ ক্ষেপে এল মঙ চো, ভিখন, তোরাব
আলী আর লখাই

সবাই এবারডীন জেটিতে নামল।

একটু পর এবারডীন জেটির পাথুরে চত্বর থেকে এল দ্বীপের মাটিতে।

মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। দুস্তর কালাপানির
ওপারে কোথায় পড়ে রইল দেশ-গাঁও-মুল্লুক! কোথায় রয়ে গেল জান-পয়চান
দুনিয়া; কতকালের কত পরিচিত সেই পৃথিবী!

শীতের বিকেল এখন নিবু-নিবু। রোদের তেজ মরে আসতে শুরু
করেছে। রস দ্বীপটাকে আবছা, অস্পষ্ট দেখায়।

উপসাগরের গর্জন বেড়েই চলে। দুর্বোধ্য ভাষায় দরিয়া অবিরাম
শাসাতেই থাকে।

এলফিনস্টোন জাহাজটার দিকে তাকিয়ে ছিল লখাই। নিরুপায় আক্রোশে
চোখজোড়া জ্বলছিল। এই ক-দিন কিনারা নেই, এমন দরিয়ায় ভেসেছে;
কালা পানি উন্মাদ হয়ে উঠেছে; পাহাড়-প্রমাণ তুফান জাহাজের তক্তি
ফাঁসাবার কারসাজিতে মেতেছে; জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবার কসরত করেছে;

সমানে। দরিয়ার চেহারা-নমুনা দেখে সারেঙ-সুখানী-খালাসী সবার বুকের লৌ পানি হয়ে গিয়েছে। লোয়ার ডেকে পিঁজরাবদ্ধ হয়ে আড়াই শ কয়েদী সমস্বরে পাঁচ পীর আর বদরের নাম জপেছে। খুদাতাল্লার দুআ মেঙেছে। ভগবান আর ফায়ার নাম নিয়েছে। ভয়ার্ত গলায় কেঁদেছে।

লখাইর রক্তে ডর নেই। কোন কিছুতে তার তরাস ধরে না। উন্মাদ তুফানে জাহাজ যখন ওলট-পালট খেয়েছে, বিচিত্র উল্লাসে সে তখন ডেকের উপর বুকে হেঁটেছে। দরিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে যুঝেছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে নেমে মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে সব যোগাযোগ ঘুচিয়ে লখাইর মনে হয়, ডাক ছেড়ে চিল্লায়। মনে হল, একটা বিকট অদম্য চিৎকার গলার নলীটাকে চিরে ফেঁড়ে বেরিয়ে পড়বে। ঢোক গিলেও চিৎকারটাকে রোখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ সমস্ত দুনিয়ার উপর অদ্ভুত আক্রোশে মনটা ভরে গেল লখাইর।

একটা পুরনো কয়েদী জানপয়চান করতে এসেছিল। আলাপ জমাতে চেয়েছিল। 'নাম কি তোর?'

লখাই জবাব দিল না।

কয়েদীটা আবার বলল, 'ইণ্ডিয়ার কোন গাঁও থেকে এসেছিস?'

ক্রুর চোখে তাকাল লখাই। ভীষণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হঠ্ শালে, কুত্তীকা বাচ্চা—'

কয়েদীটাও খিস্তি করল। কিছু অশ্লীল বুলি আদান-প্রদানের পর কয়েদীটা ভিখন আহীরের কাছে গেল।

লখাই ভাবছিল সেই বিবির বাজার, মোতি, তিয়াসী নদী, শরীয়তুল্লা মৃধা —এমনি নানা কথা। হাজার কথা। পারকূলহীন দরিয়া পাড়ি দিয়ে আন্দামানে নেমে তাদের কথা মনে পড়ে কেন? ভেবে ভেবে লখাই দিশা পায় না।

হঠাৎ পাঠান টিণ্ডাল দেহের সমস্ত তাগদ গলায় ঢেলে চিল্লাল, 'নয়া কয়েদীলোগ, আ যা—'

লখাই চমকে উঠল।

একটু পর কয়েদীরা কম্বল-কাপড়া-বোঁচকা মাথায় চাপিয়ে পাহারাদারদের পিছু পিছু চলল। দু শ কয়েদীর পায়ের বেড়ি ঝনঝন করে সমতালে বাজতে লাগল।

পাথুরে সড়কটা অ্যাটলাণ্টা পয়েন্টের টিলাটাকে পেঁচিয়ে পুরা একটা পাক

খেয়ে উপরে উঠেছে। টিলাটা নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ। ঝড় মুখে নিয়ে সমুদ্র ফুঁড়ে বাতাস উঠে আসে; নারকেল গাছের মাথাগুলি এলোপাথাড়ি ঝাঁকায়। নারকেলের পাতার পাতায় সোঁ সোঁ শব্দ তুলে দরিয়ার বাতাস কি শোহরত যে করে, কে জানে?

তুফান মুখে নিয়ে যে সমুদ্র পাথুরে দেওয়ালে অবিরাম আছাড় খায়, তাকে এখন আর স্পষ্ট দেখা যায় না। এখান থেকে উপসাগরটাকে মাঝে মাঝে একটা চকিত ঝিলিকের মত মনে হয়।

তোরাব আলী পিছে পিছে হাঁটছিল। হঠাৎ সে ডাকল, 'লখাই ভাই—'

চলতে চলতেই ঘাড়টা একবার ঘোরাল লখাই, 'কি কইছিস রে তোরাব?'

তোরাব আলী বলল। তার গলায় কাঁপুনি ধরেছে, 'বড় ডর লাগে রে লখাই ভাই।'

লখাই খেঁকিয়ে উঠল না। দাঁত মুখ খিঁচাল না। মৃদু নরম গলায় বলল, 'হুঁ—'

ভরসা পেয়ে তোরাব আলী বলতে লাগল, 'দ্বীপান্তরে নেমেই জান লবেজান হয়ে গেল রে লখাই ভাই। দু চার রোজেই ফৌত হয়ে যাব। চোদ্দ বছর আর ঘানি ঘোরাতে হবে না।'

লখাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

কাঁপা-কাঁপা বিষণ্ণ গলায় তোরাব বলেই চলে, 'বড় আপসোস রয়ে গেল লখাই ভাই; বিবির পেটের ছানাটা কুনো কালে তার বাপজানের মুখ দেখবে না।'

গলাটা ধরে এল তোরাব আলীর। লখাই দেখল, হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছছে তোরাব।

দু পাশে কয়েদীদের লম্বা লম্বা ব্যারাক। এগুলির নাম 'বিজন'। 'বিজন' থেকে পুরনো কয়েদীরা নতুন কয়েদীদের দেখছে।

এক সময় রাস্তা ফুরিয়ে গেল। দু শ আনকোরা কয়েদী কয়েদখানার সামনে এসে পড়ল।

পাঠান টিণ্ডাল হুঙ্কার ছাড়ল, 'কয়েদীলোগ, ঠার যা—'

দু শ কয়েদী থমকে দাঁড়াল। চার শ চোখের নজর সামনের দিকে স্থির হয়ে পড়ল। চোখের পাতা নড়ল না।

হাত বিশেকের মধ্যেই সেলুলার জেল; আন্দামানের কয়েদখানা। ফটকের সামনে দু দল পাহারাদার কাঁধে বন্দুক ফেলে টহল দিচ্ছে। ফটকের এ মাথায় এসে জোড়া পায়ে শব্দ তুলে একবার তারা দাঁড়ায়। তারপরেই ঘুরে ফটকের ও-মাথায় যায়। আবার ফেরে। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে তাদের কঠিন নিয়মে ঘোরাফেরা। পাকা সড়কে ভারী বুটের বিচিত্র গম্ভীর আওয়াজ ওঠে সমতালে। খট খট, খটা খট।

পাহারাদারদের বন্দুকগুলির মাথায় সঙীনগুলো ঝকমক করছে। লখাই একদৃষ্টে সে দিকে তাকিয়ে রইল।

সূর্যটাকে এখন আর দেখা যায় না। পশ্চিম আকাশে খাড়া-খাড়া পাহাড়ের মাথা উঠেছে। সেগুলোর আড়ালে সূর্যটা ঢলে পড়েছে। পাহাড়ের চূড়ার পাশ দিয়ে নিবু-নিবু রক্তাভ আলো আকাশের খানিকটা অংশ দখল করে রেখেছে।

খণ্ড-খণ্ড ঘন কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। সামুদ্রিক বাতাসের বাড়ি খেয়ে ঝাঁক বেঁধে তারা উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটেছে।

পিছন থেকে তোরাব আলী ডাকল, 'লখাই ভাই—'

'উঁ—'

ফিসফিস ডরানো গলায় তোরাব আলী বলল, 'এই বুঝি দ্বীপান্তরের কয়েদখানা!'

'হুঁ—'

এবার বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় কি যে বলতে লাগল তোরাব আলী, কিছুই বোঝা গেল না।

লখাই ভাবছিল। তার মনটা সোজা সহজ খাতে বয় না। নিজের মনোভাবই বুঝতে পারে না সে। কতকগুলো ছন্নছাড়া আবোল-তাবোল ভাবনা এই মুহূর্তে মনটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাবু করে ফেলতে চায়।

আউটরাম ঘাট থেকে যখন জাহাজে উঠেছিল লখাই, মনের কোথাও ভাবনার চিহ্ন মাত্র ছিল না। মনটা ছিল ফাঁকা শূন্য হালকা; সব কিছু থেকে মুক্ত। সব ভাবনা মেনল্যাণ্ডের মাটিতে রেখে কালা পানির জাহাজে উঠেছিল সে।

লখাই হচ্ছে সেই মানুষ, মন যাকে বিকল করতে পারে না। কিন্তু এই মুহূর্তে দ্বীপান্তরের কয়েদখানার সামনে পশ্চিম আকাশ থেকে যখন শীতের

বেলাশেষ নিবু-নিবু আলো দিচ্ছে, মনের উপর পরতের পর পরত ভাবনা চাপান পড়ল। বিবির বাজারের মোতি, দরিয়ার জাহাজ, কালা পানির ঝড়, শরীয়তুল্লা, ভিখন আহীর—সব একযোগে তুমুল ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিল।

আচমকা বিরাট শরীর আর শরীরের মধ্যে অদৃশ্য মনটার ভেতর চমক খেলে গেল লখাইর। সব ছাপিয়ে সোনিয়ার মুখ দেখা দিল। ঝড়ের দরিয়ায় উথল-পাথল জাহাজের সঙ্গিনী মুহূর্তে সমস্ত মন জুড়ে বসল।

সামনে পিছনে, সব দিক থেকে ফ্যাঁচ ফোঁচ শব্দ উঠছে। চমকে এদিক সেদিক ওদিক—চারদিকে তাকালে লখাই। বিশাল চেহারার জনকতক খুনিয়ারা মরদ কাঁদছে।

মরদের কান্না কোনকালে সইতে পারে না লখাই। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎই তার মনে হল, আন্দামানের কয়েদখানার সামনে মরদের কান্না অস্বাভাবিক নয়, অসহ্যও নয়।

একটু পরেই লোহার কব্জায় বিকট শব্দ তুলে কয়েদখানার ফটকটা খুলে গেল।

পাঠান টিণ্ডাল খেঁকিয়ে উঠল, 'কয়েদীলোগ আ যা—'

একে একে কয়েদীরা কয়েদখানার ভিতরে ঢুকতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফটকটা দু শ নয়া কয়েদীকে গ্রাস করে ফেলল।

পশ্চিম আকাশের নিবু-নিবু আলো এখন এক ফুৎকারে নিবে গিয়েছে। ছায়া-ছায়া অস্পষ্ট অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

ফটকের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দশ

এটা উনিশ-শ এগারো সাল।

আঠারো-শ আটান্নতে বন্দী উপনিবেশের পত্তন হয়েছে। উনিশ-শ দুই সালে আট শ কুঠুরির সেলুলার জেল তৈরী হয়ে গিয়েছে। শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে দূরে দূরে গাঁও বসছে। জঙ্গল নির্মূল হয়ে ক্ষেতিবাড়ি হচ্ছে।

আন্দামানের উপনিবেশ জমে উঠেছে। ভারত-ব্রহ্মের মূল ভূখণ্ড থেকে জাহাজ ভরে প্রত্যেক মাসে মাসে কয়েদী আসে। দ্বীপের জীবন বাড়ে। হাজার বছরের অরণ্য সংহার করে মানুষ তার সীমানা বাড়ায়।

কালাপানি পাড়ি দিয়ে শুধু কয়েদীই আসে না। আজকাল আন্দামানের বিভীষিকা কাটিয়ে মেনল্যাণ্ড থেকে দুঃসাহসী বেনিয়ারা আসতে শুরু করেছে এই দ্বীপে।

এই উনিশ-শ এগারো সালে এবারডীন বাজারে পাঁচখানা দোকান বসেছে। পুরনো কয়েদী সুলেমান মোপলার কাপড়ের দোকান, ফাই মঙ বর্মীর কাঠ এবং বেতের আসবাবের দোকান, মাদ্রাজী চীনা রেড্ডির সরাইখানা, মারোয়াড়ী খুবলালের চাল-ডাল-মসলার দোকান আর বাঙালী খ্রীষ্টান গোমেসের প্রবাল-শামুক, শঙ্খ, হরেক রকমের কড়ির দোকান।

পাঁচটা দোকান জড়াজড়ি করে রয়েছে।

রাত অনেক বেড়েছে।

আকাশে ইতস্তত খণ্ড খণ্ড মেঘ। মেঘের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে খানিকটা অস্পষ্ট ম্যাকাশে চাঁদের আলো এসে পড়েছে এবারডীন বাজারের মাথায়।

দূর থেকে অশান্ত উপসাগরের শাসানি ভেসে আসছে। টিলার গায়ে নারকেল-বনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। নারকেলের পাতাগুলো চাঁদের আবছা আলোতে চিকমিক করে। বিরাট চেহারার রেনট্রিগুলোকে ভৌতিক মনে হয়।

ফাই মঙ বর্মীর দোকানের সামনে বাঁশের মাচানে বসে ছিল চারু সিং

আর মাউ খে। চান্নু সিংয়ের হাতে মুখে মাথায়—সমস্ত শরীরে ব্যাণ্ডেজ আর পট্টি।

চীনা রেড্ডির সরাইখানা থেকে গোটা দুই মুরুক্কু কিনে এনেছিল মাউ খে। মুরুক্কুতে এলোপাথাড়ি কামড় বসাতে বসাতে সে বলল, 'মঙ চো'টা অ্যাদ্দিনে এল। এবার দুভাই এক সাথ থাকা যাবে।'

চান্নু সিং ধমকে উঠল, 'ছোড়্ দে তোর মঙ চো! ইদিকে আমার শির ফেটেছে, হাড্ডি তুড়েছে, কত খুন গিয়েছে! সিকম্যানডেরার (হাসপাতালের) ডাক্তার সাহিব সুঁই মেরে মেরে চামড়া ফুটা ফুটা করে দিয়েছে। আর তুই শালে মঙ চো'র বাত বলছিস।'

মাউ খে জবাব দিল না। শক্ত ঝাল মুরুক্কুতে তবিয়ত করে কামড়ের পর কামড় বসাতে লাগলো।

দূরের আর একটা মাচানে বসে জনকতক বর্মী পিনিক ফুঁকছে, কেউ শুখা তামাক চিবুচ্ছে। আর ফাই মঙ বর্মীর দোকানের ভিতরে একটা চোরা কুঠুরিতে অন্দর বাহির জুয়ার আড্ডা বসেছে। কাঠের চোঙায় গুটি পুরে গপাগপ করে চালার আওয়াজ আসছে। মাঝে মাঝে চাপা গলায় হররা উঠছে।

মাউ খে বলল, 'কুত্তাগুলো একদিন নির্ঘাত ধরা পড়বে। সেদিন অন্দর বাহির—'

মাউ খে'র কথা শেষ হবার আগেই চান্নু সিং খেঁকিয়ে উঠল, 'ছোড়্ দে শালে অন্দর বাহির! সোনিয়ার জন্তে কত'—

চান্নু সিংয়ের কথা শেষ হবার আগেই ফাই মঙ বর্মীর চোরা কুঠুরি থেকে ঢোলা জোব্বা পরা একটা লোক উঠে এল। মুখময় দাড়িগোঁফ, লম্বা লম্বা জটা-পাকানো চুল। লাল টকটকে একজোড়া চোখ। চুলদাড়ি থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। লোকটা দাঁত বের করে হাসল। তারপর ছড়া আওড়াল।

'যো গুলকা জোহিয়া হ্যায়
উসে ক্যা কারকা খটকা।'

ছড়া আওড়াবার পর লোকটা বলল, 'যে গুল ফুল তুলতে চায়, তার কাঁটার ভয় করলে চলে! খুবসুরতী আওরত চাইবি আর খুন দিবি না! কি রে উল্লু?'

লোকটার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল চান্নু সিং আর মাউ খে

তাদের চোখের পাতা নড়ল না। মাউ খে মুরুকুতে কামড় দিতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে। চান্নু সিং অবাক হয়ে গিয়েছে।

লোকটা সামনের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে এল। ঢোলা জোব্বা আর চুলদাড়ি থেকে উৎকট দুর্গন্ধের ঝাঁঝ নাকে ঢুকল চান্নু সিং ও মাউ খে'র।

অসমান দাঁতগুলো মেলে সমানে হাসছে লোকটা। বলল, 'কি রে, আমাকে চিনতে পারছিস না!'

এতক্ষণে চান্নু সিং কথা বলল, 'বহুত তাজ্জবকি বাত। তুই—'

'হাঁ আমি ; ভাগোয়া কয়েদী।'

'তুই অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি জাজিরুদ্দিন?'

দাড়ির ফাঁকে হাসিটা অদৃশ্য হল। দুই ঠোঁটের আড়ালে দু পাটি দাঁত ঢাকা পড়ল। কর্কশ গম্ভীর গলায় জাজিরুদ্দিন বলল, 'কতবার তোদের বলেছি, আমি শুধু জাজিরুদ্দিন না। আমি হলাম মৌলানা জাজিরুদ্দিন হাজী। জানিস, দু দুবার হজে গিয়েছিলাম।'

'জরুর।' সঙ্গে সঙ্গে মাউ খে আর চান্নু সিং মাথা নাড়তে নাড়তে সায় দেয়।

জাজিরুদ্দিনের হাসি এবং দাঁত আবার দেখা দেয়।

এই দ্বীপের সবাই জানে বছর দুই আগে লক্ষ্ণৌ শহর থেকে তামাম জীবনের সাজা নিয়ে এখানে এসেছিল জাজিরুদ্দিন। আন্দামানের মাটিতে নেমেই নিজের নামের সামনে পিছে মৌলানা আর হাজী বসিয়ে শোহরত করেছিল। কিন্তু এই দ্বীপের কয়েদীরা কেমন করে যেন টের পেয়ে গিয়েছে, জাজিরুদ্দিন কোনদিন মৌলানা ছিল না, আর কোন কালেই হজে যায় নি। যারা সত্যিকার মৌলানা আর হাজীর মাহাত্ম্য জানে, প্রথম প্রথম তারা সরাসরি এমন শোহরতে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু জাজিরুদ্দিনের মস্ত থাবার ঘুষা খেয়ে দাঁত-নাক ছুটিয়ে খুন ঝরিয়ে শেষ পর্যন্ত সামনাসামনি কেউ কিছু বলত না।

আড়ালে সব কয়েদীই বলত, 'মৌলানা হাজী না হোক, শালা বড় মরদ হৈ। এক ঘুষায় শালা শির ছেঁচে দেয়।'

সেই জাজিরুদ্দিন মাসখানেক কয়েদ খাটতে না খাটতেই একদিন উধাও হল। পয়লা পয়লা তাকে নারকেলের ছোবড়া কোটার কাজ দেওয়া হয়েছিল। মুগুর পিটিয়ে পিটিয়ে শুকনো নারকেল-ছোবড়া থেকে খুয়া

ঝরিয়ে প্রতি রোজ তাকে আড়াই পাউণ্ড তার ছিলতে হত। মুগুরের ঘষায় প্রথমে ফোস্কা পড়ত, তারপর ফোস্কা ফাটত, তারও পর হাতের তেলো থেকে পরতের পর পরত চামড়া উঠে যেত। এক-এক ওক্তে এক পাউণ্ড খানার বদলে এতখানি তখলিফ আর মেহনত করার মানুষ দুনিয়ায় লাখে লাখে মেলে। কিন্তু জাজিরুদ্দিন যে সে ধাতের মানুষ নয়, কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিয়ে দিল।

ছোবড়া কোটার মুগুর ছুঁড়ে ফেলে জাজিরুদ্দিন পয়লা পয়লা চিল্লাত, 'কয়েদী কি সিরকারের কেনা বন্দা?'

পাশ থেকে পেটি অফিসার দাঁত খিঁচাত। 'কুত্তীকা বাচ্চা, ঠিকসে কামান কর।' বলেই কোত্‌কা হাঁকাত।

দুর্বিনীত ভঙ্গিতে গর্দান বাঁকিয়ে তাকাত জাজিরুদ্দিন। বলত, 'অ্যায়সা মাত মারো। আমি কারো বন্দা না। আমি খুদাবন্দ্।'

দু-চার দিনের মধ্যেই মেজাজ বদলে ফেলল জাজিরুদ্দিন। প্রতি রোজ ঠিক ঠিক আড়াই পাউণ্ড নারকেল ছোবড়ার তার বের করল। পেটি অফিসার বেজায় খুশী।

তারপর একদিন পেটি অফিসারকে তোয়াজ করতে করতে জাজিরুদ্দিন বলল, 'পেটি অফসার সাহিব, আপ আন্দামানের আল্লারসুল, আমার খুদ্ বাপজান—'

পেটি অফিসার খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, 'কি মতলব রে শালে, এত খুশামুদি করছিস?'

মাথা এক হাত জিভ কেটে জাজিরুদ্দিন কানে আঙুল রাখল। চোখ বুঁজে বলতে লাগল, 'খুদ বাপজানের কাছে খুশামুদি করতে পারি! এট্টু মেহেরবানি মাঙছি। অফসার সাহিব—'

চোখ কুঁচকে তেরছা নজরে তাকাল পেটি অফিসার। বলল, 'কিসের মেহেরবানি?'

'হে হে অফসার সাহিব, অ্যাদ্দিন তো ছোবড়া ছিলাকোটার কাজ করলাম। এবার দুসরা কামান চাই।' জাজিরুদ্দিন সমানে হাত কচলাতে লাগল।

'কি কামান?'

'সড়ক বানানোর কামান।'

এক মুহূর্ত কি যেন ভেবেছিল পেটি অফিসার। তারপর বলেছিল, 'বদ মতলব নেই তো রে?'

'খুদার নামে বিশ কসম। কোন বদ মতলব নেই অফসার সাহিব।' মাপা আধ হাত জিভ বের করে চোখ বুঁজে কানে হাত ঠেকিয়েছিল জাজিরুদ্দিন।

'ঠিক হায়; কাল থেকে সড়ক বানাতে যাবি।'

আন্দামানে আসার পর কয়েদখানায় আটক হয়ে ছিল জাজিরুদ্দিন। নিজের কুঠুরিতে বসেই নারকেলের ছোবড়া ছিলতে কুটতে হত। পেটি অফিসার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। একটু নড়াচড়া কি আরাম করার উপায় ছিল না।

পেটি অফিসারের মেহেরবানিতে পরের দিনই কয়েদখানার বাইরে বেরুতে পেরেছিল জাজিরুদ্দিন। সড়ক বানানোর ফাইলে নাম লিখিয়ে হাডু এসেছিল। হাডুতে তখন নতুন সড়ক তৈরী হচ্ছে। তামাম দিন অন্য কয়েদীদের সঙ্গে পাথর ভেঙেছে, হাত-রোলার টেনে সড়ক সমান করেছে। দুপুরে কয়েদখানায় এসে খানাও খেয়ে গিয়েছে। তারপর সন্ধ্যার আগে পেটি অফিসার যখন সড়ক বানানোর কয়েদীদের গুনতে শুরু করেছিল, তখন আর জাজিরুদ্দিনের পাত্তা মেলে নি। সমস্ত হাডু এলেকা ঢুঁড়েও তাকে পাওয়া গেল না।

যেদিকে তাকানো যায়, টিলায় টিলায় দোল খাওয়া আন্দামানের পাহাড়মালা। সেই সব পাহাড়ে কত শতাব্দীর নিবিড় গভীর জটিল অরণ্য। সেই অরণ্যের কোথায় যে জাজিরুদ্দিন উধাও হয়ে গেল, কে বলবে?

সমস্ত আন্দামান তোলপাড় করেও যখন জাজিরুদ্দিনকে পাওয়া গেল না, তখন সবাই ভাবল, হয় জংলী জারোয়াদের তীরে তার জান চলে গিয়েছে, তা না হলে উপসাগরের দাঁতাল হাঙররাই তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ বলে, ছোট ডিঙিতে বিপুল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে বর্মা মুলুকে চলে গিয়েছে জাজিরুদ্দিন। কারো কারো মতে সুমাত্রায় পালাবার পথে ডিঙি উল্টে সমুদ্রে ভেসে গিয়েছে সে।

শেষ পর্যন্ত ভাগোরা কয়েদীদের খাতায় জাজিরুদ্দিনের নাম উঠেছে।

এই হল জাজিরুদ্দিনের কিস্সা। এই দ্বীপের কয়েদী বাসিন্দারা মাত্র

কয়েকদিন দেখেছে তাকে। তবু আন্দামানের কৌতূহল এবং বিস্ময়ের মধ্যে এই আজব কয়েদী মিশে রয়েছে।

অনেকক্ষণ পর জাজিরুদ্দিনই বলতে শুরু করল, 'কি রে চান্নু, উল্লু, সোনিয়াকে সাদি করবি ?'

দু বছর পর কোথা থেকে যে জাজিরুদ্দিন গভীর রাতের এবারডীন বাজার ফুঁড়ে বেরুল, ভেবে দিশা পায় না চান্নু সিং। পিছনের দুটো বছর কোথায় যে সে লুকিয়ে ছিল, তা-ও এক অতল রহস্য। তাজ্জব বনে গিয়েছে চান্নু সিং। বিস্ময়ের ঘোরটা এখনও টোটে নি। অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে।

জাজিরুদ্দিন এবার খেঁকিয়ে উঠল, 'এই শালে, মুখ দিয়ে বাত বেরুচ্ছে না কেন ? বোবা হয়ে গেলি নাকি ?'

চান্নু সিং হুবহু মনে করতে পারছিল, যে বছর জাজিরুদ্দিন লক্ষ্ণৌ শহর থেকে দ্বীপান্তরের সাজা নিয়ে সেলুলার জেলে এল, সে বছর সে টিণ্ডাল হয়েছে। অল্প অল্প জান-পায়চান হয়েছিল জাজিরুদ্দিনের সঙ্গে।

এই দ্বীপে যারা কয়েদ খাটতে আসে, তাদের সকলের সঙ্গেই তো অল্প-বিস্তর আলাপ হয়। কিন্তু এই আজব কয়েদীটা মৌলানা আর হাজী বনে পয়লাই সকলের নজরে পড়েছিল। তারপর বিরাট মুঠার ঘুষা দিয়ে অন্য কয়েদীদের যখন সে ঢিট করতে লাগল, তখন সবাই তটস্থ হয়ে উঠল। যত দুর্ধর্ষই হোক, নতুন কয়েদী আন্দামানে এসে পয়লা পয়লা চুপচাপ থাকে। কিন্তু জাজিরুদ্দিনের জাত এবং ধাত একেবারেই আলাদা।

চান্নু সিং ভাবছিল, যে কয়েদী পেটি অফিসারের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে সড়ক বানানোর ফাইল থেকে ভাগতে পারে, নিঃসন্দেহে সে বাহাদুর লোক। তার এলেম জেয়াদা। তাকে সহজে ভোলা যায় না।

জাজিরুদ্দিন আবার বলল, 'কি রে চান্নু, সোনিয়াকে তুই সাদি করবি ?'

'জরুর, লেকিন তুই সোনিয়ার কথা জানলি কেমন করে ?'

জাজিরুদ্দিন হাসল। বলল, 'আন্দামানের সব আদমী জানে। পুট বিলাস (পোর্ট ব্লেয়ার) থেকে বাম্বু ফ্ল্যাট, মিঠা খাড়ি, ডাণ্ডাস পয়েন্ট, এগার চালান, সব জায়গার সবাইকে পুছে ছাখ্। সবাই জানে।'

একটু থামল জাজিরুদ্দিন। তারপর গলাটা খাদে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করল, 'দু রোজ হাবরাডীন বাজারে এসে রয়েছি। ফাই মণ্ড বর্মীর

দোকানে আস্তানা গেড়েছি। সোনিয়ার পিছু পিছু ছুটে পাহারাদারের ডাণ্ডা খেয়ে তোর শির ছেঁচল, হাড্ডি ভুড়ল, সচ্ কি না বল্ ?'

'হাঁ।'

'সব জানি আমি। সব শুনেছি।' রহস্যময় গলায় জাজিরুদ্দিন বলতে লাগল, 'জঙ্গলে থেকেও এই দু বরষে সব শাগে লোকের খবর রাখতাম।'

হঠাৎ চান্নু সিং উত্তেজিত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, 'দু রোজ তুই ফাই বর্মীর দোকানে রয়েছিস ?'

'জরুর।'

'পুলিসলোক টের পায় নি ?'

'না।'

'তুই তো ভাগোয়া কয়েদী। একবার তোকে ধরতে পারলে জানে খতম করে ফেলবে। হাবরাডীন বাজারে এসে উঠেছিস ; ডর লাগে না ?'

'ডর ! না ; বিলকুল না।'

বিকট শব্দে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল জাজিরুদ্দিন।

চান্নু সিং ও মাউ খে চমকে উঠল। যারা ওপাশের মাচানে বসে পিনিক ফুঁকছিল, মুহূর্তের জন্য তাদের ফোঁকা বন্ধ হল। হাসির তোড়ে বিরাট দীর্ঘ শরীরটা বেঁকে দুমড়ে গেল জাজিরুদ্দিনের। একটু পরই টান টান খাড়া হয়ে পড়ল সে। আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, 'আমার বুকের সিনাটার দিকে তাকা চান্নু। এর অন্দরে ডর নেই। বুঝলি ?'

চান্নু সিং মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

জাজিরুদ্দিন আবার বলল, 'ডরের কুছু নেই। পুলিসের হাতে ধরা দিতেই তো এসেছি।'

চান্নু সিং শিউরে উঠল। গলার মধ্য দিয়ে একটা অস্ফুট অমানুষিক আওয়াজ বেরুল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সে বলল, 'জরুর তোকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।'

'দেবে না।'

অনেকটা সময় কাটল। তুফান মুখে নিয়ে যে অস্থির সমুদ্র পাথুরে দেওয়ালে অবিরাম মাথা কোটে, তার শাসানি শোনা যেতে লাগল। নারকেল-বনে ঝোড়ো বাতাস মাতামাতি করতেই থাকল। চারদিক থেকে বিরাট বিরাট

মেঘের খণ্ডগুলো দক্ষিণ আকাশে ধাওয়া করেছে। চাঁদটা ঘুরে ঘুরে আর পারছে না।

হঠাৎ চান্নু সিং বলল, 'এই দু বরষ তুই কোথায় লুকিয়ে ছিলি?'

'জঙ্গলে।'

'জঙ্গলে কোথায়?'

জাজিরুদ্দিনের গলায় বিরক্ত স্বর ফুটল, 'ও বাত ছোড় দে।'

'কৌন বাত তবে বলব?'

'সোনিয়াকে সাদি করবি কি না বল?'

'জরুর। লেকিন—'

'লেকিন কি?'

'ক্যায়সা সাদি হবে?'

'বহুত মুসিবত কি বাত; তাই না রে চান্নু?' জাজিরুদ্দিন মিটিমিটি তাকায়। তোয়াজ করে দাড়ি চুমরাতে চুমরাতে হাসে।

'হাঁ।' মাথা নীচু করে সমানে মাথা নাড়ে চান্নু সিং।

'আমি সব বন্দোবস্ত্ করে দিতে পারি।'

'পারিস!' লাফিয়ে উঠে জাজিরুদ্দিনের একটা হাত ধরে চান্নু সিং। করুণ খোশামুদির সুর ফোটে গলায়, 'তাই করে দে। আমি শালে তোর গুলাম হয়ে থাকব। সোনিয়াকে না পেলে আমার দিল ফেটে যাবে।'

হঠাৎ জাজিরুদ্দিন বলে, 'ধরম দিতে পারবি?'

বিমূঢ় চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চান্নু সিং। তারপর অদ্ভুত গলায় বলে, 'তুই কি বলছিস?'

'জানিস তো আমি মৌলানা আর হাজী। দু দুবার হজে গিয়েছিলাম।'

'জরুর, জরুর।' জাজিরুদ্দিনের হাতটা পরম নির্ভরতায় আঁকড়ে থাকে চান্নু সিং। আর সমানে বলে যায়, 'জরুর, আমি সব জানি। সব জানি।'

'তুই আমাকে ধরম দিবি, আমি তোকে সোনিয়া দেব।' জাজিরুদ্দিন বলে, 'এর মতলব হল, তুই মুছলমান হবি।'

'ওয়া গুরুজীকি ফতে।' চান্নু সিং চিৎকার করে ওঠে। জাজিরুদ্দিনের হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে। বলে, 'সোনিয়াকে পেলে জান দিতে পারি। ধরম জরুর দেব। লেকিন সোনিয়াকে পাব তো?'

'পাবি।'

চান্নু সিংএর হাত থেকে জাজিরুদ্দিন নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। তারপর এবারভীন বাজার থেকে যে সড়কটা বেঁকে সেলুলার জেলের দিকে চলে গিয়েছে, সেই সড়কে গিয়ে ওঠে।

চান্নু সিং হাঁকে, 'এই জাজিরুদ্দিন—'

জাজিরুদ্দিন জবাব দেয় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঢোলা জোব্বা পরা দীর্ঘ মূর্তিটা সড়কের বাঁকে মিলিয়ে যায়। অনেক দূর থেকে একটা স্বর ভেসে আসতে থাকে।

'যো গুলকা জোহিয়া হ্যায়,
উসে ক্যা খারকা খটকা।'

জাজিরুদ্দিন গাইছে। তার গলা ভারী মিঠা।

এগারো

দ্বীপের জীবন শুরু হয়েছে।

মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে আন্দামানের মাটিতে নেমেছে লখাই। এখন কত রাত কে জানে?

মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে সব যোগাযোগ ঘুচে গিয়েছে। বিপুল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে এসেছে লখাই। আন্দামানের কয়েক হাজার দ্বীপান্তরী কয়েদীর সঙ্গে তার জীবন মিশল।

আন্দামানের জীবনের শরিক হল লখাই।

এত সব কথা লখাই ভাবছিল না। কোন ভাবনাই সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ভাবে ভাবার মত মনই নয় তার।

এখন কত রাত কে বলবে?

মোটা মোটা গরাদের ফাঁকে এক খণ্ড আকাশ দেখা যায়। দু-একটা ইতস্ততঃ মিটমিট তারা আর কালো ভীষণ আকারের হানাদার মেঘ ছাড়া আকাশে কিছুই নেই।

গারদখানাটা এখন একেবারে নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। এক হাজার দুর্দান্ত খুনিয়ারা সমস্ত দিন ছোবড়া পিটিয়ে, সড়ক সমান করে, ঘানি ঘুরিয়ে, টিণ্ডাল আর পেটি অফিসারদের ডাণ্ডা আর খিস্তি খেয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কয়েদখানার বিরাট বিরাট ইমারতগুলো রাত্রির অন্ধকার মুড়ি দিয়ে অচেনা রহস্যময় হয়ে গিয়েছে।

পাথুরে দেওয়ালে উপসাগরের শাসানি আর নারকেল-বনে বাতাসের গর্জন ছাড়া কোথাও শব্দ নেই।

ঘুম আসছে না লখাইর। কদিন দরিয়ায় ভেসেছে সমানে। জাহাজের ঝাঁকানি আর দোলানি এখনও সমস্ত শরীরে রয়ে গিয়েছে। মাথাটা টলছে। মনে হয়, গারদখানার ইমারতগুলো বুঝি নড়ছে।

মোটা মজবুদ গরাদে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল লখাই। ভাবছিল। মেনল্যাণ্ডের কয়েদখানা থেকে দুখানা কম্বল, দুটো আটহাতি ধুতি আর দুটো কুর্তা মিলেছিল।

ধুতিকুর্তা এখানকার মুন্সীজীর কাছে জমা দিয়ে, চুপচাপ মেরে 'কয়েদী কাপড়া' মিলেছে। কয়েদী কাপড়া হল, নীল ধারীওয়ালা ইজের আর কুর্তা। আর মিলেছে খানাপিনার জন্ম লোহার বর্তন।

আউটরাম ঘাট থেকে জাহাজে ওঠা, দরিয়ার ঝড়, সোনিয়া, এই আন্দামান, গারদখানা—সব কেমন যেন অসম্ভব, অদ্ভুত একটা ভোজবাজির মত মনে হয়। যা কিছু ঘটেছে, সব যেন তাজ্জব এক ভেল্কি।

লণ্ঠন হাতে ওয়ার্ডারের মুখ দেখা দিল। লখাই চমকে উঠল।

গোলাকার মুখ; বাঁ চোখটা ছোট; খোঁচা খোঁচা শলার মত কাঁচাপাকা গোঁফ। মাথায় লাল সাফা পাগড়ি।

ওয়ার্ডার খেঁকিয়ে উঠল, 'এই শালে, কি মতলব ?'

লখাই জবাব দিল না। একদৃষ্টে ওয়ার্ডারটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওয়ার্ডার আবার গর্জে উঠল, 'শালে নয়া এসেছিস; এসেই ভাগবার মতলব! টিক (বেত) মেবে মেরে জান পায়মাল করে দেব।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ গলাটা নরম শোনাল ওয়ার্ডারের, 'ভাগবি আর কেমন করে? গরাদ তো তুড়তে পারবি না। তালাও ভাঙতে পারবি না। তালা তক তোর হাতই যাবে না।'

বলতে বলতে কুঠুরিটার সামনে থেকে সরে গেল ওয়ার্ডারটা। তার পায়ের আওয়াজ বারান্দা ধরে বাঁ দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

অনেকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল লখাই। এদিকে সেদিকে ওয়ার্ডারদের পায়ের শব্দ, পাহারাদারদের ভারী বুটের শব্দ, বিচিত্র সব আওয়াজ শুনতে লাগল।

নাঃ, ঘুম আসছে না। ঘুম আসবে না।

বাইরে শীতের রাত ঘন হচ্ছে। সমুদ্র ফুঁড়ে যে কনকনে বাতাস উঠে আসে, চামড়া মাংস ফেড়ে তা হাড়ে গিয়ে বাজে।

বিছানা থেকে একটা কম্বল নিয়ে এল লখাই। বেশ ঘনিষ্ঠ করে শরীরে জড়িয়ে নিল। তারপর গরাদ ধরে দাঁড়াল।

আবার ওয়ার্ডারের মুখ দেখা দিল।

লখাই-ই পয়লা কথা বলল, 'ঘুম আসছে না ওয়াডারজী। মাথা ঘুরছে।'

ওয়ার্ডারটার গলায় অন্তরঙ্গতার স্বর ফুটল, 'পয়লা নয়া কয়েদীর আঁখে নিদ আসে না। পরে সব ঠিক হয়ে যায়। কি রে শালে, ডর লাগছে?'

অস্ফুট একটা শব্দ করল লখাই। কিছুই বোঝা গেল না।

লখাইর জবাবের জন্য দুশ্চিন্তা নেই ওয়ার্ডারটার। আপন মনেই সে বকে চলল, 'ডর তো লাগবার কথাই। পন্দর বছর আগে এই কয়েদখানায় এসেছিলাম। পয়লা রাতে আমারও ডর লেগেছিল। ডরাস নি ; সব ঠিক হো যায়েগা।'

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল লখাই।

ওয়ার্ডার এবার অন্য প্রসঙ্গ ফাঁদল। সরাসরি প্রশ্ন করল, 'নাম কি তোর ?'

'লখাই।'

'দেশগাঁও কোথায় ?'

'চব্বিশ পরগনা জেলা। হেতমপুর গাঁয়ের নাম।'

ওয়ার্ডারের চোখের তারা দুটো ঝিক করে নেচে উঠল, গলা ফেড়ে এক বিচিত্র উল্লাসের শব্দ বেরুল, 'তুই বঙ্গালী !'

'হাঁ।'

'আমিও বঙ্গালী।'

ওয়ার্ডারটা চলে গেল। বারান্দা দিয়ে এ মাথা থেকে সে মাথায় বার কয়েক টহল দিয়ে বেড়াল। কুঠুরিতে কুঠুরিতে কয়েদীদের ডেকে ডেকে পরখ করে দেখল, জেগে আছে কি না ?

আবার লখাইর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল ওয়ার্ডারটা। বলল, 'দেশগাঁওয়ে জরু রিস্তাদার কেউ আছে ?'

'না, কেউ নেই।'

'খুব ভাল বাত। ও ল্যাঠা না থাকাই ভাল।' হঠাৎ ওয়ার্ডারের গলাটা ভারী, গাঢ় শোনাল, 'ও সব থাকলে দিল বরবাদ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না।

ওয়ার্ডারের বুকের বিরাট সিনাটা তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

লখাই বলল, 'ওয়ার্ডারজী, আপনি তো বাঙালী—'

'জরুর। চাটিগাঁর কক্সবাজার আমার মুল্লুক। পন্দর বছর দ্বীপান্তরে রয়েছি।' একটু থেমে চোখ বুঁজে কি যেন খুঁজে ফিরল ওয়ার্ডারটা। তারপর ভাঙা-ভাঙা অদ্ভুত এক বেদনার সুরে বলতে লাগল, 'আমার নাম মোহর গাজী। পন্দর বছর মুল্লুক ছেড়ে খালি জাজিরা (দ্বীপ) দেখছি, সমুন্দর দেখছি, পানি আউর বন দেখছি। পন্দর বরষে বঙলা বুলিটা ভুলে গেছি। তুইও ভুলে যাবি। সব আদমী ভুলে যাবে।'

হতাশা আর আক্ষেপের মধ্যে কথা শেষ করল মোহর গাজী। মুখেচোখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ল। যন্ত্রণার ধরনটি বড় খাঁটি।

লখাইর গলায় চমক খেলল, 'বাঙলা বুলি ভুলব কেন?'

'পাঠান-পাঞ্জাবী টিণ্ডাল আর পেটি অফিসাররা পিটিয়ে পিটিয়ে ভুলিয়ে দেবে।'

হঠাৎ গারদখানার স্তব্ধতা আর গভীর রাত্রির শান্তি খানখান করে কর্কশ ভাঙা গলার একটানা চিৎকার উঠল। ডানপাশের কুঠুরি থেকেই চিৎকারটা উঠছে।

ওয়ার্ডার মোহর গাজীর মুখে বিরক্ত, ভয়ঙ্কর এক ভঙ্গি ফুটল। দাঁতে দাঁত ঘষে সে গর্জে উঠল, 'শালের জ্বালায় বাতচিত করা যাবে না। হর রোজ কুত্তীকা বাচ্চা কয়েদীদের নিদ টুটে দেবে।'

লণ্ঠন হাতে মোহর গাজী ডান পাশের কুঠুরিটার দিকে ছুটল। গরাদে হাত রেখে তার হুমকি আর শাসানি শুনতে লাগল লখাই।

মোহর গাজী শাসাচ্ছে, 'এই পরাঞ্জপে; চুপ মার হারামী। কালই তোকে 'টিকটিকি'তে বেত মারার স্ট্যাণ্ডে পাঠাব। পাছা যখন ঢিলা করে দেবে, তখন মালুম পাবি। থাম্ শালে—'

ধমক-ধামক আর শাসানিতে কিছুই হল না। পরাঞ্জপের চিৎকার বেড়েই চলল। গলা-ফাটা ভাঙা-ভাঙা কর্কশ কান্না গারদখানার ইমারতে ইমারতে বাড়ি খেতে লাগল।

মোহর চাপা গলায় হুমকে উঠল, 'চুপ মার শালে, পাগল সেজে রয়েছিস কামের ডরে! কাল সকালে সব ফাঁস করে দেব।'

নিমেষে চিৎকার থামল।

ঢুলকি চালে কদমে কদমে আবার এগিয়ে এল মোহর গাজী। গরাদ ধরে তখনও লখাই দাঁড়িয়ে আছে!

মোহর বলল, 'ও শালে পরাঞ্জপে; মারাঠী।'

লখাই জবাব দিল না।

মোহর আবার বলল, 'কামের ডরে হারামীটা পাগল সেজে থাকে।'

'কাজের ডরে!'

'হুঁ।' লখাইর গলার স্বরটা বুঝবার চেষ্টা করল মোহর গাজী। একটু চুপচাপ থেকে বলল, 'কাল থেকে মালুম পাবি, দ্বীপান্তরের কয়েদখানার কাম ক্যায়সা?'

লণ্ঠন ঝুলিয়ে ডান দিকে চলল মোহর গাজী।

বারো

সেলুলার জেল।

ভারত-ব্রহ্মের মূল ভূখণ্ড থেকে কয়েক শ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের এই কয়েদখানা একই সঙ্গে তোমার আমার মত সৎ, ভদ্র মানুষের মনে সন্ত্রাস জাগায়, রহস্য ঘনায়।

আন্দামানের এই ভয়াবহ কারাবাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে। আর শেষ হয়েছিল এই শতকের প্রথম দিকে স্যার রিচার্ড টেম্পলের আমলে।

সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে সাতটা হাতের মত সাতটা তিনতলা কলনেড সাত দিকে ছুটে গিয়েছে। প্রায় আট শ সেল। সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে সবগুলি কুঠুরির উপর নজর রাখা যায়। সেণ্ট্রাল টাওয়ারের আরো দুটি নাম আছে। মেন টাওয়ার এবং ওয়াচ টাওয়ার।

সেলুলার জেল প্রাচীন স্থাপত্যের সব নিদর্শনই নিজের চেহারায় ফুটিয়ে রেখেছে। সমস্ত পৃথিবীতে এই নমুনার কয়েদখানার মধ্যে এটি তৃতীয়।

বছরের পর বছর ডাণ্ডাস পয়েণ্ট আর হার্ড্র ব্রিকফিল্ডে কয়েদীরা ইট পুড়িয়েছে। কয়েদীদের বানানো বিশ লক্ষ ইটে সেলুলার জেলের জন্ম হয়েছে। সেই জেলেই মাসে মাসে নতুন কয়েদী মেনল্যাণ্ড থেকে দ্বীপান্তরের সাজা খাটতে আসে।

কয়েদীরা আক্ষেপ করে বলে, 'আমাদের বানানো কয়েদখানায় আমাদেরই আটক করছে। শালে, আপনা জুতিসে আপকো পিটছে।'

আটল্যাণ্টা পয়েণ্টের টিলায় সেলুলার জেল।

সামনের দিকের সড়কটা ডান দিকে বেঁকে এবারডীন বাজারের মধ্য দিয়ে হাড্র্ ডিলানিপুর চ্যাথাম দ্বীপের দিকে চলে গিয়েছে। আবার ডান পাশে ঘুরে উপসাগরের কিনার দিয়ে সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানা বাঁয়ে ফেলে হ্যাটন পাহাড়, ক্রুথসাবাদ, করবাইনসে উধাও হয়েছে।

সেলুলার জেলের মাথা থেকে এ পাশে রস ও পাশে চ্যাথাম দ্বীপ নজরে পড়ে। অনেকদূরে ধোঁয়ার পাহাড়ের মত দেখা যায় হ্যাভলক দ্বীপটাকে।

এদিকে সিসোস্ট্রেস বে, ওদিকে কোনিস্ম বে। অশান্ত, উদ্দাম উপসাগর মেতেই আছে। কোনিস্ম বে'র উল্টা দিকে মাউন্ট হ্যারিয়েটের চূড়াটা খাড়া হয়ে উঠেছে।

সেলুলার জেলে সকাল হল।

ওয়ার্ডার মোহর গাজীকে আজ আর দেখা গেল না। একটা পেশোয়ারী পেটি অফিসার এসে তালা খুলল। তার সঙ্গে একজন কয়েদী জমাদার আর একজন ত্রি সিপাই এসেছে।

পেটি অফিসার সামনে এসে দাঁড়াল। বাঁ কাঁধ থেকে বুকের উপর দিয়ে ডান দিকের কোমর পর্যন্ত কোনাকুনি লাল কাপড়ের পট্টি। বুকে তকমা আঁটা। তাতে লেখা আছে, পেটি অফিসার।

পুরা সাড়ে চার হাত লম্বা রোমশ শরীর, ঘন দাড়ি গোঁফ, ঘোলাটে চোখ জোড়া আর ঢিলেঢোলা কুর্তার মধ্য থেকে পেশোয়ারী পেটি অফিসারের সঠিক উমর (বয়স) বের করা সোজা ব্যাপার নয়।

পেটি অফিসার লখাইর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ দিয়ে জরিপ করে নিল। তারপর বেশ মুলাইম করে বলল, 'আমি হলাম পেটি অফসার। আমার নাম নসিমুল গণি। ইয়াদ রাখিস।'

নসিমুল গণির হাতে মোটা বেতের পোক্ত একটি ডাণ্ডা ছিল। এবার সেটা উচিয়ে সে বলল, 'এই ডাণ্ডাটার কথাও ইয়াদ রাখিস।'

লখাই জবাব দিল না।

পেটি অফিসার আবার বলল, 'যা, বর্তন নিয়ে এবার নীচে যা। কাঞ্জি-পানি মিলবে।'

চার নম্বর ব্লকের দোতলায় একটা কুঠুরি মিলেছে লখাইর। লোহার একটা বর্তন নিয়ে কয়েদী জমাদারের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে প্রশ্ন করল, 'কাঞ্জিপানি কি?'

তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত, লোভার্ত একটা শব্দ করল জমাদারটা। বলল, 'আ বে বুদ্ধু, কাঞ্জিপানি হল খানা। বহুত বঢ়িয়া চীজ—'

মুখ হাত ধুয়ে লখাই এসে দেখল, চার নম্বর ইমারতের সামনে অনেক কয়েদী এসে জমায়ত হয়েছে। সকলে জোড়া জোড়া বসেছে। কয়েদীদের হাতে হাতে লোহার থালা।

একটু পর টিণ্ডাল, পেটি অফিসার, ক্রি জমাদার, সিপাই এসে পড়ল।

জমাদার কয়েদী গোনা শুরু করল। হাঁকল, 'সাত-শ বিশ নম্বর—'

একটি কয়েদী উঠে দাঁড়াল। সেলাম ঠুকে বলল, 'সিরকার (সরকার) সালাম।'

জমাদার আবার হাঁকল, 'সাত-শ একইশ—'

আর একটি কয়েদী উঠল, 'সিরকার সালাম—'

একের পর এক কয়েদী গণনা চলল। বিচিত্র সুরে জমাদার নম্বর হাঁকতে লাগল। কয়েদীরা হাজিরা দিতে লাগল।

এক সময় জমাদার হাঁকল, 'সাত-শ পঁচাশ—'

'হাজির—'

শ খানেক কয়েদী চমকে উঠল। পেটি অফিসার, টিণ্ডাল, জমাদার, সিপাই —সবাই দাঁতে দাঁত ঘষল।

জমাদার গর্জে উঠল, 'এ শালে হরবনস; ইধার আ হারামীকা বাচ্চে। তেরি—'

একটা বছর বিশ-বাইশের জোয়ান উঠে দাঁড়াল। দু পাটি ঝকঝকে দাঁত বের করে সে হাসছে।

জমাদারের চোখে হত্যা ঝিলিক দিল। সে বলল, 'আজ তোকে টিক-টিকিতে (বেত মারার স্ট্যাণ্ডে) ফেলে জিন্দ্‌গী চৌপট করে দেব। ইধর আ—'

লম্বা লম্বা কদমে জমাদারের সামনে এসে দাঁড়াল হরবনস।

জমাদার আবার বলল, 'তোকে হর রোজ বলছি না, হাজিরার সময় 'সিরকার সালাম' বলবি।'

হরবনস হি-হি করে হাসতেই লাগল। বলল, 'জমাদার সাহিব, সিরকার আমাকে কয়েদ করেছে, লেকিন আমার সালাম তো কয়েদ করে নি। ও বাত আমার মুখ দিয়ে বার হবে না।'

মুখের উপর বিরাট এক ঘুষা এসে পড়ল। পাক খেয়ে ঘুরে পড়ল হরবনস। সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল।

জমাদার খেঁকিয়ে উঠল, 'তোর মুখ দিয়ে বার হবে না! শালের বাচ্চে, তোর বাপের মুখ দিয়ে বার করিয়ে ছাড়ব।'

অম্লান গলায় হরবনস বলল, 'এ তো ঠিক বাত। লেকিন আমার মুখ দিয়ে বার হবে না।'

জমাদার বাঁ চোখটা কুঁচকে ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটো পেটি অফিসার হরবনসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে হিঁচড়ে তাকে সাত নম্বর ব্লকের দিকে নিয়ে চলল।

এক পাশে বসে শ খানেক কয়েদীর সঙ্গে সব দেখল লখাই। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় তার শরীরটা কাঁপছে।

আবার যথারীতি নম্বর হাঁকতে শুরু করল জমাদার, 'সাত-শ ষাট—'

'সিরকার সালাম—'

'এক ষাট—'

কেউ হাজিরা দিল না।

জমাদার তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কৌন শালে এক ষাট—'

লখাই হরবনসের কথা ভাবছিল। হঠাৎ পাশের কয়েদীটা কনুইর গুঁতো মারল পাঁজরে। বলল, 'এ বুরবক, তুই তো এক ষাট—'

লখাই চমকে উঠে দাঁড়াল। কাঁপা গলায় হাজিরা দিল, 'সিরকার সালাম।'

'সিরকার সালাম! শালে কুত্তীকা বাচ্চা! এতক্ষণ ধরে হাঁকছি!' দৌড়ে গিয়ে জমাদারটা এক রদ্দা কষিয়ে দিল লখাইর গর্দানে। সমানে খেঁকাতে লাগল, 'কানে শুনিস না! আঁখ নেই! টিকিটে নম্বর দেখতে পাস না!'

কয়েদীদের গলায় লোহার হাঁসুলিতে কাঠের টিকিট ঝুলানো। টিকিটে কয়েদীদের নম্বর, সাজার তারিখ, মেয়াদ—সব খোদাই করা আছে। টিকিটটা লখাইর নাকের সামনে তুলে ধরে জমাদার চিল্লায়, 'ছাখ শালে।' তারপর গর্দানে ঠাসানি দিয়ে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বৈঠ শালে। আপনা নম্বর মনে রাখিস।'

কে এক কয়েদী টেনে টেনে রসিয়ে রসিয়ে বলল, 'নয়া আয়া জমাদারজী। দেশ গাঁওমে জরুবহু পড়ে রয়েছে। তার কথা ভাবতে ভাবতে—'

শেষ না করেই হাসতে লাগল কয়েদীটা।

হাসিটা এ মাথা থেকে সে মাথায় ছড়িয়ে পড়ল। শ খানেক কয়েদী হাসতে হাসতে হল্লা বাধিয়ে ফেলল।

জমাদার হমকে উঠল, 'চুপ মার শালে-লোগ—'

কোন দিকে নজর নেই লখাইর। রক্তচোখে জমাদারটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। চোখের তারা নড়ছে না।

খানিকটা পর কালো ভঁইসের মত দুটো বিরাট আকারের জোয়ান দুই মস্ত বালতি আর বড় বড় লোহার হাতা নিয়ে এসে পড়ল।

জোয়ান দুটোর কালো দেহ চুঁইয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। পয়লা মনে হয়েছিল, কালো কালো মাংসই বুঝি গলে পড়ছে।

কয়েদীদের মধ্যে হল্লা শুরু হয়ে গেল, 'কাঞ্জিপানি আ গিয়া—'

কয়েদীরা থালা হাতে কাতার দিয়ে বসে পড়ল।

কুচকুচে কালো দুই জোয়ান, মাথায় ফেট্টি, হাতে পট্টি, দুই হাতা দিয়ে বালতি থেকে কয়েদীদের থালায় সমানে কাঞ্জি ফেলতে লাগল।

কাঞ্জি হল কয়েদীদের সকালের খাদ্য। গুঁড়ো চাল, কুঁড়ো এবং খুদ মিশিয়ে পাকানো এই গাঢ় থকথকে বস্তুটির রঙ বিচিত্র। ইঁদুরনাদি, ধুলোবালি ইত্যাদি নানা আবর্জনার মাহাত্ম্যে এর স্বাদ, বর্ণ এবং গন্ধ যা খুলেছে, তার তুলনা নেই।

কয়েদীদের থালায় এক-এক হাতা কাঞ্জি পড়ছে। আগুনে ফুটে ফুটে এই কাঞ্জি থেকে সির্কার মত অম্ল ঝাঁঝ বেরুচ্ছে। অদ্ভুত স্বাদ গন্ধ এবং বর্ণের এই তরল পরম তৃপ্তির সঙ্গে কয়েদীরা খাচ্ছে। হুশহাশ করে জিভ আর মুখ নাড়ার শব্দ হচ্ছে।

হঠাৎ কাতারের শেষ মাথা থেকে সরু তীক্ষ্ণ গলার চিৎকার উঠল, 'আউর একটু দে, বহুত ভুখ্—'

লখাই চমকে তাকাল। দেখল, ভিখন আহীর দু হাতে কাঞ্জির বালতি আঁকড়ে ধরেছে। সমানে চিল্লাচ্ছে, 'দে ভেইয়া, না হলে ভুখাই ফৌত হয়ে যাব।'

'ছোড় শালে—'

যে লোকটা কাঞ্জি ঢালছিল, লোহার মস্ত হাতা দিয়ে ভিখনের কাঁধে দশ-বিশটা বাড়ি বসিয়ে দিল।

গর্দান গুঁজে ভিখন চেঁচাতে লাগল, 'মার, মেরে মেরে জিন্দগী চৌপট করে দে। লেকিন কাঞ্জিপানি দে।'

হঠাৎ কি হল, লখাই চিৎকার করে ডাকল, 'এ ভিখন, ইদিকে আয়।'

ভিখন গর্দান খাড়া করল। কাঞ্জির বালতিটা ছেড়ে লোহার থালা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। লখাইকে দেখে তাজ্জব বনে গেল। বলল, 'তুই লখাই ভেইয়া, তুই! তুই কোন কুঠুরিতে রয়েছিস?'

লখাই আবার ডাকল, 'ইদিকে আয়—'

ভিখন দৌড়ে এল। লখাইর পাশে বসতে বসতে বলল, 'একটু কাঞ্জি-পানি মাঙলুম, শালে দিলে না।'

লখাই কাঞ্জিতে হাত দেয় নি। লোহার থালাটা ভিখনের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'খা—'

লখাইর থালাটা এক রকম ছিনিয়েই নিল ভিখন। তারপর বাঁ হাত দিয়ে দুটো থালা আড়াল করে, বিরাট কদাকার দেহটা ঝুঁকিয়ে থাবায় থাবায় কাঞ্জি শেষ করে ফেলল।

ভিখনের খাওয়া দেখছিল লখাই। চক্ষের নিমেষে থালা দুটো চেটেপুটে সাফ করে মাথা তুলল ভিখন। পোড়া বীভৎস মুখে এবং একটিমাত্র চোখে হাসল। সে হাসিতে কৃতজ্ঞতা মিশে রয়েছে।

হঠাৎ ভিখনের খেয়াল হল। কদাকার মুখ থেকে হাসি উধাও হল। বড় বিষণ্ণ দেখাল তাকে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে বলল, 'আমি তো তোর কাঞ্জি খেলাম। তুই কি খাবি ?'

'ও বাত ছোড়্ শালে—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ ভিখন বলল, 'আমার সব মনে আছে—'

'কি মনে আছে ?'

চারদিকে একমাত্র চোখটার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ভিখন দেখল; কয়েদীরা কাঞ্জি নিয়ে মেতে আছে। অন্য দিকে তাদের নজর নেই। ভিখন নিঃসন্দেহ হল। তারপর মুখটা লখাইর কানে ঢুকিয়ে দিল, 'তুই ভাবিস না ভেইয়া, তোর নেশার চীজ জরুর জুটিয়ে দেব। সোনিয়ার খবর এনে দেব। তুই খানা দিয়ে আমার জান বাঁচিয়েছিস। নেশা দিয়ে আমি তোর জান বাঁচাব। সোনিয়ার খবর এনে তোর দিল খুশ করব। বিশ্বাস কর ভেইয়া। ঘাবড়ানা মাত।'

ভিখনের চোখে চোখ রাখল লখাই। দুটো কয়েদীর তিনটে চোখ মিলল। তিনটে চোখে পাকা দোস্তির চিহ্ন ফুটেছে।

তেরো

পেটি অফিসার নসিমুল গণি লখাইকে ওয়ার্কশপে নিয়ে গেল। দুটো ছোবড়ার বস্তা তার পিঠে চাপিয়ে বলল, 'তোর কুঠরিতে চল।'

সিঁড়ি বেয়ে চার নম্বর ব্লকের দোতলায় নিজের কুঠুরির সামনে এসে পড়ল লখাই।

নসিমুল গণি বলল, 'বস্তা নামা।'

লখাই বস্তা নামাল।

একটা নারকেল ছোবড়া মুগুর দিয়ে পিটতে পিটতে নসিমুল গণি বলতে লাগল, 'ছাখ শালে, অ্যায়সা করে পিটবি, ঝুরা ফেলবি, তার বের করবি। সন্ধ্যের সময় আড়াই পাউণ্ড তার মেপে নেব। একটু কম হলে হাড্ডি থেকে গোস্ত আলাদা করে ফেলব।'

ভীষণ চোখে পেটি অফিসারের দিকে তাকাল লখাই।

নসিমুল গণি গর্জে উঠল, 'এ হারামী, আঁখ দেখাচ্ছিস! জানে খতম করে দেব।'

লখাই জবাব দিল না। দুর্বিনীত ভঙ্গিতে গর্দান খাড়া করেই রইল।

লখাইর পেটে বেতের ডাণ্ডার গুঁতো দিয়ে পেটি অফিসার বলল, 'মনে রাখিস শুয়ারকা বাচ্চা, মেরা নাম নসিমুল গণি। তোর মাফিক কয়েদী আমি বহুত দেখেছি। কয়েদী পিটবার জন্যে খুদা আমাকে পয়দা করেছে।'

বলতে বলতে নসিমুল উঠে দাঁড়াল, 'মনে রাখিস শালে, কামে ফাঁকি মারবি না। আমি দুসরা কয়েদী দেখছি।'

নসিমুলের কাছ থেকে ছোবড়া পিটিয়ে তার বের করার প্রক্রিয়া শিখে নিয়েছে লখাই। এবার সে বেঁটে আকারের কাঠের মুগুর ধরল।

শীতের রোদ চড়ছে। দ্বীপের নোনা মাটি তেতে উঠছে। উপসাগর মেতেছে।

নিঃসীম দরিয়া পাথরের দেওয়ালে সমানে তুফান ভাঙে। নারকেল বনে ঝোড়ো বাতাস গোমরায়। গোঁ গোঁ আওয়াজ বাজে অবিরাম।

এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন সেলুলার জেলের মাথা পেরিয়ে উপসাগরের দিকে উড়ে যায়।

গারদখানায় দিন শুরু হয়েছে অনেক আগে। কয়েদীদের কাজ শুরু হল এই মাত্র।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লখাইর। কাঠের বেঁটে মুগুরটা দিয়ে নারকেল ছোবড়ায় ঘা বসায়।

শক্ত, শুকনা, নিরেট ছোবড়া। বাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুগুরটা লাফিয়ে ওঠে।

এক ঘণ্টা মুগুর পিটিয়ে, ঝুরো ঝরিয়ে মাত্র গোটা চারেক ছোবড়ার তার বের করতে পারল লখাই।

সারা গায়ে ঘাম ছুটেছে। কুর্তা কামিজ ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে। মুগুরের ছু-চারটে বাড়ি বসাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চেটোতে বড় বড় ফোস্কা পড়েছে। ফোস্কা ফেটে এক পর্দা চামড়া উঠে গিয়েছে।

হাতের চেটোটা ভয়ানক জ্বলছে।

বাঁ হাত দিয়ে কপাল কাঁচিয়ে ঘাম ঝরাল লখাই। কুর্তা খুলে শরীরটা মুছল। তারপর মুগুরটা ছুঁড়ে ফেলে জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল।

হঠাৎ সরু, তীক্ষ্ণ গলার ডাক শোনা গেল, 'এ লখাই ভেইয়া, এই যে ই ধার—'

লখাই দেখল, গোটা ছয়েক কুঠুরির পর লোহার মোটা গরাদ। তার ওপাশে ভিখন ছোবড়া পিটছে।

ভিখন করুণ গলায় বলল, 'লখাই ভেইয়া, জরুর মর্ যায়গা। হাতের চামড়া উঠে গোস্ত বেরিয়ে পড়েছে।'

লখাই বলল, 'আমারও।'

একটু পরেই পেটি অফিসার নসিমুল গণিকে দেখা গেল।

ছোবড়া ছিলাকোটা বন্ধ রেখে চুপচাপ বসে ছিল লখাই। ডান হাতটা ভয়ানক টাটাচ্ছে।

পেটি অফিসার লাচাড়ি পড়ার মত একান্ত অবলীলায় শ-খানেক খিস্তি আউড়ে গেল, 'বেশরম, বেতমীজ, নালায়েক, হারমীকা বাচ্চে, কুত্তীকা বাচ্চে! তেরি—'

তারপর মোটা বেতের ডাণ্ডাটা দিয়ে লখাইর পাঁজরে প্রচণ্ড গোঁত্তা বসিয়ে

দিল। খেঁকিয়ে বলল, 'শালে, আরাম করার জন্তে কালা পানি এসেছিস? ডাণ্ডা হাঁকিয়ে পাছা ঢিলা করে দেব।'

মুখ কাঁচুমাচু করে লখাই বলল, 'পেটি অফসার সাহিব, হাতে দরদ হচ্ছে। চামড়া উঠে গেছে।'

নসিমুল গণির চোখে হত্যা ঝিলিক দিল। 'দরদ হচ্ছে! চামড়া উঠে গেছে!' দাঁতের নীচে কথাগুলোকে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে করতে লখাইর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পেটি অফিসার। কিল, ঝাপ্পড় এবং ঘুষায় তার দাঁতমুখ ফাটিয়ে আর এক প্রস্থ অশ্লীল, ভীষণ খিস্তি আওড়াল। শাসাল, 'বিকালে আড়াই পাউণ্ড তার না পেলে 'টিকটিকি'তে চড়াব। ইয়াদ রাখিস। এ হল কালাপানির কয়েদখানা। এখানে দরদ নেই।'

সারি সারি কয়েদীরা ছোবড়া নিয়ে বসেছে। একটানা ছোবড়া পিটিয়ে, মুগুরের ঘষায় হাতের এক পর্দা চামড়া উপড়ে, যন্ত্রণায় কাঁধ থেকে পুরাপুরি হাতখানা খসিয়ে ফেলার দাখিল করে কেউ কেউ একটু জিরান নিচ্ছিল। কারো কারো অল্প-স্বল্প ঝিমুনি ধরেছিল।

পেটি অফিসার নসিমুল গণির কিল-ঘুষার বহর দেখে সবাই তটস্থ হয়ে উঠল। বিচিত্র তালে আবার মুগুর পড়তে লাগল।

গরাদের ওপাশ থেকে সরু, তীক্ষ্ণ গলাটাকে মোলায়েম করে হঠাৎ ভিখন আহীর চেঁচিয়ে উঠল, 'পেটি অফসার সাহিব—'

চোখের ঘোলাটে মণিদুটো ধক করে উঠল নসিমুল গণির, 'কৌন বাত রে কুত্তিকা বাচ্চে বিল্লী—'

'ইধর আইয়ে সাহিব। থোড়া বাত'—গলার স্বর আরো মোলায়েম হল ভিখনের।

পেটি অফিসার নসিমুল গণি গরাদের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কি বাত?'

'আপ মেরে মা-বাপ অফসার সাহিব।' পোড়া মুখের একটি মাত্র ধূর্ত চোখে যতখানি সম্ভব করুণ দৃষ্টি ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল ভিখন।

তোষামুদিতে পেটি অফিসারের নিরেট, নীরস মনটা সামান্ত ভিজেছিল। কিন্তু মুখেচোখে তার কোন লক্ষণ মালুম হল না। খেঁকিয়ে বলল, 'কি রে শালে, নালায়েক কাঁহিকা! কোন মতলব?'

'মেরে মা-বাপ, ছোবড়ায় মুগুর হাঁকলে সেই মুগুর লাফিয়ে শির ছেঁচে দেয়।'

'শির ছেঁচে দেয়!'

'হাঁ সাহিব। মেরে মা-বাপ।'

ভিখন আহীরের একটিমাত্র খল চোখে শয়তানি, তোষামুদি, কুটিলতা—কত ভাব যে খেলে যায়!

এর পর নসিমূল আর কথা বলল না। ক্রূর চোখে ভিখনের দিকে তাকিয়ে রইল।

গলার স্বরটাকে আশ্চর্য রকমের কাতর করে ভিখন আবার বলল, 'অফসার সাহিব, মেরে মা-বাপ, থোড়া পানি না হলে আপনার লেড়কার জান ফৌত হয়ে যাবে।'

'পানি দিয়ে কি হবে?'

'ছোবড়া ভিজিয়ে নেব অফসার সাহিব। শুকনো ছোবড়ায় মুগুর বড্ড লাফাচ্ছে। হাতের পর্দা পর্দা চামড়া উঠে যাচ্ছে।'

'শালে হারামী, উল্লুকা বাচ্চে'—অশ্রাব্য খিস্তি করে, শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে লোহার গরাদের ছোট ফোকর খুলে ওপাশে চলে গেল পেটি অফিসার। সমানে ফুঁসতে লাগল, 'পানি মাঙছে! পানি দিয়ে ভিজিয়ে ছোবড়া ছিলতে সুবিধা হয়! এটা হল আন্দামানকা কয়েদখানা; এখানে বহুৎ মুসিবৎ। এটা সমুরাকা কোঠি নেহি গাধার বাচ্চা পাঁঠা—'

মোটা বেতের ডাণ্ডা দিয়ে হাড্ডি থেকে চামড়া মাংস ঢিলা করে দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল নসিমূল গণি। দাঁতে দাঁতে হিংস্র আওয়াজ করে গর্জাচ্ছে, 'মনে রাখিস শালে, আন্দামানের কয়েদীর জিন্দ্‌গী তুড়বার জন্যে খুদা আমাকে পয়দা করেছে। তেরি—'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ভিখন। দৌড়ে পেটি অফিসারের কাছে ছুটে গেল। পোড়া, বীভৎস মুখটা তার কানে ঢুকিয়ে ফিসফিস গলায় কি যে বলল, আশেপাশের কয়েদীরা শুনতে পেল না।

কয়েদীর জিন্দ্‌গী তুড়বার জন্য যে নসিমূলকে খুদা দুনিয়ায় পাঠিয়েছে, মুহূর্তে তার হিংস্র, সাঙ্ঘাতিক মুখে ভাবান্তর দেখা দিল।

গলা নামিয়ে অবিশ্বাসের সুরে নসিমূল বলল, 'সচ্ বলছিস তো শালে।'

'জরুর মেরে মা-বাপ।'

'তবে চল্।'

'এখুনি?' ভিখনের চোখমুখ করুণ হয়ে উঠল।

'জরুর।' বেতের ডাণ্ডা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে ভিখনকে তার কুঠুরিতে ঢোকাল পেটি অফিসার। নিজেও ঢুকল।

একটু পর দুজনেই বেরিয়ে এল।

কোনদিকে দৃকপাত না করে পেটি অফিসার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। খানিকটা পর এক বালতি জল নিয়ে উঠে এল। মুলাইম স্বরে বলল, 'পানি নে ভিখন। আস্তে আস্তে মুগুর পেট। হাতে চোট লাগবে।'

ভিখন আহীরের উপর পেটি অফিসারের এমন দুআ দেখে অন্য কয়েদীরা তাজ্জব বনে গিয়েছিল।

পেটি অফিসারের কোন দিকে নজর নেই। দুলকি কদমে দোসরা ব্লকের দিকে চলে গেল সে।

চারদিক ভাল করে দেখে নিল ভিখন। নাঃ, টিণ্ডাল, পেটি অফিসার, জমাদার, ওয়ার্ডার—কারুকেই দেখা গেল না।

ভিখন উঠে পড়ল। গুটিগুটি পায়ে গরাদের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর ফোকর গলে এদিকে এসে লখাইর পাশে বসল।

লখাই একটু একটু আন্দাজ করেছিল। ফিসফিস করে বলল, 'পেটি অফসার শালা তোকে পেয়ার করছে।'

'হাঁ রে লখাই ভেইয়া, করছে। অ্যায়সা অ্যায়সা পেয়ার করছে!'

'তবে? কিছু দিয়েছিস?'

'জরুর।'

মাঝখানের আঙুলটার নীচে বুড়ো আঙুলটা রেখে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করল ভিখন। এটা তার মুদ্রাদোষ। একমাত্র চোখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এর নাম রূপেয়া। এই চীজ তোর কাছে থাকলে দুনিয়ার সব চীজ তোর মিলবে। আন্দামানের কয়েদখানায় পেয়ার ভি মিলবে।'

চোদ্দ

উপসাগর এখন খুবই শান্ত। যে উদ্দাম তুফান পাথুরে দেওয়ালে অবিরাম মাথা কোটে, তার গুমরানি পড়ে এসেছে। সাগর-ফোঁড়া যে বাতাস নারকেলের পাতায় পাতায় এলোপাথাড়ি বাজে, তারও সাড়া শব্দ মেলে না।

লম্বা বারান্দায় ছোবড়া পেটার ঢুপ দাপ আওয়াজ হচ্ছে। এক তালের বিচিত্র, অদ্ভুত সব আওয়াজ।

মুগুরটা একপাশে ছুঁড়ে চুপচাপ বসে ছিল লখাই। প্রথমে ডান হাত দিয়ে ছোবড়া পিটেছে। ডান হাতের এক পর্দা চামড়া উঠবার পর বাঁ হাতে মুগুর নিয়েছে। এখন বাঁ হাতের চামড়া তুলে, দু চোখে নিরুপায় আক্রোশ, হাতের চেটোয় সাঙ্ঘাতিক জ্বালা আর সমস্ত গায়ে দরদর ঘাম নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লখাই।

এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন সেলুলার জেলের উপর দিয়ে উপসাগর ডিঙিয়ে মাউণ্ট হ্যারিয়েটের দিকে চলেছে।

মনটা ঠিক বশে নেই। অস্থির, অন্যমনস্ক লখাই সাগর-পাখিগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। পাখিগুলো যখন দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন সে চোখদুটো ফিরিয়ে আনল।

হাতের সামনে ছোবড়া, মুগুর, ঝুরা এবং তার ছত্রখান হয়ে পড়ে রয়েছে। সকাল থেকে এই দুপুর পর্যন্ত ছোবড়া কুটে পাউণ্ডখানেকের বেশি তার ছিলতে পারে নি লখাই। অথচ পেটি অফিসার নসিমুল গণি শাসিয়ে গিয়েছে, সন্ধ্যার আগে আড়াই পাউণ্ড তার সে কাঁটায় কাঁটায় মেপে নেবে। একটু কম হলে হাড় থেকে চামড়া মাংস আলাদা করে ফেলবে।

নিরেট ছোবড়াগুলো দেখতে দেখতে রক্তাভ চোখদুটোতে যন্ত্রণা, আক্রোশ এবং রোষমাখা এক বিচিত্র দৃষ্টি ফুটল লখাইর।

হঠাৎ চাপা তীক্ষ্ণ গলায় কে যেন ডাকল, 'এই, এই শালে—'

চারিদিকে তাকিয়ে ডাকের উৎসটা খুঁজে পেল না লখাই। চনমন করে এদিকে সেদিকে তাকাতেই লাগল।

আবার শোনা গেল, 'এই বুদ্ধু, ইধর—'

এবার নজরে পড়ল। [illegible] ঠিক দেখা যাচ্ছে না। গরাদের ফাঁক দিয়ে অস্বাভাবিক লম্বা একটা হাত বেরিয়ে এসেছে। হাতটা ইশারায় ডাকছে।

যে কুঠুরিটা থেকে হাতটা বেরিয়ে রয়েছে, সেটা লখাইর কুঠুরির ডান পাশে। হঠাৎ লখাইর মনে পড়ল, কাল রাত্রে এই কুঠুরির কয়েদীই ভাঙা, কর্কশ গলায় একটানা চিৎকার করছিল। আর ওয়ার্ডার মোহর গাজী এদিকেই দৌড়ে এসে কয়েদীটাকে ধমক ধামক দিয়েছিল। লোকটার নামও মনে আছে। মোহর গাজীই বলেছিল। নাম পরাঞ্জপে, মারাঠী।

হাতটা অস্থির হয়ে উঠল ; ক্রমাগত নড়তে লাগল।

লখাই উঠে পড়ল। তারপর গুটিগুটি পায়ে কুঠুরিটার সামনে এসে দাঁড়াল।

পরাঞ্জপের চিৎকারই শুনেছে লখাই। এই পয়লা দেখল। মাপা পাঁচ হাত দীর্ঘ শরীর। বাজের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক। কপালে-জানুতে-হাতে-গলায় মোটা মোটা শিরাগুলো সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। বাঁ গালে মেটে রঙের মস্ত জরুল। দেহটা একেবারেই উলঙ্গ। সমস্ত মুখে চোখা চোখা নোংরা গোঁফ দাড়ি। কুর্তা ইজের মাথায় পাগড়ির ধরনে বাঁধা। দু চোখে মারাত্মক ধারাল দৃষ্টি ; ঈষৎ তামাটে তারাদুটো ধকধক করে।

সকালে ভাণ্ডারা যে কাঞ্জিপানি দিয়ে গিয়েছিল, তরিবৎ করে সারা দেহে সবটুকু মেখে ফেলেছে পরাঞ্জপে। তরল কাঞ্জিপানি শুকিয়ে চড়চড় করছে।

এবার গরাদের উপর ঝুঁকে পড়ল পরাঞ্জপে। অস্বাভাবিক লম্বা হাতটা বাড়িয়ে লখাইর ঘাড়টা ধরে ফেলল। লম্বা লম্বা আঙুলের ডগায় ভাঙা ভাঙা ক্ষয়িত নখ। নখগুলো লখাইর মাংসল ঘাড়ে গেঁথে গেল।

লখাই চমকে উঠল।

অনেকক্ষণ খ্যা খ্যা করে হাসল পরাঞ্জপে। হাসির দমকে পাঁচ হাত দীর্ঘ শরীরটা ধনুকের মত বেঁকতে লাগল। কুণ্ডলী-পাকানো শিরগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। চোখ থেকে ধকধক তামাটে তারা দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চায়।

ভয় অস্বস্তি এবং আতঙ্ক-মেশা অদ্ভুত এক অনুভূতিতে শরীরটা কুঁকড়ে যেতে থাকে লখাইর। তবু পরাঞ্জপের থাবা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না ; নিস্তার মেলে না। অশরীরী, অদৃশ্য কেউ যেন পেরেক ঠুকে তার পা দুটোকে বারান্দায় সেঁটে দিয়েছে।

হাসির দমক কমলে ধনুকের মত ঝাঁকানো দেহটা টান টান খাড়া হয়ে

পড়ল পরাঙ্গপের। আরো খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে এল সে। গরাদের উপর কালো রোমশ বুকটা ঠেকিয়ে বলল, 'নয়া এসেছিস ?'

'হাঁ।'

অদ্ভুত স্বর ফুটল লখাইর গলায়। পরাঙ্গপে যেন বিচিত্র এক ভোজবাজিতে তাকে বশ করে ফেলেছে।

'তোর নাম লখাই না ?'

'হাঁ। আমার নাম জানলে কেমন করে ?'

আবারও খানিকটা খ্যা খ্যা করে হাসল পরাঙ্গপে। টেনে টেনে বলল, 'আমি সব জানি। পাগল হয়েছি বলে কি তোর নামটাও জানব না রে শালে! হারামীকো বাচ্চে—' বলতে বলতে গরাদের ওপাশের পরাঙ্গপে গরাদের এপাশের লখাইর ঘাড়ে মাথায় মুখে দমাদম কিলঘুষা ফেলতে লাগল।

একটু পর কিল-ঘুষার প্রকোপ কমল। এবার মুলাইম গলায় পরাঙ্গপে বলল, 'তোকে পয়লা দেখেই দিলটা যেন কেমন করছে।'

লখাই জবাব দিল না।

পরাঙ্গপে আবার বলল, 'দিল হচ্ছে, তোকে শালে পেয়ার করি।'

বলেই ঘা কতক কিলঘুষা লাগাল।

হঠাৎ লখাইর একগোছা চুল বাগিয়ে ধরে মাথাটা গরাদের কাছে টেনে আনল পরাঙ্গপে। তার কানের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি পাগল, তাই না রে ?'

লখাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

লখাইর দিক থেকে জবাব না পেয়ে পরাঙ্গপে ক্ষেপে উঠল, 'কি রে কুত্তীকা বাচ্চে, বাতাচ্ছিস না কেন ? আমি পাগল ?'

'কে বললে ?'

'যোহর ওয়াডার তোকে বলে নি ?' পরাঙ্গপে খেঁকিয়ে উঠল। অবিরাম তার লম্বা হাতের কিলঘুষা এসে পড়তে লাগল লখাইর উপর।

মুখে কথা সরল না লখাইর। অদ্ভুত কয়েদী পরাঙ্গপের বিচিত্র ব্যবহারে সে তাজ্জব বনে গিয়েছে।

কিলঘুষা আর নখের গুঁতো খেয়ে নাকমুখ হয়তো ফাটত লখাইর। তার আগেই দুপুরের খানাপিনার সময় হল। সঙ্গে সঙ্গে পেটি অফিসার নসিমুল গণির মুখ দেখা দিল। কর্কশ গলায় সে হাঁকল, 'কয়েদীলোগ আ যা—'

নারকেলের ছোবড়া, মুগুর, মুয়া, তার—সমস্ত পড়ে রইল।

নতুন পুরাণ—সব কয়েদী দলা পাকিয়ে হুড়মুড় করে নীচে নেমে এল সকলের হাতেই লোহার বর্তন।

নীচেই গোসলের বন্দোবস্ত। পাথুরে চত্বরে হুশহাশ করে দু-চার বর্তন জল মাথায় ঢেলে কয়েদীরা ছুটল।

দীর্ঘ কলোনেডের সামনে সকলে কাতার দিয়ে বসেছে। একপাশে হিন্দু, আর একপাশে মুসলমান কয়েদী। বর্মা মুলুকের বৌদ্ধ কয়েদীরা হিন্দুদের সঙ্গেই বসেছে।

একটু পরেই হিন্দু এবং মুসলমান, দুই 'ভাণ্ডারা' থেকেই খানা এসে পড়ল। মাথায় ফেট্টি-বাঁধা কালো কালো জন চারেক জোয়ান বিরাট বিরাট বালতি থেকে খানা, ডাল, ঘ্যাঁট কয়েদীদের লোহার থালায় ফেলতে লাগল।

এবেলা লখাইর ঠিক পাশেই বসেছিল ভিখন আহীর। লখাইর থালায় খানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোড়া বীভৎস মুখটা অস্বাভাবিক করুণ করে সে ডাকল, 'লেখাই ভেইয়া—'

লখাই জবাব দিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

গলার স্বরটাকে যতখানি সম্ভব বিষণ্ন করে ফেলল ভিখন। পাঁজরা ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরুল। আস্তে আস্তে হতাশ স্বরে বলতে লাগল, 'না খেয়ে খেয়ে শালে ভুখাই মরে যাব। আন্দামানে জান জরুর বরবাদ হয়ে যাবে—'

নিঃশব্দে লখাই খানিকটা খানা নিজের থালা থেকে ভিখনের থালায় তুলে দিল।

ভিখনের একমাত্র চোখটা লোভে খুশিতে জ্বলতে লাগল। লখাইর একটা হাত ধরে তোয়াজ করতে করতে সে বলল, 'সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি ভেইয়া—'

'কিসের ব্যবস্থা?'

কানের মধ্যে মুখ ঠেকিয়ে ভিখন বলল, 'আফিং আর চরস। পেটি অফসার শালে কালকে দেবে। বহুত চড়া দাম ভেইয়া। এক রুপেয়া খসাতে হল।'

'সত্যি বলছিস?' লখাইর গলায় [illegible] স্বর ফুটল।

'জরুর সত্যি।' একটু থেমে ভিখন বলল, 'দো চার রোজের মধ্যে সোনিয়ার একটা খবর ভি মিলবে। তুই দেখিস লখাই ভেইয়া।'

এরপর আর কেউ কথা বলল না। বাঁ হাতে লোহার থালা আগলে গর্দান গুঁজে বিরাট বিরাট গরাসে খানা মুখে তুলতে লাগল ভিখন। খেতে খেতে লখাই দেখল।

খানাপিনা চুকিয়ে উপরে উঠে এল লখাই। নিজের কুঠুরিটার সামনে স্তূপাকার নারকেল ছোবড়া, ঝুরা আর তারের মধ্যে বসে ঢুলতে লাগল।

এই শীতের দুপুরেও আন্দামানের আকাশে মৌসুমী মেঘ দেখা দিয়েছে। ছন্নছাড়া খণ্ড খণ্ড মেঘ। সেলুলার জেলের মাথা থেকে রোদ উধাও হয়ে গিয়েছে। দূরের উপসাগর, রস দ্বীপ কেমন আবছা, দুর্বোধ্য দেখায়।

একে একে সব কয়েদী উপরে আসতে লাগল।

কয়েদখানার নিয়মে খানাপিনার পর কিছুটা সময় আরামের জন্য পায় কয়েদীরা। এই সময়টা কেউ কিস্‌সা করে কাটায়, কেউ কিতাব পড়ে, কেউ ঝিমায়, কেউ ঢোলে, কেউ আবার কিছুই করে না; আসমানের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কি ভাবে!

কিন্তু টিণ্ডাল পেটি অফিসারদের দাপটে দু দণ্ড কি নিশ্চিন্ত হবার জো আছে!

একটু পরেই পেটি অফিসার নসিমুল গণির মুখ দেখা দিল। দাঁত খিঁচিয়ে সে চিল্লায়, 'এ শালে লোক, খুব যে আরাম করছিস! সন্ধ্যের আগে আড়াই পাউণ্ড তার এক-এক কয়েদীর কাছ থেকে না পেলে হাড্ডি গোস্ত আলাদা করে ফেলব। ইয়াদ রাখিস।' চিল্লাতে চিল্লাতে লম্বা কদমে দুসরা ব্লকের দিকে উধাও হয়ে গেল পেটি অফিসার।

আর সঙ্গে সঙ্গে শুকনা ছোবড়ার উপর ধুপধাপ্, সমতালে বেঁটে বেঁটে মুগুরের ঘা পড়তে লাগল। চাপা, ভীষণ গলায় এক কয়েদী বলল, 'পেটি অফসার শালা দোজখের কুত্তা।'

কথাটা অবশ্য পেটি অফিসার নসিমুল গণির কান পর্যন্ত পৌঁছাল না।

হাতের চেটো থেকে এক পর্দা চামড়া উঠে গিয়েছে লখাইর। সারা সকাল ছোবড়া পিটিয়ে দু হাত ফুলে গিয়েছে; যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অসহায়, করুণ চোখে একবার ছোবড়া, আর একবার বেঁটে মুগুরটার দিকে তাকাতে লাগল লখাই।

ও পাশের কুঠুরি থেকে সেই ডাকটা শোনা গেল, 'লখাই, এ শালে লখাই—'

গরাদের ফাঁক দিয়ে অস্বাভাবিক লম্বা একটা হাত বার করে অস্থির ভাবে নাড়ছে পরাঙপে।

লখাই মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। চোখাচোখি হতেই পরাঙপে আবার ডাকল, 'অ্যাই বুদ্ধু, এদিকে আয়।'

পরাঙপে যেন জাদু জানে। গুটি গুটি পায়ে কুঠুরিটার দিকে এগিয়ে এল লখাই। নাগালের মধ্যে পাওয়া মাত্র লখাইর চুলের মুঠি পাকিয়ে ধরল পরাঙপে। বাকী হাতটা বার করে কিছুক্ষণ কিলঘুষা চালাল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'শালে উল্লু, বুদ্ধু, বুরবক!'

গালাগালির কারণটা না বুঝে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল লখাই।

পরাঙপে বলল, 'তোকে দেখে পেয়ার করার ইচ্ছে হয়েছে। তাই কিছু বলছি না। নইলে পয়লাই কোতল করে ফেলতুম, হাঁ—'

বাজের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে বার করে টেনে টেনে বাতাস নিল পরাঙপে। উত্তেজনায় কপাল আর জানুর শিরগুলি ফুলে ফুলে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল।

এতক্ষণে লখাই বলল, 'কেন, কোতল করতে কেন?'

পরাঙপে ক্ষেপে উঠল, 'পয়লা দেখেই তোকে দোস্ত করে নিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, তোর মাথায় মগজ আছে, একটু বুদ্ধি আছে। লেকিন কুছ্ নেই। মাথাটা তোর একটা টাট্টিখানা।'

লখাইর মাথার সঙ্গে টাট্টিখানার উপমা দিয়ে নিজেকে তারিফ করল পরাঙপে। খুব এক চোট হাসল। তারপর আবার বলল, 'শালে, ছোবড়া পিটিয়ে জান পয়মাল করছিস কেন?'

'ছোবড়া পিটব না!'

'না।'

'পেটি অফসার তা হলে হাড্ডি মাংস আলাদা করে ফেলবে।'

'ছোড়্ শালে পেটি অফসারকো! থোড়া বুদ্ধি খরচ কর। আমার মত পাগল সেজে যা। পাগল বনতে পারলে আর কাজ করতে হবে না। লেকিন পুরা খানা মিলবে।'

তাজ্জবের গলায় লখাই বলল, 'পাগল বনব কেমন করে?'

'আরে বুদ্ধু, আমার দিকে তাকিয়ে ভাখ্।'

লখাই দেখল। পরাঞ্জপের সারা দেহ নগ্ন; কুর্তা ইজের মাথায় ফেট্টির আকারে বাঁধা। একটু আগে 'ভাণ্ডারা' থেকে খানা দিয়ে গিয়েছিল। কিছু তার খেয়েছে; বাকীটা সারা দেহে মেখেছে।

পরাঞ্জপে গলা ফাটিয়ে হা হা করে হাসল। বলল, 'দেখলি আমাকে। তামাম আন্দামান ঢুঁড়লে আমার মত বুদ্ধি কোন বুদ্ধুর মধ্যে পাবি না।' একটু থেমে আবার সে শুরু করল, 'নয়া এসেছিস কালা পানি। পয়লা তোকে ছোবড়া ছিলতে দিয়েছে; যখন হুইল ঘানিতে চাপাবে, রাম্বাস ছিঁচতে দেবে, সড়ক বানাতে দেবে, তখন মালুম পাবি দরিয়ায় কত পানি। বাপের নাম ভুলে যাবি। তোকে দেখেই দোস্ত বানিয়ে নিয়েছি লখাই। তাই বলছি, বেঁচে থাকতে হলে পাগল বনে যা।'

লখাই একটা কথাও বলল না।

পরাঞ্জপে বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না! শালে ঠেলা পাবি। কালা পানি এসে পাগল না সাজলে ঘানি ঘুরিয়ে, ছোবড়া ছিলে, পাথর ভেঙে জান লবেজান হয়ে যাবে। আমার বুদ্ধি নে লখাই; বাঁচবি। আমার মত অ্যায়সা বুদ্ধি আন্দামানের কারো নেই।'

লখাই একদৃষ্টে আন্দামানের সবচেয়ে চতুর, সবচেয়ে বুদ্ধিওলা কয়েদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

সিন্ধুপার-

পনেরো

সিসোস্ট্রেস বে'র ঐ কোনায় আটলান্টা পয়েন্টের মাথায় আট শ কুঠুরির সেলুলার জেল। ওটা পুরুষদের কয়েদখানা। সিসোস্ট্রেস উপসাগর যেখানে ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে সিধা সমুদ্রে মিশেছে, সেই সাউথ পয়েন্টের মাথায় কয়েদিনীদের গারদখানা, অর্থাৎ সাউথ পয়েন্ট জেল। আন্দামানের পুরুষ কয়েদীরা সাউথ পয়েন্ট জেলটাকে বলে, 'রেণ্ডিবারিক' কয়েদখানা। কেউ কেউ বলে, 'সিক্সান'।

আন্দামান আসার পর কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল।

সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার এক কিনারে মাঝারি একটি টিলার মাথায় বসে ছিল সোনিয়া। উপসাগরের নীল জলে বিরাট বিরাট ঢেউগুলি কেমন উথল পাথল হয়ে অদ্ভুত আক্রোশে দ্বীপের দিকে ছুটে আসছিল, তাই দেখছিল একদৃষ্টে। চোখের পাতা নড়ছিল না।

এখন বিকাল। আকাশের এ মাথায় ও মাথায় দু চার খণ্ড হানাদার মেঘ কোন দিকে যে দিশাহীন পাড়ি জমিয়েছে, কে বলবে? সিন্ধুশকুনগুলি ছোট ডানায় বিরাট আকাশ মাপতে মাপতে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে চলেছে।

সোনিয়া দরিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল আর ভাবছিল। আন্দামান আসার পর মাত্র কয়েকটা রোজ পার হয়েছে। এর পর একটা একটা করে কত রোজ যাবে, একটা একটা রোজ মিলে একটু একটু করে তার উমর (বয়স) বাড়াবে। একদিন সে বুড়ী বনবে। বাকী জিন্দগী কালা পানির এই দ্বীপেই ফৌত হয়ে যাবে।

সোনিয়া ভাবছিল। তার দিলটা টুটিফাটা হয়ে বড় বড় শ্বাস পড়ছিল।

দরিয়ায় রোদের তেজ মরে আসে। সামনের রস্ দ্বীপটা আবছা দেখায়।

সোনিয়া ভাবছিল।

অনেক, অনেকদিন পর সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার এই টিলাটায় বসে সেই মরদটার কথা ভাবল সোনিয়া। মরদটার নামও হুবহু মনে আছে তার।

রামদেও তিওয়ারী। আদমীটার চেহারা নমুনাও অবিকল মনে পড়ল। ছোট ছোট গোল চোখ, খাড়া গর্দান, শক্ত চোয়াল, মজবুত চওড়া বুক, গলায় পিতলের মস্ত তাবিজ, কানে চাকার মত ছুই মাকড়ি। আদমীটা বিশ-বিশটা ভঁইস চরাত, লোটা লোটা সিদ্ধি ঘুঁটত, ঢকঢক করে সেগুলো গিলত, পড়ে পড়ে ভোঁসভোঁস করে ঘুমাত। মেজাজটা বেয়াড়া হয়ে পড়লে সারা রাত্রি বদখত কর্কশ গলায় গাইত—

'সৈঁয়া গ্যয়া রফককা সাথ,
ম্যঁয় ক্যা করু,
ম্যঁয় ক্যা করু—'

বহুত বড় শহর পাটনা থেকে গানটা শিখে এসেছিল রামদেও তিওয়ারী।

তামাম রাত চিল্লাচিল্লি করে হয়রান হয়ে ভোরের দিকে রশির খাটিয়ায় টান টান হয়ে পড়ত মরদটা। পড়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাত।

আদমীটা কথা বলত কম। শুধু গোল গোল চোখ ছুটোতে হিংস্র, ভীষণ দৃষ্টি ফুটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। চোখ ছুটো হাড্ডি মাংস ফুঁড়ে ফুঁড়ে তার দিলের গোপন কারসাজিটা যেন খুঁজত। ডরে বুকের খুন জমে আসত সোনিয়ার। সেই চোখের হিংস্রতা সওয়ার মত তাগদ তার বুকে ছিল না।

মাঝে মাঝে রামদেও তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠত। হাসির রকম দেখে শিউরানি লাগত সোনিয়ার।

রামদেও তিওয়ারীর কথা ভাবতে ভাবতে আর একটা আদমীর কথা মনে পড়ে। সে ব্রিজলাল। ছুটো মরদের ভাবনায় দিলটা যত কাবু হয় সোনিয়ার, চোখের ঈষৎ কপিশ তারা ছুটো ততই ঝিকঝিক জ্বলে। সোনিয়ার চোখ গত ছু বছরে একবার ছাড়া আর ভেজে নি। তার চোখে কেউ আঁশু দেখে নি।

চোখের সামনে থেকে আন্দামানের দরিয়া, দূরের রস্ দ্বীপ, আরো দূরের হ্যাভলক দ্বীপ, আটলান্টা পয়েন্টের মাথায় সেলুলার জেল—সব, সব যেন মুছে গিয়েছে। জ্বালা-ধরা, পোড়-খাওয়া, খাক-হওয়া, ফাঁকা দিলটার মধ্যে অদ্ভুত এক ককানি পাক খেয়ে খেয়ে ভেঙে পড়ছে। তবু আঁখ ফেটে আঁশু বেরুচ্ছে না। অদম্য আকণ্ঠ অসহ্য এক যন্ত্রণা বুকটাকে টুটিয়ে কাটিয়ে চুরমার করে দিচ্ছে। সোনিয়া ভাবল, একটু যদি কাঁদতেও পারত, দিল তার জুড়াত। এর আগে মুল্লুকের কয়েদখানায় ছু বছর ছিল সোনিয়া। কোনদিন তো রামদেওয়ের কথা ভেবে দিল এমন বেসামাল হয় নি। বিপুল দরিয়া পেরিয়ে

দ্বীপান্তরে এসে দিল এমন বিগড়ায় কেন! যে মানুষের কথা মুলুকে থাকতে একবারও ভাবে নি, তার ভাবনা কালা পানি পার হয়ে এত দূর এসে তার মন এমন বিকল করে কেন! নিজের কাছেই এ সব কথার জবাব মেলে না।

দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সোনিয়া। রামদেও তিওয়ারীর মনে এমন বদ মতলব ছিল, তা কি সে জানত? বেতমীজটা তার হাতে জান দিয়ে তার গুনাহ্‌রই সাজা এমন করে দিচ্ছে! অস্ফুট স্বরে সোনিয়া বলে, 'বেদরদী শয়তান, মরেও আমার জিন্দগী একটু একটু করে খতম করে মজা পাচ্ছে।'

উপসাগরের বিরাট বিরাট ঢেউগুলি আরো বিরাট হয়। দরিয়ার গর্জন বাড়ে, আক্রোশ বাড়ে। দ্বীপের পাথুরে দেওয়ালে উপসাগরের অবিরাম উদ্দাম মাথা কোটাকুটি চলে।

আকাশের কোথাও এখন আর সূর্যটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'এ সোনিয়া—'

পিছন থেকে কে যেন ডাকল। সোনিয়া মুখ ঘুরিয়েই চমকে উঠল। টিণ্ডাল রামপিয়ারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবছা আলোতে রামপিয়ারীকে দেখে চমকে ওঠারই কথা। বাঁ দিকের কান আর চোয়ালের খানিকটা অংশ পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কেউ কেটে নিয়েছে। কান পর্যন্ত দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। পুরাণ আমলের কয়েদিনীরা জানে, হাল আমলের কয়েদিনীরা শুনেছে, দেহ্‌লীর ওদিকে কোথায় যেন রামপিয়ারীর ভারী ডাকাতের দল ছিল। কোন এক শহরে রাহাজানি করতে গিয়ে বাঁ কান আর চোয়ালের খানিকটা খোয়াতে হয়েছে। প্রতিপক্ষ পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কান চোয়াল কেটে নিয়েছিল। মাংস শুকিয়ে তুবড়ে তুবড়ে ঝুলছে। চোখের পাতা কেটে নিয়েছিল। চোখে তার পাতা পড়ে না। এ কিস্‌সা সোনিয়াও শুনেছে।

শেষ বেলায় আবছা আলোতে রামপিয়ারীকে দেখে সোনিয়া চমকায়। চমকাতে হয়।

রামপিয়ারী বাজখাঁই গলায় আবার ডাকল, 'এ সোনিয়া—'

'হাঁ—'

'তাঁতের কাজ হয়ে গিয়েছে?'

'হাঁ—'

রামপিয়ারী খেঁকিয়ে উঠল, 'সচ্ বলছিস ?'

'জরুর।'

টিণ্ডালান রামপিয়ারীর দাপটে 'রেগুবারিক' কয়েদখানার কয়েদিনীরা সদাই তটস্থ। কোন কয়েদিনী তাঁত বুনল না, কোন কয়েদিনী কুর্তা সিলাই করল না, কে কোপরার জন্ম নারকেল কাটল না, কার কাজে গাফলতি হয়েছে—সব, সব কিছু পাতাহীন চোখে ঠিক ঠিক দেখে ফেলে রামপিয়ারী। তারপর কেমন করে শয়তানী কয়েদিনীদের চুলের মুঠি উপড়ে ফেলতে হয়, চট পরিয়ে তিন রোজ খানা বন্ধ করে দিতে হয়, ধারাল নখে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে চামড়া উপড়ে নিতে হয়, সে সব অমোঘ কায়দাগুলো তার জানা।

রামপিয়ারীকে দেখে সোনিয়ার বুকে কাঁপুনি ধরেছিল। সেই কাঁপুনি এখনও থামে না।

একটু সময় কাটে।

সোনিয়া দরিয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। আর পাতাহীন লম্বাটে চোখে একদৃষ্টে সোনিয়াকে দেখছিল রামপিয়ারী।

এবার বড় মুলাইম গলায় রামপিয়ারী ডাকল, 'সোনিয়া—'

'হাঁ—'

'তুই বহুত খুবসুরতী, বহুত বহুত সুন্দর।'

সোনিয়ার পাশে ঘন হয়ে বসল রামপিয়ারী। বাঁ হাতটা দিয়ে তার চিকন সুঠাম মাজা পেঁচিয়ে ধরল। পাতাহীন চোখে তারা দুটো ঝিকঝিক করছে। সোনিয়ার মাজায় রামপিয়ারীর হাতটা আরো চেপে বসছে। কানের কাছে মুখটা ঠেকিয়ে খুব আস্তে, গাঢ়, অদ্ভুত স্বরে রামপিয়ারী বলল, 'তুর উমর (বয়স) কত ?'

উপসাগর ফুঁড়ে সামুদ্রিক বাতাস সোঁ সোঁ করে ছুটে আসে। নারকেল-বনে এলোপাথাড়ি আছাড় খায়।

অস্পষ্ট আলোতে রামপিয়ারীর চোখের দিকে তাকিয়ে অজানা, দুর্বোধ্য এক ভয়ে বুকের মধ্যটা শিরশির করে সোনিয়ার।

রামপিয়ারী হাসে। কালো কালো দাঁতগুলো মেলে বিকট ভাবে হাসে। এখন পাতাহীন চোখের তারা দুটি জ্বল জ্বল করে। নরম গলায় সে বলে, 'কি রে সোনিয়া, বাতচিত করছিস না কেন ? উমর কত তোর ?'

ভয়ে ভয়ে ফিস ফিস গলায় সোনিয়া বলে, 'বিশ বরষ—'

'তুই বড় খুবসুরতী, বড় সুন্দর—'

সোনিয়া জবাব দেয় না। অসাড়, আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে।

কিছু সময় যায়।

হঠাৎ রামপিয়ারী সোনিয়ার মাজা থেকে হাতের প্যাঁচ খুলে ফেলে। বলে, 'আমার দিকে চা সোনিয়া—'

বলতে বলতে একটা বেশরম কাজ করে ফেলে রামপিয়ারী। বুকের কুর্তাটা ঢিলা করে খুলে ফেলে। তারপর হি হি করে টেনে টেনে খুব একচোট হাসে। আবার বলে, 'ছাখ্ ছাখ্—দিল ভরে ছাখ্—'

চোখের পাতা নড়ছে না সোনিয়ার। তাজ্জব হয়ে সে রামপিয়ারীর বুক দেখছে। বিরাট, মাংসল রামপিয়ারীর বুক আশ্চর্য শুকনা। ছোট ছোট ঢিলা স্তনে, স্তনের উপরের চওড়া সমতল অংশে রাশি রাশি উল্কি আঁকা রয়েছে।

উল্কিগুলির নমুনা দেখতে দেখতে সোনিয়া শিউরে উঠল। মানুষ-মানুষীর জৈব প্রবৃত্তির, আদিম কামের, রতির বীভৎস সব চিত্র রামপিয়ারীর বুকময় ছড়িয়ে আছে।

যে সোনিয়া কোতল করে বেবাক জীবনের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে 'কালা পানি' আসতে ডরায় নি, এই মুহূর্তে বিচিত্র এক ভয়ের তাড়নায় সে চোখ বুঁজে ফেলল।

চোখ মেলেই সোনিয়া দেখল, এক জোড়া পাতাহীন চোখ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই ঠিক আগের মত টেনে টেনে হাসল রামপিয়ারী। লোলুপ গলায় বলল, 'দেখলি ?'

সোনিয়া জবাব দিল না।

রামপিয়ারী বলল, 'দুনিয়ার সব সুখ, সব মজার ছবি আমার বুকে আঁকিয়ে রেখেছি।'

সোনিয়া এবারও কিছু বলল না।

রামপিয়ারী আবার শুরু করল, 'আমার বুকে এই ছবি কেন আঁকিয়ে রেখেছি, জানিস ?'

'না।' ফস করে বলে ফেলল সোনিয়া।

একটু সময় কি ভাবে রামপিয়ারী, সে-ই জানে। হঠাৎ সে মত বদলায়, 'আজ থাক, দুসরা একদিন বলব।'

প্রথমে হাল্কা একটা পর্দার মত অন্ধকার নামল। একটু একটু করে সেই পর্দাটা গাঢ় হয়ে সমস্ত দরিয়াটাকে ঢেকে ফেলল। এখন উপসাগর, রস্ দ্বীপ, কিছুই দেখা যায় না।

রামপিয়ারী বা সোনিয়া, কেউ কথা কয় না।

বুকের উপর কুর্তাটা তুলতে তুলতে রামপিয়ারী শুরু করল, 'তোকে আমি বড় পেয়ার করি সোনিয়া। পয়লা যেদিন তুই এই 'স্নেগুবারিকে' এলি, সে দিন তোকে দেখেই আমার দিল মজেছে। একটা কথা সব সময় মনে রাখিস, আওরতে আওরতে যে পেয়ার, সে পেয়ার বড় খাঁটি চীজ।'

সোনিয়া হাঁ না, কিছুই বলে না।

অন্ধকারের চেহারা দেখে হঠাৎ হুঁশ ফেরে রামপিয়ারীর। ঝট করে কুর্তাটা বুকে চড়িয়েই তাড়া লাগায়, 'ওঠ, ওঠ সোনিয়া। কয়েদানী গোনার সময় হয়েছে।'

দু-জনে উঠে পড়ে।

সকাল বিকাল দু বার কয়েদিনী গোনার নিয়ম। কয়েদিনী গুনতির পর খানাপিনার পালা। সপ্তাহে দু দিন কয়েদিনীদের মাছ মেলে। আজ মাছের দিন।

লোহার বর্তন নিয়ে কয়েদিনীরা কাতার দিয়ে বসেছে। টিণ্ডালান, পেটি অফিসারনী আর জমাদারনীরা বড় বড় হাতায় করে বর্তনে খানা ফেলে ফেলে চলেছে।

টিণ্ডালান রামপিয়ারী সোনিয়ার কাছাকাছি এসে শরীরটা বাঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ল। তার থালায় তিন খণ্ড মাছ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'মনে রাখিস সোনিয়া, আমি তোকে কত পেয়ার করি। তিন টুকরা মাছ দিলাম।'

রামপিয়ারী পাশের কয়েদিনীর দিকে এগিয়ে গেল।

রামপিয়ারীর পিছন পিছন আসছিল পেটি অফিসারনী। নাম, এত্তোয়ারী। সে খানা দিচ্ছিল।

সোনিয়ার থালায় এক ডাব্বা খানা দিয়ে, ফিসফিসিয়ে এত্তোয়ারী বলল, 'খুব সাবধান সোনিয়া।'

হকচকিয়ে সোনিয়া বলে ফেলল, 'কেন?'

খাটো খাটো করে ছাঁটা চুল, থ্যাবড়া নাক, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে

আসছে, দু গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মস্ত হাঁ—এই হল পাঠান পেটি অফিসারনী এতোয়ারীর চেহারা নমুনা।

চারদিকে একবার ভাল করে দেখে নিল এতোয়ারী। রামপিয়ারী অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। এতোয়ারী বলল, 'ঐ টিণ্ডালানকে সাবধান। ও শালী বহুত হারামী। সব কয়েদী জানে, উ মাগী মাগী না।'

'তবে কি?' বিস্ময়ে চোখের তারাদুটো ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন সোনিয়ার।

পাশের কয়েদিনীরা চিল্লাচিল্লি শুরু করল।

'জলদি খানা লাও—'

'খানা লাও, বহুত ভুখ—'

এতোয়ারী অস্থির গলায় বলল, 'রাতে তোকে সব বলব সোনিয়া।'

কয়েদিনীদের লোহার থালায় খানা দিতে দিতে এতোয়ারী সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

একটা কম্বল বিছিয়েছে। আর একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে সোনিয়া। কাতার দিয়ে কয়েদিনীরা ঘুমাচ্ছে।

আচমকা পাঁজরে নখের খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠল সোনিয়া। দেখল এতোয়ারীর মস্ত গোলাকার মুখটা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

চাপা, ভয়ানক গলায় এতোয়ারী বলল, 'চুপ।'

খানিকটা সময় কাটল। একটু ধাতস্থ হয়ে সোনিয়া বলল, 'কি মতলব অফসারনী?'

'তোর সঙ্গে বাতচিত আছে।'

সোনিয়া একদৃষ্টে এতোয়ারীর দিকে তাকিয়ে রইল।

চারপাশে কয়েদিনীরা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। একেবারে শেষ মাথায় শুয়েছে হাবিজা। সব নাকের ডাক ছাপিয়ে তার নাক থেকে বিকট আওয়াজ বেরুচ্ছে। কয়েদিনীদের নাকের ডাকে প্রলয় ঘটছে যেন।

আলো নিবে গিয়েছে। কেউ জেগে নেই। ঘন অন্ধকারে পেটি অফিসারনী এতোয়ারীর কাছে বসে থাকতে থাকতে সোনিয়ার বুকের খুব ভেতরে আতঙ্ক।

অশান্ত উপসাগর গর্জায়। পাথরের দেওয়ালে অবিরাম আছাড় খায়। নারকেল-বনে বাতাস মেতে ওঠে। দরিয়া আর বাতাসের গর্জন, ঘন অন্ধকার, কয়েদিনীদের নাকের ডাক—সব মিলিয়ে খুনিয়ারা সোনিয়ার বুকে বিচিত্র এক ভয় ঘনিয়ে তোলে।

হঠাৎ ফিসফিস করে এতোয়ারী বলে, 'তুই যেদিন আন্দামান এলি, সেদিন একটা মরদ তোর জন্যে কত খুন দিয়েছে।'

'কোন মরদ?'

'চান্নু সিং।' গলার স্বরটাকে এবার বড় নরম করে ফেলে এতোয়ারী, 'মরদটা বড় ভাল। তামাম আন্দামান ঢুঁড়ে চান্নুর মত দুসরা মরদ পাবি না সোনিয়া। বড় ভাল, বড় আচ্ছা মরদ। তোর জন্য চান্নু কত খুন দিল।'

সোনিয়ার গায়ে গা ঠেকিয়ে ঘন হয়ে বসে এতোয়ারী। অন্ধকারেই সোনিয়ার মুখের চেহারা নমুনা দেখতে চেষ্টা করে।

আশ্চর্য! অন্ধকারেই হাসে সোনিয়া। ঠিক হাসে না; যে ঠোঁট বিদ্রূপে বেঁকে গিয়েছে, সেই ঠোঁটে হাসিটাকে টিপে টিপে মারে। একটু আগের ভয়ডর তার আর নেই।

সোনিয়ার হাসির রকমটা দেখতে পায় না এতোয়ারী। সে বলে, 'মঙ্গলবার মঙ্গলবার এখানে সাদীর প্যারিড (প্যারেড) হয়। মরদানা কয়েদীরা আসে, জেনানা কয়েদীদের সঙ্গে বাতচিত করে। দু তরফ রাজী-বাজী হয়ে গেলে সাদি হয়ে যায়।'

'আমি জানি।'

'তুই জানিস! কার কাছে জানলি?'

'চান্নু সিং বলেছে।'

এতোয়ারী চমকে উঠল, 'চান্নু সিংকে তুই চিনিস!'

'জরুর। যে মরদ আমার জন্য এত খুন দিল, তাকে চিনব না!' খিক খিক করে দুর্বোধ্য শব্দে হেসে ওঠে সোনিয়া। বলে, 'চান্নু বলেছে, সাদির প্যারিডের সময় সে আসবে; মাথায় লাল সাফা (পাগড়ি) থাকবে, হাতে লোহার বালা।'

এতোয়ারী উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'তামাম জিন্দগীর সাজা নিয়ে কালাপানি এসেছিস সোনিয়া। সারা জীবন এই দ্বীপে কাটাতে হবে। তুই খুবসুরতী লেড়কী; একটা সাদি করে না ফেললে তোর জিন্দগী বরবাদ হয়ে যাবে।'

সোনিয়া কথা কয় না। অন্ধকারে তার ঠোঁটে সেই দুর্বোধ্য হাসিটা আরো দুর্বোধ্য হয়।

এতোয়ারী আবার বলে, 'সাদি না করলে কোনদিন এই কয়েদখানা থেকে তোকে বেরুতে দেবে না।'

'কেন ?'

'এই দ্বীপে আওরত খুব কম। মরদানা কয়েদীগুলো লেড়কীর জন্ত পাগলা কুত্তা হয়ে আছে। জেনানা পেলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। একে তুই জেনানা, তার ওপর খুবসুরতী জেনানা। তুই বেরুলে উপায় আছে! আমি বলছি, তুই সাদি কর সোনিয়া।'

'দিল যে সাদি করতে চায় না।'

'দিলের বাত তুই কি বুঝিস ছুকড়ি ; তোর বয়সে দিল বহত দিল্লাগী করে।'

একটু থামে এতোয়ারী। টেনে টেনে দম নেয়। তারপর বলে, 'সাদি কর সোনিয়া ; ঐ চান্নু সিংকেই সাদি কর। আদমীটার ইমান আছে, দিল আছে, আবার রূপেয়াও আছে। চান্নুকে সাদি করলে তোর সুখ হবে। নয়া নয়া কাপড়া পাবি, গয়না পাবি।'

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে এতোয়ারী। পরে ফিস ফিস করে বলে, 'তুই নয়া এসেছিস সোনিয়া। পাঁচ বরষ এখানে না কাটালে সিরকার (সরকার) তোকে সাদি করতে দেবে না। পাঁচ বরষে তোর কাছে টিণ্ডাল পেটি অফসারনীরা দুসরা কয়েদীর সঙ্গে সাদির কথা বলবে। লেকিন তুই চান্নুর কথা ইয়াদ রাখিস। তোকে আমি পেয়ার করি, তাই চান্নুর মত ভাল আদমীর সঙ্গে তোর সাদির কথা বলছি।'

'চান্নুর সঙ্গে তোমার জান পয়চান আছে পেটি অফসারনী ?'

'জরুর।' অন্ধকারেও চোখজোড়া ধিকি ধিকি জ্বলে এতোয়ারীর।

'কেমন করে জান পয়চান হল ?'

এবার এতোয়ারীর গলা বড় করুণ শোনায়, 'চান্নুর সাথে আমার সাদী হয়েছিল। ছ রোজ একসাথ ঘর করেছিলাম। লেকিন আমার কসুরেই সেই ঘর ভুড়ল। সাদি খারিজ হয়ে গেল। আর কোন কালে 'রেণ্ডিবারিক' কয়েদখানা থেকে আমি বেরুতে পারব না।'

এতোয়ারীর গলার স্বর ভারী, বিমর্ষ শোনাল।

কেউ আর কথা কয় না। একটু আগে অন্ধকার, উপসাগরের গর্জন, নিঃশব্দ

আকাশের অসংখ্য মিটি মিটি তারা, সামুদ্রিক বাতাস, এতোয়ারী—সব মিলিয়ে সোনিয়ার বুকের খুনে বিচিত্র এক ভয় ঘনিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে এতোয়ারীর বিষণ্ণ, বিমর্ষ গলার স্বর শুনতে শুনতে সেই বিচিত্র ভয়টা অদ্ভুত এক করুণার রূপ নিয়েছে।

নিজের অজান্তে একটা হাত বাড়িয়ে এতোয়ারীর হাতে রাখল সোনিয়া। হাতের মধ্যে দিলের উত্তাপ পেল এতোয়ারী।

ষোলো

সেই রাত্রে ফাই মঙ বর্মীর দোকানে খুদার নামে বিশ কসম খেয়ে চান্নু সিংকে কথা দিয়েছিল জাজিরুদ্দিন। চান্নু যদি কলমা পড়ে ইসলামী হয়, তা হলে সোনিয়ার সঙ্গে তার সাদির সব ইন্তেজাম করবে সে নিজে। চান্নু এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল।

সেই রাত্রেই এবারডীন বাজার থেকে সরাসরি সেলুলার জেলে চলে এসেছিল পীরজাদা মৌলানা জাজিরুদ্দিন হাজী।

দু বছর আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে কোথায় যে পালিয়ে বেড়িয়েছে জাজিরুদ্দিন, কে বলবে! পুলিস, টিণ্ডাল, পেটি অফিসার—তামাম দ্বীপ চুঁড়েও কেউ তার পাত্তা পায় নি। দু বছর বাদে ভাগোয়া কয়েদী আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে।

আন্দামানে ভাগোয়া কয়েদীর সাজা বড় মারাত্মক।

কিন্তু আপনা থেকে ধরা দেওয়ার গুণেই হোক, আর যে কারণেই হোক, ভাগোয়া কয়েদী জাজিরুদ্দিনের সাজাটা তেমন ভীষণ হল না।

পয়লা সাত দিন খাড়া ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে। তার পর দু রোজ 'টিকটিকি'তে চড়িয়ে দুই পাঠান জোয়ান তিরিশ ঘা করে বেত মেরেছে। তারও পর তিন রোজ পুরা খানা বন্ধ ছিল।

পুরা বারোটা দিন কুঠুরিতে আটক ছিল জাজিরুদ্দিন। কারো সঙ্গে কথা কইতে দেওয়া হয় নি তাকে। বাতচিত দূরে থাক, সিপাই আর জমাদার ছাড়া একটা কয়েদীর মুখ পর্যন্ত দেখে নি।

আজ পয়লা ছুটা পেয়েছে জাজিরুদ্দিন।

এখন দুপুর।

উপরে বিশাল আকাশ, নীচে বিপুল দরিয়া। আকাশের কোথাও এক টুকরা মেঘের চিহ্ন নেই। দুপুরের রোদে আন্দামানের আকাশ জ্বলে, দরিয়া জ্বলে। আকাশ আর সমুদ্র যেখানে একাকার হয়ে মিশেছে, সেখানকার রঙ বোঝা যায় না। অস্পষ্ট, দুর্জ্ঞেয় এক রহস্যের মত মনে হয়।

পাথরের দেওয়ালে উপসাগর ক্রমাগত আছাড় খায়। সব বাধা চুরমার

করে দরিয়া নিজেকে আরো প্রসারিত করতে চায়। সমুদ্রকে পাথরের দেওয়ালে বশ মানানো কি সোজা কথা!

কয়েদীদের দুপুরের খানাপিনা হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের আরাম-বিশ্রামের সময়।

সাত নম্বর ব্লকের ওয়ার্কশপের সামনে ছোট ছোট দলে জোট পাকিয়ে বসেছে কয়েদীরা। খুশ খেয়ালের গল্প করছে। নয়া নয়া কয়েদী পরস্পরের সঙ্গে দোস্তি মহব্বতি করছে। কেউ কেউ ঘাসের উপর চিত হয়ে আরাম করছে। কেউ কেউ কুর্তা খুলে শীতের রোদে পিঠ সেঁকছে। জন কতক তবিয়ত করে লম্বা চুলে বিনুনি পাকাচ্ছে। কয়েক জন পাঠান চোখা সুর তোয়াজ করছে।

ফাঁসি কুঠুরির ও-পাশ থেকে জাজিরুদ্দিন এসে পড়ল।

জাজিরুদ্দিনের চাঁছাছোলা মাথায়, পরিপাটি সুরে, দীর্ঘ খাড়া চেহারায়, লাল-লাল এক জোড়া চোখে কেমন এক ধরনের আদিম হিংস্রতা রয়েছে। নয়া কয়েদীরা তটস্থ হয়ে উঠল।

দু পাটি দাঁতে ঝিলিক হেনে জাজিরুদ্দিন হাসল। তারপর বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠল, 'এ শালে লোক—'

তটস্থ কয়েদীরা এবার নড়েচড়ে বসল।

জাজিরুদ্দিন আবার চিল্লায়, 'তোরা আমাকে চিনিস?'

কেউ জবাব দিল না। হতবাক হয়ে সকলে জাজিরুদ্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জাজিরুদ্দিন বলে, 'আমার নাম পীরজাদা মোলানা জাজিরুদ্দিন হাজী। সাত সাতবার আমি হজে গিয়েছি। কথাটা ইয়াদ রাখিস।'

সাত রোজ খাড়া ডাণ্ডাবেড়িতে ঝুলে, তিন রোজ বিনা খানায় আর দু রোজ 'টিকটিকি'তে বেত খেয়ে একটু কাহিল হয়ে পড়েছে জাজিরুদ্দিন। তবু গলার তেজ তার পুরাই আছে।

জাজিরুদ্দিন আবার শোহরত করে, 'দু বরষ আগে আমি কালাপানি এসেছিলাম। এই কয়েদখানায় কয়েক রোজ থেকে জঙ্গলে ভেগেছিলাম। আবার এসেছি।'

'ভাগোয়া কয়েদী!'

নয়া কয়েদীদের গলা ফেঁড়ে ভয়, আতঙ্ক আর বিস্ময়ভরা অদ্ভুত আওয়াজ বার হয়।

সাত নম্বর ব্লকের সামনে ঘাসের ছোট্ট ময়দান ও কয়েদীদের [illegible] ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসে জাজিরুদ্দিন। দু পাটি ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। একটা দস্তুর জানোয়ারের মত তাকে দেখায়।

জাজিরুদ্দিন খেঁকাতে খেঁকাতেই বলে, 'ভাগোয়া কয়েদী। জরুর আমি ভাগোয়া কয়েদী। আমার কলিজায় কত হিম্মত, বুঝে ছাখ শালে লোক। এত এত সিপাহী, এত এত টিণ্ডাল, পেটি অফসার, জমাদার, কোন শালে আমাকে আটক রাখতে পারল না। কোন শালে আমাকে রুখে রাখতে পারবে না।'

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে মেনল্যাণ্ডের যে সব কয়েদী সারা জীবনের সাজা খাটতে আসে, এমনিতেই তারা খুনিয়ারা, লুঠেরা, ভয়ঙ্কর। যারা ভাগোয়া কয়েদী, তারা আরো ভয়াবহ। সভ্য দুনিয়ার কানুন ভেঙে কয়েদীরা আন্দামান আসে। আন্দামানের কানুন ভেঙে যারা পালায়, তারা ভাগোয়া কয়েদী। সাধারণ দ্বীপান্তরের কয়েদীরা এই সব ভাগোয়া কয়েদীদের ভীষণ ডরায়। তাদের ধারণায়, আন্দামানের কানুন ভাঙার সাহস যার খুনে আছে, তার মত বড় মরদ আর কে? তার মত হিম্মতদার আদমী দুনিয়ার কোথায় মিলবে? ভাগোয়া কয়েদী সম্বন্ধে সাধারণ কয়েদীর মনে ভয়, বিস্ময় এবং সম্ভ্রমভরা এক বিচিত্র মোহ ঘনিয়ে থাকে।

অবাক হয়ে নয়া কয়েদীরা জাজিরুদ্দিনকে দেখছে। কেউ টুঁ শব্দটি করছে না।

জাজিরুদ্দিন সদর্পে চেঁচায়, 'দিন দুনিয়ায় আমাকে আটক রাখার তাগদ কোন মানুষের নেই।'

একপাশে চুপচাপ বসে রঙ্গ দেখছিল লখাই। এবার সে বলল, 'বেফায়দা কি চিল্লাচিল্লি লাগিয়েছ!'

চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এল জাজিরুদ্দিনের। পোড়া তামার মত মুখের চামড়া। সেই চামড়ায় আড়াআড়ি অনেকগুলো হিংস্র রেখা ফুটে বেরুল। দু-পাটি খিঁচানো দাঁতে হত্যা ঝিলিক দিল।

শোহরতে বাধা পড়ায় জাজিরুদ্দিন গর্জে উঠল, 'কৌন, কৌন রে উল্লুকা বাচ্চে—'

'আমি রে শালে হারামীকা বাচ্চে—' লখাই রুখে দাঁড়াল।

[illegible] একবার দেখল জাজিরুদ্দিন। তারপর কি মনে করে ঈষৎ নরম স্বরে বলল, 'কি বলছিস ?'

'বলছি, খুব তো চিল্লাচ্ছ ; তোমাকে কেউ আটক রাখতে পারবে না ! এই তো কয়েদখানায় আটক রয়েছ। নালায়েক, বুড্ঢু কাঁহাকা !'

লখাইর অজ্ঞতায় মুলাইম ভঙ্গিতে হাসে জাজিরুদ্দিন। বলে, 'আবে মুরুখ, আমি নিজে এসে তো ধরা দিলাম। নইলে আমাকে আটক করে, কার সাধ্যি !'

'ধরা দিলে কেন ?'

এবার চোখদুটো আসমানের দিকে তুলে জাজিরুদ্দিন বলে, 'ঐ আসমানে দিন দুনিয়ার যে মালেক রয়েছে, তার মর্জিতেই ধরা দিলাম।'

'দিন দুনিয়ার মালেকের এমন বদ মর্জি হল কেন ? শুনেছি, ভাগোয়া কয়েদী একবার ধরা পড়লে 'পুলিপোলাও' বহুত চলে !'

লখাই মিটিমিটি হাসে। তার হাসিতে বেতবিয়ত মতলব মিশে রয়েছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে লখাইর হাসির রকমটা বুঝবার চেষ্টা করে জাজিরুদ্দিন। তার পর হুমকে ওঠে, 'খবরদার বেয়াদব দুশমন ! আমি খুদাবন্দ্, খুদার নামে বদ কথা বললে জান নেব।'

জাজিরুদ্দিনের চাঁছাছোলা মাথায়, চোখা সুরে, গলার আওয়াজে এমন কিছু ছিল, লখাই চমকে উঠল। আর কথা বলল না। মিটিমিটি বদ হাসিটাও থেমে গেল।

এখনও জাজিরুদ্দিনের লাল-লাল চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছে। পোড়া তামাটে রঙের মুখটায় অজস্র আঁকিবুকি ফুটে রয়েছে।

হঠাৎ কি হল, জাজিরুদ্দিন নরম গলায় বলল, 'শোন মুরুখ, তুই নয়া এসেছিস, আন্দামানের সবাই জানে, আমার মর্জি হলে যখন খুশি কয়েদখানা থেকে চলে যেতে পারি। লেকিন খুদার ইচ্ছা দুসরা।'

খুদার ইচ্ছাটা জানার জন্য লখাইকে বড় উদগ্রীব দেখায়। সে বলে, 'খুদার কি ইচ্ছা ?'

'সে পরে বলব।'

অনেকটা সময় কাটে।

একটু আগেও মেঘ ছিল না। এখন পশ্চিম আকাশে পাটল রঙের মৌসুমী মেঘ হানা দিতে শুরু করেছে। নীচে দরিয়ার গর্জন বাড়ছে। অনেক উঁচুতে

কতকগুলি বিন্দু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওগুলি গোয়েলেথ পাখি। বাতাসের সমুদ্রে ভেসে ভেসে দিশাহীন তারা কোন দিকে যে চলেছে, তার হদিস মেলে না।

প্রথমে জাজিরুদ্দিনই শুরু করল, 'তোর নাম কি?'

'লখাই।'

'কৌন দেশকা মূর্তি?'

'বাঙলা দেশ।'

'হিন্দু না মুছলমান?'

'হিন্দু।'

'বাঙলা কিতাব পড়তে পারিস?'

'পারি।'

হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে জাজিরুদ্দিন হাঁকল, 'ফয়জর আলী—'

'জী—'

ওয়ার্কশপের পিছন থেকে বেঁটে-খাটো গোলগাল এক কয়েদী ছুটে এল। তার গলায় "D" মার্কা টিকিট ঝুলছে। "D" টিকিট হল সন্দেহজনক চরিত্রের কয়েদীর মার্কা। কাঠের টিকিটে কোন ধারার আসামী, কবে কয়েদ হয়েছে, সব খোদাই করা আছে। সবার তলায় আছে একটা "L" অক্ষর। অর্থাৎ তামাম জীবন সাজা খাটার কয়েদী।

জাজিরুদ্দিন বলল, 'কিতাব এনেছিস?'

ডান এবং বাঁ—দু দিকেই মাথা হেলিয়ে খুব এক চোট ঝাঁকাল ফয়জর আলী। তারপর বলল, 'হাঁ, এই নাও।'

বগলের নীচ থেকে খানকতক কিতাব বার করে জাজিরুদ্দিনের হাতে দিল ফয়জর। কিতাবগুলি থেকে খান দুই বেছে লখাইর দিকে বাড়িয়ে দিল জাজিরুদ্দিন। বলল, 'পড় দেখি, কি লেখা আছে?'

লখাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বই দুটোর নাম পড়ল। একটার নাম, 'শিবের সঙ্গে মুহম্মদের লড়াই,' আর একটার নাম, 'আলীর সাথে হনুমানের যুদ্ধ'।

'ঠিক হায়। এই কিতাব দুটো আগে পড়। পরে দুসরা কিতাব দেব।'

'কি আছে এর মধ্যে?'

'পড়লেই বুঝবি।' জাজিরুদ্দিন রহস্যময় হাসি হাসে। তারপর বলে, 'পরশু হল রবিবার, ছুটির দিন। আমাকে সেদিন কিতাব দুটোর কিস্সা

বলতে হবে। ইয়াদ রাখিস।' বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে যায় জাজিরুদ্দিন।

জাজিরুদ্দিন একটা কয়েদীর দিকে হাত বাড়িয়ে হাঁকে, 'নাম কি তোর ?'

'সা মিঙ।'

'মুলুক কাঁহা ?'

'বর্মা, মৌলমিন।'

'ফায়া তোদের দেওতা ?'

'হাঁ।'

একে একে সকলের সঙ্গে জান পয়চান হয় জাজিরুদ্দিনের। কেউ পাঞ্জাবী, কেউ বর্মী, কেউ কারেন, কেউ মোপলা, কেউ বাঙালী। কেউ হিন্দু, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বৌদ্ধ। কেউ শিখ, কেউ জৈন।

যারা পড়তে পারে, তাদের সকলকেই কিতাব দেয় জাজিরুদ্দিন। যারা পড়তে পারে না, তাদের আশ্বাস দেয়, কিতাবের কিস্‌সা রবিবার সে নিজেই তাদের শোনাবে।

বিচিত্র সব কিতাব। হিন্দী, উর্দু, বাঙলা, বর্মী—সব ভাষারই কিতাব বিলায় জাজিরুদ্দিন। কোনটা 'মুহম্মদের সঙ্গে শিবের লড়াই,' আবার কোনটা 'মুহম্মদের সঙ্গে ফায়া কি নানকের যুদ্ধ'।

কিতাব বিলাবার পালা শেষ হবার আগেই পেটি অফিসাররা ঝাঁক বেঁধে এসে পড়ে। তাড়া লাগায়, 'এ শালে লোক, খুব যে আরাম ফুর্তি লাগিয়েছিস। কাজে যাও আভি। আড়াই পাউণ্ড করে নারকেলের ছোবড়ার তার না পেলে পাছার হাড্ডি ঢিলা করে দেব।'

কয়েদীরা যে যার কাজে ছোটে।

পিছন থেকে জাজিরুদ্দিন চিল্লায়, 'ইয়াদ রাখিস, ছুটির রোজ সবাই আমরা মিলব। কিতাবের কিস্‌সা জিগ্যেস করব।'

সতেরো

দিন যায়।

উপসাগর আর সামুদ্রিক বাতাসের গর্জন শুনে, দরিয়া দেখে, নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ টিলা দেখে, মাউণ্ট হ্যারিয়েট, রস দ্বীপ, সিন্ধুশকুন আর 'রেগুবারিক' কয়েদখানা দেখে দেখে বিশটা দিন কাটিয়ে দিল লখাই।

এই বিশ দিনে লখাই একটা সার সত্য বুঝেছে। একটি একটি দিন গেঁথে এই দ্বীপে সপ্তাহ যায়, সপ্তাহের পর মাস আসে, মাসে মাসে বছর ঘোরে। বছরের পর বছর কাটিয়ে একদিন কয়েদীর তামাম জীবন শেষ হয়ে যায়। সেই জীবনের জন্য কেউ এতটুকু আপসোস পর্যন্ত করে না।

এই বিশ দিনেই মনটা কেমন যেন নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছে লখাইর। উগ্র নেশা আর কামাতুর নারীমাংস ছাড়া একটি দণ্ড যার চলত না, আন্দামান এসে সেই লখাইর নারী আর নেশার আসক্তিটা যেন তিলে তিলে টিমিয়ে আসছে। মেনল্যাণ্ডে থাকতে দুটি মাত্র স্থূল মনোধর্ম তার মধ্যে প্রকট ছিল। একটি কাম, অপরটি লালসা। আদিম প্রবৃত্তিগুলির একান্ত বশীভূত ছিল লখাই। অসংযত, ভীষণ প্রবৃত্তিগুলির তাড়নায় কি ইচ্ছায় সে চলত ফিরত। দুর্বল মুহূর্তে মনের মধ্যে যদি কোন সদিচ্ছাই জন্মাত, সে ইচ্ছা তার নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারত না।

চরসে, গুলিতে, গেঁজিয়ে-ওঠা তাড়িতে আর নারীদেহে ছিল লখাইর জীবনের সমস্ত চরিতার্থতা।

আশ্চর্য, আন্দামানে এসে কাম আর লালসার মত উগ্র স্থূল মনোধর্মের পাশে একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি জন্মেছে লখাইর মনে। সেটি হল বেদনাবোধ। আর এই বেদনার বোধটাই মাত্র বিশটা দিনে তাকে বিকল করে ফেলেছে। এই বোধটাই তাকে ভাবতে শিখিয়েছে। হৃদয়হীন লখাই আজকাল ভাবে।

কয়েদখানার ঘড়িতে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মেপে আড়াই পাউণ্ড নারকেল ছোবড়ার তার দিয়েছে পেটি-অফিসারকে। তারপর কখন যে নিজের সেলের সামনের বারান্দাটায় এসে দাঁড়িয়েছে, হুঁশ নেই লখাইর।

বিকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভাণ্ডারা' থেকে ভাজি আর চাপাটি দিয়ে গিয়েছে।

দুপুর থেকেই মনের গতিক আজ সুবিধার নয় লখাইর। মনটা কেমন ফাঁকা, উদাস হয়ে রয়েছে। বিকালের খানা সে আনতে যায় নি। নারকেল ছোবড়ার আড়াই পাউণ্ড তার পেটি অফিসারকে ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেবার পর সেই যে নিজের সেলের সামনে এসে লখাই দাঁড়িয়েছে, তারপর কখন যে দরিয়ার রোদ মরে গিয়েছে, কখন যে সব সিন্ধুশকুন দ্বীপের আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছে আর কখন যে একটু একটু করে আবছা অন্ধকার নামতে শুরু করেছে, খেয়াল নেই।

লখাই ভাবছিল। বিবির বাজারের মোতি ঢুলানি তার সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এক বছর দু বছর নয়, মোতি ঢুলানির সঙ্গে তার পুরা সাত বছরের পাকা সম্পর্ক।

নাম তার মোতি। রূপের দেমাকে মাজা ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে পথ চলত মোতি। সেই থেকে বিবির বাজারের রসিক সুজনদের মুখে মুখে নাম উঠল, মোতি ঢুলানি। সেই নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই নামের টানেই একদিন বিবির বাজারে এসে উঠেছিল লখাই।

মোতির মাজায় যত ঢুলানি, সারা অঙ্গে তত ঢলানি। বিবির বাজারের সেরা কামিনী মোতি। রূপসী বটে একখানা। মাজা কালো দেহ; সেই দেহে চিকিমিকি খেলে, কেমন এক ধরনের বন্য আভা ফুটে বের হয়। সুপুষ্ট নিটোল দেহ, চিকন মাজা, বুকে দু পিণ্ড কঠিন টাটকা মাংস, নধর পাছায় সুঠাম মাংস মাজা ঢুলাবার সময় দোলে। দু চোখে ধাঁধা লাগায়। মোতির দেহে ধার, কালো কুচকুচে চোখে ধার, জিভে ধার। এমন কামিনী দু ভারতে মেলে না।

লুঠেরার দল ছিল লখাইর। যখন খুশি রাহাজানি করে বেড়াত। সেই ছেড়ে বিবির বাজারের কামিনীপাড়ায় এসে উঠল লখাই। সরাসরি মোতিনির ঘরেই উঠল।

পাকা কথা হল মোতির সঙ্গে। যত টাকা, শখ বিলাসের যত উপকরণ, ত শাড়ি গয়না—সব যোগাবে লখাই। কিন্তু অন্য পুরুষে অন্য নাগরে মন দেওয়া চলবে না মোতির। মোতি দু রাত ভেবে রাজী হয়ে গিয়েছিল।

পুরা সাত বছর মোতির সঙ্গে বিবির বাজারের কামিনীপাড়ায় ঘর
লখাই। এক দিক থেকে দেখতে গেলে মোতির সঙ্গে তার সম্পর্কটা হল
সম্পর্ক, নাগরালির সম্পর্ক। যে মাংসাশী পুরুষ নারীমাংস কেনে অ
কামিনী নিজের মাংস বেচে, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। কিন্তু এই সম্পর্ক
আর একটা অদৃশ্য সঙ্গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার আর মোতির
লখাই তা স্পষ্ট বুঝত। সাত বছর একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘর করে
খুনিয়ারা লখাইর মনটা অনেক নরম হয়ে গিয়েছিল। লখাই বুঝত, তা
মোতির মধ্যে দেহ কেনাবেচার সম্পর্কটা বাতিল হয়ে একটা মধুর
সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। খুনী লখাইর ভীষণ মন নরম আবেশে ভরে থাকত

প্রথম প্রথম টের পায় নি লখাই। যখন পেল? সে কথা
পরের।

যে নারীর বিবির বাজারের কামিনীপাড়ায় বাস, যার চিকন ...
ঢলানি, সারা দেহে ঢলানি, যার রক্তে রক্তে নাগরালির বীজ, এক পুরু
কেমন করে তার মন বসবে? মন মজবে?

ভাবতে ভাবতে লখাইর চোখে জ্বালা ধরল। শিরা-স্নায়ুর মধ্য দিয়ে অদ্ভু
এক উত্তেজনা দাপাদাপি করতে লাগল।

'লখাই ভাই—' পিছন থেকে কে যেন ডাকল।

ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল লখাই। ঘুরে দেখল, আবছা অন্ধকারে
তোরাব আলী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনেকটা ধাতস্থ হয়ে লখাই বলল, 'কি রে তোরাব?'

'লখাই ভাই, জান লবেজান হয়ে গেল। নির্ঘাত খতম হয়ে যাব।
তোরাব আলী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জোয়ান মরদের কান্না লখাই সইতে পারে না। কিন্তু আন্দামানের
কয়েদখানায় আসার পর থেকেই তার মনে হয়েছে, এখানে না
বেমানান। তোরাবকে কিছুই বলল না লখাই। একদৃষ্টে তার দিকে তাকি
রইল।

তোরাব আলী আবার বলল, 'লখাই ভাই, সারা জীবনের সাজা নিয়ে
কালা পানি এসেছি। কোন কালে আর দেশে ফিরতে পারব না!'

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আস্তে শব্দ করে লখাই, 'না—'

তোরাব আলীর ফোঁপানি বাড়তেই থাকে। সে বলে, 'আর

বিবির মুখ দেখতে পাব না। বিবির পেটে যে বাচ্চাটা রয়েছে, সে কোন কালে তার বাপজানের মুখ দেখবে না।'

লখাই সাড়া দেয় না। অন্ধকার আকাশে রাশি রাশি তারার হরফে কি দুর্জ্ঞেয় ভাষ্য লেখা রয়েছে, বুঝি বা তা পড়তে চেষ্টা করে।

তোরাব আলী বলে, 'কান্না পানি এসে জ্বালা আরো বেড়েছে লখাই ভাই।'

'দেশের কয়েদখানায় থাকলেই তো পারতি। নিজেই তো কালাপানি আসার খাতায় নাম লেখালি। এখন কেঁদে কি করবি?' লখাইর গলাটা বড় নরম শোনায়। কথাগুলির মধ্যে কোথায় যেন একটু সান্ত্বনার আভাস রয়েছে।

'সাধে কি কালা পানির খাতায় নাম লিখিয়েছি!' প্রশ্রয় পেয়ে তোরাব ালী বলতে থাকে, 'ভেবেছিলুম দেশ থেকে অনেক দূরে কালা পানি গেলে লটা জুড়োবে। বিবি বাচ্চার ভাবনা তেমন থাকবে না। কিন্তু খুদাতাল্লার র্জি অন্য লখাই ভাই, ভাবিয়ে ভাবিয়েই আমার জান খতম করে দেবে। ামি আর পারি না। তামাম রাত দু চোখে ঘুম আসে না। এর থেকে রতে পারলেও জান জুড়াত।' তোরাব আলী একেবারেই ভেঙে পড়ে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে মেনল্যাণ্ডের কয়েদখানা থেকে কয়েদীকে আন্দামান লান করতে গেলে তাদের মত নিতে হয়। সে সব ক্ষেত্রে কালা পানি াসা না আসা কয়েদীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অবশ্য জেল কর্তৃপক্ষ কালা পানির য়েদখানা, তার খানাপিনা, আরাম সুখসুবিধা সম্বন্ধে মজাদার এবং লোভনীয় ানান কথা শোনায়। অর্থাৎ সেলুলার জেলে খাটুনি কম, খানাপিনা ভাল, র্তিফার্তা খুশিমত—এমনি নানান রূপকথা শুনতে শুনতে কয়েদীর মন মজে য়। কালাপানির খাতায় তারা নাম লেখায়।

নিজের ইচ্ছায় আন্দামান এসেছে তোরাব আলী। কালাপানি আসার াপারে তার গরজটাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

সেই তোরাব আলীই দ্বীপান্তরে এসে সব চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে। বারাত্রি সে খুদাতাল্লার কাছে কাঁদে। তার মুখে খানা রোচে না, চোখে ্ আসে না। এক দুঃসহ যন্ত্রণায় দিল মুচড়ে মুচড়ে তার খুন ঝরে।

ধরাধরা বিমর্ষ গলায় তোরাব আলী ডাকে, 'লখাই ভাই—'

'কি কইছিস?'

'বিবি বাচ্চাকে ফেলে দরিয়া পেরিয়ে এতদূর এলুম। তবু তাদের ভাবনা গেল না। দরিয়া পেরিয়ে আমার সঙ্গে তাদের ভাবনাটাও এল। আর পারি না লখাই ভাই।'

'কি করবি, বরাতে যা আছে, তা হবেই। নিজেকে সামাল দে তোরাব।'

তোরাবের ফোঁপানি আরো বাড়ে। লখাইর একটা হাত বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, 'গলায় একদিন ঠিকই রশি দেব লখাই ভাই।'

লখাই জবাব দেয় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নারকেল-বনে সামুদ্রিক বাতাস মাথা কোটে। পাথুরে দেওয়ালে লবণ দরিয়া উথল-পাথল হয়ে উঠে। দরিয়া আর বাতাসের গর্জন স্নায়ুতে স্নায়ুতে কেমন যেমন ঝিমঝিম ক্রিয়া করে।

তোরাব আলী বলে, 'চোদ্দ বছর এই দ্বীপে আটক থাকতে হবে। তার মধ্যে মোটে বিশটা দিন কাটল। আরো কতদিন বাকী। আমি পাগল হয়ে যাব লখাই ভাই। আমার বিবি বাচ্চা—হাঃ—'

বুকের উপর চাপড়ের পর চাপড় বসায় তোরাব আলী।

এই বিশ দিনেই কি তোরাব আলী উন্মাদ হয়ে গেল! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে ভাল করে দেখে লখাই। তারপর হাত দুটো ধরে ফেলে। ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলে, 'কি করছিস তোরাব!'

'ঠিকই করছি লখাই ভাই। বুকটা আমার ছিঁড়ে যাবে, দিলটা ফেটে যাবে। আমি জান দেব।'

চোখ দুটো টকটকে লাল, মাথার চুল খাড়া খাড়া, রুক্ষ কর্কশ বস্ত মুখভঙ্গি। তোরাব আলীর সারা দেহে পাগলামির লক্ষণ প্রকট হয়েছে।

অনেকটা সময় যায়।

হঠাৎ তোরাব আলী বলে, 'লখাই ভাই, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আজকাল আমাকে সড়ক বানানোর ফাইলে কাজ দিয়েছে। রোজ কয়েদখানার বাইরে যাই। ভাবছি দরিয়া সাঁতরে দেশে পাড়ি দেব।'

লখাই জবাব দিল না।

গুটিগুটি পায়ে একসময় কখন যে তোরাব আলী চলে যায়, হুঁশ থাকে না লখাইর। তারপর কত সময় যে যায়, সে হিসাবই বা কে রাখে?

অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে। এতক্ষণ দ্বীপ আর দরিয়া আবছা দেখাচ্ছিল। এখন রাত্রির অতল অন্ধকারে সব কিছু অবলুপ্ত।

লখাই কিছুই ভাবছিল না। বলা যায়, ভাবতে পারছিল না। তার মনটা ফাঁকা, শূন্য হয়ে গিয়েছে।

'এ লখাই দাদা—' পাশ থেকে কে যেন ডাকল।

ঘুরে লখাই দেখল, ভিখন আহীর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারে পোড়া, বীভৎস মুখে হেসে উঠল ভিখন। এমন যে দুর্দান্ত লখাই, মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠল।

ভিখন আবার বলল, 'তুই যাই বলিস লখাই দাদা, কালা পানি আমার মনে ধরেছে। এ জায়গা বহুত আচ্ছা। থোড়া তখলিফ করলে সব কুছ মেলে। আওরত মেলে, নেশা মেলে।' একটু দম নিয়ে বলে, 'এই নে—'

'কি?'

চারদিকে চনমন চোখে তাকিয়ে ভিখন ফিসফিস করে বলল, 'কি আবার? তোর নেশার চীজ—আফিং।'

কাগজের একটা মোড়ক লখাইর হাতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'রোজ তোর খানা থেকে আমাকে ভাগ দিস। নিমকহারামি আমি করি না লখাই দাদা—'

লখাই বলল, 'রোজ তুই আমার নেশা কোথা থেকে জোটাস?'

'আ রে দাদা, রুপেয়া—' দুই আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে ভিখন বলে, 'তোকে তো বলেছি দাদা, রুপেয়া থাকলে আন্দামানের কয়েদখানায় পেয়ার ভি মেলে।'

পোড়া, কদাকার মুখে বিচিত্র আত্মতৃপ্তির হাসি ফোটে ভিখনের। আবার সে বলে, 'রুপেয়ার তাগদে কি না হয়! এই ত্যাখ, তোরা নারকেল ছোবড়া ছিলেকুটে তার বের করিস, সড়ক বানিয়ে জান বরবাদ করিস, আর আমি? নারকেলের কোপরা কাটি। আমার কাজে তখলিফ নেই, মেহনত নেই।'

হতবাক হয়ে ভিখনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লখাই।

কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথায় কাটে দু জনের।

হঠাৎ ফুর্তিতে লখাইর কানে মুখটা গুঁজে দেয় ভিখন আহীর, 'লখাই দাদা, মেজাজটা আজ বড় খোশ রয়েছে।'

'কেন?'

'আট আনা পয়সা খসিয়ে একটা মজাদার খবর এনেছি।' ভিখন আহীর একটি মাত্র চোখে মিটি মিটি চায়।

ভিখনের একমাত্র চোখের ফন্দিটা ঠিকমত ধরতে পারে না লখাই। ভীষণ গলায় সে চেঁচায়, 'জলদি বল। নইলে অ্যায়সা কোতকা হাঁকব!'

নিরাপদ দূরত্ব রেখে সরে দাঁড়ায় ভিখন। কদাকার মুখে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসে। বলে, 'বহুত ভাল খবর, শুনলে তুই দাদা কাপড়া খুলে পাগলা বনে নাচবি।'

'বল শালে—' লখাই রুখে আসে।

ভিখন বলে, 'বলছি বলছি, এট্টুস সবুর দাদা। বহুত মজাদার খবর; শুনলে দিল বিগড়োবে। হেঁ হেঁ দাদা—আওরত কয়েদানী সোনিয়ার খবর—'

'সোনিয়া, কোন সোনিয়া—'

'হায় হায় দাদা, তুই ক্যায়সা বেকুফ মরদানা। কৌন সোনিয়া! সোনিয়া তো একই জানতাম, তোর দিলজ্বালানেবালী লেড়কি। দাদা পুরা একরাত জাহাজের খোলে তার সঙ্গে কাটালি। এখন পুছছিস, কৌন সোনিয়া!' কপট শোকে কপাল থাপড়ায় ভিখন।

এবার আগ্রহে চোখদুটো ঝকমক করে লখাইর। গুটি গুটি পা ফেলে ভিখনের পাশে ঘন হয়ে দাঁড়ায় সে। মুলাইম স্বরে বলে, 'কি খবর রে সোনিয়ার?'

'হেঁ হেঁ দাদা—দুটা খবর আছে। একটা বহুত খারাপ খবর।'

'কেমন খারাপ?'

'আমার কোন খতা (দোষ) নেই। শুনলাম, চান্নু সিং সোনিয়াকে সাদী করবার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছে।'

চোখের তারাদুটো ধক করে জ্বলে উঠল। খাড়া চোয়াল দুটো কঠিন হল। লখাই গর্জে উঠল, 'চান্নু সিং শালে আবার কে?'

'পুরাণা কয়েদী।'

'শালের জান নেব।'

ভিখন জবাব দিল না। একমাত্র চোখটা দিয়ে চেয়ে চেয়ে বুঝল, চান্নু সিংকে এই মুহূর্তে পেলে নির্ঘাত তার জান নেবে লখাই।

হঠাৎ ভিখনের চওড়া গর্দানটা দুই থাবায় ঠেসে ধরে লখাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই হারামী, একটা খবর তো দিলি, আর একটা খবর কি?'

ভয়ে ভয়ে ভিখন বলে, 'সোনিয়ার বোখার হয়েছে। রোজ রোজ সে রস্ দ্বীপের 'সিকমেনডেরা'য় (হাসপাতালে) যাচ্ছে। আমি কি বলি, শোন লখাই দাদা—'

'কি বলিস হারামীকা বাচ্চে—'

'দাদা, আমার কি দোষ! চান্নু শালে সোনিয়াকে সাদি করতে চায়। আমি তো চাই না। ঝুটমুট আমাকে গালি দিচ্ছিস।'

ভিখন আহীরের পোড়া বীভৎস মুখটা কাচুমাচু দেখায়। করুণ স্বরে সে বলে, 'আমি তোর সাচ্চা দোস্ত লখাই ভেইয়া! থানার বখরা যেমন তুই দিস, আমিও নেশার চীজ জুটিয়ে দি। তুই দাদা গোসা হবি না।'

লখাইর রাগ পড়ে না। চান্নু সিংয়ের কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে শিরাস্নায়ুগুলো বারুদের মত ফস্ করে জ্বলে উঠেছে। রাগ জ্বালা এবং যন্ত্রণা মেশা বিচিত্র এক উত্তেজনা রক্তের মধ্যে দাপাদাপি করে ছুটছে।

ভিখনের কদাকার মূর্তিটার দিকে চেয়ে চেয়ে লখাই আরো ক্ষেপে ওঠে, 'কি বলবি শালে, বল—'

'তোকে একটা খাসা বুদ্ধি বাতলে দিতে চাই।'

লখাই জবাব দেয় না। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভিখনের ভাব গতিক দেখে।

লখাইর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে ভিখন। কানের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে সে বলে, 'দাদা, তোকেও রস দ্বীপের সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) যেতে হবে। সোনিয়ার সঙ্গে বাতচিত করবি, সিধা সাদির কথা বলবি।'

'সাদীর কথা তো বলব! কিন্তুক সাত বরষ এখানে না থাকলে তো সিরকারী টিকিট মিলবে না। টিকিট না মিললে সাদী হবে কেমন করে?'

'আরে ভেইয়া, তুই বড় বুদ্ধু! সাত বরষ বাদেই সাদী করবি। লেকিন তার আগে দুলহানকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার দিল মেজাজ খোশ রেখে রাজীবাজী করিয়ে রাখবি তো! নইলে খুবসুরতী সোনিয়া তোর মুঠা থেকে ছুটা হয়ে যাবে। হেঁ—হেঁ—দাদা।'

খিক খিক করে একটা বদখত হাসিকে চেপে চেপে মারে ভিখন।

এবার অনেকটা নরম হয় লখাই। বলে, 'সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) যাব কেমন করে? আমার তো ব্যারাম নেই।'

'হেই ভেইয়া; তুই শালে যতখানি গোঁয়ার, ততখানি যদি মতলবদার হতি, তা হলে দিন দুনিয়ার মালেক বনতে পারতি।' একমাত্র চোখটা

কুঁচকে শব্দ করে করে তিনবার তুড়ি বাজায় ভিখন। তারপর বলে, 'ভেইয়া, তোর ব্যারাম বানাতে হবে।'

'ব্যারাম বানাবো কেমন করে?'

'আমি বানিয়ে দেব।' গলাটা এবার ফিসফিস শোনায় ভিখনের, 'পিনিক টানলে তো তোর বুকের ধড়কানা বাড়ে?'

'হাঁ।'

'পেটের ব্যারাম হয়?'

'হাঁ।'

'কাল তোকে পিনিক এনে দেব।'

উল্লাসে উন্মাদ হয়ে ওঠে লখাই। পাঁজাকোলে করে ভিখনকে তুলে ধরে চিল্লায়, 'তুই আমার আসল দোস্ত; আর সব ঝুটা।'

কপট ভয়ে ভিখন চেঁচায়, 'ছোড় দে, ছোড় দে, গিরলে আমার শির ফাটবে। মর যায়েগা, মর যায়েগা—'

ভিখনকে নামিয়ে তার পোড়া কদাকার মুখে গোটা বিশেক চুমু খায় লখাই।

আঠার

আজ ছুটির দিন।

ছোবড়া ছিলা কোটার কাজ নেই, ঘানি টানার কাজ নেই, সড়ক বানানোর কাজ নেই। রখাস ছেঁচা, দড়ি পাকানো, কোপরা শুকানো—সব ঝামেলা থেকে আজ রেহাই। সপ্তাহে এই একটা দিন সব ব্যাপারে মকুব।

কালা পানির কয়েদখানায় এই দিনটা ফুর্তিতে আরামে, হল্লায় আলস্যে কেটে যায়। আন্দামানের অন্য দিনগুলি ঢিমে তেতালা, মন্থর, ক্লান্ত; কিছুতেই যেন ফুরোতে চায় না। কিন্তু এই দিনটার স্বাদই আলাদা। কালোয়াতী গানের জলদ তালের মত যেমন দিনটা আসে, আবার যায়ও তেমনি দ্রুত লয়ে।

একমাত্র "D" টিকিট মার্কা কয়েদী ছাড়া আর কারো কাজ নেই এই দিনে। কয়েদখানার ইমারতগুলি এই দিন তারা ঝাড়ে পোঁছে, ঘাস আগাছা সাফ করে।

অন্য কয়েদীদের কাজের মধ্যে দুই। খানাপিনা আর ঘুম। খানাপিনাটাও এই দিন জোর। মাছ মেলে, একটু মিঠাই অর্থাৎ গুড়ও মেলে। কাঞ্জিপানি অন্য দিন থাকে নোনা এবং কালচে; এই দিন তার স্বাদ ও বর্ণ বদলে যায়। এই দিন তার রঙ লালচে, স্বাদ মিঠা।

খানাপিনা আর ঘুম বাদ দিয়েও কাজ আছে। চুলদাড়ি বড় হলে হাজমের কাছে কামিয়ে আসা; আর কাপড়া কুর্তা বর্তন সাফ করা। তারপর তামাম দিন ফুর্তি ফার্তা, গানা হল্লা, কিস্‌সা, অশ্লীল রসের গল্পগুজব, গুলতানি।

সপ্তাহে এই একমাত্র দিনটার স্বাদ গন্ধ বর্ণই আলাদা। অন্য দিনগুলির সঙ্গে এর আসমান জমিন ফারাক। এই দিনটা মিঠা, মুলাইম, বড় খুবসুরত।

একটু আগেই কয়েদী গুনতি হয়ে গিয়েছে; কাঞ্জিপানি দেওয়া হয়েছে।

কাঞ্জিপানি খেয়ে বর্তন ধুয়ে কয়েদীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গুলতানি পাকাতে শুরু করেছে।

খানিকটা আগেই রোদ উঠেছে। উপসাগরের নীল জলে রক্তাভা ছড়িয়ে পড়েছে। বিরাট বিরাট ঢেউগুলি মাথায় নতুন রোদের চিকিমিকি নিয়ে

বিচিত্র আক্রোশে দ্বীপের দিকে ছুটে আসে; তারপর পাথরের দেওয়ালে আছাড় খেয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায়। উপসাগর পেরিয়ে কালো কুটিল দুর্জ্ঞেয় সমুদ্র। সমুদ্র—তরঙ্গমুখর, ফেনিল, লালায়িত। সেই সমুদ্র থেকে তরঙ্গ ছুটে আসে উপসাগরে; উপসাগর থেকে আসে দ্বীপে। বস্তুময় অনড় স্থবির দ্বীপের মৃত্তিকা চূর্ণবিদীর্ণ করে ভাসিয়ে নিরাকার করে দিতে চায়।

সেলুলার জেলের সেণ্ট্রাল টাওয়ারের মাথায় একটা সাগরপাখি দুই ডানা মেলে শীতের রোদের তাপ নেয়। আরামে দুই চোখ বোঁজা।

এদিকে সেদিকে ছোট ছোট জটলাগুলি কিস্‌সায়, খিস্তি এবং খেউড়ে গুলজার হয়ে রয়েছে।

এক কয়েদী বলল, 'মুন্সীজীর কাছে শুনলাম, দশ রোজ বাদে এবার জাহাজ আসছে। এইবার জাহাজ আসবে মাদ্রাজ থেকে। চার শ কয়েদী আসছে। মোপালা, পাঠান আর পাঞ্জাবী কয়েদী।'

পাশের কয়েদীটি প্রথম কয়েদীর গা ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আগ্রহে তার চোখ দুটো ঝকমক করে। একটা চোখ কুঁচকে আর একটা চোখ ইঙ্গিতময় করে ফিসফিস গলায় বলে, 'মুন্সীজী আর কি বললে?'

'আবার কি বলবে?'

'খালি মরদানা কয়েদীই আসবে; মাগী কয়েদী আসবে না!'

'না রে বুদ্ধু, নসীব বড় খারাপ। এবার আর মাগী কয়েদী আসছে না আন্দামানে।'

জিভ এবং তালুর সহযোগে চুকচুক শব্দ করে দ্বিতীয় কয়েদী। মুখে বলে, 'বহুত আফসোসের বাত। সিরকার (সরকার) শালে বেদরদী, আহাম্মক। যত মরদানা তত জেনানা না পাঠালে কালাপানির জিন্দগী বেচাল হয়ে যাবে। সব কয়েদীর ভাগে একটা করে আওরত না পড়লে খুনখারাপি বেধে যাবে।' একটু থেমে বলে, 'কত দিন আওরত দেখি না। দু-চার বরষ আর না দেখলে, মেয়েমানুষের চেহারা নমুনাই ভুলে যাব।'

সরকারের আহাম্মকি এবং বেদরদী মনোভাবের জন্য তার আফসোসের অন্ত থাকে না।

ঠিক তার পাশেই অন্য কিসিমের আলাপ চলছিল।

চাছা-মাথা এক কয়েদী দুই হাত আর দুই পা নেড়ে নেড়ে বেশ রসিয়ে

রসিয়ে বলছে, 'তোরা নেশার ব্যাপারে নালায়েক। নেশার তোরা বুঝিস কি ?'

সমস্ত জটলাটা মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, নেশার ব্যাপারে সত্যি সত্যিই তারা নালায়েক, কিছুই বোঝে না।

চাঁছা-মাথা কয়েদী আত্মগর্বে ফুলে উঠল। রোমশ, মাংসল বুকে গোটা দশেক টোকা বাজিয়ে বলল, 'আমি, বুঝলি শালেরা, বাজি ধরে একবার শরাব খেয়েছিলুম।'

'কেমন, কেমন ?'

শরাবী নেশার ব্যাপারে সবাই উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

সগৌরবে সকলের মুখের উপর দিয়ে নজরটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল চাঁছা-মাথা কয়েদী। তারপর বলল, 'ফয়জাবাদে এক দারুর দোকানে দারু খাচ্ছিলাম। এক এংরাজ লোক সেখানে এল। সাহেব বড় দিলদরিয়া। দারু খেতে খেতে ইয়ার বনে গেলাম দুজনে। জানিস তো, শরাবের দোস্তি বড় পাকা দোস্তি—'

সকলে সমস্বরে সায় দেয়, 'হাঁ-হাঁ—জরুর—'

'সাহেবের সঙ্গে দোস্তি হল। সাহেব বিলাইতের কিস্‌সা বলল, আমি মুলুকের কিস্‌সা শুনালাম। কথায় কথায় সাহেব বলল, 'সারা দুনিয়া আমি ঘুরেছি, বহুত বড় বড় নেশাড়ি দেখেছি। কালা আদমীরা নেশা করতে জানে না। দু বোতল টানলে চার রোজ খাটিয়া থেকে উঠতে পারে না।' আমি কালা আদমী। কথাটা শুনে দিলে বড় লাগল।'

'তার পর কি হল ?'

চারপাশ থেকে কয়েদীরা ঘন হয়ে এল।

'হুঁ-হুঁ—' দুই হাঁটুর মাথায় আঙুল দিয়ে তাল ঠোকে চাঁছা-মাথা কয়েদী। গর্দান দুলিয়ে বলে, 'বললাম, সাহেব বাজি ধর ; তুমি কিতনা বড় এংরাজবালা শরাবী আর আমি কিতনা বড় ফয়জাবাদী শরাবী, যাচাই হয়ে যাক। সাহেব বলল, অলরাইট। বাজি কি হবে ? শরাব খেতে খেতে যার আঁখ আগে লাল হয়ে যাবে, সে নাঙ্গা (উলঙ্গ) হয়ে কাপড়াকুর্তা মাথায় বেঁধে ঘরে যাবে।'

'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা—'

এক কয়েদী বলল, 'তুই তো সাধুর দলে ছিলি। বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের

নীচে তোদের আস্তানা ছিল। তুই কেমন করে ফয়জাবাদী শরাবী হলি ?'

'আ বে শালে, আমি সাধুবাবা, তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়াই। যখন যেখানে থাকি, তখন সেটাই আমার মুলুক। সাধুর দল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেবার ফয়জাবাদে গিয়েছিলুম। ফয়জাবাদই তখন আমার মুলুক।'

'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা—'

কয়েদীরা হল্লা করে উঠল।

'শোন শালেরা, শোন। চিল্লাস না। পেটি অফিসার এলে হাড্ডি চুর চুর করে দেবে।' চাঁছা-মাথা সস্নেহে বলতে থাকে, 'তারপর শরাব গেলা শুরু হল। দারু গেলার জন্যে যারা দোকানে এসেছিল, মজা দেখার জন্যে আমাদের ঘিরে ধরল। শরাব গেলার লড়াই বাঁধল সাদা আদমী আর কালা আদমীতে। এক বোতল গেল, দু বোতল গেল, তিসরা বোতলে সাহেব বেসামাল হয়ে পড়ল। নেশার আরামে আঁখ বুঁজে এসেছিল। শরাবীদের চিল্লানিতে তাকালাম, সাহেবের আঁখ টকটকে লাল। সাহেব দেখল, আমার আঁখ সাদা, সাফ—'

'তারপর কি হল ?'

কয়েদীরা আবার হল্লা বাধায়।

'কি আবার হবে। কুর্তা প্যাণ্ট মাথায় বেঁধে সাহেব সেই রাতেই ফয়জাবাদ ছেড়ে কোথায় গেল, রামজী মালুম।'

চাঁছা-মাথাকে ঘিরে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে কয়েদীরা তার গল্পের তারিফ করে।

চাঁছা-মাথা বিমর্ষ গলায় বলে, 'এংরাজবালাকে শরাবে কাবু করলাম। লেকিন কালাপানি এসে এক ফোঁটা দারু পড়ছে না গলায়। চারিপাশে দরিয়ায় এত পানি ; আমার তিয়াসই খালি মিটছে না।'

আর এক পাশে আর এক কয়েদী বলছে, 'খুদার যদি আর একটু মগজ থাকত, তা হলে দুনিয়ায় খুনখারাপি কিছুই থাকত না। দুনিয়ায় আওরত বড় কম। খুদা যদি আরো মেয়েমানুষ পয়দা করত ! মেয়েমানুষ নিয়েই যত গণ্ডগোল ; বুঝলি মুরুখ—'

কিন্তু কয়েদীটা হো হো করে হাসে। স্বয়ং খুদার উপর খুদকারি করেই তার যত উল্লাস।

মনটা মজুত নেই লখাইর। কয়েদীরা হরেক রকমের কিস্সায় মশগুল হয়ে রয়েছে। লখাই তাদের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা সেণ্ট্রাল টাওয়ারের চূড়ায় সাগরপাখিটার দিকে চেয়ে থাকে।

"D" টিকিট মার্কা কয়েদীরা গারদখানার ঘাস এবং আগাছা নির্মূল করছে। কেউ কেউ বা ইমারত ধুয়ে সাফ করছে। অন্যমনস্ক, লক্ষ্যহীন গতিতে মাঝে মাঝে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় লখাই। আবার কয়েদখানার এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত একা একাই হাঁটে। আন্দামান এসে একটা অদৃশ্য নতুন মন পেয়েছিল লখাই। যে মন ভাবে, যে মন ভাবতে ভাবতে বিরাট শরীরের শিরা স্নায়ু এবং বোধগুলিকে বিকল করে দেয়, সেই মন। আশ্চর্য, সেই মনটা এখন একেবারেই ফাঁকা, শূন্য। সে মন কোন ক্রিয়াই করছে না।

কয়েদীদের জটলাতেও মন বসে না লখাইর। সেই এক পুরাণ কেচ্ছা—আওরত, নেশা, খিস্তিখেউড়। কালাপানির কয়েদখানায় নারী এবং নেশা মেলে না। কিন্তু আওরত এবং শরাবের কল্পনায় বিভোর কয়েদীদের মুখে এবং দিলে কুৎসিত অশ্লীল রস গেঁজে ওঠে। নারীসঙ্গহীন, নেশাহীন নিরুৎসব বন্দীজীবনে নারী আর নেশার বীভৎস কেচ্ছা তর্বিয়ত করে বলেই যেন সুখ পায় তারা। সেলুলার জেলের আদিকাল থেকে এই সব কেচ্ছার ঢালা স্রোত বয়ে চলেছে। যতকাল এর অস্তিত্ব থাকবে, এই স্রোতও চলবে। মুহূর্তকালের জন্য থামবে না।

লখাইর কি যে হয়েছে! কিছুই ভাল লাগে না। নারী নেশা, এই পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

রোদের রঙ বদলে যাচ্ছে। দরিয়ার রোদ—তীক্ষ্ণ, ধারাল, জ্বালাময়। সেলুলার জেলের বিরাট বিরাট ইমারত ছাপিয়ে সেই রোদ কয়েদীদের জটলাগুলির উপর এসে পড়েছে। এখন কত বেলা, কে জানে।

হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল মানুষটা।

'ম্যয় আ গ্যয়া—আজ সেই ছুটির দিন। ইয়াদ আছে শালেদের।'

কয়েদীদের মশগুল আসরগুলো চমকে উঠল। সবাই দেখল, ওয়ার্কশপের

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ এক চেহারা। পীরজাদা মৌলানা জাজিরুদ্দিন হাজী।

জাজিরুদ্দিন চিল্লায়, 'কি রে শালে লোক, সেদিন যে কিতাবগুলো দিয়েছিলাম, পড়েছিস?'

সকলে সমস্বরে সায় দেয়, 'জরুর।'

'কেমন লাগল?'

'বহুত আচ্ছা।'

জাজিরুদ্দিন এবার গম্ভীর হয়ে বয়েৎ আওড়ায়, 'তোরা সব ইসলামী বনে যা। মুছলমান হলে আল্লার দুআয় কোন ঝামেলা থাকবে না, দুখ থাকবে না, বহুত সুখ হবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ফাঁসীর কয়েদীদের যে তিনটে সেলে রাখা হয়, সেদিকে চলে গিয়েছিল লখাই। জাজিরুদ্দিনের গলার আওয়াজ পেয়ে গুটি গুটি ওয়ার্কশপের সামনে এসে দাঁড়াল।

লখাইকে দেখে জাজিরুদ্দিন বয়েৎ থামাল। ডাকল, 'এই লখাই, এদিকে আয়—'

লখাই দেখল, জাজিরুদ্দিনের দু পাশে তোরাব আলী আর ভিখন আহীর ঘুর ঘুর করছে।

কাছাকাছি আসতেই লখাইর একটা হাত পাকড়াল জাজিরুদ্দিন। দু পাটি দাঁতে ঝিলিক হেনে হাসল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঘন দাড়িতে পেখম মেলল।

জাজিরুদ্দিন বলল, 'কিতাব দুটো পড়েছিস লখাই?'

'কোন কিতাব?'

'শিবকা সাথ মুহম্মদের লড়াই', 'আলীকা সাথ হনুমানকা যুদ্ধ', আর 'সোনাভান বিবিকো কিসসা।' তিন কিতাবই মজাদার।'

'পড়েছি। বহুত খারাপ।'

'বহুত খারাপ!'

চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল জাজিরুদ্দিনের। হাতের থাবায় এবং দাঁতে হত্যা যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। জাজিরুদ্দিন গর্জায়, 'জান তোর শেষ করে ফেলব হারামীর বাচ্চা—'

এক ঝটকায় জাজিরুদ্দিনের থাবা থেকে হাতটা ছুটিয়ে নেয় লখাই। বলে,

'তোর মত জানলেনেবালা আমি অনেক দেখেছি রে কুত্তীর বাচ্চা। শালা, বড় মরদ এয়েছে! মুহম্মদ কুনো কালে শিবের সঙ্গে লড়ে পারে, না আলী পারে হনুমানের সঙ্গে! কিতাব পড়েছিস উল্লু! শিব আর হনুমান কত বড় জোয়ান, তুই বুঝবি কি রে নালায়েক বুদ্ধু। এ্যায়সা কোতকা হাঁকবো!'

জাজিরুদ্দিন কিছুই বলল না। একদৃষ্টে লখাইর দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখজোড়া একটু একটু করে ক্রূর, ভয়ানক হয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, যে কোন মুহূর্তে সে লখাইর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; তাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবে।

জাজিরুদ্দিনের চোখে চোখ রেখে সন্তর্পণে দু পা পিছু হটল লখাই। বলল, 'জানিস শালে, শিব দক্ষযজ্ঞ করেছিল, হনুমান গন্ধমাদন মাথায় তুলেছিল। শিব আর হনুমান কত বড় মরদ, তুই শালে পাঠানবালা কি বুঝবি!'

জাজিরুদ্দিনের মত দুর্দান্ত ভাগোয়া কয়েদীকে পরোয়া করে না যে লখাই, তার সম্বন্ধে বিস্ময়ে ভয়ে তাজ্জব বনে গিয়েছে নয়া কয়েদীরা। কেউ এতটুকু শব্দ পর্যন্ত করছে না।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল।

কয়েদীদের জটলায় একজোড়া গোলাকার চোখ ধকধক করছিল। নির্মম চোখ দুটো থেকে হিংস্রতা ক্রূরতা ঠিকরে পড়ছিল। চোখজোড়া সেই চাঁছা-মাথা কয়েদীর। নাম তার বিরসা। আশ্চর্য! একটু আগেই তরিবৎ করে রসিয়ে রসিয়ে সে শরাবের কেচ্ছা করছিল।

আচমকা লাফিয়ে উঠে পড়ল বিরসা। হুঙ্কার ছাড়লো, 'মারো শালে জাজিরুদ্দিনকো। মার ডালো। শালে হিন্দুলোগদের ধরে ধরে ইসলামী বানাচ্ছে।'

বিরসার বাঁ চোখের নীচে গভীর ক্ষতচিহ্ন। তাকালেই মনে হয়, চোখটা ভীষণ ভঙ্গিতে কুঁচকে রয়েছে।

বিরসা ধাঁ করে ছুটে এল। জাজিরুদ্দিনের গলাটা দুই থাবায় আঁকড়ে ধরল। তার ভাঙা-ভাঙা ধারাল নখগুলি জাজিরুদ্দিনের মাংসল গর্দানে গিঁথে যেতে লাগল।

গলনালীর মধ্য দিয়ে পিষ্ট, কুণ্ডলিত, অস্ফুট একটা গোঙানি ছুটে এল জাজিরুদ্দিনের। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হল।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেতে পারত। কিন্তু তার আগেই বিরসা আর

[illegible] মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিখন আহীর। বিরসার খাড়া চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুষা বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে [illegible] গর্দান থেকে বিরসার থাবাটা খসে গেল।

একটু ধাতস্থ হয়ে বিরসার দিকে তাকাল পীরজাদা জাজিরুদ্দিন। দৃষ্টিটা কুটিল, ভীষণ, জিঘাংসু হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ হচ্ছে। মজবুত, কঠিন শরীরটা থরথর কাঁপছে। এই মুহূর্তে তার প্রতিশোধ চাই। নিষ্ঠুর, সাঙ্ঘাতিক প্রতিশোধ।

এক পা দুই পা করে বিরসার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল জাজিরুদ্দিন। বিরসার নখের খোঁচায় গর্দান থেকে খুন ঝরছে, চামড়া ছিঁড়ে জ্বলছে। সেদিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই তার।

বিরসা নামে কয়েদীটির একটা বিচিত্র অতীত আছে।

বিশ রোজ আগে লখাইদের সঙ্গে এলফিনস্টোন জাহাজে সে আন্দামান এসেছে। এই বিশ রোজের পিছনে আছে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জিন্দগীর কথা।

বিরসা যখন ক্রূর, ভয়ানক হয়ে ওঠে, তখন সমস্ত মুখে বাঁ চোখের গভীর ক্ষতচিহ্নটি ছাড়া আর কোন রেখা পড়ে না। সেই নিরেখ কঠিন মুখে কোথায় যেন চল্লিশ বছরের নিরেট, সাঙ্ঘাতিক ইতিহাসটা ফুটে বের হয়।

জন্ম তার কোথায়, নাসিকে না অমরকোটে, আজ আর মনে নেই বিরসার। সেটা তার জিন্দগীর বিস্মৃত, অবলুপ্ত অধ্যায়।

জিন্দগীর প্রথম যে অংশটা মনে পড়ে, তখন বিরসার বয়স সাত আট বছর।

ইলাহাবাদ প্রয়াগের চারপাশে গাঁওয়ে গাঁওয়ে, শহরে শহরে, কখনও বা ঘন জঙ্গলে ভান্তুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত বিরসা।

ভান্তুরা উত্তর প্রদেশের এক বিচিত্র জাতের মানুষ। এরা রাজপুতদের বংশধর। এদের রক্তে আদিপুরুষের বীরত্ব আছে, শৌর্য আছে। কিন্তু জাতি এবং মাটি হারিয়ে ভান্তুরা এখন যাযাবর। শহরে শহরে, গাঁওয়ে গাঁওয়ে কয়েকদিনের জন্ম তারা তাঁবু ফেলে। কয়েকদিনের স্থিতির সাক্ষ্য হিসাবে পোড়া উনুন, হাঁড়ি, দু এক টুকরা চাপাটি রেখে আবার নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

খুনখারাপি, রাহাজানি, লুঠপাট ভান্তুদের পেশা।

এই ভান্তুদের সঙ্গে ঘুরত বিরসা। যাযাবর ভান্তুরা যেখানে যেখানে তাঁবু ফেলত, সেখানে সেখানে সে-ও আশ্রয় পেত। দু চার টুকরা চাপাটি পেত। বাপ-মা'র খবর জানে না বিরসা। এত বড় আসমানের নীচে, এত বড় দুনিয়ায় কোন মানুষটার সঙ্গে যে তার রক্তের সম্বন্ধ আছে, তা-ও তার অজানা। শুধু মনে আছে, ভান্তুদের সঙ্গে তার দু চার টুকরা চাপাটি আর মাথা গোঁজার সামান্য আশ্রয় ছাড়া আর কোন সম্পর্কই নেই। ভান্তুরা তার জাতি গোত্র বা রক্তের কেউ না। কেমন করে এ সব খবর জানল, তা-ও জানে না বিরসা। কেমন করে ভান্তুদের দলে জুটেছিল, তা-ও আজ মনে নেই।

ভান্তুদের দল থেকে আর্য সমাজী সাধুদের পাল্লায় গিয়ে পড়ল বিরসা।

সেবার লক্ষ্ণৌ শহরের কাছে তাঁবু ফেলেছে ভান্তুরা। একটু দূরে টিলার মাথায় একদল সাধুও আস্তানা গেঁড়েছে। গাঁজা পুড়ছে, ঘিউ চাপাটি বানানো হচ্ছে, আর মাঝে মাঝে হল্লা উঠছে, 'হর হর, ব্যোম ব্যোম—'

তিন রোজ ভান্তুদের তাঁবুতে খানা জোটে নি বিরসার। দু চোখে আন্ধার দেখতে দেখতে সাধুদের আস্তানায় এসেছিল সে।

সাধুরা ঘিউ চাপাটি দিল, সীতাফল ভাজি দিল। এমন চাপাটি আর ভাজি কোন কালে খায় নি বিরসা।

দু রোজ সাধুরা টিলার মাথায় ছিল। এই দু রোজ তাদের সঙ্গ ছাড়ে নি বিরসা, ভান্তুদের তাঁবুর দিকেও যায় নি। জন্ম থেকে এই আট দশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন দিন তার ভর-পেট খানা জুটেছে কি না, বিরসা মনে করতে পারে না।

দু রোজ বাদেই সাধুরা লোটা কম্বল, তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওনা হল। তারা হাঁটাপথে বিন্ধ্যাচল যাবে।

সাধুরা বলল, 'যাওগে বেটা?'

বিরসা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করল।

সাধন মার্গের লোভে নয়, শুধু মাত্র চাপাটি ভাজির টানে ভান্তুদের ছেড়ে দশ বছরের বিরসা সাধুদের সঙ্গ নিল। নিজের অজান্তেই এক জীবন থেকে আর এক জীবনে জুটে গেল। লক্ষ্ণৌ থেকে বিন্ধ্যাচল। এক পথ থেকে এক পথ।

হাঁটা পথে বিন্ধ্যাচল পৌঁছতে কতদিন লেগেছিল, আজ আর মনে নেই বিরসার। শুধু মনে আছে, বিরাট পাহাড়ের নীচে তারা আস্তানা গাঁড়ল। যথারীতি তিনখানা ইঁট সাজিয়ে চাপাটি পুড়িয়ে ঘিউ মাখানো শুরু হল। গাঁজা পুড়তে লাগল। বোঁটকা, তীব্র ধোঁয়ায় বিন্ধ্যাচলের পাহাড়গুলির শ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

এর মধ্যেই একদিন বিরসার দীক্ষা হয়ে গেল।

বড় সাধুবাবাই কানমন্ত্র দিলেন।

কিসের একটা যোগ যেন ছিল সেদিন। সাধুদের আস্তানার পাশেই ছোট পাহাড়ী নদী। সকাল থেকে দলে দলে মানুষের ভিড় লেগেছে।

সূর্য ওঠার আগে মহালয়ে নদী থেকে একটা ডুব দিয়ে এল বিরসা। চেলা বাবারা তার সারা গায়ে ভস্ম মাখালো। তিন টুকরা হলুদে ছোপানো নয়া কাপড় আনা হল। এক টুকরায় কৌপীন হল ; এক টুকরা হল উত্তরীয় ; এক টুকরা দিয়ে চোখ বাঁধা হল।

জিভ ফুঁড়িয়ে লোহার শলা ঢোকান হল। রীতি অনুযায়ী একমাস মৌনীবাবা সেজে থাকতে হবে।

বড় সাধুবাবা কাপড়-বাঁধা কানে ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়লেন। চেলা বাবারা চেঁচিয়ে উঠল, 'হর হর, ব্যোম ব্যোম—'

বিরসা বালক সাধু হয়ে গেল।

একে একে দিন গেল, মাস গেল, বছর ঘুরল। বিরসা জোয়ান হল। আঠা মাখিয়ে চুলে জটা ধরানো হল। গোঁফ দাড়ি বেরুল। একসময় একটা দুটো করে সেই দাড়িগোঁফে পাকও ধরতে লাগল।

বিন্ধ্যাচলের এই অংশটা নির্জন। নির্জন হলেও লোকালয় থেকে খুব দূরে নয়। পাহাড়ী নদীটার ওপারে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা গাঁও-ক্ষেতিবাড়ি এবং অড়হরের ক্ষেত। গাঁও-ক্ষেতবাড়ি পেরিয়ে বড় একটা শহরও নাকি মেলে। সেখানে বড় বড় শেঠেদের গদী আছে।

ক্রমে ক্রমে বিরসা জেনেছে, বিন্ধ্যাচলের এই পাহাড় যেমন আস্তানা দিয়েছে, তেমন খানা যোগাচ্ছে শহরের সেই বড় বড় শেঠেরা।

শেঠেদের পাঠানো আটা ঘিউ মরিচ লবণ দিয়ে এতগুলি সাধু জীবাত্মা বাঁচিয়ে মহাত্মা বনে পরমাত্মার ধ্যান করে।

এমনি করেই দিন চলত। কিন্তু পাহাড়তলিতে আর একদল সাধু এল। নতুন সাধুরা উদাসী সম্প্রদায়ের।

শুধু গাঁজা পোড়ানো চাপাটি পোড়ানোই নয়, [illegible] দলের অন্য কাজও ছিল। হিন্দু ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যারা অন্য ধর্মের পাল্লায় পড়েছে, তাদের আবার হিন্দু বানানোই ছিল আর্য সমাজীদের কাজ। এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত, যাগযজ্ঞ লেগেই ছিল বিন্ধ্যাচলের পাহাড়তলিতে।

সেটা ছিল শুক্লপক্ষের রাত।

চেলাবাবারা কোথা থেকে যেন দুটো মানুষকে ধরে আনল। একেবারে বড় সাধুবাবার সামনে হাজির করল। লোক দুটো আগে হিন্দুই ছিল, অভাবে খ্রীষ্টান হয়েছে।

যথারীতি যাগযজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে, শুদ্ধ করিয়ে তাদের আবার হিন্দু বানাবার কাজ চলছিল। এমন সময় উদাসী সম্প্রদায়ের সাধুরা বাধা দিল।

উদাসীদের বড় সাধুবাবা গর্জে উঠল, 'এ হবে না, খ্রীষ্টানের হিন্দু হবার অধিকার নেই।'

আর্য সমাজী সাধুবাবার বাজখাঁই স্বরে তেজ এতটুকু কম নয়, 'জরুর হবে। হিন্দু ধরম ছেড়ে অনেকে দুসরা ধরম নিয়েছে। তাদের আবার যদি হিন্দু না বানাই, একদিন এই জগৎসে হিন্দু ধরম লোপ পেয়ে যাবে।'

'লোপ পাক, তবু খ্রীষ্টান আর হিন্দু হবে না।'

'হবেই।'

এর পরেই উদাসী বাবাদের সঙ্গে আর্য সমাজীদের লড়াই বেধে গেল। বিন্ধ্যাচলের পাহাড়তলিতে পরমাত্মার সন্ধানী দুই দল নিরাসক্ত যোগী ত্রিশূল, লোটা, ডাণ্ডা হাতে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল।

শির ছেঁচল। কলিজা ফুঁড়ে ত্রিশূলের ফলা ওপিঠে বেরিয়ে গেল। খুন ছুটল। সাধুদের চিৎকারে আর্তনাদে খুনে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়তলি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

পরদিন এল পুলিস। দুই দলের অনেকেই জখম খতম হয়েছে। বাকী যারা জিন্দা ছিল, তাদের ধরে সদরে চালান দিল। বিরসাও সেই চালানী দলে ছিল। সদরে বিচার হল। তামাম জিন্দগীর সাজা নিয়ে কালাপানি পেরিয়ে আন্দামান এল সে।

এই হল বিরসার অতীত।

এক পা এক পা করে হিংস্র ভঙ্গিতে এগুচ্ছে জাজিরুদ্দিন। যে কোন মুহূর্তে সে বিরসার গর্দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বিরসাও তিন কদম পিছু হটে সতর্ক হয়ে রয়েছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে গর্জাচ্ছে, 'শালে, জিন্দগীভর যবন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ধরে ধরে হিন্দু বানালাম। আর শালে, আমার আঁখের সামনে তুই হিন্দুলোকদের ইসলামী বানাবি! তোর জান তুড়ব।'

দুই পা জোড়া করে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাক করছিল জাজিরুদ্দিন। দুই হাতে তার কোমরটা জাপটে ধরল ভিখন আহীর।

জাজিরুদ্দিন খেঁকিয়ে উঠল, 'এ শালে কুত্তীকা বাচ্চা—'

'জী, হাজী সাহিব!'

'আমার কোমর পাকড়ালি কেন হারামী? ঐ শালের জান না নিলে আমার খুন ঠাণ্ডা হবে না।'

সামনে থেকে বিরসা টিপ্পনী কাটল, 'তোর মাফিক জানলেনেবালা আমি বহুত দেখেছি রে জাজিরুদ্দিন! আয় না, কে কার জান নেয় দেখি!'

বিরসার গোলাকার চোখজোড়া স্থির হয়ে জ্বলছে।

কি হত বলা যায় না, মাঝখান থেকে এক কয়েদী উঠে দাঁড়াল। চেহারা নমুনা দেখে বুঝবার জো নেই, আদমীটা মালাবার না বেলুচ, মারাঠা না আসাম, কোন মুল্লুকের? বুঝবার জো নেই, আদমীটা হিন্দু না বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান না মুসলমান।

দুটো লম্বা লম্বা হাত দু দিকে বাড়িয়ে কয়েদীটা চেঁচাল, 'ঠার যা—'

তার স্বরে এমন কিছু রয়েছে, যাতে এগিয়ে আসতে আসতে জাজিরুদ্দি থমকে পড়ল। চারপাশের কয়েদীরা চমকে উঠল।

আজব কয়েদীটা বলল, 'শোন সবাই, আমি একটা কথা বলি।'

'কি কথা?'

চারপাশ থেকে কয়েদীরা ঘন হয়ে এল।

'বিরসা আর জাজিরুদ্দিন লড়াই করছে। জাজিরুদ্দিনের মতলব, ‹ সবাইকে ধরে ধরে ইসলামী বানায়। আর বিরসার মতলব, ও কারুবে ইসলামী হতে দেবে না। দু জনেরই মতলব আচ্ছা। লেকিন একটা কথা! চোখ দুটো চারপাশে চরকির মত ঘুরিয়ে আনল আজব কয়েদী। বলতে

লাগল, 'কথাটা হল, আসছে ছুটির রোজে বিরসা আর জাজিরুদ্দিনে লড়াই হবে। লড়াইতে কয়েদখানার সব কয়েদী থাকবে। জাজিরুদ্দিন হারলে তাকে হিন্দু বনতে হবে। আর বিরসা হারলে তাকে ইসলামী বনতে হবে। রাজীবাজী ?'

বিরসা বলল, 'রাজীবাজী।'

জাজিরুদ্দিন বলল, 'রাজীবাজী।'

চারপাশের কয়েদীরা হল্লা করে উঠল, 'রাজীবাজী।'

একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল লখাই, সব শুনল। আরও দেখল, ওয়ার্কশপের গা ঘেঁষে ভাণ্ডারার দিকে চলেছে জাজিরুদ্দিন। তার পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে ভিখন আহীর আর তোরাব আলি।

উনিশ

এখন কত রাত কে বলবে ?

আকাশে খণ্ড খণ্ড মৌসুমী মেঘ। মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে যেটুকু চাঁদের আলো আসছে, তাতে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপের কিছুই স্পষ্ট নয়। আকাশ, মেঘ আর ক্ষয়িত চাঁদের দিকে তাকিয়ে রাত্রির বয়স আন্দাজ করা মুশকিল।

সেলুলার কয়েদখানাটাকে অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কালের মত দেখাচ্ছে।

রাত বাড়ে। রাত গাঢ় হয়। ব্লকে ব্লকে কয়েদীদের কোন শব্দ পাওয়া যায় না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু নিদ নেই ওয়ার্ডারদের চোখে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে তারা চৌকি দিচ্ছে। সেলে সেলে উঁকি মেরে পরখ করছে, কোন কয়েদীর বদ মতলব আছে কি না ? কারো দিলে শিকলি কাটার শখ জেগেছে কিনা।

সপ্তাহের একমাত্র ছুটির দিনটা ফুরিয়ে গেল। দিনটা এসেছিল মন্থর, ক্লান্ত গতিতে, চলে গেল কালোয়াতী গানের দ্রুত একটা রেলার মত।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে শীত এবার বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। একটা কম্বল পেতে, আর একটা কম্বলে আগাপাশতলা মুড়ি দিয়েছে লখাই।

অনেকক্ষণ শুয়েছে লখাই, কিন্তু ঘুম আসছে না। কম্বলের রোঁয়াগুলো গায়ে বিঁধছে। অনেকক্ষণ ছটফট করল লখাই, এ-পাশ ও-পাশ করল। তবু ঘুম আসে না। কপালের দু পাশে দুটো রগ সমানে লাফায়।

আজ দরিয়া বুঝি উন্মাদ হয়ে উঠেছে। বিরাট বিরাট হালফা (ঢেউ) উঠছে। হালফার মুখে শাসানি নিয়ে সমুদ্র পাথুরে দেওয়ালে অবিরাম আছাড় খায়। নারকেল বনে ক্ষ্যাপা বাতাসের তাণ্ডব বাড়তেই থাকে।

হঠাৎ মনে পড়ল। রোজ রোজ সোনিয়া যাচ্ছে রস দ্বীপের সিকমেন-ডেরায় (হাসপাতালে)। ভিখন আহীর খবরটা জুটিয়ে এনেছিল। মনে পড়ল, শক্ত রকমের ব্যারাম বাধাতে না পারলে রস দ্বীপের সিকমেনডেরায় যাবার কোন সুযোগই মিলবে না। সেলুলার কয়েদখানার ডাক্তার সাহেবরাই দাওয়াই দিয়ে রোগ সারিয়ে দেবে।

ব্যারাম বাধাবার বন্দোবস্তও করেছে ভিখন আহীরই। দু দিন ধরে

সন্তানে পিনিক খুসিয়ে যাচ্ছে। আজও বিকালে খানিকটা পিনিক দিয়ে গিয়েছে। পিনিক লখাইর খাতে সয় না। পিনিক বেশি পরিমাণ ফুঁকলে লখাইর পেট ফোলে, মুখের মধ্যে ঘা হয়, দম বন্ধ হয়ে জান খতম হবার দাখিল হয়।

কম্বলটা গুটিয়ে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল লখাই। ভাবল, সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। পুরা একটা রাত ঝড়ের দরিয়ায় যে সাথী হয়েছিল, তাকে এত সহজে ভোলা যায় না। শক্ত রকমের একটা ব্যারাম বাধাতেই হবে।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হল। যে কম্বলটা পাতা রয়েছে, সেটার ভাঁজে পিনিক আর তামাকপাতা লুকিয়ে রেখেছিল লখাই। পিনিকটা তামাক-পাতার ঠোঙায় পুরে সেলের গরাদের কাছে এসে দাঁড়াল। ভিতর থেকে যতদূর দেখা যায়, নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। না, ওয়ার্ডারকে দেখা যাচ্ছে না।

এবার ধীরে-সুস্থে কম্বলটার উপর এসে বসল লখাই। তরিবত করে তামাকপাতায় পিনিক পুরে আগুন ধরাল। তারপর জুতসই এক টান দিল। টানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মাথার খুলিটা চড়াৎ করে চার ফাঁক হয়ে গিয়েছে। দু চোখে শীতের অন্ধকার রাত্রিটা আরো অন্ধকার হয়ে গেল। গলার মধ্য দিয়ে অসহ্য, তীব্র ধোঁয়ার স্রোত কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে নীচের দিকে নামতে লাগল। মুহূর্তে সমস্ত শরীরটাকে বিকল করে দিল।

শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। এই অবস্থায় পিনিকে আবার টান মারল লখাই। আবার, বার বার। এক সময় দম বন্ধ হয়ে ঢলে পড়ল। কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। প্রাণান্তকর নেশা তাকে গ্রাস করল।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল, খেয়াল নেই লখাইর। ততক্ষণে মৌসুমী মেঘগুলি পশ্চিম আকাশে অনেকদূর পাড়ি দিয়েছে। মরা-মরা বিবর্ণ আলো এখন উজ্জ্বল হয়েছে।

লখাইর মনে হল, খুলি ফাটিয়ে মগজটা ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অসহ্য এক যন্ত্রণায় জিভ, চোয়াল, গলা অসাড় হয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে সেই তীব্র, ভীষণ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এত বাতাস; তবু লখাইর মনে হল, শ্বাস নেবার মত পর্যাপ্ত নয়।

চোখ মেলেই লখাই দেখল, গরাদের উপর একটা মুখ ঝুঁকে রয়েছে। মুখটা গরাদের ফাঁক দিয়ে অনেকটা ঢুকে পড়েছে। ওয়ার্ডার মোহর গাজী।

মোহর গাজী ডাকল, 'লখাই, এ লখাই—'

লখাই আস্তে জবাব দিল, 'হাঁ—'

গরাদের মধ্যে নাকটা ঢুকিয়ে বাতাস টেনে টেনে কিসের যেন গন্ধ নেয় মোহর গাজী। আবার ডাকে, 'লখাই ভেইয়া—'

'জী—'

'ইধর আয়।'

টলতে টলতে দেওয়াল ধরে ধরে গরাদের সামনে এল লখাই। মোহর গাজীর মুখোমুখি দাঁড়াল।

মোহর গাজী বলল, 'কতক্ষণ ডাকছি, শালে শুনতে পাচ্ছিস না ?'

'ঘুম এসেছিল।'

'হারামী, তোর ঘুম এসেছিল !'

চোখ দুটো ঝিক করে জলে উঠল ওয়ার্ডার মোহর গাজীর। স্বরটাকে ঝুপ করে খাদে নামিয়ে ফেলল সে, 'আমার নাককে তুই ফাঁকি মারবি ?'

অনেকক্ষণ তেমনি জলন্ত চোখে একদৃষ্টে লখাইর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মোহর গাজী। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'খুদা আমাকে আর কিছু দেয় নি লখাই, লেকিন নাকটা ঠিক দিয়েছে। এই শালে নাক ঠিক বলে দিতে পারে, কোথায় কি হচ্ছে ? কোথায় লাস পচল, কোথায় খুন গিরল, কোথায় কে দারু গিলল ! এই নাকের বহুত তাগদ !'

গরাদের ফাঁক দিয়ে দু হাত ঢুকিয়ে লখাইর গলাটা চেপে ধরল মোহর গাজী। বলল, 'বল শালে, একটু আগে পিনিক ফুঁকছিলি না ? ওয়ার্ডের ও মাথা থেকে ঠিক টের পেলাম।'

রীতিমত ভয় পেয়েছে লখাই। করুণ, কাতর স্বরে বলল, 'হাঁ ওয়ার্ডারজী।'

'জানিস নালায়েক বুদ্ধু, জেলার সাহিব টের পেলে বাপের শাদী, মায়ের নিকাহ্ একসাথ দেখিয়ে দেবে।'

লখাই জবাব দিল না। শঙ্কিত, ভয়াতুর দৃষ্টিতে ওয়ার্ডারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'হারামী, তুই বঙ্গালী হামি ভি বঙ্গালী, তাই ছেড়ে দিলুম। দুসরা

কয়েদী হলে জান ভুড়ে দিতুম। মনে রাখিস, এ্যায়সা বেআইনি কাম কয়েদখানায় কভী করবি না। মনে থাকবে?'

প্রশ্রয় পেয়ে লখাই বলে, 'নিঘ্‌ঘাৎ মনে থাকবে।'

এবার গরাদের ফাঁক থেকে মুখটা বের করে এদিক সেদিক ভাল করে দেখে নিল মোহর গাজী। নিঃসন্দেহ হয়ে ফিসফিস গলায় বলল, 'আর পিনিক আছে, না ফুঁকে মেরে দিয়েছিস?'

'আছে ওয়ার্ডার দাদা, টানবে?'

'হাঁ বুদ্ধু, জলদি আন।'

আধপোড়া পিনিকে আগুন ধরিয়ে আবার গরাদের সামনে এল লখাই। মোহরের ছুই ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে বলল, 'টান, কষে টান মার।'

তবিয়ত করে পর পর গোটাকতক টান মারল মোহর। মুখ বুঁজে পিনিকের ধোঁয়া প্রাণান্তকর প্রয়াসে চেপে চেপে গলনালীর মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নামাতে লাগল। চোখ ছুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। পিনিক জীর্ণ করে ছুই নাকের মধ্য দিয়ে ছুটো পাণ্ডুর ধোঁয়ার রেখা বের করে দিল মোহর। মুখে তৃপ্তির ছাপ পড়ল। বলল, 'আঃ, এমন পিনিক বহুত দিন ফুঁকি নি।'

পিনিকের নেশায় মাথাটা অল্প অল্প টলছে মোহরের। আবছা চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়, চোখ ছুটো টকটকে লাল। জড়ানো জড়ানো গাঢ় স্বরে মোহর আবার বলল, 'পিনিকের ধোঁয়া মগজে ঢুকলে তার কথাটা মনে পড়ে যায় রে লখাই। এতদিনেও যে তাকে ভুলতে পারলাম না!'

আগ্রহে গরাদের কাছে ঘন হয়ে আসে লখাই। বলে, 'কার কথা বলছ ওয়ার্ডার দাদা?'

'দাঁড়া একটু। কয়েদীগুলোকে দেখে আসি। কোন শালার মাথায় কি মতলব ঘুরছে খুদ খুদাও জানে না।'

সেলে সেলে উঁকি মেরে একবার ঘুরে এল মোহর গাজী। এখন সে একেবারে অন্য মানুষ। মোহর বলল, 'একটা গান শুনবি লখাই?'

লখাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পিনিক টেনে ওয়ার্ডারের হল কি!

লখাইর জবাব শোনার বিন্দুমাত্র গরজ নেই। ছুনিয়ার কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। গুনগুন করে ওয়ার্ডার গান ধরল।

> 'মন রে আর ধর্ব মানে না,
> দিল রে আর ধর্ব মানে না।

চাটগাঁ ছাড়াইল মোরে পরীজান সোনা।
পরীজান রাস্তা দিয়া যায়,
ফির ফির তার শাড়ির আকল (আঁচল) বাতাসে উড়ায়।
তার চক্ষের বিজলী মন করে দেবালা।'

একটু থামে মোহর গাজী।

লখাই বলে, 'তারপর ?'

মোহর আবার গায়।

'পরীজানের শাড়ির জবর উম,
বুকত জড়াইলে বুক জুড়ায়, চোখত আসে ঘুম।'
আর ঠোঁটের কথা হুনলে (শুনলে) পরাণ মূরছনা।
পরীজানের মাথায় কালো চুল।
য্যান মেঘের পিছে হাজার পদ্দীপ করে জুল জুল।
তার চোখ ডাকে ইশারায়, হাত করে মানা।
তার হাতত বাজু, পায়ত জোড়া মল।
আর বুকত দরদ, মুখত (মুখে) করে ছল।
ও আমার পরীজান সোনা—আ-আ-আ—'

গান থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তার রেশটা অন্ধকার রাত্রির সেলুলার জেলের দেওয়ালে দেওয়ালে হাহাকারের মত মাথা কুটে মরছে।

কেউ কথা বলছে না। লখাইও না, মোহরও না। নিস্তব্ধ কয়েদখানা আরো নিঝুম হয়ে গিয়েছে। দূর থেকে বঙ্গোপসাগরের গর্জন আর নারকেল বনে বাতাসের মাতামাতি ছাড়া এই দ্বীপে আর কোন শব্দ নেই। কয়েদখানার স্তব্ধতা আর দরিয়ার গর্জন মোহর গাজীর গানের সেই হাহাকারটাকে গভীর স্পর্শময় করে তুলেছে। হাহাকারটা যেন দুটো প্রাণীকে চারপাশ থেকে একটু একটু করে ঘিরে ধরছে।

লখাই-ই প্রথম কথা বলল, 'ওয়ার্ডার দাদা—'

'হুঁ—'

তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিল মোহর গাজী। লখাইর ডাকে ধড়মড় করে উঠল, 'হাঁ, কি বলছিস রে লখাই ?'

'তুমি সেদিন বলেছিলে, বাঙলা বুলি ভুলে গেছ। পাঠান পাঞ্জাবী

টিওালরা পিটিয়ে পিটিয়ে বাঙলা বুলি ভুলিয়ে দিয়েছে! তবে কেমন করে বাঙলা গীত গাইলে ?'

'খুব তাজ্জব বনে গিয়েছিস লখাই! তাই না রে ?' বিচিত্র গলায় মোহর গাজী বলল, 'সব ভুলে গেছি লখাই, বুলি ভুলেছি, গাঁও-মুলুক, বাপ-মা, সবার কথা ভুলেছি। লেকিন এই গানটা ভুলি নি।'

'কেন ?'

'গানে পরীজান বিবির কথা আছে যে।'

'পরীজান বিবি কে ?'

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল মোহর, 'পরীজানকে দিয়ে তোর দরকার কি ? শালে নালায়েক হারামী।' বলেই চুপ করে গেল।

লখাই এই অদ্ভুত, রহস্যময় মানুষটার কূল-কিনারা পায় না। হতবাক হয়ে সে মোহরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মোহরের সঙ্গে প্রতি রাত্রেই দেখা হয়, বাতচিত হয়, দু চারটে দিলের কথাও হয়। কিন্তু এই মোহরকে সে চেনে না। এই মোহর, যার দৃষ্টি উদভ্রান্ত, স্থির, যার চোখের সামনে এখন এই দুনিয়ার কিছুই নেই ; কোন এক পরীজান বিবির ধ্যানে যার কাছে এখন দুনিয়ার সব কিছু অবলুপ্ত।

অনেকক্ষণ পর ঘোর ঘোর ভাবটা কাটল মোহরের। বুকটা চৌচির করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধরা গলায় সে বলল, 'দিলটা যেন কেমন করে উঠল ; বুঝলি লখাই। পিনিকের ধোঁয়া মগজে ঢুকলে দিলটা যেন কেমন করে! পুরাণা জমানার কথা মনে পড়ে। ছোড়্ শালে ও বাত।'

সব ঝেড়েঝুড়ে মুক্ত হয়ে গর্দান সিধা করে দাঁড়াল মোহর গাজী।

কেমন একটা জেদ চেপে গেল লখাইর। মোহরের দুটো হাত চেপে ধরে বলল, 'না না, কিছুতেই ছাড়ব না ওয়ার্ডার দাদা। তোমার মনে জ্বালা রয়েছে। পরীজান বিবির কথা কও। কইতেই হবে।'

লখাইর হাত থেকে নিজের হাতদুটো ছাড়াবার চেষ্টা করল না মোহর। ভিজা-ভিজা কেমন এক আবেগের স্বরে বলল, 'সব কথা তোকে বলব লখাই, দিলের মধ্যে বড় জ্বালা। বুকের মধ্যে পনর বরষের কথা জমে রয়েছে। সব বলব তোকে, লেকিন আজ না। আর একদিন বলব।'

একটু থামল মোহর। লখাই দেখল, মোহরের চোখজোড়া চিকচিক করছে।

গাঢ় অদ্ভুত স্বরে মোহর আবার শুরু করল, 'পরীজানের কথা ভাবার জন্তে কভী কভী আমি পিনিক ফুঁকি। লেকিন তুই কার জন্তে পিনিক ফুঁকিস? মুলুকে দিলজ্বালানেবালী কারুকে রেখে এসেছিস না কি?'

'আমি ফুঁকি সোনিয়ার জন্তে।'

'সোনিয়া কৌন?'

'আমার দিলজ্বালানেবালী এক কয়েদানী। একসাথ এক জাহাজে আমরা কালাপানি এসেছি।' লখাই বলল, 'তোমাকে দাদা বলেছি, বিশ্বাস করে একটা কথা বলব?'

'বল্।'

'বিশ্বাস নষ্ট কববে না তো!'

'না, খুদা কসম।'

'ওয়ার্ডার দাদা, সোনিয়াকে আমার চাই। রোজ রোজ সোনিয়া রস দ্বীপের সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) যায়। আমিও যাব। পুরা একটা রাত ঝড়ের দরিয়ায় তার সঙ্গে কাটিয়েছি। তাকে আমার চাই ওয়ার্ডার দাদা। সোনিয়াকে সিধা সাদীর কথা বলব।'

এবার মোহর গাজীকে খুব চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'সবই তো সমঝালাম, লেকিন তুই রস দ্বীপের সিকমেনডেরায় যাবি কেমন করে? ভারী বুখার না হলে তো কয়েদীলোক সেখানে যেতে পারে না!'

লখাই মিটিমিটি হাসে। বলে, 'ভারী বুখার আমার হবে।'

মোহর গাজী খেঁকিয়ে উঠল, 'তামাশা ছোড় শালে। ভারী বুখার হবে কেমন করে? সব অ্যায়সা অ্যায়সা!'

'পিনিক আমার সয় না ওয়ার্ডার দাদা। ভারী বুখারের জন্তে পিনিক ফুঁকছি। দু চার দিন বাদে দেখবে চিতায় ওঠার দাখিল হয়েছি।'

বিস্ময়ে তাজ্জব বনে গেল মোহর। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না। তারপরেই সে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস লখাই, সাবাস। আমি বলছি, খুদা তোকে দুয়া করবেই। সোনিয়াকে তুই পাবি। জরুর পাবি।'

গরাদের এপাশে ওপাশে দুটো মানুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল।

লখাই ওয়ার্ডার মোহর্ গাজীর দিলের তাপ পেল।

বিশ

পরের দিন সকালেই পিনিকের ক্রিয়া শুরু হল।

মাথার শক্ত খোলের ভিতর তরল মগজটা যেন ফুটছে। শিরায় শিরায় রক্ত ফুটছে; যে কোন মুহূর্তে চামড়া ফাঁসিয়ে ফিনকি দিয়ে ছুটবে। মুখটা অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে; হাঁ করতে ঢোক গিলতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। চোখ দুটো টকটকে লাল, রক্তাভ। পেটটা ফুলে উঠেছে।

শরীরের মধ্যে তাণ্ডব চলছে যেন।

সকাল হয়েছে অনেক আগেই।

এক ঝাঁক সিন্ধু শকুন রোদে সাঁতার কাটতে কাটতে সেলুলার জেলের মাথা টপকে উপসাগরের দিকে চলেছে। চেয়ে চেয়ে যতক্ষণ না পাখিগুলো দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে যায়, লখাই দেখল।

শরীরটা বিকল হয়েছে। কাজে আর মন বসে না।

সকালে কাঞ্জিপানি এনেছিল; খেতে ইচ্ছা হয় নি। খানাপিনার গরজটাই মরেছে। কুঠুরির মধ্যে লোহার বর্তনে সেই অপূর্ব স্বাদ গন্ধের থকথকে কাঞ্জি পড়ে রয়েছে।

কাঞ্জিপানি নেবার পর পেটি অফিসার নসিমুল গণির কাছ থেকে বস্তা ভরে ছোবড়া এনেছে লখাই।

ছোবড়া, মুগুর, ঝুরা চারপাশে ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। ছিলেকুটে সন্ধ্যার মধ্যে আড়াই পাউণ্ড ছোবড়ার তার বের করতে হবে। না হলে পেটি অফিসার হাড্ডি মাংস আলাদা করে ফেলবে। তবু কাজে উৎসাহ পেল না লখাই। চনমন চোখে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। বেজুত শরীর ছোবড়া ছিলতে চায় না।

ছ-টা সেলের পর গরাদ। গরাদের ওপাশ থেকে তীক্ষ্ণ, সরু একটা স্বর ভেসে এল, 'লখাই দাদা, এ লখাই দাদা—'

ঘাড় ঘুরিয়ে লখাই তাজ্জব বনে গেল। স্তূপাকার ছোবড়ার মধ্যে বসে রয়েছে ভিখন আহীর। তার পোড়া, বীভৎস মুখটা বড় কাচুমাচু দেখাচ্ছে। পেটি-অফিসার নসিমুল গণির হুআয় ছোবড়া ছিলাকোটার হাত থেকে রেহাই

পেয়েছিল ভিখন। এই কদিন সে কোপরার জন্ত নারকেল কেটেছে। ভিখনের মত তাকতদার কয়েদীর পক্ষে নারকেল কাটা কাজই নয়। লখাই ভেবেই পায় না, আবার কেন ভিখন ছোবড়া ছিলতে বসেছে!

লখাই বলে, 'কি রে ভিখন, আবার যে ছোবড়া ছিলতে এলি!'

প্রথমে ভিখন জবাব দেয় না।

লখাই আবার বলে, 'পেটি অফসারের সঙ্গে এত পেয়ার, এত দোস্তি মহব্বতি—সব ছুটে গেল!'

পোড়া কপালে চামড়া মাংস থুবড়ে থুবড়ে রয়েছে ভিখনের। হাত দিয়ে কপালটা দেখিয়ে সে বলে, 'সব নসীব রে দাদা, সব নসীব। বহুত মন্দ নসীব—'

বলতে বলতে কপাল চাপড়ায় ভিখন।

লখাই বলে, 'কেমন করে নসীবটা তোর মন্দ হল রে ভিখন? তুই না কইতি রুপেয়া থাকলে আন্দামানের কয়েদখানায় পেয়ার মেলে, মহব্বৎ মেলে! নসীব কেনা যায়!'

'সাচ্চা কথাই কইতাম রে লখাই দাদা।'

'তবে এমন হল কেন?'

গরাদের ফোকর গলে চট করে এদিকে চলে এল ভিখন আহীর। পোড়া, বীভৎস মুখটা লখাইর মুখের উপর ঝুঁকিয়ে দিল। লখাইর একটা হাত নিজের গলার কাছে এনে ভিখন বলল, 'গলাটা টিপে টিপে ছাখ্—'

বুঝতে না পেরে লখাই বলল, 'কি দেখব?'

'আরে ভেইয়া, তুই এ্যায়সা নালায়েক!' ভিখন আহীর পোড়া কপালটা আবার চাপড়ায়। বলে, 'দাদা রে তুই জানিস না, আমার গলার মধ্যে একটা চোরা থলি রয়েছে!'

'হাঁ হাঁ জানি।'

'কলকাত্তা থেকে আসার সময় থলিটায় রুপেয়া, সোনার একটা হার, ছুটো দামী পাথর এনেছিলাম। পেটি অফসার শালাকে রিসোয়াত (ঘুষ) দিয়ে ছোবড়া পেটা মকুব করেছিলাম; কোপ্‌রা কাটার কাজ পেয়েছিলাম। লেকিন নসীবটা আমার বড় নিমকহারাম। আমি পয়দা হলাম বলে যে নসীব পয়দা হতে পারল, সেই শালে আমার একটু আরামের বন্দোবস্ত করলে না।'

'হল কি ?'

'পেটি অফসার শালে আমার গলার থলিটার কথা টের পেয়ে গেল। কাল সন্ধ্যের সময় ডাণ্ডা মেরে মেরে আমার হাড্ডি চুরচুর করলে, গোস্ত আলগা করে দিলে ; তার পর গলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হারটা আর বাকী রুপেয়া নিলে। শালে, কুত্তীকা বাচ্চে—'

ভিখন আহীরের পোড়া, কদর্য মুখে একমাত্র চোখটা ঝিকঝিক করতে লাগল। বলতে বলতে কুর্তা খুলে পিঠটা দেখাল ভিখন। ডাণ্ডার ঘায়ে চামড়া মাংস থেঁতলে থেঁতলে খুন জমে রয়েছে।

ভিখন আবার বলল, 'পেটি অফসারের জানজমানা খতম করে দেব, তবে শালে আমি ভিখন আহীর।'

লখাই চুকচুক করে আপসোসের শব্দ করল।

ভিখন বলতেই থাকে, 'কাল শালে সোনার হার রুপেয়া, সব বাগালো। আর আজই ছোবড়া ছিলতে দিয়েছে। ছোবড়া ভিজাবার জন্যে একটু পানি ভি দিল না। অন্য অন্য রোজ দু ডাব্বা কাঞ্জিপানি দিত। আজ দিয়েছে এক ডাব্বা। লখাই দাদারে, ভুখ তাতে মরল না। এবার ভুখাই খতম হয়ে যাব।'

ভিখনের মুখ চোখ করুণ হয়ে উঠল।

হঠাৎ লখাই বলে, 'কাঞ্জিপানি খাবি ভিখন ?'

'কাঞ্জিপানি! কিধর ?'

ভিখনের একমাত্র চোখটা চকচক করে ; লোলুপ হয়ে ওঠে।

'আমার কুঠরিতে আছে ; বর্তনে। সকালে ভুখ ছিল না, তাই রেখে দিয়েছি। যা—'

লখাইর কথা শেষ হবার আগেই দৌড়ে কুঠুরি থেকে কাঞ্জিপানির বর্তনটা নিয়ে আসে ভিখন। নিমেষে থকথকে খাদ্যটুকু চেটেপুটে সাফ করে ফেলে।

একমাত্র চোখটায় কৃতজ্ঞতা ফোটে ভিখনের। সে বলে, 'কাঞ্জিটা খেয়ে জানটা বাঁচল। তুই দাদা আর জন্মে আমার বাপ ছিলি।'

অনেকটা সময় কাটে। শীতের রোদের তাপ বাড়ে, উপসাগরের গর্জন বাড়ে, নারকেল বনে বাতাসের মাতামাতি বাড়ে।

আচমকা লখাই ডাকে, 'আচ্ছা ভিখন—'

'হাঁ হাঁ ভেইয়া—'

ভিখন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। বলে, 'কি কইছিস ?'

'এখনও তুই বলবি, রূপেয়ার পেয়ার মহব্বৎ কেনা যায়!'

'জরুর; ও বাত একদম খাঁটি। রূপেয়া থাকলে সব মেলে, না থাকলে কুছু মেলে না। যত রোজ জিন্দা আছি, এ বাত আমার ঠিক থাকবে।'

লখাই জবাব দেয় না।

ভিখন উঠে পড়ে। গরাদের ফোকর পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ফিরে আসে। মুখটা লখাইয়ের কানে গুঁজে ফিসফিস স্বরে বলে, 'কাল যে পিনিক দিয়েছিলাম, ছুঁকেছিলি?'

লখাই ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

ভিখন বলে, 'ইয়াদ রাখিস, রোজ রোজ সোনিয়া রস দ্বীপের সিকমেন-জেরায় যাচ্ছে। তোকে শক্ত বুখার বাধাতে হবে। মনে রাখিস, চান্নু সিং সোনিয়াকে সাদী করার জন্যে পাগলা কুত্তার মত ঘুরছে।'

'সব মনে আছে। দু রোজের মধ্যে শক্ত ব্যারাম হবেই। আজ আরো পিনিক দিয়ে যাস।'

'আচ্ছা'

গরাদের ফোকরের দিকে যেতে যেতে ভিখন বিষাক্ত স্বরে বলল, 'এখন যাই রে লখাই দাদা, পেটি অফসার হারামী ছোবড়া ছিলতে না দেখলে "টিকটিকি'তে (বেত মারার স্ট্যাণ্ডে) চাপাবে। শালে—'

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে গরাদের ওপাশে চলে গেল ভিখন।

একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে লখাই দেখল।

বেলা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিনিকের উপসর্গগুলো সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠল। মাথার রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে; মুখের ভিতরে অসংখ্য ফোস্কা পড়েছে। শরীরটাকে আর খাড়া রাখতে পারছে না লখাই।

এখন দুপুর।

সকাল থেকে এ পর্যন্ত একটা ছোবড়াও ছেলে নি লখাই। ছিলতে পারে নি।

একটু পর খানাপিনার সময় হল।

দুদাড় করে সিঁড়ি কাঁপিয়ে কয়েদীরা নীচে ছুটেছে। টলতে টলতে লোহার বর্তন হাতে সকলের সঙ্গে নীচে নামল লখাই। খানা দেবার জন্য কানুন মাফিক লাইন দিয়ে বসল।

খানা, ডাল, ভাজি আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করল লখাই। খাওয়ার গরজ নেই, ইচ্ছাও নেই।

এ পাশে কাতার দিয়ে বসেছে হিন্দু কয়েদীরা, ও পাশে মুসলমান কয়েদীরা।

খানা নাড়তে নাড়তেই হঠাৎ লখাইর চোখে পড়ল, মুসলমান কয়েদীদের কাইলে জাজিরুদ্দিনের গা ঘেঁষে বসেছে ভিখন আহীর। তরিবৎ করে মুসলমান ভাণ্ডারার খানা খাচ্ছে।

লখাই তাজ্জব বনে গিয়েছে; অদ্ভুত এক আক্রোশে চোখদুটো তার জ্বলছে।

খানাদানার পর বর্তন ধুয়ে যখন উপরে যাচ্ছে ভিখন, লখাই চিৎকার করে ডাকল, 'এই শালে ভিখন, কুত্তার ছানা এদিকে আয়—'

তরতর করে নীচে নেমে এল ভিখন আহীর। পোড়া, বীভৎস মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ডাকছিস লখাই ভেইয়া—'

'হারামী তুই যে জাত দিলি; মুসলমান ভাণ্ডারার খানা খেলি যে!'

বিচিত্র স্বর ফুটল ভিখনের গলায়, 'কয়েদীর আবার জাত কি রে ভেইয়া! ও বাত ছোড়্; যদি জাতই বলিস, জাত দেবই বা না কেন? হিন্দু ভাণ্ডারা যে খানা দেয়, তাতে পেট ভরে না। জাজিরুদ্দিন বলেছিল, ইসলামী বনলে ডবল খানা মিলবে।'

বলতে বলতে মুখ চোখ করুণ হয়ে উঠল ভিখনের, 'পেটি অফসার সোনা রুপেয়া সব কেঁড়ে নিয়েছে। রুপেয়া না থাকলে জেয়াদা খানাও মেলে না। তাই ভেইয়া শ্রিফ্ পেটকো আস্তে শ্রিফ্ ভুখের জন্তে আমি ইসলামী বনলাম; জাত দিলাম।'

গলাটা ধরে গেল ভিখনের।

লখাই দেখল, শুধুমাত্র পেটের ভুখের জন্ত আন্দামানের এই নিদারুণ কয়েদখানায় মুসলমান হল ভিখন; জাত হারাল।

একুশ

জীবনের সীমানা বাড়ছে।

মানুষের পৃথিবী বাড়ছে।

কিন্তু জীবনের সীমানা কি মানুষের পৃথিবী একদিনে বাড়ে না।

প্রথমেই তো জন্ম! সেই জন্ম—আকাশ বাতাস, সমগ্র জৈব জগৎ—সমস্ত অস্তিত্বকে তোলপাড় করে যার গোড়াপত্তন। জন্মের পর স্থিতি—প্রতিকূল বিমুখ পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে যার টিকে থাকতে হয়। স্থিতির পর অজস্র সংগ্রামের মূল্যে বিস্তার। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

পৃথিবী এবং জীবনের জন্ম স্থিতি ও বিস্তার কি সহজ কথা!

বঙ্গোপসাগরের অগাধ অতল থেকে কবে যে আন্দামান দ্বীপমালা মাথা তুলেছিল, বন্দা নওয়াজ খান জানেন না। আন্দামানের জন্ম তিনি দেখেন নি, কিন্তু এখানকার উপনিবেশের জন্ম দেখেছেন।

সেই উপনিবেশ এখন বাড়ছে।

আঠার শ আটান্ন সালের চৌঠা মার্চ ডক্টর জে. পি. ওয়াকার সেই যে দু শ কয়েদী নিয়ে আন্দামান এসেছিলেন, নওয়াজ খান সে দলে ছিলেন।

সে দিন দক্ষিণ আন্দামান ছিল এক নিদারুণ আদিম পৃথিবী।

সে দিন দক্ষিণ আন্দামানের ছায়াগভীর অরণ্যে কিং কোব্রারা বিশাল ফণা দুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। বিষাক্ত, ভীষণ কানখাজুরার পাল শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরত; তাদের একটিমাত্র ছোবলে নিশ্চিত মৃত্যু। নিবিড় জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কালো কালো হিংস্র মুখ দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে যেত। খর্বকায় উলঙ্গ জারোয়াদের তীর ঝকমক করত। উপসাগরে হাঙর আর অক্টোপাস হানা দিত। উপকূল বেয়ে অতিকায় কচ্ছপের পাল উঠে আসত এই দ্বীপে। উপসাগরটা দুলত; আকাশের স্তূপাকার মেঘ ফেঁড়ে কড় কড় শব্দে বজ্র যখন ঝলসে উঠত, দুর্বার বেগে সমুদ্র যখন উপকূলের দিকে ছুটে

আসত, যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামত, তখন প্রকৃতি বিপর্যয়ে পৃথিবী এবং সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপ দুস্তর কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে মুহূর্তে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে উঠত।

সে সব দিনে দ্বীপের ভিজা ছায়াচ্ছন্ন মাটিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কিং কোব্রার সঙ্গে কচ্ছপের, গোয়েলেথ পাখির সঙ্গে কানখাজুরার, জারোয়াদের সঙ্গে হাঙর আর অক্টোপাসের নিরন্তর লড়াই। এই দ্বীপের জীব-জগৎ ক্রমাগত লড়াই করে আন্দামানের বর্বর মহিমা বাঁচিয়ে রাখত।

সেটা আঠারো শ আটান্ন সাল, আর এটা উনিশ শ এগার। মধ্যের তিপ্পান্ন বছরে কিং কোব্রা আর জারোয়া, কানখাজুরা আর গোয়েলেথ পাখির সেই ছায়া-শীতল ভয়ঙ্কর অরণ্যকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে, জংলী অসভ্য আদিবাসীদের উৎখাত করে শহর পোর্ট ব্লেয়ারের জন্ম হল।

মানুষের বর্বরতা এবং হিংস্রতার কাছে আদিম অরণ্য হার মানল। দক্ষিণ আন্দামানে উপনিবেশ জন্ম নিল।

তিপ্পান্নটা বছর ফুসফুসে বঙ্গোপসাগরের লোনা বাতাস টেনে টেনে, আর আন্দামান অরণ্যের বিনাশ দেখে দেখে একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বন্দা নওয়াজ খান। তাঁর মনে হয়, সকল সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বর্বরতা। বর্বরতা দিয়ে যার শুরু, শেষও তার বর্বরতার মধ্যেই কি না কে বলবে? আন্দামান উপনিবেশের ভবিষ্যৎ ভেবে মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন নওয়াজ খান।

আন্দামানের উপনিবেশ জঙ্গল নির্মূল করে ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে। জীবনের সীমানা বাড়ছে। মানুষের পৃথিবী অরণ্য নিশ্চিহ্ন করে নিজের দখল কায়েম করে চলেছে।

তিপ্পান্ন বছরের উপনিবেশ শৈশব পেরিয়ে এখন যৌবনে পা দিয়েছে।

পুরা তিপ্পান্নটা বছর এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে কাটিয়ে নিজস্ব একটা তত্ত্বে পৌঁছেছেন নওয়াজ খান। সভ্যই বল, অসভ্যই বল, সৎ অসৎ, পাপীতাপী, আসক্ত নিরাসক্ত, খুনী কি প্রেমী—সর্ব কালের সর্ব মানুষের মধ্যে এক একটা আন্দামান উপনিবেশ রয়েছে।

কি বিচিত্র কি নিদারুণ এই দ্বীপ!

এই দ্বীপের আত্মাকে খুঁজতে খুঁজতে নওয়াজ খানের মনে হয়েছে, আদিম পৃথিবীই একমাত্র সত্য। হাজার হাজার বছর ধরে জীবনের আর

উপর স্তরে স্তরে সভ্যতার যে প্রলেপ পড়েছে, খামাখো নখে তাকে ছিঁড়ে, সভ্যতার সব মলাট খেঁড়ে খেঁড়ে যে বস্তুটি মিলবে, সেটি হল বর্বরতা।

আশ্চর্য। সেই বর্বরতাকে বিনাশ করার জন্যই আন্দামান উপনিবেশের জন্ম। নওয়াজ খানের মনে হয়, এই উপনিবেশের প্রয়োজনই ছিল না। তবু এর সৃষ্টি হয়েছে।

জীবনের সীমানা বাড়ছে।

নওয়াজ খানের ভাবনার উপর দিয়ে পৃথিবী বাড়ছে।

বন্দী নওয়াজ খান স্থালিয়ালির পথ ধরে চৌলদাইর দিকে উঠছিলেন। ভাঙা-ভাঙা পাথরের সড়কটা চড়াই বেয়ে উপরে উঠেছে। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে হাঁটছিলেন নওয়াজ খান। দু পাশে হাওয়াই বুটির জঙ্গল। ঈষৎ লালচে দু চারটে ফুল ফুটে রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে শীত ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বসন্ত এসে পড়বে। এখানকার নোনা মাটিতে বসন্ত সমারোহ করে আসে না। হাওয়াই বুটির জঙ্গলে, রেন-ট্রীগুলোর মাথায় কিছু কিছু ফুল ফুটিয়েই বসন্তের সমস্ত উদ্যম শেষ হয়ে যায়। বসন্তের নিশানা সেই ফুলগুলি একদিন ঝরে পড়ে বুঝিয়ে দিয়ে যায়, দ্বীপের মাটি থেকে বসন্ত উধাও হয়ে গিয়েছে।

শীতের শেষে সেই বসন্তই আসতে শুরু করেছে।

হাওয়াই বুটির জঙ্গল থেকে বুনো গন্ধ উঠে আসছে। দু পাশের ভিজা-ভিজা ছায়াচ্ছন্ন মাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে নওয়াজ খান চৌলদাই পেরিয়ে গোল-ঘর পিছে রেখে সিধা পাহাড়গাঁও গারাচারামার পথ ধরেছেন। দু দিকের জঙ্গল আরো ঘন হচ্ছে। মাটির গন্ধ, জঙ্গলের গন্ধ, বুনো ফুলের গন্ধ মিশে একটা উগ্র মিশ্রিত গন্ধ নাকটাকে অবশ করে দিচ্ছে।

তিপ্পান্ন বছর এই দ্বীপে কাটিয়েছেন নওয়াজ খান। তিপ্পান্ন বছরে তিপ্পান্নটা বসন্ত এসেছে এই দ্বীপে। বসন্তের চেহারা তাঁর পরিচিত, বসন্তের গন্ধ তাঁর কতকালের চেনা। তবু প্রতিবারই এই ঋতুতে ভিজা মাটির গন্ধ, বুনো ফুলের গন্ধ, জঙ্গলের গন্ধ অনাস্বাদিত মনে হয় নওয়াজ খানের; অনাস্বাদিত প্রাচীন জাগায়।

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপের সব কিছুই ছন্নছাড়া।

নোনা মাটিতে বসন্ত যেমন দু চারটে ফুলও ফোটায়, তেমনি দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এক টুকরা নিকষ কালো মেঘকেও টেনে আনে। মৌসুমী বাতাসের তাড়নায় মেঘের টুকরাটা ফুলে ফেঁপে স্তূপাকার হয়ে নিমেষে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলে। সমুদ্রের তলা থেকে একটা গম্ভীর গুরগুর ডাক ঠেলে বেরিয়ে পড়ে। পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে কালো কুটিল জল দুর্জয় বেগে দ্বীপের দিকে ছুটে আসে। চারপাশের সমুদ্র এই দ্বীপের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

বছরের শেষ ঋতুটি বর্বর হয়ে এই বর্বর দ্বীপের মর্যাদা পুরাপুরি বজায় রাখে।

বন্দী নওয়াজ খান পাথুরে সড়ক ভাঙছিলেন। প্রতিদিন পোর্ট ব্লেয়ারের বন্দী উপনিবেশে একবার টহল দিয়ে বেড়ানো তাঁর অভ্যাস। অনেক বছরের পাকা অভ্যাসটা এখন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

সড়কের দু পাশে বনতুলসীর ঝাড়, সুপারী বাগিচা, নারকেল বাগিচা। ফাঁকে ফাঁকে বরগাছ, দিদু আর পপিতা গাছ। মাঝে মাঝে জঙ্গল সাফ করে কুঠি বাড়ি উঠেছে; আবাদের জন্য ক্ষেতিবাড়ি তৈরী হয়েছে।

পথে দু চার-জনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

'আদাব খান সাহেব—'

'আদাব—'

'তবিয়ত আচ্ছা?'

'আচ্ছা।'

'আজ আমাদের গাঁও-এ আসবেন তো?'

'না। আজ গারাচারামা গাঁওএ যাব। ডি-কুনহার কুঠিতে মেজবান (নিমন্ত্রণ) আছে।'

লোকগুলো চলে যায়।

অলক্ষ্যে নৈঋৎ আকাশে এক খণ্ড সোনামুখি মেঘ দেখা দিয়েছে।

এখন কত বেলা কে জানে? এখনও বাতাসে শীতের আমেজ মিশে রয়েছে। আবার রোদের তেজও মারাত্মক। চড়া রোদ আর হিমাক্ত বাতাস মিশে সর্বাঙ্গে সুখস্পর্শ দিচ্ছে।

নতুন উপনিবেশের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গারাচারামা গাঁও-এ ডি-কুনহার কুঠিবাড়িতে এসে পড়লেন নওয়াজ খান।

বাইশ

কুঠিবাড়ির সামনের দিকে ছোট্ট একখণ্ড বাগিচা। নারঙ্গী, গোঁড়া লেবু, মুসম্বী—দ্বীপের নোনা মাটিতে বহু আয়াসে কিছু কিছু মরশুমী ফল ফলানো হয়েছে।

ডি-কুনহার কুঠিবাড়ি অনেকটা বর্মী প্যাগোডার মত। টিনের নক্সাকাটা চাল, খোদাই কাঠের দেওয়াল, কাঠের পাটাতন। কুঠিবাড়ির সর্বাঙ্গে সুন্দর একটি রুচির ছাপ রয়েছে।

বন্দা নওয়াজ খান ডাকলেন, 'ডি-কুনহা—'

'হাঁ, কৌন ?'

কুঠিবাড়ি থেকে ত্রস্ত গম্ভীর স্বর ভেসে এল।

'আমি নওয়াজ—'

'আমি ভাবলাম কে না কে ?' সঙ্গে সঙ্গে কুঠিবাড়ির দরজায় পুরা ছ ফুট দীর্ঘ এক পুরুষমূর্তি দেখা দিল। লালচে কোঁকড়ানো চুল, নীল চোখ। নতুন পয়সার মত উজ্জ্বল তাম্রাভ রঙে কিছুটা মোঙ্গলীয় খাদ মিশে আছে। খাড়া, কঠিন দুটি চোয়ালের মধ্যে বাজপাখির ঠোঁটের মত নাকটি উদ্ধত। এই হল ডি-কুনহা। টান-টান তাম্রাভ চামড়ার একটি মলাট সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিজের আসল বয়স লুকিয়ে রেখেছে লোকটা। চেহারা দেখে ডি-কুনহার বয়স বুঝবার জো নেই।

পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর ফিনফিনে কলিদার পাঞ্জাবী। ডি-কুনহা দরজার উপর থেকে নীচে নেমে এল। বলল, 'আসুন, আসুন খান সাহেব—'

কি বিচিত্র এই দ্বীপ !

আর কি বিচিত্র এই ডি-কুনহা !

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাবী বাঙলায় পর্তুগীজ আর হার্মাদ লুঠেরারা যে তাণ্ডব শুরু করেছিল, ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। সেদিনের বিবর্ণ ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি রক্তে হত্যায় ধর্ষণে আর অমানুষিক অত্যাচারে কলঙ্কিত। পর্তুগালের রুক্ষ ঊষর উপকূল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে জলদস্যুর

জাহাজ বাঙলাদেশের সম্পদ লুঠ করতে আসিত। সপ্তদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ জাহাজের এক টুকরা কাঠও আজ মিলবে না। একজন জলদস্যুর একখণ্ড হাড়ও নিয় বাঙলার কোথাও নেই।

সুশ্যাম বাঙলা দেশের অদ্ভুত এক কুহক আছে। এর নিরুত্তাপ জলবায়ুতে বিচিত্র মোহ আছে। হার্মাদ বোম্বেটেরা নিজেদের অজান্তে বাঙলার কোমল পলিমাটিতে আটকে গেল। হাল আর চলল না, পাল আর উঠল না। কালে কালে স্তরে স্তরে পলিমাটি এসে জাহাজগুলিকে গ্রাস করে ফেলল। ফিরবার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

সেই যে বিদেশী জলদস্যুরা নেমেছিল, তারপর তিনটে শতাব্দী পার হতে চলল। এই তিন শ বছরে বাঙলা দেশ তাদের সব উদ্দামতা জুড়িয়ে দিল। যে হাতে তারা শাণিত তলোয়ার আর কামান বাগিয়ে ধরত, সেই হাত হাল লাঙল ধরল। তিন শ বছর আগে তাদের ধমনীতে যে বিশুদ্ধ পর্তুগীজ রক্ত বইত, সে রক্ত আর বিশুদ্ধ রইল না। আরাকানী, মগ আর নোয়াখালি চট্টগ্রামের দেশী রক্তের খাদ মিশে আদিপুরুষের গৌরব ম্লান করে দিল; সমস্ত অতীতকে ভুলিয়ে দিল। কিছু কিছু বিকৃত নাম, মাতা মেরী, গলায় ক্রুশ, বিসাস—সামান্য কয়েকটি উপকরণের মধ্যে পোর্তুগালের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ক্ষীণ একটি সূত্রে ঝুলতে লাগল।

বাঙলা দেশ সেই নিদারুণ অত্যাচারের চরম প্রতিশোধ এমন নির্মমভাবেই নিয়েছে।

এদেরই একজন ডি-কুনহা।

ডি-কুনহার যে অতীত, তাতে পুরাপুরি জাত সে হারায় নি। কিছু বর্মী রক্ত ছাড়া তার ধমনীতে বিশুদ্ধ পোর্তুগীজ রক্তই বইছে। তবে অনেক কাল নাবী বাঙলার বাতাসের সঙ্গে ফুসফুসের সম্পর্ক রাখতে হয়েছে। কাজেই তিন শ বছর আগের মত ফুসফুসটা তেমন পোক্ত নয়; রীতিমত নোনা ধরেছে। তবু বাঙলা দেশের জলবায়ুর তাড়না থেকে নিজেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রাখতে বিন্দুমাত্র কসুর করে নি ডি-কুনহা। এত সত্ত্বেও পোশাকে-আশাকে রুচিতে চেহারায় বাঙলা দেশ আর বর্মার প্রভাব ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি।

নারী ঘটিত গোটা সাতেক জঘন্য অপরাধে সারা জীবনের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছে ডি-কুনহা। বছর খানেক হল সাজার মেয়াদ ফুরিয়েছে। বড় করিতকর্মা লোক ডি-কুনহা। এক বছরের মধ্যেই প্রচুর

টাকা করেছে। গারাচারামা [illegible] আর পোর্ট ব্লেয়ারের এবারডীনে দুটো কুঠিবাড়ি বানিয়েছে। জঙ্গলে অনেক জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে। এত টাকা কোথা থেকে তার হল, সে এক দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার।

আন্দামানে আসার আগে আকিয়াবে সুপারীর ব্যবসা ছিল ডি-কুনহার। এখানে তার 'সিপি'র ব্যবসা। 'সিপি' হল সামুদ্রিক শঙ্খ-কড়ি-শামুক। সমুদ্র থেকে এগুলিকে তুলে বিদেশের বন্দরে চালান দেয় ডি-কুনহা।

অন্য কয়েদীরা বলে 'সিপি'র ব্যবসা করে এত পয়সা কামানো যায় না। তবু কোথা থেকে তার টাকা আসে, তা এক দুর্বোধ্য রহস্য হয়েই রয়েছে।

ডি-কুনহার চরিত্রটি বিচিত্র। নারীঘটিত সাত সাতটা জঘন্য অপরাধের দায়ে আন্দামান এসেছিল সে। অথচ আন্দামানে কোনদিন তাকে কেউ নারীসঙ্গ করতে দেখে নি। আওরত কয়েদী নিয়ে জাহাজ যখন এই দ্বীপের উপকূলে নোঙর গাঁথে, অন্য কয়েদীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; রেণ্ডিবারিক কয়েদখানার চারপাশে হন্যে হয়ে ঘোরে। তা ছাড়া এই উপনিবেশে বর্মী যুবতী জোটানো তেমন দুরূহ ব্যাপার নয়। নারীমাংস এই দ্বীপে যেমন দুর্লভ, তেমনই আবার সহজলভ্য।

কিন্তু কোনদিন ডি-কুনহাকে আওরতের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে কেউ দেখে নি। গারাচারামার কুঠিবাড়িতে একা নিঃসঙ্গ দিন কাটায় ডি-কুনহা।

ইতিমধ্যে কাঠের কুর্শিতে জাঁকিয়ে বসেছেন নওয়াজ খান।

ডি-কুনহা বলল, 'খান সাহেবের খুব তখলিফ হল।'

'না না, তখলিফ আর কি? এ তো অভ্যাসই হয়ে গিয়েছে। রোজ একবার পেনাল কলোনিটা ঘুরে ঘুরে না দেখলে ভালো লাগে না। এই দ্বীপের সঙ্গে কতদিনের সম্পর্ক; কয়েদীদের কতকাল ধরে দেখছি—'

বুড়া নওয়াজ খান বড় একটা শ্বাস ফেললেন।

একটু সময় চুপচাপ কাটল।

নওয়াজ খান আবার বললেন, 'কি ব্যাপার, মা-পোয়েকে আনলে না?'

'না।'

বাজপাখির ঠোঁটের মত যে নাকটা দুই খাড়া চোয়ালের মধ্যে উদ্ধত হয়ে ছিল, সেটা ফুলে উঠল। নীল চোখদুটো ঈষৎ কুঁকড়ে গেল। চাপা, কঠিন গলায় আবার সে বলল, 'না।'

নওয়াজ খান বলতে লাগলেন, 'সাজার মেয়াদ ফুরিয়েছে, ঘুটিবাড়ি বানিয়েছ, এবার মুলুক থেকে মা-পোয়েকে নিয়ে এস।'

এই দ্বীপের কেউ জানে না, কিন্তু বন্দা নওয়াজ খান অনেক [illegible] করে ঠিক খোঁজ নিয়েছেন, আন্দামান আসার আগে আকিয়াবে একটা শাদি করে এসেছে ভি-কুনহা। বিবির নাম মা-পোয়ে। বর্মী। গুটি তিনেক ছেলেপিলেও রয়েছে।

মা-পোয়ের প্রসঙ্গ আসতেই চুপ করে গেল ভি-কুনহা।

নওয়াজ খান আবার বললেন, 'কি, কথা বলছ না কেন?'

'কি বলব?'

'তুমি একবার মেন ল্যাণ্ডে যাও।'

'মেন ল্যাণ্ডে গিয়ে কি করব?'

'বিবি আর বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এস।'

'বিবি আর বাচ্চাগুলো কোথায় রয়েছে কি করে বলব? বিশ বছর তাদের কোন পাত্তা নেই। তাদের ঠিকানা জানি না। দুনিয়া থেকে তাদের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছে কি না, কে জানে?'

অনেকবার আকিয়াব গিয়ে মা-পোয়েকে আনবার কথা বলেছেন নওয়াজ খান। প্রতিবার একই জবাব দিয়েছে ভি-কুনহা।

মা-পোয়েকে এই দ্বীপে নিয়ে আসার পিছনে নওয়াজ খানের কোন মতলব রয়েছে কি না, কে বলবে? বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর দ্বীপে অনাবশ্যক উপনিবেশ যখন গড়েই উঠল, তখন তা মানুষে ভরে উঠুক। হয়ত বা এই ইচ্ছাই নওয়াজ খানের থাকবে। শুধু মা-পোয়ে কেন, এই দ্বীপের যত কয়েদী —সকলকেই তিনি মুলুক থেকে বিবি বাচ্চা আনার পরামর্শ দেন।

নওয়াজ খান বললেন, 'তবু একবার মেন ল্যাণ্ডে যাও, বিবি বাচ্চার খোঁজ কর।'

'দেখি—'

গলায় কালো কারে একটা ছোট ক্রশ ঝুলছে। ক্রশটা ছুঁতে ছুঁতে ভি-কুনহা বলল, 'অনেক বেলা হয়েছে খান সাহেব, এবার খানা দিক।'

'হাঁ—'

সেই সকালে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেরিয়েছেন নওয়াজ খান। সূর্য এখন মাথার মাথায় এসে উঠেছে। শীতের অরণ্য জ্বলছে। বাগিচা থেকে লেবু

ফুলের মদির গন্ধ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস এসে নারকেল গাছের মাথা দুলিয়ে যাচ্ছে।

এই জঙ্গলেও মোগলাই খানার বন্দোবস্ত করেছে ডি-কুনহা। বাদক পাখির কাবাব, হরিণের গোস্তের কোর্মা, পোলাও। খানার অনুপান হিসেবে বিশেষ পিনার ব্যবস্থাও রয়েছে।

বর্মী চাকর টেবিলে খানা সাজিয়ে দিল।

হরিণের হাড্ডি চিবাতে চিবাতে ডি-কুনহা মুলাইম স্বরে বলল, 'খান সাহেব, আমার একটা আর্জি আছে—'

'আমার কাছে?'

'হাঁ—'

'বল।'

'বলছিলাম, কমিশনার সাহেবের সঙ্গে আপনার তো খুব খাতির। কয়েদীরা বলে পুরা দোস্তি মহব্বতি—'

নওয়াজ খান মৃদু হাসলেন। বললেন, 'থোড়া জানপয়চান আছে।'

এর পর দুজনেই চুপ। কিছুটা সময় কাটে।

খেতে খেতেই ডি-কুনহা নওয়াজ খানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মুখচোখের ভাবগতিক লক্ষ্য করে। তারপর সুযোগ বুঝেই বলে, 'খান সাহেব, দিন কতক আগে আমরা উত্তর আন্দামান গিয়েছিলাম; সেই পোর্ট কর্নওয়ালিস—'

'হাঁ—'

বিকারহীন চোখে একবার ডি-কুনহার দিকে তাকিয়ে কোর্মায় কামড় দিলেন নওয়াজ খান।

একটু অপেক্ষা করল ডি-কুনহা। তারপর বলল, 'উত্তর আন্দামানের দরিয়ায় অনেক 'সিপি' দেখে এসেছি। আপনি যদি কমিশনার সাহেবকে বলে ঐ জায়গাটা বন্দোবস্ত করে দেন, আমার বড় উপকার হয়।'

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন নওয়াজ খান। একটু পর বললেন, 'কমিশনার সাহেবকে বলতে পারি, লেকিন তোমার একটা কাজ করতে হবে।'

'কি?'

'যেন ম্যাও থেকে মা-পোয়েকে খুঁজে আনতে হবে।'

'হাঁ-হাঁ জরুর—'

হঠাৎ মা-পোয়ের ব্যাপারে বড় উৎসাহী হয়ে ওঠে ভি-কুনহা, 'আমার শাদি করা বিবি, আর আপনি যখন বলছেন। ... তাকে নিয়ে আসব।'

খানাপিনা চুকতে চুকতে এই দ্বীপে বিকাল নামে। ভি-কুনহার নারকেল গাছগুলোর মাথা টপকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদক পাখিরা কোনদিকে যে উড়ে যায়! বাতাসের একটানা তাণ্ডব চলতেই থাকে।

বিকাল থেকেই অস্থির হয়ে উঠল ভি-কুনহা। বাগিচার ফাঁক দিয়ে সড়কের যে অংশটা অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে, বার বার সেদিকে তাকাতে লাগল। কখন যে তারা এসে পড়বে! এদিকে নওয়াজ খান উঠবার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছেন না। মনে মনে যেশাসের নামে একটা কুৎসিত শপথ নিয়ে ভি-কুনহা ভাবল, আজ নওয়াজ খানকে মেজবান না করলেই ভাল হত।

শেষ পর্যন্ত ভি-কুনহার উদ্বেগ বিশগুণ বাড়িয়ে প্রাণটাকে ওষ্ঠাগত করে সন্ধ্যার একটু আগে আগেই তারা এসে পড়ল। সরাসরি সেই কামরাতেই এসে ঢুকল।

কুর্শির বাজুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নওয়াজ খান। বয়স হয়েছে। খানাপিনার পর কেমন যেন নেশা-নেশা লাগে; চোখ দুটো আপনা থেকেই ভারী হয়ে ওঠে। তখন আর আলস্যের ঘুমটাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

সর্বনাশ যা ঘটবার ঘটে গেল; সেই মুহূর্তেই নওয়াজ খান কুর্শির বাজু থেকে মাথা তুললেন।

ভি-কুনহার ইশারায় লোকদুটো বেরিয়ে যাচ্ছিল।

নওয়াজ খান বললেন, 'ও—ও কে? ফাই মঙ বর্মী না! এবারডীন বাজারে দোকান আছে?'

ফাই মঙ ঘুরে দাঁড়াল। চাপা-চাপা কুতকুতে চোখজোড়ায় একটা নিষ্ঠুর ছায়া পড়ে চকিতেই মিলিয়ে গেল। সামান্য হাসল ফাই মঙ; সোনা বাঁধানো একটা দাঁত একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হল। মৃদু, কঠিন স্বরে ফাই মঙ বর্মী বলল, 'হাঁ জী, আমি ফাই মঙ, এবারডীন বাজারে আমার দোকান আছে।'

অন্য লোকটা এতক্ষণে দরজার সামনে থেকে সরে গিয়েছে। কিন্তু একবার

দেখেই চিনে ফেলেছেন নওয়াজ খান। এই দ্বীপের প্রতিটি কয়েদীকেই চেনেন তিনি। সকলের গাঁও মুলুক, সাজার মেয়াদ, কে দণ্ডবিধির কোন ধারার আসামী, কার মেয়াদ ফুরাতে কতদিন বাকী—সব, সব নওয়াজ খানের কণ্ঠস্থ। এই দ্বীপের সঙ্গে কি তাঁর দু দশ দিনের সম্পর্ক!

ভি-কুনহার কুঠিবাড়িতে কোনদিন ভাগোয়া কয়েদী জনকে দেখবেন, এমন অনুমান কস্মিনকালেও করেন নি নওয়াজ খান! অদ্ভুত উত্তেজনায় বুকের মধ্যটা ধক্‌ধক্ করছে। পরিষ্কার তাঁর মনে আছে, দু বছর আগে মালয় থেকে জন এই দ্বীপে সাজা খাটতে এসেছিল। দু মাস সাত রোজ সাজা খাটার পর সে ফেরার হয়ে যায়।

সেলুলার জেলের নথিপত্রে উল্লেখ আছে, 'আজ উনিশ শ নয় সালের বারই অক্টোবর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী মালয়ী খ্রীষ্টান জন আজ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফেরার হয়ে যায়। দণ্ডবিধির তিন শ দুই ও তিন শ সাতষট্টি ধারার যাবতীয় সাজা তার উপর প্রযুক্ত ছিল।'

'জন অতি ভয়ানক প্রকৃতির আসামী। এ যাবত সে সজ্ঞানে স্থিরমস্তিষ্কে তিনটি হত্যা করেছে। জন সেলুলার জেলের বিশ নম্বর কয়েদী।'

জন ফেরারী হওয়ার কিছুদিন পর পাহাড়গাঁওতে দুটো খুন হয়েছিল। খুনের পদ্ধতি বিচার করে সেলুলার জেলের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, এ জনেরই কাজ।

পাহাড়গাঁও-এর খুনের পর সরকার থেকে ঘোষণাপত্র বেরোয়, 'জীবিত বা মৃত, যে কোন অবস্থায় জনকে ধরে দিতে পারলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।'

দু বছরেও জনকে ধরা যায় নি। পুরা দক্ষিণ আন্দামান চুঁড়েও তার কোন পাত্তা মেলে নি।

নওয়াজ খান অস্থির হয়ে উঠলেন। উদ্বেগ এবং আতঙ্কের ছাপ পড়ল তাঁর মুখে।

একদৃষ্টে নির্মম চোখে নওয়াজ খানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভি-কুনহা। সমস্ত ভাবান্তর লক্ষ্য করছে।

অনেকটা সময় কাটল। দরজার পাশ থেকে কাই মঙ বর্মী আর জন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বাইরের অরণ্যের মাথায় রোদ মরে আসতে শুরু করেছে। মেলু বাগিচার

ফাঁক দিয়ে যে সড়কটা অস্পষ্ট হয়ে ছিল, সেটা এখন একেবারেই নিশ্চিহ্ন। জঙ্গল ফুঁড়ে হিমাক্ত বাতাস উঠে আসছে।

হঠাৎ নওয়াজ খান বললেন, 'ঐ লোকটা কে ?'

কঠিন, নির্মম স্বরে ভি-কুনহা বলল, 'আবদাল্লা—আমার নোকর।'

আরো খানিকটা পর উঠে পড়লেন নওয়াজ খান। বিদায় জানিয়ে সড়কে এসে নামলেন। সমস্ত দিলটা ভারী বিশ্রী হয়ে গিয়েছে।

ভাগোয়া কয়েদী জনকে এক নজরেই পরিষ্কার চিনে ফেলেছেন নওয়াজ খান। তবু ভি-কুনহা মিথ্যা বলল। কেন ?

ভি-কুনহার সাজার মেয়াদ ফুরিয়েছে। আইনের চোখে সে এখন অপরাধ-মুক্ত, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ মানুষ। তবে ভাগোয়া কয়েদী জনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ?

চলতে চলতে নওয়াজ খানের মনে হয়, ভি-কুনহার সঙ্গে জনের কোথায় যেন একটা নিগূঢ় যোগাযোগ রয়েছে। যোগাযোগটা আদপেই নির্দোষ নয়; ভীষণ এবং সাজ্যাতিক একটা সম্বন্ধ।

এত বছর এই দ্বীপে কয়েদ খেটেও চরিত্রের শোধন হল না ভি-কুনহার !

তেইশ

লখাইর কুঠুরির ডান পাশের কুঠুরিটা পরাণ্ডপের। বাঁ পাশের কুঠুরিটা এতদিন খালি পড়েই ছিল। দিন তিনেক আগে মাঝ রাত্রির দিকে এক কয়েদীকে সেখানে পোরা হয়েছে। লোকটা বর্মী; ওয়ার্ডার মোহর গাজীর কাছে নামটাও জেনে নিয়েছে লখাই। নাম তার লা ডিন।

অন্য কয়েদীদের সকালে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু পুরা তিনটা দিন লা ডিনকে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পেটি অফিসার সকালে এক বর্তন কাঞ্জি, দুপুরে এক ডাব্বা ভাত এবং বিকালে খান তিনেক রুখা রুটি— সেলুলার জেলের বরাদ্দ খানা সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে তার কর্তব্য চুকিয়ে ফেলে।

তিন দিনের খানা জমে গরাদের মুখে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। বাসি কাঞ্জি থেকে অম্ল সির্কার গন্ধ ছুটছে। রুটিগুলিতে ছাতা পড়তে শুরু করেছে।

আশ্চর্য! লা ডিন একবার ফিরেও তাকায় না।

বাইরের বারান্দায় নারকেল ছোবড়ার ঝুরা খসিয়ে সরু মিহি তার বার করতে করতে লখাই লক্ষ্য করেছে, তিন দিনে একবারও মুখ ফেরায় নি লা ডিন। কুঠুরির পিছনের দেওয়ালে বাইরের আলো আর বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য যে ছোট্ট ফোকরটা রয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে মেরুদণ্ড খাড়া রেখে সারা দিন বসে থাকে লোকটা। রাত্রির কথা অবশ্য লখাই বলতে পারে না। তবে তার মনে হয়, পুরা রাত্রিটাও লা ডিন ঐ একই অবস্থায় বসে বসে কাটিয়ে দেয়।

বাইরে কয়েদীদের এত হল্লা, এত চিৎকার, টিণ্ডাল পেটি অফিসারদের খিস্তি খেউড়, ছোবড়া পেটার দুপদাপ আওয়াজ, ঘাঁতা পেষার ঘর্ঘর শব্দ—কোন কিছুই লা ডিনকে টলাতে পারে না।

পয়লা দিন ভিখন আহীর গরাদের কাছ থেকে খান দুই রুটি সরিয়েছিল; তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। মোপলা হারামী বকরুদ্দিন গরাদের ফাঁকে মুখ ঢুকিয়ে কুত্তার ডাক ডেকে তামাশা করেছে; তবু বিকার নেই।

নিজের চারপাশে অটলতার একটা কঠিন বর্ম এঁটে দিবারাত্রি স্থির হয়ে

বসে থাকে লা ভিন। কুত্তার ডাক, তামাশা, হল্লা—সব কিছু বর্মে ঘা খেয়ে ফিরে যায়।

বারান্দায় ঘাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে কি ছোবড়া পিটতে পিটতে কয়েদীরা নিজেদের মধ্যে বাতচিত করে। এমন তাজ্জবের আদমী না কি তারা সারা জিন্দগীতে আদৌ দেখে নি। কথা বলে না, হল্লা বাধায় না, খিস্তি করে না, অন্তত পক্ষে বুক থাপড়ে কাঁদে না—এমন কয়েদীর কথা সেলুলার জেলের নথিতেই নেই।

চার দিনের মাথায় পেটি অফিসার নসিমুল গণি সেলের গরাদ খুলল। মুলাইম স্বরে ডাকল, 'লা ভিন জী—'

নিঃশব্দে মুখ ঘোরাল লা ভিন।

নসিমুল আবার বলল, 'আপকো খানা—'

আন্দামানের কয়েদী শায়েস্তা করার জন্য খুদ খুদা যাকে মুখে খিস্তি হাতে ডাণ্ডা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, সেই নসিমুল গণির স্বরটা এত মিঠা হতে শুনে পয়লা পয়লা কয়েদীরা তাজ্জব বনে গিয়েছিল।

ভিখন আহীর পাশের কয়েদীর কানে মুখ গুঁজল, 'নয়া কয়েদী বড় মরদ হৈ! দেখছিস, পেটি অফসার শালা কেমন তুষামোদ করছে!'

কয়েদীরা অবাক হয়ে দেখল, নসিমুল গণি নয়া কয়েদীর সকালের নাস্তা এনেছে; এবং সে নাস্তা কালচে কটুস্বাদ কাঞ্জিপানি না; টাটকা কিছু ফল আর কলের রুটি। নসিমুল সমানে সাধছে, 'আপকো খানা নিন লা ভিন জী।'

খানার নমুনা দেখে চারপাশের কয়েদীদের চোখগুলো লোভে ছুরির ফলার মত ঝকমক করতে লাগল।

লা ভিন বলল, 'আগে গোসল করব।'

'আসুন।'

পেটি অফিসার নীচ থেকে লা ভিনকে গোসল করিয়ে আনল। তারপর ফল এবং রুটির সঙ্গে তাকে সেলের মধ্যে পুরে গরাদে তালা আঁটল। তারও পর পাথুরে সিঁড়ি কাঁপিয়ে কয়েদী শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই বুঝি বা দুসরা ব্লকের দিকে উধাও হল।

আশ্চর্য! এবার আর পিছনের সেই খোকরটার দিকে চোখ রেখে স্থির হয়ে বসল না লা ভিন। একখানা কম্বল চার ভাঁজ করে গরাদের সামনে পাতল। তার উপর বসে প্রসন্ন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল।

পিনিকের দাপটে মাথা আর খাড়া রাখতে পারছে না লখাই। শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটছে। মাথার শক্ত খোলটা ফাটিয়ে ফুটন্ত মগজটা বুঝি এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়বে। অসহ্য এক যন্ত্রণা সমস্ত শরীরের মধ্যে চরকির মত ঘুরছে। চোখ দুটো টকটকে লাল; শিরাগুলো সাপের মত ফুলে উঠেছে।

তবু নসিমুল গণির হাত থেকে রেহাই নেই। যথারীতি নারকেল ছোবড়া আর মুগুর দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। বিকালে আড়াই পাউণ্ড তার মেপে নেবে।

হাত আর চলে না লখাইর। দেহটা আপনা থেকেই টলে পড়ছে। লখাইর মনে হল, ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। কিন্তু কাঁদার সামর্থ্যটুকুও সে হারিয়েছে।

হঠাৎ কে যেন ডাকল, 'এই যে শোন—'

পিছন ঘুরে লখাই দেখল, হাতের ইশারায় লা ভিন ডাকছে, 'এদিকে এস।'

লা ভিনের ডাকে কি ছিল, টলতে টলতে তার কুঠুরির সামনে উঠে এল লখাই। বলল, 'আমাকে?'

'হাঁ—বস।'

গরাদের এপাশে বসে পড়ল লখাই।

'তোমার বুখার হয়েছে?'

লা ভিনের গলার স্বরে এমন একটা সহানুভূতির কোমল স্পর্শ রয়েছে, যা মুহূর্তে লখাইর সমস্ত মনটাকে অভিভূত করে ফেলল।

এই নিদারুণ দ্বীপ! এই নিদারুণ সেলুলার জেল! পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই সৃষ্টিছাড়া কয়েদখানায় দয়া নেই, মায়া নেই, তিল মাত্র সহানুভূতি নেই। চিরকাল এখানে পেটি অফিসারের মুষ্টিতে পীড়নের দণ্ডটি উদ্যত হয়েই থাকে।

তিনটে দিন পিনিকের নেশায় আচ্ছন্নের মত কাটছে লখাইর। দু চার টুকরা রুটি আর দু চার আঁচলা জলে প্রাণকে কোনক্রমে টিকিয়ে রেখেছে। কেউ একবার জিজ্ঞাসাও করে নি, কি হয়েছে লখাইর? কারো জন্য এতটুকু সহানুভূতি না জানানো এখানকার দস্তর। সেলুলার জেলের মতই এখানকার কয়েদীদের মনগুলি নির্মম, অনুভূতিহীন। সেখানে মমতার বাষ্পমাত্র নেই।

কালাপানির দরিয়ায় মনের সবটুকু সুকুমার অনুভূতি ডুবিয়ে দুর্দান্ত কয়েদী এই

এমন যে হৃদয়হীন লখাই, লা ডিনের সহানুভূতির তাপে তার মধ্যেকার সেই স্নেহলোভী স্পর্শাতুর প্রাণটা কতকাল পর যেন আকুল হয়ে উঠল।

মা-বাপের কথা আদৌ মনে করতে পারে না লখাই। স্নেহ কি মমতার স্বাদ প্রথম যার কাছে পেয়েছিল, সে হল বিবির বাজারের মোতি। লখাইর পরিষ্কার মনে পড়ে, সারা জীবনে মোতি ছাড়া কেউ কোনদিন তাকে বিন্দুমাত্র আদর কি প্রশ্রয় দেয় নি। এত বড় পৃথিবীতে মোতি ছাড়া আর কেউ তার বেদনার পরিমাপ কষতে বসে নি। এত বড় পৃথিবীতে কেউ যদি দু চার বিন্দু চোখের জল তার কল্যাণে ফেলে থাকে, সে মোতিই। অনেক, অনেক দিন পর দ্বীপান্তরী কয়েদী লখাইর বুকটা মোতির জন্য হু-হু করে উঠল।

লা ডিন আবার বলল, 'তোমার বুখার হয়েছে?'

'হুঁ।'

লখাইর গলার স্বরটা আপনা থেকেই জড়িয়ে এল।

লা ডিন বলল, 'তোমার ছোবড়াগুলো আর মুগুরটা আমাকে দাও, আমি তার বার করে দিচ্ছি।'

চমকে লা ডিনের মুখের দিকে তাকাল লখাই। লা ডিন মৃদু মৃদু হাসছে। সে হাসিতে বঙ্গোপসাগরের এই বিবেকহীন বর্বর দ্বীপের এক দুর্লভ পরিচয় ফুটে বেরিয়েছে।

লা ডিন বলল, 'কই নিয়ে এস।'

'পেটি অফসার খিস্তি করবে, ডাণ্ডা হাঁকবে—'

'সে আমি বুঝব, তুমি ছোবড়া-মুগুর দাও—'

ছোবড়া-মুগুর এগিয়ে দেবার কথা ভুলে গেল লখাই। বার বার তার মনে হতে লাগল, বিবির বাজারের মোতির সঙ্গে বর্মা মুলুকের লা ডিনের কোথায় যেন একটা নিবিড় মিল রয়েছে। পরস্পর সাজিয়ে গুছিয়ে ভাবার শিক্ষা কোন কালে পায় নি লখাই। তার অস্থির উন্মুখ মনে যে ভাবনা চলছে, সেগুলো সাজিয়ে নিলে বুঝি এমনই দাঁড়ায়। বঙ্গোপসাগরের দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে বিবির বাজারের মোতি আর বর্মী লা ডিন যে কেমন করে একাকার হয়ে যায়, সেটুকু সমস্ত বিচারবুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না লখাই।

এক সময় মুগুর আর ছোবড়া লা ডিনের সেলে ঢুকিয়ে দিল লখাই।

লা ভিন বলল, 'তোমার বুখার, তুমি শুয়ে আরাম কর, যাও আপনা কুঠুরিতে যাও।'

'না।'

গরাদের উপর মাথাটা রেখে নির্জীবের মত পড়ে রইল লখাই।

এই দ্বীপে শীতের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। সকালের দিকে সমুদ্র ফুঁড়ে যে হিমাক্ত জলো বাতাস উঠে আসে, বেলা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাস থেকে হিম আর জলীয় ভাবটা মুছে যায়। তীক্ষ্ণ, প্রখর রোদে সিসোস্ট্রেস উপসাগরটা জ্বলতে থাকে। টিলাগুলি নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ ; ঝড় এসে সেখানে অবিরাম মাথা কোটে। ভোরের সিন্ধু সারসগুলোকে এখন আর দেখা যায় না। এক দ্বীপ থেকে তারা অন্য দ্বীপে উধাও হয়ে যায়।

শীতের শেষের এই দিনটিতে সেলুলার জেলের মাথায় ধারাল রোদ এসে পড়েছে। বেলা চড়ছে।

দীর্ঘ বারান্দায় কয়েদীরা নারকেলের ছোবড়া ছিলছিল, কেউ যাঁতায় গম পিষছিল। ভুখোড় হারামী যারা, তাদের রম্বাস ছিঁচতে দেওয়া হয়েছিল। হাতের কাজ গুটিয়ে রেখে তাজ্জব হয়ে তারা লা ভিনের কাজ দেখছিল। সবাই ভাবছিল, নয়া কয়েদীটা বড় আজব আদমী বটে! পরের জন্য যে কয়েদী ছোবড়া ছিলে দেয়, তার মত আজব এবং মুরুখ এই দ্বীপে আর একটাও আছে কি না, তারা ভেবে উঠতে পারছিল না।

নসিমুল গণি ফল আর রুটি দিয়ে গিয়েছে। দু-চার টুকরা রুটি ছাড়া কিছুই খায় নি লা ভিন।

হঠাৎ লা ভিন গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে ভিখন আহীরকে ডাকল, 'এদিকে আও ভেইয়া—'

গুটি গুটি পায়ে লা ভিনের সেলের কাছে এসে উবু হয়ে দাঁড়াল ভিখন আহীর। বলল, 'আমাকে কুছু বলছ?'

'হাঁ—'

বর্মী লা ভিন অল্প হাসল। বলল, 'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ভিখন আহীর।'

হঠাৎ ভিখনের মুখচোখের ভাব করুণ হয়ে উঠল। লখাইর দিকে একটা মাত্র চোখে একবার তাকিয়ে ফিসফিস স্বরে সে বলল, 'এতকাল ভিখন আহীরই ছিলাম। দু রোজ হল স্রেফ পেটের ভুখের জন্য

আমি ইসলামী বনেছি। জাত দিয়েছি। এখন আমার নাম শরীয়তুল্লা। তুমি আমাকে ভিখন বলেই ডেক।'

লা ডিন বলল, 'তোমার বড় ভুখ, না?'

'হাঁ, ভুখটা আমার বড় দুশমন।'

'এক রোজ তুমি এই গরাদের কাছ থেকে দুটো রুটি নিয়েছিলে ভিখন?'

ভিখন হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পুরা তিনটে দিন লা ডিন পিছনের ফোকরটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। সামনের গরাদের কাছ থেকে দুটো রুটি ভিখন হাত সাফাই করে সরিয়েছে।—তা-ও টের পেয়েছে লা ডিন!

ভিখন ভাবল, লা ডিন কি ভেলকি জানে?

ভিখনের কদাকার পোড়া মুখটা হাঁ হয়ে রইল। সেই হাঁয়ের মধ্য দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল।

লা ডিন বলল, 'তোমার বড় ভুখ, এই নাও রুটি ফল। খা লেও।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'রোজ তোমাকে আমার খানা থেকে রুটি দেব।'

'সচ্?'

'হাঁ হাঁ—সচ্—'

রুটি ফল নিয়ে ভিখন চলে গেল।

ভিখন চলে যেতেই মোপলা কয়েদী বকরুদ্দিনকে ডাকল লা ডিন। বলল, 'তুমি বড় তামাশাবালা! কুত্তার ডাক ঠিক ঠিক ডাকতে পার। বিল্লির ডাক ডাকতে পার?'

বকরুদ্দিন অবাক হয়ে গেল। যে কয়েদী তিন দিনে একবারও পিছন ফেরে নি, সে কেমন করে সব টের পায়!

লা ডিন আবার বলল, 'তামাশা আমার খুব ভাল লাগে। তুমি যত পার আমার কুঠুরির সামনে কুত্তার ডাক ডেক। এখন যাও, পেটী অফিসার এসে পড়বে।'

বকরুদ্দিন একটা কথা বলারও সুযোগ পেল না। যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি ফিরে গেল।

এর পর আর কারুকে ডাকল না লা ডিন। লখাইর ছোবড়াগুলো ছিলে কুটে তার বার করতে লাগল।

গরাদের উপর মাথা রেখে নির্জীব আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল লখাই। পিনিকের ক্রিয়া চরম পর্যায়ে উঠেছে। মাথা আর খাড়া রাখা যাচ্ছে না।

পিনিকের চরম নেশার মধ্যেই লখাই ভাবল, যে মানুষ পরের ছোবড়া ছিলে দেয়, নিজের ফল রুটি নির্বিবাদে বিলিয়ে দেয়, সে মানুষের মনে কি আছে কে জানে? তার মনে হল, নিজের চারপাশে বিচিত্র এক আবরণ এঁটে লা ডিন ভিতরের অনেকখানি রহস্যকে ঢেকে রেখেছে। সেই রহস্যটা যে কি, এই মুহূর্তে পিনিকের এই প্রবল নেশার ঘোরের মধ্যে সঠিক বুঝে উঠতে পারছে না লখাই।

ভাবতে ভাবতে গরাদের উপর টলে পড়ল লখাই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

চব্বিশ

ম্যোণ্ট্যাণ্ডের কয়েদখানায় যেমন মেট, কালা পাগড়ী, সেলুলার জেলে তেমনি টিণ্ডাল, পেটি অফিসার, কয়েদী জমাদার।

দক্ষিণ আন্দামানের আটালাণ্টা পয়েণ্টের মাথায় যেমন পুরুষ কয়েদীদের সেলুলার জেল, সাউথ পয়েণ্টের মাথায় তেমনই কয়েদিনীদের জন্য রেণ্ডিবারিক জেল বা সিপ্পান। সেলুলার জেলে যেমন টিণ্ডাল পেটি অফিসার, রেণ্ডিবারিক জেলে তেমনই টিণ্ডালান পেটি অফিসারনী।

লিঙ্গগত সামান্য তফাৎটুকু ছাড়া টিণ্ডাল কি টিণ্ডালান, পেটি অফিসার কি পেটি অফিসারনী আদতে একই বস্তু। ডাণ্ডা মেরে, কীল ঘুষা হাঁকিয়ে কয়েদীর জান পায়মাল করার জন্যই এদের জন্ম। ক্রূরতা, নির্মমতা, অমানুষিক অত্যাচার করার ঝোঁক—দুনিয়ার জঘন্য ওঁচা কদর্য বস্তু দিয়ে এরা তৈরী। এদের সৃষ্টিকর্তা কালাপানির জেলে কয়েদী পিটবার জন্য একই ধাতুতে একই ছাঁচে এদের মনগুলোকে ঢালাই করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে।

জেলাররা কয়েদীদের মধ্য থেকেই টিণ্ডাল পেটি অফিসার বাছাই করে নেয়। একমাত্র সেরা কয়েদী অর্থাৎ সেরা দুশমনদেরই টিণ্ডাল পেটি অফিসার হবার যোগ্যতা থাকে।

কালাপানির জেলে কয়েদনীতি বড় ভুখোড়।

টিণ্ডাল পেটি অফিসারদের এখানে মাসিক তলব (মাইনে) মেলে। মাস গেলে পেটি অফিসাররা পায় বার আনা, টিণ্ডালরা পায় পাঁচ সিকা। এ ছাড়া খানা এবং পোশাক তো আছেই। সাধারণ কয়েদীর তুলনায় এদের খানা অনেক উঁচু দরের। কুর্তা ইজেরের উপর আড়াআড়ি রঙদার চওড়া ফিতে মেলে, মাথায় সাফা (পাগড়ি) মেলে, পিতলের চাপরাশ মেলে।

কয়েক গণ্ডা পয়সার জন্য এই সব টিণ্ডাল পেটি অফিসাররা না পারে হেন কাজ নেই। পিটিয়ে পিটিয়ে কয়েদীকে সিধা রাখতে এদের জুড়ি মেলে না।

বকরুদ্দিন কয়েদখানার খানা সম্বন্ধে খারাপ কথা বলেছে, তাকে হাঁকাও চার ডাণ্ডা। গোবিন চাঁদের মনে জেলের শিকলি কাটার বাসনা উঁকি মেরেছে, টিকটিকিতে (বেত মারার ষ্ট্যাণ্ড) চাপিয়ে তার পাছার ছাল উপড়ে নাও।

মণ্ড ফো জেলার সাহেবের বিল্লী গোঁফ নিয়ে তামাশা করেছে, তিনদিন ডাণ্ডা বেড়িতে ঝুলিয়ে বুঝিয়ে দাও দুনিয়ার হাল হকিকত কেমন!

পেটি অফিসার টিণ্ডালদের দুআয় অতি মসৃণ নিয়মে কালাপানির কয়েদ-নীতি দিনের পর দিন এগিয়ে চলে। মাত্র কয়েক গণ্ডা পয়সার জন্য কয়েদীদের সমস্ত অসন্তোষকে শায়েস্তা করে বশংবদ টিণ্ডাল পেটি অফিসাররা দ্বীপান্তরের কয়েদনীতিকে নিরঙ্কুশ এবং অব্যাহত রাখে। শিকারী কুত্তার মত এদের আনুগত্য। নিমকহারামী এদের ধাতে নেই।

যতগুলি গুণ থাকলে টিণ্ডালান কি পেটি অফিসারনী হওয়া যায়, তার চেয়ে কিছু বেশীই আছে হাবিজার।

পুরা পাঁচ হাত লম্বা; মাথার আধাআধি পর্যন্ত টাক, তারপর খাবলা খাবলা তামাটে চুল, গোল নোংরা দুটো চোখ, শাড়িটা জানু পর্যন্ত, লম্বা লাউয়ের মত দুটো স্তন, অস্বাভাবিক দীর্ঘ দুই হাত—এই হল পাঠান জেনানা হাবিজার চেহারা নমুনা।

রেগুবারিক জেলে আসার পর দু দশ রোজ চুপচাপ রইল হাবিজা। প্রথম প্রথম সব কয়েদীই চুপচাপ থাকে। কোন ঝামেলা বাধায় না।

পুরা চারটে দিন লাগে বঙ্গোপসাগরের কালাপানি পাড়ি দিয়ে আন্দামান পৌছতে। কয়েদী যত হারামী যত দুশমনই হোক, চারটে দিন নিরবচ্ছিন্ন দরিয়া দেখতে দেখতে তার অন্তরাত্মা ছম ছম করে ওঠে। সত্য-মিথ্যা আজগুবি, নানা কথা শুনে শুনে আন্দামানের কয়েদখানা সম্বন্ধে আগে থেকেই কয়েদীর মনে ভয় জমে থাকে। চারটে দিন বঙ্গোপসাগরের সাঙ্ঘাতিক চেহারা দেখে সেই ভয়টা হাজার গুণ বাড়ে। আন্দামান পৌছে সেই ভয়ের প্রতিক্রিয়ায় কিছুদিন কয়েদীগুলো যেন বোবা মেরে থাকে। মেনল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে পয়লা পয়লা চুপচাপ থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি?

হাবিজাও দু দশ রোজ গণ্ডগোল করল না। এই নতুন জায়গা, অচেনা কয়েদখানা, অপরিচিত সব কয়েদিনী—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এখানকার হালচাল, জমানা, কেতা, সমস্ত কিছু বুঝে নেবার চেষ্টা করল।

এমন করেই দু দশটা রোজ পার করে দিল হাবিজা। তারপর একটু একটু করে অন্য কয়েদিনীদের নিজের মহিমা বোঝাতে শুরু করল।

কয়েদিনীরা কাতার দিয়ে খেতে বসেছিল। টিণ্ডালান আর পেটি অফিসারনীরা খানা দিচ্ছিল।

হাবিজার ঠিক পাশেই বসেছিল প্রেমা। গোলগাল বেঁটে আকারের মাংসল এক কয়েদিনী। প্রেমার বর্তনে খা...র সঙ্গে সঙ্গে হাবিজা ছোঁ মারল।

...া তীক্ষ্ণ গলায় প্রেমা চেঁচিয়ে ...ল, 'শালী খানা লে গিয়া, আমার জান লে গিয়া—'

তৎক্ষণাৎ দুই থাবায় প্রেমার খানা আত্মসাৎ করে ফেলে হাবিজা। বেঁটে বেঁটে হাত বাড়িয়ে হাবিজার মুখ থেকে খানা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে আর সমানে চিল্লাচ্ছে প্রেমা, 'শালী হারামী, ঢেঙী খচরী, আমার খানা গিলে ফেলল।'

অস্বাভাবিক লম্বা একটা হাতে প্রেমাকে অনেকটা দূরে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে হাবিজা। প্রেমার বেঁটে হাত দুটো তার মুখ পর্যন্ত পৌছাচ্ছে না।

অনেকখানি খানা এক সঙ্গে মুখে পুরে ফেলেছে হাবিজা। সেগুলো গিলতে গিলতে চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ছে। অচর্বিত খাদ্যের পিণ্ড কি সহজে গেলা যায়! গলনালী দিয়ে প্রবল শক্তিতে ঠেলে সেগুলোকে পাকস্থলীর দিকে পাঠাতে পাঠাতে জানটা বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে হাবিজার। গলার শিরগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ফুলে উঠেছে।

প্রেমা যখন দেখল খানা ফেরত পাবার আর ভরসা নেই, তখন মারমুখী হয়ে উঠল। লোহার বর্তনটা তুলে হাবিজার শির বরাবর ছুঁড়ে মারল। একান্ত অবলীলায় এক হাতে বর্তনটা লুফে নিল হাবিজা।

প্রেমা সমানে চিল্লাচ্ছে, কাঁদছে আর খিস্তি করছে, 'কুত্তীর বাচ্চা, খচরীর বাচ্চার জান নেব। পেট ফাঁসিয়ে আমার খানা বার করব।'

প্রেমা ফুঁসছে। দুই চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। খিস্তির তোড়ে সে হাবিজার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ফেলছে। আর বেঁটে বেঁটে দুই হাতে সমানে কীলঘুষা হাঁকাচ্ছে।

এতক্ষণ মুখ এবং একটা হাত আটক ছিল। একটা হাতে প্রেমার কীলগুঁতো আক্রমণ ঠেকিয়ে যাচ্ছিল হাবিজা। খানা গিলে এবার সুবিধা হল। মুখ এবং ...ত কাজে লাগানো গেল। প্রেমার দিক থেকে যে পরিমাণ খিস্তি আসছে, হাবিজার মুখ থেকে তার বিশগুণ ফেরত যেতে লাগল। হাতে লোহার কাঙনা (বালা) ছিল। সেটা দিয়ে প্রেমার চোয়াল বরাবর প্রচণ্ড এক

ঘা বসিয়ে দিল হাবিজা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। পাক খেয়ে ঘুরে পড়ল প্রেমা। গোঙাতে লাগল, 'এ পেটি অফিসারনী, এ টিণ্ডালান আমাকে মেরে ফেলল, মেরে ফেলল।'

পেটি অফিসারনী এবং টিণ্ডালান [illegible] এল। হাবিজাও উঠে [illegible]ড়াল তার চোখজোড়া ধিকি ধিকি জ্বলছে।

এক পক্ষে হাবিজা একা, অপর পক্ষে রেণ্ডিবারিক কয়েদখানার সমস্ত টিণ্ডালান আর পেটি অফিসারনী। প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে কিছুটা অশ্রাব্য খিস্তির আদান প্রদান হয়ে গেল।

পেটি অফিসারনীরা হাবিজার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাল কষছিল। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল, কাঠের একটা ধারাল খণ্ড বাগিয়ে ক্রূর চোখে চেয়ে রয়েছে হাবিজা। এগুতে এগুতে পেটি অফিসারনীরা থমকে পড়ল। ভাবল, হাবিজাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে। ভাবলই শুধু, কিন্তু কাজটা আদপেই এত সোজা নয়। পাঁচ হাত লম্বা তাদের এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিনী বড় মারাত্মক।

মারামারিটা আর হল না। কিন্তু দুই তরফে আর এক প্রস্থ অশ্লীল গালির আদান প্রদান হয়ে গেল।

বিকালে কয়েদিনীদের কাজকর্ম চুকে যাবার পর হাবিজাকে ধরল সোনিয়া। বলল, 'তোর সাথ আমার বাতচিত আছে।'

'কি বাত ?'

দুজনে একটা টিলার মাথায় নারকেল গাছের ছায়ায় এসে বসল।

হাবিজার সঙ্গে সোনিয়ার অনেক কালের জান পয়চান। মেনল্যাণ্ডের কয়েদখানায় পুরা দুটো বছর তারা একসঙ্গে কাটিয়েছে। একই সঙ্গে তারা কালাপানি এসেছে। দুজনেই দুজনের জিন্দগীর খবর রাখে, দিলমর্জি, জান-জমানার কথা জানে, সুখদুঃখের হদিস রাখে। অনেক দিন কয়েদখানায় এক সঙ্গে কাটিয়ে পাঠান আওরত হাবিজা আর বিহারী জেনানা সোনিয়ার মধ্যে একটা বন্ধন গড়ে উঠেছে। কয়েদখানার সঙ্গিনীদের মধ্যে [illegible] মহব্বতি, তার রীতিই অদ্ভুত।

সোনিয়া বলল, 'প্রেমার খানা নিলি কেন ?'

উদাসীন স্বরে হাবিজা বলল, 'এমনি।'

'এমনি না, ঠিক কথা বল। তুই তো বেশি খাস না।'

হাবিজা এবারও এড়িয়ে গেল। বলল, 'এমনি নিয়েছি। দিল হল, তাই নি[illegible]।'

[illegible]।' কিছুক্ষণ একদৃষ্টে হাবিজার মুখের দিকে চেয়ে রইল সোনিয়া। তার লম্বাটে রেখাময় মুখটা থেকে গূঢ় কোন কারসাজি বার করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'তোর সাথ তো আমার দু দশ রোজের জানাশোনা নয়, তোকে আমি চিনি। বল, কেন প্রেমার খানা নিলি?'

অনেকটা সময় ধরে কি যেন ভাবতে লাগল হাবিজা।

এখন বিকাল। সমুদ্র ফুঁড়ে ঠাণ্ডা, হিম হিম বাতাস উঠে আসছে। সেই বাতাস সোনিয়া হাবিজার মুখের উপর ক্রমাগত ঘা মেরে চলেছে। কি যেন ভাবছে হাবিজা! বিকালের নরম রোদে তার কদাকার মুখটা বড় রহস্যময় ঠেকছে।

সোনিয়া বলল, 'কি রে, কথা বলছিস না কেন?'

এক একটা সময় মানুষকে যেন জাদু করে। যে পাঠান আওরত হাবিজা খেঁকিয়ে ছাড়া কথা বলে না, এখন তার স্বরটা আশ্চর্য মুলাইম শোনায়, 'বুঝলি সোনিয়া, আমি পেটি অফিসারনী বনতে চাই।'

'পেটি অফিসারনী বনবি, সে তো ভাল কথা। লেকিন প্রেমার খানা নিলি কেন? কাঙনা (বালা) দিয়ে ওর শির ছেঁচলি কেন?'

হাবিজা হাসল। বলল, 'ছাখ ছোকড়ি তোর বয়স কম, মাথায় এক ছটাক বুদ্ধিও নেই। থোড়া বুদ্ধি থাকলে বুঝতি, এ্যায়সা এ্যায়সা পেটি অফিসারনী হওয়া যায় না। দস্তুর মত এলেম দেখাতে হয়। পিটিয়ে পিটিয়ে কয়েদিনীর জান চৌপট করতে না পারলে কি পেটি অফিসারনী হওয়া যায়!'

'প্রেমার চোয়াল ফাটিয়ে বুঝি এলেম দেখালি?'

হাবিজা হাসতে লাগল। কিছু বলল না।

সো[illegible] আবার বলল, 'টিণ্ডালান পেটি অফিসারনীরা তোর ওপর ক্ষেপে আছে। [illegible]র জান নেবে বলেছে। তুই ওদের কাছে মাফি মেঙে নে।'

তাচ্ছিল্যে কালো ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল হাবিজার। ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বলতে লাগল, 'কুত্তীদের বাত ছোড়্। আমার জান নেবে! বহুত দেখেছি।

জানিস জোড়া খুন করে কালাপানি এয়েছি। জান দেবার আগে দু দশটা জান জরুর নেব, হাঁ! কথাটা ইয়াদ রাখিস সোনিয়া।'

বলতে বলতে হাবিজা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আরো অনেকটা সময় কাটে। [illegible] রঙ মরে আসে।

হঠাৎ সোনিয়া বলে, 'পেটি অফিসারনী হয়ে কি হবে?'

'তলব (মাইনে) মিলবে; পয়সা পাব।'

'কয়েদখানায় পয়সা দিয়ে কি করবি? খরচা তো আর করতে পারবি না।'

এক মুহূর্ত চুপচাপ থাকে হাবিজা। তারপর বলে, 'তুই তো সব জানিস সোনিয়া, তোকে সব বলেছি।' একটু থামে, আবার শুরু করে, 'মুল্লুকে আমার আদমীটা রয়েছে। একটা পা তার কাটা, জিন্দগীটা তার বেকার হয়ে গিয়েছে। ভিখ মেঙে সে খায়।'

গলাটা ধরে আসে হাবিজার। কুৎসিত কদাকার মুখটা বড় করুণ দেখায়। আশ্চর্য! হাবিজা কাঁদে না। আঁখ তার কোনকালেই ভিজে না; চিরদিন শুকনাই থাকে।

সব কথাই জানে সোনিয়া।

হাবিজার আদমীর নাম বকাউল্লা। কুঁচকি পর্যন্ত বকাউল্লার একটা পা কাটা। আদমীটার শরীরে অফুরন্ত শক্তি, কিন্তু সেই শক্তি প্রয়োগ করার উপায় নেই। একটা পা বাতিল হয়ে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা সে হারিয়েছে। ভিখ মাঙা ছাড়া তার গতি কি?

যতকাল কয়েদখানার বাইরে ছিল, ততকাল বকাউল্লার খানা আস্তানা— সমস্তই যুগিয়েছে হাবিজা। কিন্তু এখন যে আদমীটার কি অবস্থা, কে বলবে? আন্দামান আসার আগে খবর পেয়েছিল, বকাউল্লা লাহোর শহরে ভিখ মেঙে পেট চলাচ্ছে।

হাবিজার পাঁচ হাত লম্বা বেঢপ দেহটা কাঁপিয়ে বড় রকমের একটা শ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'আদমীটা যে কি করছে, খুদা জানে।'

সোনিয়া কিছু বলল না।

হাবিজা বলল, 'বেঁচে আছে না মরে গেছে, কে বলবে? [illegible]রোজ যে আদমীটার খবর পাই না।'

কুৎসিত কদাকার হাবিজাকে এই মুহূর্তে তত খারাপ দেখায় না। অদ্ভুত

এক যন্ত্রণায় তার চোখ দুটো ফেটে যেন রক্ত ছুটে আসবে। বার বার তার গলাটা জড়িয়ে আসে।

সোনিয়া সান্ত্বনা দেয়, 'মরবে কেন, বেঁচেই আছে।'

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ কি বিচিত্র! মেনল্যাণ্ডের কয়েদখানায় মাঝে মাঝে বকাউল্লার কথাই বলত হাবিজা। সে কথায় মমতার তাপ ছিল না। কিন্তু কালাপানির এই কয়েদখানায় সেই আদমীটার জন্যই তার আঁখ ফেটে আঁশু বেরিয়ে পড়তে চায়। বিরাট দেহের মধ্যে লুকানো হাবিজার আওরতী দিলটা অসহ্য বেদনায় টনটন করে ওঠে।

এই দ্বীপ কয়েদীকে হৃদয়হীন বানায়। আবার বুঝি কখনও কখনও কয়েদীর দিলে মমতারও জন্ম দেয়।

হাবিজা বলল, 'পেটি অফিসারনী আমার বনতেই হবে। তলব (মাইনে) যা পাব, আদমীটাকে পাঠিয়ে দেব। কি যে করছে আদমীটা! একটা পা নেই—'

শুনতে শুনতে বুকের মধ্যটা হু-হু করে ওঠে সোনিয়ার। কেন জানি সেই মরদটার কথা মনে পড়ে যায়। সেই রামদেও তিওয়ারী—যাকে একেবারে ভুলে যাবার জন্য জেদ ধরে সে আন্দামান এসেছে। আশ্চর্য! সেই মানুষটার কথাই এই মুহূর্তে মনে পড়ে। নাঃ, রামদেও তিওয়ারীর ভাবনা থেকে কোনদিন নিস্তার মিলবে না। মরদটা সোনিয়ার হাতে মরবে। আবার তারই কথা ভাবিয়ে ভাবিয়ে সোনিয়াকে একটু একটু করে মারবে। বেদরদী শয়তান!

হাবিজা আবার বলল, 'চোদ্দ বছরের সাজা খাটতে আন্দামান এসেছি। এই কটা রোজ পার হলেই মুল্লুকে ফিরব। আদমীটাকে নিয়ে আবার ঘর করব।'

সোনিয়ার দিলের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চোদ্দ বছর পর তারও সাজার মেয়াদ ফুরাবে। হাবিজার ভবিষ্যৎ আছে, দিলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে। সাজা ফুরালে হাবিজা বকাউল্লাকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবে। কিন্তু সোনিয়ার কি আছে? তার অতীত এক দুর্বহ যন্ত্রণা, বর্তমান অসহ্য এক জ্বালা, আর ভবিষ্যৎ তো নিরন্ত অন্ধকার। এত বড় দুনিয়ায় হাবিজার মত তার এমন একটা মানুষ নেই, যার কথা ভেবে ভেবে চোদ্দটা বছর এক নিমেষে পার করে দেওয়া যায়। চোদ্দ বছর পর যাকে নিয়ে সে নতুন করে

জীবনের স্বাদ পেতে পারত, তাকে তো নিজের হাতেই কোতল করে এসেছে সোনিয়া। চোদ্দ বছরের ওপারে হাত বাড়িয়ে ধরবার মত কিছুই নেই তার। চোদ্দ বছরের ওপারটা ধূ-ধূ, শূন্য, দুঃসহ।

দিল টুটিয়ে গলা ফাটিয়ে আকণ্ঠ এক চিৎকার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে উঠে আসতে চাইছে। আন্দামানের এই নিদারুণ কয়েদখানায় ভবিষ্যৎ জীবনের চেহারাটা আন্দাজ করে শিউরে উঠল সোনিয়া।

পঁচিশ

দু পাঁচ দিনের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে বসন্ত এসে পড়বে। তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে মৌসুমী হানাদার মেঘ আন্দামানের আকাশে ছুটে আসতে শুরু করেছে। উপসাগর ফুঁড়ে একটা গোঁ গোঁ গম্ভীর গর্জন ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। দরিয়া থেকে বিরাট বিরাট হালফা (তুফান) পাহাড়ের মত ফুলে ফুলে ফুঁসে ফুঁসে দুর্জয় বেগে দ্বীপের দিকে ধাওয়া করে আসছে। কালো কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের নীচ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গোয়েলেথ পাখি উত্তর দিকে পাড়ি জমিয়েছে। শীত আসার আগে বাতাসে হাজার হাজার মাইল ভাসতে ভাসতে মানস সরোবর থেকে এই পাখিরা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ডিম পাড়তে এসেছিল। শীত ফুরিয়ে আসছে; আবার তারা মানস সরোবরে ফিরে চলেছে।

আকাশ জোড়া বিরাট একটা মৃদঙ্গে ঘা পড়ছে। গুরু গুরু শব্দটা সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে মিশে এই সৃষ্টি ছাড়া দ্বীপে একটা ভীষণ সর্বনাশকে টেনে আনছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে বসন্তর মাহাত্ম্যই ভিন্ন!

পশ্চিমা ভিখনটা পিনিকের সঙ্গে কি মিশিয়ে ছিল, সে-ই জানে! কিন্তু তার ক্রিয়াটা সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। লখাই ভয়ানক কাহিল হয়ে পড়েছে।

লা ডিনের কুঠুরির গরাদে সেই যে টলে পড়েছিল লখাই, আজ আর উঠে বসার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। টলে পড়ার পর কখন যে ভিখন আহীর আর মোপলা হারামী বকরুদ্দিন তাকে ধরাধরি করে তার কুঠুরিতে রেখে গিয়েছে, খেয়াল করতে পারে না। কাল দুপুর থেকে বাকী দিনটা আর পুরা একটা রাত বেহুঁশ অবস্থায় কেটেছে লখাইর। বিকালে পেটি অফিসার নারকেলের ছোবড়ার তার নিতে এসেছিল। লা ডিনই তার বুঝিয়ে দিয়েছে। রাত্রে ওয়ার্ডার মোহর গাজী বার কতক ডাকাডাকি করে জবাব না পেয়ে কিছুক্ষণ খিস্তি করে গিয়েছে। কিছুই হুঁশ নেই লখাইর।

সেলুলার কয়েদখানায় সকাল হল।

আজ আর মাথা খাড়া করতে পারছে না লখাই। আচ্ছন্ন, অস্থির দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল সে। চার পাশ থেকে কুঠুরির চারটে দেওয়াল যেন একটু একটু করে চেপে আসছে, ছাদটা নেমে আসছে। পিছনের দেওয়ালে সেই ছোট ফোকরটা অনেক খুঁজেও বার করতে পারল না লখাই। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে অফুরন্ত, পর্যাপ্ত বাতাস। তবু লখাইর মনে হল, শ্বাসনলীটা বন্ধ হয়ে আসছে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে নোনা বাতাসের যোগাযোগ রাখতে প্রাণটা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে। বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে।

আকাশের কালো কালো জমাট মেঘ ফেড়ে রোদের দীর্ঘ ধারাল রেখা এসে পড়েছে সেলুলার জেলের মাথায়।

পেটি অফিসার নসিমুল গণি গরাদের ফাঁকে নাক ঢোকাল। যথারীতি শ খানেক অশ্রাব্য খিস্তি আউড়ে ডাকল, 'এ লখাই, শালে আন্দামানের জনাব বনে গেলি যে! নালায়েক হারামীকা বাচ্চা, কামান (কাজ) নেই। সিরকারের (সরকারের) বড় মেহমান এয়েছে! খানা গিলবে আর ঘুমাবে, ও সব আরাম কালাপানির কয়েদখানায় চলবে না। ওঠ শালে! সকাল হয়েছে, মালুম পাচ্ছিস না বুঝি! মালুম পাইয়ে দিচ্ছি, এ্যায়সা ডাণ্ডা হাঁকবো! শালেকে আজ ছোবড়া ছিলতে দেব না। হুইল ঘানিতে চাপাবো।'

কম্বল পেঁচিয়ে পড়ে ছিল লখাই। পেটি অফিসারের আওয়াজ পেয়ে ঘোর ঘোর রক্তাভ চোখে গরাদের দিকে তাকাল। তাকালই শুধু, আবছা অস্পষ্ট একটা মানুষের আকার ছাড়া কিছুই নজরে পড়ল না। আপনা থেকেই চোখ বুঁজে গেল।

চাবি ঘুরিয়ে গরাদের তালা খুলল পেটি অফিসার নসিমুল গণি। খেঁকাতে খেঁকাতে কুঠুরির মধ্যে ঢুকল, 'শালে খুব যে দিল্লাগী করছিস! একবার আঁখ মেলছিস আবার বুঁজছিস! পিটিয়ে পিটিয়ে আজ তোর জান চৌপট করে ফেলব।'

পেটি অফিসারের এত শাসানিতেও লখাই উঠবার লক্ষণ দেখাল না। নড়াচড়ার তাগদই সে হারিয়ে ফেলেছে।

আঁখ থেকে আগ ঠিকরে বেরুল। নাকের মধ্য দিয়ে যে কালো কালো রোঁয়াগুলো বেরিয়ে পড়েছে সেগুলো নড়তে লাগল। গলার মধ্য দিয়ে একটা উত্তেজিত গর গর শব্দ বেরিয়ে আসছে। পেটি অফিসার দুই হাতে লখাইর

গর্দানটা আঁকড়ে ধরল। গর্দান আঁকড়েই চমকে উঠল। লখাইর দেহ থেকে খানিকটা অসহ্য উত্তাপ তার হাতের তালুটা যেন পুড়িয়ে দিল।

লখাইর গর্দানটা ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল পেটি অফিসার। চোখ দুটো কুঁচকে সন্দিগ্ধ ভীষণ দৃষ্টিতে কি যেন দেখল। তারপরেই ডাকল, 'আই হারামী—'

লখাই জবাব দিল না।

দুই থাবায় লখাইকে প্রচণ্ড ঝাঁকানি মেরে পেটি অফিসার গর্জে উঠল, 'আই লখাই, কুত্তীকা বাচ্চা, জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিস! আমার সাথ দিল্লাগী করছিস!'

কোমরের খাঁজ থেকে তেলপাকানো বেতের মোটা ডাণ্ডাটা টেনে বার করল পেটি অফিসার। লখাইর পাছায় একটা গোঁত্তা হাঁকিয়ে বলল, 'ওঠ শালে—'

আন্দামান মানেই সেলুলার জেল। আর সেলুলার জেল মানেই পেটি অফিসার। পেটি অফিসার মানেই পাঠান। পাঠান মানেই মুখে খিস্তি হাতে ডাণ্ডা এক দুশমন মূর্তি।

বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর দ্বীপের হৃদয় কোন কালে ছিল কি না, ইতিহাসে তার নজীর নেই। যদি থেকেও থাকে, নসিমুল গণির মত পেটি অফিসারেরা অর্ধ শতাব্দী ধরে তাকে তিল তিল করে হত্যা করেছে। হৃদয়হীন এই দ্বীপ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন মহিমায় বিরাজ করছে।

পেটি অফিসার লখাইর গর্দান ধরে খাড়া বসিয়ে দিল। লখাই টলে পড়ছিল, মুণ্ডটা ধরে টানতে টানতে তাকে কুঠুরির বাইরে আনল নসিমুল। সমানে চিল্লাতে লাগল, 'শালেকে আজ হুইল ঘানিতে জুড়ে দেব। খানা কি এমনি এমনি আসে! সিরকার (সরকার) কি কালা পানিতে আরামখানা জমিয়েছে! সশুরকা কোঠি পেয়েছ হারামী!' একটু থামে। গলার শির-গুলো উত্তেজনায় কাছির মত ফুলে ওঠে নসিমুলের। আবার চিল্লায়, 'হুইল ঘানিতে জুড়ে দিলে বুঝবি খানা কোথা থেকে আসে! বুঝবি দরিয়ায় কত পানি!'

বলেই একদমে লাচাড়ির মত গুটিকতক গালি আউড়ে যায়।

পাশের কুঠুরি থেকে লা ডিন সমস্ত দেখেছিল। সে ডাকল, 'এ পেটি অফিসার—'

'হাঁ জী—'

'ইধর এস।'

পেটি অফিসার লা ভিনের কুঠুরির সামনে এল।

লা ভিন বলল, 'কেন লখাইকে তখলিফ দিচ্ছ। ওর বোখার হয়েছে।'

পেটি অফিসার যেন তাজ্জব বনে গেল। সেলুলার কয়েদখানার কয়েদীদের যে বোখার হয়, বা হওয়া উচিত, এ তার ধারণার বাইরে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। তারপর প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাল। 'না না লা ভিনজী, লখাই শালে ভুখোড় হারামী। বোখারের নাম করে কাজে ফাঁকি মারতে চায়। দুই ডাণ্ডা হাঁকালে সিধা হয়ে যাবে কুত্তাটা।'

'না।'

কঠিন গম্ভীর স্বরে লা ভিন বলতে লাগল, 'ওর বোখার হয়েছে। ওকে সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) নিয়ে যাও। আভী যাও।'

লা ভিনের স্বরে এমন কিছু ছিল, পেটি অফিসারের মত দুর্দান্ত পাঠানও আর কিছুই বলতে পারল না। গুটি গুটি পায়ে লখাইর সামনে এসে দাঁড়াল।

গরাদের ফাঁকে ফাঁকে কয়েদীদের মুখ দেখা দিয়েছে। অবাক হয়ে আজব কয়েদী লা ভিন আর পেটি অফিসারের কাণ্ড দেখছে তারা।

মুখের চেহারা নমুনা কদর্য করে গজ গজ করছে পেটি অফিসার। কয়েদীরা আন্দাজ করল, পেটি অফিসার গালি দিচ্ছে। কিন্তু সেই গালির একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

লখাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে।

পেটি অফিসারের ইচ্ছা ছিল, আজ থেকেই লখাইকে ঘানিতে চাপায়। কালাপানির কয়েদখানা কি চীজ, মালুম পাইয়ে দেয়। কিন্তু এমন একটা সদিচ্ছাকে আপাতত বাগ মানিয়ে রাখতে হল। খুদার দুনিয়ার বাইরে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপের স্বরূপ আর লখাইকে জানানো গেল না। যত আপসোস হল তার বিশ গুণ হল আক্রোশ। ভাবল দু দশ রোজের মধ্যেই কালাপানির মহিমা সে লখাইকে টের পাইয়ে দেবে।

পেটি অফিসার খেঁকিয়ে উঠল, 'চল শালে, সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) যাবি।'

বলেই দুই পা ধরে টানতে টানতে লখাইকে সিঁড়ির মুখে নিয়ে এল।

সামনের কুঠুরিটা খুলে একটা কয়েদীকে বার করল। তার ঘাড়ে লখাইকে চাপিয়ে বলল, 'নীচে চল।'

পাথুরে সিঁড়ি কাঁপাতে কাঁপাতে পাঠান পেটি অফিসার নীচে নামল।

লখাইর সেলের ঠিক পাশেই পরাণ্ডপের সেল। কুর্তা প্যাণ্ট মাথায় বাঁধা। উলঙ্গ পরাণ্ডপে লম্বা কদমে সেলের মধ্যে ঘুরছে। ঘুরছে আর হাসছে। হাসছে আর বিড় বিড় করে বকছে, 'লখাই শালের খুব এলেম। বিশ পঁচাশ রোজ কালাপানির কয়েদখানায় কাটিয়ে বুদ্ধি খুলে গিয়েছে। বোখারের নাম করে কাজে ফাঁক মারছে। শালে আমার পাক্কা দোস্ত বনতে পারবে।'

বকতে বকতে গলা ফাটিয়ে হা হা করে হেসে উঠল পরাণ্ডপে।

সেলুলার জেলের মধ্যে কয়েদীদের জন্য একটা ছোট সিকমেনডেরা (হাসপাতাল) রয়েছে। লখাইকে নিয়ে প্রথমে সেখানে এল পেটি অফিসার।

নেটিব ডাক্তার বুক পেট বাজিয়ে লখাইকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করল। বলল, 'বোখারটা বেশ শক্তই বাধিয়ে বসেছে। এখানে হবে না, রস দ্বীপের ডাক্তারখানায় যেতে হবে। সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের পারমিশন করিয়ে রাখব। বিকালে এটাকে নিয়ে 'রস'-এ যাবে।'

ডাক্তার অন্য রুগীর তদারকে গেল। পেটি অফিসার ছুটল চার নম্বর ব্লকের দিকে। এখনও কয়েদীদের সেলের তালাই খোলা হয় নি।

আর হাসপাতালের বারান্দায় বেহুঁশ হয়ে লখাই পড়ে রইল। জ্বরের অসহ্য তাপে তার চামড়া পুড়ে যাচ্ছে।

পুরা দিনটা হাসপাতালের বারান্দায় কাটল লখাইর। এক কণা খাদ্য কি কি এক বিন্দু দাওয়াই জুটল না। কেউ খোঁজও নিল না লখাইর।

আন্দামানের এই নিদারুণ কয়েদখানা কয়েদীর জীবন সম্বন্ধে একেবারেই নির্বিকার, উদাসীন।

বিকালের দিকে জ্বরের প্রকোপ কমল, বেহুঁশ অবস্থাটা কাটল। বারান্দার মোটা একটা থামে ঠেসান দিয়ে বসল লখাই। অসহ্য যন্ত্রণায় ঘাড় থেকে মাথাটা যেন খসে পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পেটি অফিসার নসিমুল গণি, পুলিশের একজন জমাদার, জন দুই সিপাই এসে পড়ল। ডাক্তারের কাছ থেকে জেল সুপারিনটেনডেণ্টের পারমিশন মিলল। লখাইকে নিয়ে সকলে এবারডীন জেটিতে রওনা হল।

সেলুলার জেলের বাইরে এসে পড়ল সকলে।

কত দিন এই দ্বীপের কয়েদখানায় কাটাল, এই মুহূর্তে লখাই ঠিক করে উঠতে পারছে না। জ্বরের দাপটে স্নায়ুগুলো এখন শিথিল, স্মৃতিটা বড় দুর্বল। একবার মনে হল, সেলুলার জেলে সে বিশ দিন আটক রয়েছে। আবার মনে হল, পুরা চল্লিশ দিনের এক সেকেণ্ড কম নয়। হিসাবটা কিছুতেই মেলাতে পারে না লখাই।

দুই সিপাইর কাঁধে দুই হাতের ভর রেখে টলতে টলতে এবারডীন জেটিতে এসে পড়ল লখাই। উতরাই বেয়ে নামতে নামতে হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে পড়ছিল। তবু খুব ভাল লাগছে লখাইর। এই কটা দিন সেলুলার জেলের মাথায় এক টুকরা আকাশ, সারি সারি কুঠুরি, ওয়ার্ক শপ, পেটি অফিসার টিণ্ডাল আর ওয়ার্ডার দেখে দেখে চোখের বোধ ছিল না।

সামনে নীল জলের উপসাগর, দূরে উধাও ধাওয়া সমুদ্র। অনেক দূরে ধোঁয়ার পাহাড়ের মত হ্যাভলক দ্বীপটা চোখে পড়ে কি পড়ে না। সকালে কালো কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মৌসুমী মেঘ আন্দামানের আকাশটাকে ঘিরে ফেলেছিল। এখন সেই মেঘ উড়ে উড়ে আকাশ আর সমুদ্র যেখানে এক হয়ে মিশেছে, তার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বিকালের নরম রোদে উপসাগরের মৃদু মৃদু ঢেউগুলি ঝিকমিক করে। উড়ুক্কু মাছগুলি উপসাগরময় ছুটে বেড়ায়।

চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল লখাইর। এই উপসাগর, বিকালের নরম রোদ, উড়ুক্কু মাছের ফিনফিনে রূপালী ডানা, সব মিলে মিশে লখাইর সমস্ত যন্ত্রণা, পিনিকের ব্যারাম বেমালুম ভুলিয়ে দিল।

একটু পরেই লঞ্চ ফেরি এসে পড়ল এবারডীন জেটিতে।

যথারীতি সিপাইদের কাঁধে ভর দিয়ে মোটর বোটে উঠল লখাই।

উপসাগরটা পাড়ি দিতে মিনিট দশেকের বেশি লাগল না। 'রস' দ্বীপের জেটিতে নেমেই চমকে উঠল লখাই।

জেটির এক কিনারে গুটিকতক মেয়ে মানুষ দলা পাকিয়ে বসে রয়েছে। তাদের ঘিরে রয়েছে জনকতক পুলিশ, একজন জমাদার আর তিন জন টিণ্ডাল। মেয়েমানুষগুলোর মধ্যে সোনিয়া বসে রয়েছে।

একবার দেখেই চিনতে পারল লখাই। ঝড়ের দরিয়ায় পুরা একটা রাত যে নারীর সান্নিধ্যে কাটানো যায়, যার নরম হাতের ডলায় বুকের যন্ত্রণা উবে যায়, তাকে কি এত সহজে ভোলা যায়!

কদিন ধরেই রস দ্বীপের সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) আসছে সোনিয়া।

তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। মাংসের একটা ডেলা সমস্ত তলপেটটা জুড়ে চাকা বেঁধে আছে। মাংসের ডেলাটা যখন ওঠানামা করে, পেটের মধ্যটা তোলপাড় করে একটা যন্ত্রণার ঢেউ দেহময় ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। তখন মনে হয় তলপেটটা শরীর থেকে ছিঁড়ে পড়বে। দাঁতে দাঁত পিষেও যন্ত্রণার বেগ সামলাতে পারে না সোনিয়া। মাঝে মাঝে বেহুঁশ, অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

রেণ্ডিবারিক জেলের হাসপাতালে কদিন সুঁই (ইঞ্জেকসন) নিয়েছে সোনিয়া। কিন্তু যন্ত্রণার কোন আসানই হয় নি। যন্ত্রণাটা বেড়েই চলেছে। মাংসের ডেলাটা ক্রমাগত ফুলছে। এ এক দুরারোগ্য স্ত্রী-ব্যাধি।

রেণ্ডিবারিক জেলের ডাক্তারই রস দ্বীপের হাসপাতালে পাঠিয়েছে সোনিয়াকে। কদিন ধরে টিণ্ডালান পেটি অফিসারনীদের পাহারায় রস-এ আসছে সে।

পশ্চিমা ভিখনটা তো মিথ্যা স্তোক দেয় নি। সত্যিই তো সোনিয়া রস দ্বীপে এসেছে!

লখাই ভাবল, সোনিয়ার সঙ্গে একটু দেখা করা আর দু চারটে কথা বলার জন্য সে পিনিক ফুঁকেছে; পিনিকের নেশার ব্যারাম বাধিয়েছে। কটা দিন অসহ্য যন্ত্রণায় একেবারে কাবু হয়ে রয়েছে।

সোনিয়াকে দেখতে দেখতে বুকের মধ্যটা মোচড় দিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডটা হাজার গুণ জোরে লাফালাফি করতে লাগল। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় দুর্বল, কাহিল শরীরটা কাঁপছে।

মোটর বোট দেখে সোনিয়ারা উঠে পড়েছিল। সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানা থেকে দুপুরে তারা রস দ্বীপে এসেছিল; এখন ফিরে যাচ্ছে।

দুই সিপাইর কাঁধে ভর দিয়ে সামনের দিকে এগুতে এগুতে লখাই ডাকল, 'সোনিয়া—'

প্রথমটা শুনতে পায় নি সোনিয়া। ঘাড় গুঁজে অন্য কয়েদানীদের সঙ্গে মোটর বোটটার দিকে হাঁটছিল।

ক্ষীণ, কাতর স্বরে আবার ডাকল লখাই, 'আঁই সোনিয়া—'

চমকে সোনিয়া মাথা তুলল। এক লহমায় সে লখাইকে চিনে ফেলেছে। এগুতে এগুতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোনিয়া। অস্ফুট, তাজ্জব গলায় বলল, 'এ মরদানা—তুই !'

লখাইকে নিয়ে যে জমাদার এসেছে, সে খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে উল্লু, আওরতের সাথ মুলাকাত মহব্বত করতে 'রস'-এ এসেছিস ! পিটিয়ে জান বেচাল করে দেব।'

যে সিপাই দুটোর গর্দানে ভর রেখে লখাই এগুচ্ছিল, তাদের দিকে চেয়ে জমাদার হুমকে উঠল, 'হারামীটাকে জলদি নিয়ে চল।'

সিপাই দুটো লখাইকে টানতে টানতে এক দমে সামনের দিকে বিশ কদম এগিয়ে গেল।

টিণ্ডালান রামপিয়ারী সোনিয়াকে নিয়ে এসেছিল। পাতাহীন চোখে এক-দৃষ্টে সোনিয়ার রকম সকম দেখছিল আর ফুঁসছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে রামপিয়ারী হ্যাঁচকা টান মারল। একটানে সোনিয়াকে মোটর বোটে এনে তুলল।

সোনিয়া এবং লখাইর মধ্যে এখন অনেকটা ফারাক।

অতি কষ্টে দুর্বল ঘাড়টা ঘুরিয়ে সোনিয়াকে খুঁজছে লখাই। সিপাইরা আর এক টানে লখাইকে নিয়ে সড়কের বাঁক ঘুরল। সোনিয়াকে আর দেখা গেল না।

মোটর বোটে গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা করে চনমন চোখে লখাইকে খুঁজছিল সোনিয়া। টিণ্ডালান রামপিয়ারী তার মাথাটা ধরে উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দিল।

একটু পর মোটর বোট ছেড়ে দিল।

সিকমেনডেরার (হাসপাতাল) দিকে যেতে যেতে লখাইর মনে হল, পিনিকের ব্যারামের এত আয়োজন নেহাতই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

সড়কের উপর একখণ্ড ছোট পাথর পড়ে ছিল। অদ্ভুত আক্রোশে শরীরের সমস্ত শক্তি পায়ে এনে সেটাকে এক লাথি হাঁকল লখাই। পা-টা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। পাথরের খণ্ডটা সড়ক পেরিয়ে ওপারে চলে গেল।

জমাদারটা লখাইর কাছে এগিয়ে এল। মুলাইম, ঘনিষ্ঠ স্বরে বলল, 'কি রে, আওরতটাকে চিনিস না কি ?'

লখাই জবাব দিল না।

কি জানি কেন, হঠাৎ দ্বীপান্তরের কয়েদী দুর্দান্ত লখাই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

ছাব্বিশ

লঞ্চ ফেরিটা উপসাগর ফুঁড়ে সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার দিকে ছুটেছে।

এখন বিকাল।

বেজায় ফুর্তিতে উড়ুক্কু মাছগুলি মোটর বোটের চারপাশে ফিনফিনে রূপালী ডানায় উড়ছে। নীল জলে পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারের মত সাদা ফেনা এঁকে মোটর বোট ছুটে চলেছে।

সোনিয়ার চোখ দুটো জ্বলছে। এক দৃষ্টে সাদা সাদা ফেনার দিকে তাকিয়ে কি যেন সে খোঁজে। তার অগাধ মনের অতলে কি আছে, কে বলবে?

গোল গোল পাতাহীন চোখে সোনিয়ার দিকে চেয়ে রয়েছে টিণ্ডালান রামপিয়ারী। সোনিয়ার গা ঘেঁষে, তার চামড়ায় চামড়া ঠেকিয়ে সে বসেছে।

এতক্ষণ একটা কথাও কেউ বলে নি।

মোটর বোটটা সিসোস্ট্রেস উপসাগরের আধাআধি এসে পড়েছে।

রামপিয়ারী সোনিয়ার গলায় আস্তে একটা খোঁচা মারল। চাপা, তীব্র স্বরে ডাকল, 'এ সোনিয়া—এই—'

সোনিয়ার হুঁশ নেই। মোটর বোটের বাড়ি খেয়ে উপসাগরের নীল জলে যে ফেনারা জন্ম নিচ্ছে, একদৃষ্টে তাদের দিকেই চেয়ে থাকে সে।

সোনিয়ার চুলের মুঠি ধরে এবার ঝাঁকানি দিল রামপিয়ারী। বলল, 'শালীর হুঁশ নেই। ডাকছি, কানে যাচ্ছে না! মাগী বহুত খচরী।'

উপসাগরের দিক থেকে মুখ ফেরাল সোনিয়া। দেখল, স্থির দৃষ্টিতে রামপিয়ারী তার দিকে চেয়ে রয়েছে। তার গোল গোল পাতাহীন চোখদুটো মাছের আঁশের মত চক চক করছে।

সোনিয়া বলল, 'কি মতলব তোমার?'

অল্প একটু হাসল রামপিয়ারী। কালো কালো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গুটিকতক ভাঙা ভাঙা দাঁত দেখা দিল। আগের মতই চাপা, তীব্র স্বরে সে বলল, 'ঐ হারামীটা কে?'

'কোন হারামী?'

'কোন হারামী! শালী বুঝতে পারছিস না!'

'না।' সোনিয়ার গলাটা কঠিন শোনায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে রামপিয়ারী। সোনিয়ার দিলের গতিক বুঝবার চেষ্টা করে। কোন দিক দিয়ে এগুলে সোনিয়ার মুখ থেকে সঠিক জবাবটা বেরুবে, বুঝে উঠতে পারছে না। রস দ্বীপের জেটিতে সেই কয়েদী-টাকে দেখার পর থেকে স্বস্তি নেই রামপিয়ারীর। এর মধ্যেই পুরাপুরি একটা আন্দাজ করে নিয়েছে সে। কয়েদীটার সঙ্গে সোনিয়ার জানপয়চান আছে। এবং সেই জানপয়চান কত কালের এবং কতটা গভীর, ঠিক করে উঠতে পারছে না রামপিয়ারী। কয়েদীটার সঙ্গে সোনিয়ার যে কি সম্পর্ক, তা না বোঝা পর্যন্ত দিলটা তার অস্থির হয়েই থাকবে।

সোনিয়ার মন বোঝা কি সহজ কথা! এক এক সময় রামপিয়ারীর মনে হয়, সোনিয়া বড় দুর্জ্ঞেয়; আন্দামানের দরিয়ার চেয়েও সে অতল, অথৈ, পারকূলহীন।

বিচিত্র নারী এই রামপিয়ারী। তার মনের গতিও বিচিত্র। তার মন কোন সর্পিল খাত বেয়ে চলে, নিজেই কি সে বোঝে?

এই মুহূর্তে অদ্ভুত এক ঈর্ষায় রামপিয়ারীর বুকের মধ্যটা পুড়ে পুড়ে খাক হতে লাগল।

মোটর বোটটা সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানার কাছাকাছি এসে পড়েছে।

গলার স্বর এবার অনেকটা খাদে নামিয়ে ফেলল রামপিয়ারী। আস্তে আস্তে ডাকল, 'এ সোনিয়া—এই শালী—'

ইতিমধ্যে চোখ দুটো উপসাগরে নিয়ে ফেলেছিল সোনিয়া। মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, 'হাঁ—কি বলছ টিণ্ডালান?'

'মুখটা এই দিকে ফেরা।'

'মুখ দিয়ে তো শুনব না, কান দিয়ে শুনব। তুমি বল, কান আমার খাড়া আছে।'

থুতনিটা ধরে সোনিয়ার মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেয় রামপিয়ারী। একটু হাসে। থুতনিটা নেড়ে খানিকটা আদরও করে। গোল গোল পাতাহীন চোখে কি যেন ফুটে বেরোয় রামপিয়ারীর। দেখতে দেখতে শিউরে ওঠে সোনিয়া। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে যেন বাঁচে।

ফিস ফিস করে রামপিয়ারী বলল, 'তোকে কত পেয়ার করি সোনিয়া, তুই তা বুঝিস না? আমার ওপর তোর মন নেই। আমার জন্যে তোর দিলে একটু মহব্বৎ নেই।'

সোনিয়া জবাব দেয় না।

রামপিয়ারী আবার বলে, 'তোকে এত পেয়ার করি, দিলের সব কথা বলি, লেকিন তুই আমাকে একটা কথাও বলিস না।'

'কী বলব?' সোনিয়ার গলা অস্ফুট শোনায়।

'ঐ আদমীটা কে? রস-এর জেটিতে যে তোকে ডাকল, ওর সঙ্গে জান-পয়চান আছে?'

অদ্ভুত এক জেদে পেয়ে বসল সোনিয়াকে। সে উল্টা প্রশ্ন করল, 'কোন আদমীটা?'

'এ তামাশাবালী ছোকড়ি, আমার সাথ দিল্লাগী করছিস? সচ্ বল।'

সোনিয়া চুপ করে গেল।

সাউথ পয়েন্টে বাঁক ঘুরে নীল উপসাগর কালো দরিয়ায় মিশেছে। বাঁকের মাথায় পাথরের লম্বা জেটি; উপসাগর ফুঁড়ে জেটিটা অনেকটা নেমে এসেছে। এটা সাউথ পয়েন্ট জেটি।

লঞ্চ ফেরি সাউথ পয়েন্ট জেটিতে ভিড়ল। একে একে কয়েদিনীরা নেমে রেণ্ডিবারিক জেলে ঢুকে পড়ল।

রাত্রে খানাপিনার পর কম্বল পেঁচিয়ে কয়েদিনীরা টান টান হয়ে পড়েছে। উপসাগর থেকে হিম হিম বাতাস উঠে আসছে। কয়েদিনীরা মতলব করেছে, একটানা আরামের ঘুমে শেষ শীতের পুরা রাত্রিটা কাবার করে দেবে।

এমন একটা ইচ্ছা সোনিয়ার মনেও ছিল। কম্বলের নীচে হাত-পা-মাথা একাকার করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল।

আজ বিকালে আকস্মিক ভাবে ঝড়ের দরিয়ার সেই সাথীটার সঙ্গে রস দ্বীপের জেটিতে দেখা হয়েছিল। বোখারই বুঝি হয়েছে লখাইর। আন্দামান আসার সময় জাহাজের খোলে লখাইকে দেখেছিল, আজ আবার দেখল। আদমীটা ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছে। সিপাই দুটোর কাঁধে ভর দিয়ে বোধ হয় সিকমেনভেরায় (হাসপাতাল) যাচ্ছিল। কি বোখার হয়েছে লখাইর!

হঠাৎ ভাবনাটা পুরাপুরি ভিন্ন একটা খাতে বইতে লাগল। ঝড়ের সমুদ্রে এলফিনস্টোন জাহাজের খোলে লখাইর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই কথাটা মনে পড়ল সোনিয়ার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লখাই তার গাঁও-মুল্লুকের খোঁজ

নিয়েছিল। গাঁও-এ তার স্বজন-পরিজন-রিস্তাদার, কে কে আছে, সকলের খবর নিয়েছিল। কি অপরাধে তার সাজা হয়েছে, দ্বীপান্তরের সাজার মেয়াদ কত দিন—কিছুই সে বাদ দেয় নি।

উন্মাদ দরিয়ায় যেখানে জীবন এবং মৃত্যুর মাঝে সীমারেখাটা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যেখানে কালাপানি অন্ধ আক্রোশে এলফিনষ্টোন জাহাজটাকে এলোপাথাড়ি আছাড় মেরে টুকরা টুকরা করে ফেলতে চেয়েছিল, সেখানে কয়েক ঘণ্টা লখাইর সঙ্গে কাটিয়েছে সোনিয়া। সেই কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যেই লখাইর দিলের তাপ পেয়েছে।

জাহাজে লখাই বলেছিল, আন্দামানের কয়েদখানায় তারা পাশাপাশি কুঠুরিতে থাকবে। এখানে নেমে সোনিয়া শুনেছিল, মরদানা এবং জেনানা কয়েদীদের ভিন্ন ভিন্ন কয়েদখানা। পেটি অফিসারনী এতোয়ারী অনেক দূরে, আটলাণ্টা পয়েণ্টের মাথায় অনেকগুলো লাল মোকাম দেখিয়ে বলেছিল, সেলুলার জেল। ওটাই পুরুষ কয়েদীদের আস্তানা। সোনিয়া আন্দাজ করে নিয়েছিল, লখাই সেলুলার জেলেই আছে।

লখাইর ইচ্ছা ছিল, পাশাপাশি কুঠুরিতে তারা থাকে। কিন্তু এই দ্বীপের মর্জি অন্য। আলাদা আলাদা কয়েদখানায় লম্বা লম্বা প্রাচীরের আড়ালে তাদের আটক রাখা হয়েছে। সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানায় ডাক্তার সাহেব আর যে বুড়ো কয়েদী তাঁত শেখাতে আসে—এই দুজন ছাড়া পুরুষ ঢোকার হুকুম নেই, উপায়ও নেই। (অবশ্য মঙ্গলবার মঙ্গলবার সাদীর প্যারেডের সময় সেল্‌ফ্‌ সাপোর্টার্স টিকিট পাওয়া পুরুষ কয়েদীরা আসে)।

লখাইর পাশাপাশি থাকতে পারল না, এ জন্য বিন্দুমাত্র আপসোস নেই সোনিয়ার। তবু রস দ্বীপের জেটিতে দরিয়ার সাথীটার সঙ্গে যখন আকস্মিক-ভাবে দেখাই হয়ে গিয়েছিল, তখন দু চারটে কথা বলারও ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু টিণ্ডালান রামপিয়ারী একটা কথাও বলতে দেয় নি। টেনে হিঁচড়ে তাকে মোটর বোটে তুলেছিল।

নিরুপায় আক্রোশে অস্থির হয়ে রইল সোনিয়া। শিরায় শিরায় খুন ফুটতে লাগল। বঙ্গোপসাগরের হিম হিম বাতাসও অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত তার চোখে ঘুম আনতে পারল না।

এখন কত রাত কে বলবে?

নারকেল বনে বাতাসের তাণ্ডব, পাথুরে দেওয়ালে দেওয়ালে উপসাগরের অবিরাম গর্জন ছাড়া এখন মানুষের কোন শব্দ নেই। কয়েদিনীরা কম্বলের নীচে একটা উত্তপ্ত আরামের ঘুমে হারিয়ে গিয়েছে।

রাত্রি যখন গভীর হয়, উপসাগর থেকে ভাঙা ভাঙা পাথর বেয়ে বিরাট বিরাট সব কচ্ছপ উঠে আসে। কূল ঘেঁষে রেমোরা মাছগুলি ককিয়ে ওঠে। কোথা থেকে এক ঝাঁক নিশাচর সিন্ধু শকুন এসে এই দ্বীপে নামে।

এখন মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। রাত্রি যত গভীর হয়, কুয়াশা আর অন্ধকার যত গাঢ় হতে থাকে, এই দ্বীপের চেহারাটা একেবারেই বদলে যায়। সারাদিন যার খোঁজ মেলে না; সেই আদিম সত্তাটা এখন আত্মপ্রকাশ করে। মুহূর্তে এই দ্বীপ স্থানকালের ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে ওঠে।

গভীর রাত্রিতে এই দ্বীপটার আর একটা পরিচয় পেল সোনিয়া।

কম্বলের নীচে উষ্ণ আরামে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, হুঁশ ছিল না। কানের মধ্যে মুখ গুঁজে কে যেন ফিস ফিস, চাপা স্বরে ডাকল, 'এ সোনিয়া—সোনিয়া—'

কম্বল গুটিয়ে লাফিয়ে উঠল সোনিয়া, 'কৌন—কৌন?'

'চুপ।'

গলার আওয়াজেই সোনিয়া বুঝল, টিণ্ডালান রামপিয়ারী। বিচিত্র এক ভয়ে রক্তের মধ্যে শির শির করে কি যেন ছুটে গেল। হৃৎপিণ্ডটা বিশগুণ জোরে লাফাতে শুরু করল।

কাঁপা গলায় সোনিয়া বলল, 'কি মতলব টিণ্ডালান?'

রামপিয়ারী জবাব দিল না। তার গরম নিশ্বাস সোনিয়ার মুখের উপর পড়তে লাগল। নিশ্বাসের সেই উত্তাপের মধ্যেই রামপিয়ারীর জবাব রয়েছে।

সোনিয়ার মুখটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ভয়, অস্বস্তি এবং আতঙ্কমেশা অদ্ভুত এক অবস্থার মধ্যে সময় কাটছে। সোনিয়া আবার বলল, 'আমাকে কি দরকার টিণ্ডালান?'

টেনে টেনে খ্যাক খ্যাক করে অনেকক্ষণ হাসল রামপিয়ারী। হাসি থামিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সোনিয়ার মুখটা খুঁজে বার করল। সোনিয়াকে নিজের কাছে টেনে এনে তার মুখে একদমে

গোটা বিশেক চুমু খেল। কফ মেশা থকথকে লালা সোনিয়ার মুখে লেপটে গেল।

পুরাণ কথাটাই আবার বলল রামপিয়ারী, 'তোকে কত পেয়ার করি সোনিয়া, লেকিন আমার ওপর তোর দিল নেই।'

সোনিয়া অস্ফুট একটা শব্দ করল। কি যে বলল, কিছুই বোঝা গেল না।

রামপিয়ারী আরও ঘন হয়ে বসল। একটা হাত বাড়িয়ে সোনিয়ার চিকন কোমরটা সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল। আস্তে আস্তে হাতের প্যাঁচটা কঠিন হতে লাগল।

অন্ধকারে রামপিয়ারীর মুখ দেখা যায় না। তবু কেন জানি সোনিয়ার মনে হয়, তার গোল গোল পাতাহীন চোখ দুটো ধিকি ধিকি জ্বলছে।

হঠাৎ রামপিয়ারী ডাকল, 'এ সোনিয়া—'

কাঁপা কাঁপা ক্ষীণ স্বরে সোনিয়া শুধু বলতে পারল, 'হাঁ—'

'রস দ্বীপে যে শালে তোকে ডাকছিল, ও কে?'

বিকালে সোনিয়া জেদ ধরেছিল, রামপিয়ারীর কাছে লখাইর কথা বলবে না। সেটা ছিল বিকাল। এখন রাত্রি গভীর হয়েছে। দ্বীপের চেহারা বদলে গিয়েছে। এখন মানুষের কোন শব্দ নেই। গাঢ় অন্ধকারে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ প্রাগৈতিহাসিক হয়ে উঠেছে। এই সৃষ্টিছাড়া বর্বর পৃথিবী ফুঁড়ে দুর্মর আদিম সত্তাটা এখন দ্বীপের মাটিতে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

এই গভীর রাত্রির চরিত্রই অন্য।

রামপিয়ারী আবার বলল, 'এ সোনিয়া, বলছিস না কেন? ঐ হারামীটা কে?'

নিজের অজান্তেই সোনিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'ও লখাই, মরদানা কয়েদী। এক সাথ এক জাহাজে আমরা আন্দামান এসেছি। জাহাজে ওর সাথ জানপয়জান হয়েছিল।'

কিছুটা সময় কাটে। কেউ কথা বলে না। রামপিয়ারীও না, সোনিয়াও না।

শেষ শীতের বাতাস উন্মাদ হয়ে উঠেছে। অন্ধ আক্রোশে উপসাগরটা দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে। দুর্জয় বেগের আঘাতে এই স্থবির দ্বীপটাকে চুরমার করে নিরাকার, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। এই দ্বীপটা এখন আর

বিশ শতকে নেই। সভ্যতার সমস্ত পরিচয় ঘুচিয়ে আদিম পৃথিবীতে ফিরে গিয়েছে।

সোনিয়ার কোমরে রামপিয়ারীর হাতের প্যাচটা আরো কঠিন হয়ে বসেছে। নাক থেকে গরম বাতাস ছুটে এসে মুখটাকে যেন ঝলসে দিচ্ছে। যদিও দেখা যায় না, পাতাহীন চোখ দুটো আরো ধক ধক করছে।

ফিস ফিস রহস্যময় গলায় রামপিয়ারী বলল, 'তোকে এক রোজ একটা কথা বলেছিলুম—'

সোনিয়ার জবাব শুনবার জন্য একটু চুপ করল রামপিয়ারী। কিন্তু না, সোনিয়া কিছুই বলল না। অন্ধকারে রামপিয়ারী বুঝতে পারল না, সোনিয়া কথা বলার সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। যে নারী কোতল করে তামাম জীবনের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে কালা পানি আসতে ডরায় নি, রামপিয়ারীর কাছে বসে থাকতে থাকতে তার চোখের সামনে এই অন্ধকার রাত্রিটা আরো অন্ধকার হয়ে গেল। সোনিয়ার মনে হল, বুকের ধড়কানা বোধ হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কত অফুরন্ত বাতাস। তবু সোনিয়ার নিশ্বাস আটকে আটকে আসতে লাগল।

রামপিয়ারী বলতে লাগল, 'এক রোজ তোকে বলেছিলুম, মরদের সঙ্গে মহব্বতি করবি না। মরদের মহব্বতে বড় ভেজাল, মরদরা আসল দুশমন। মাগীতে মাগীতে যে মহব্বতি, সে-ই হল খাঁটি চীজ, আসল মহব্বতি। কথাটা জিন্দগীভর মনে রাখিস।'

কোমর থেকে হাতের প্যাচটা খুলে এবার সোনিয়াকে জাপটে ধরল রামপিয়ারী। গাঢ় উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, 'লখাই শালের সঙ্গে কোন খাতির রাখবি না।'

সোনিয়া জবাব দেয় না। রামপিয়ারীর দুই হাতের মধ্যে তার দেহটা থর থর করে কাঁপে।

রামপিয়ারী সোনিয়ার জবাবের তোয়াক্কা রাখে না। নিজে নিজেই বলে যায়, 'তোকে সোনার কাঙনা (বালা) দেব, চাঁদির মল দেব। আচ্ছা আচ্ছা খানা দেব। কয়েদখানার বাইরে থেকে তোর জন্যে মিঠাই আনিয়ে দেব। জানিস তো, আমি টিণ্ডালান; পাঁচ সিকি তলব (মাইনে) পাই। অনেক রুপেয়া জমিয়েছি; সব তোকে দিয়ে দেব।'

টেনে টেনে দম নেয় রামপিয়ারী। এক হাতে সোনিয়ার থুতনিটা ধরে

হিংস্রভাবে নেড়ে নেড়ে খানিকটা আদর করে। তারপর আবার শুরু করে, 'তোকে সেদিন বুকের কুর্তা খুলে দেখিয়েছিলুম, ইয়াদ আছে ?'

সোনিয়া শিউরে উঠল। মনে পড়ল, রামপিয়ারীর বুকময় রাশি রাশি উল্কি। মানুষ মানুষীর আদিম কামকলা এবং জৈব ক্রিয়াকলাপের ছবিগুলি বুকের চামড়া কেটে আঁকিয়ে রেখেছে রামপিয়ারী।

অন্ধকারে খ্যা-খ্যা করে হাসল রামপিয়ারী। বলল, 'দুনিয়ার সব সুখের ছবি আমার বুকে ধরে রেখেছি সোনিয়া। তাই না রে শালী ?'

বলেই দু-হাতে সোনিয়াকে নিজের দিকে টানতে লাগল। কুর্তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে টেনে সোনিয়াকে নিজের বুকে ফেলল রামপিয়ারী। জোরে, শরীরের সমস্ত শক্তি দুই হাতের মধ্যে এনে জড়িয়ে ধরল। সোনিয়ার বুকের দু পিণ্ড নরম মাংস রামপিয়ারী বুকে থেঁতলে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে। রামপিয়ারীর ধারাল নখগুলো সোনিয়ার পিঠে গিঁথে গিয়েছে। চামড়া ফেঁসে খুন ঝরছে।

ছটফট করল সোনিয়া। হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। শেষ পর্যন্ত ছটফটানি থেমে গেল। রাম-পিয়ারীর বুকে নিস্পন্দের মত এলিয়ে পড়ল সোনিয়া।

রামপিয়ারীর ঠাসানি, ডল্লানি এবং জাপটানির মধ্যে বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম হল সোনিয়ার। মনে হল, নরম সুন্দর শরীরটা কদাকার একটা পিণ্ডের মত দলা পাকিয়ে গিয়েছে।

খানিকটা পর সোনিয়াকে ছেড়ে দিল রামপিয়ারী। একটা কথাও আর বলল না। তারপর টলতে টলতে অন্ধকারে কোন দিকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

নির্জীব নিস্পন্দের মত অনেকক্ষণ বসে রইল সোনিয়া। বার বার পেটি অফিসারনী এতোয়ারীর কথাই মনে পড়তে লাগল তার। 'রামপিয়ারীটা মাগী না, শালী দুসরা কিছু।'

বাকী রাত্রিটা আর ঘুমাতে পারল না সোনিয়া। বঙ্গোপসাগরের হিম হিম বাতাস তার চোখে নিদ আনতে পারল না।

সাতাশ

রস দ্বীপ থেকে ফিরে এসে দিনকতক সেলুলার জেলের সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) কাটিয়ে দিল লখাই। পিনিকের নেশার ব্যারামটা তাকে খুবই কাবু করে ফেলেছিল। কয়েকটা দিন ঠিকমত দাওয়াই এবং হাসপাতালের ভাল খানা পেটে পড়তেই লখাই চাঙ্গা হয়ে উঠল।

হাসপাতাল থেকে আজই ছাড়া পাবে লখাই। একটু পরই পেটি অফিসার নসিমূল গণি তাকে নিতে আসবে।

এখনও অন্ধকার রয়েছে। কালো আকাশটা উপুড় হয়ে সেলুলার জেলটাকে ঢেকে রেখেছে। অন্ধকারে কয়েদখানাটাকে পরিষ্কার দেখা যায় না। কয়েদখানার ইমারতগুলি নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সাত নম্বর ব্লকের ওয়ার্কশপটা কালো একটা ভালুকের মত ওত পেতে রয়েছে।

আরো কতক্ষণ পর যে সকাল হবে, বোঝা যাচ্ছে না।

লোহার খাটিয়াটার উপর উঠে বসল লখাই।

মনোধর্মের দিক থেকে লখাই অত্যন্ত স্থূল। বিরাট দেহে মনটা তার শ্লথ গতিতে ক্রিয়া করে। বাইরের জগতে যে সব ঘটনা ঘটে, সে সব তার মনে অতি সামান্যই প্রভাব রাখতে- পারে। মনস্তত্ত্বের বিচারে লখাইর মন অনুভূতিহীন, নিষ্ক্রিয়। পশুগঠন অর্ধমানবের মন যেমন অমার্জিত অস্ফুট, লখাইর মনও অনেকটা তেমনি। স্পর্শমাত্রে সে মন বিহ্বল হয় না। সেখানে অনুভূতি জাগাতে হলে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

সেলুলার জেলে আসার আগে এ-ই ছিল লখাইর মনের স্বরূপ।

আশ্চর্য! আজকাল লখাইর মন সাড়া দেয়। তুচ্ছ নগণ্য যে কোন ঘটনা তার মনে আলোড়ন তোলে। হঠাৎ-জাগা মনটা তার ভাবে। ভাবতে ভাবতে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

পিনিকের নেশার এত সাধের এত যন্ত্রণার ব্যারামটা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। সোনিয়ার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারল না লখাই। কটা দিন ধরে অদ্ভুত এক শূন্যতায় মনটা ভরে রয়েছে। লখাই ব্যারামে যতটা না কাহিল হয়েছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী হয়েছে নৈরাশ্যে।

অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে সোনিয়ার কথাই ভাবছিল লখাই ; অস্ফুট এক গোঙানির শব্দে চমকে উঠল।

সারি সারি লোহার খাটিয়া। জেল হাসপাতালের এই ওয়ার্ডে রোগীরা নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে। এদিক সেদিক তাকিয়েও ঠাহর করতে পারল না লখাই, গোঙানির শব্দটা ঠিক কোথা থেকে আসছে।

উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল লখাই।

গোঙানির শব্দটা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে।

হঠাৎ উঠে পড়ল লখাই। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে ওয়ার্ডের শেষ মাথায় এসে পড়ল। দরজার দিক থেকে তেরছা করে এখানে এক খাটিয়া পাতা। একটা রোগী খাটিয়া থেকে নেমে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে উবু হয়ে বসেছে আর সামনে গোঙাচ্ছে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আর একটু পরেই সকাল হবে। ফিকে ফিকে আবছা অন্ধকারে লোকটাকে চিনে ফেলল লখাই।

লোকটার নাম কপিল প্রসাদ। কয়েদীরা কপিলজী কপিলজী বলে ডাকে ; উঠতে বসতে সেলাম ঠুকে সম্ভ্রম জানায়।

সেলুলার জেলের এই হাসপাতালেই কপিল প্রসাদের সঙ্গে লখাইর পরিচয় হয়েছে।

জেলের নিয়ম অনুযায়ী মুসলমানের মুর, শিখের চুলদাড়ি বাদ দিয়ে হিন্দুদের দাড়িগোঁফ চেঁছে ফেলতে হয়। মুসলমানের মুর এবং শিখের চুল হিংস্র ; হিন্দুর চুলদাড়ি নিরীহ। নির্বিবাদে হিন্দুরা হাজমের ক্ষুরের নীচে মাথা দেয়।

আশ্চর্য! হিন্দু হয়েও কপিল প্রসাদের একজোড়া সুপুষ্ট চুমড়ানো গোঁফ এখনও বিরাজ করছে। গোঁফ জোড়া দেখলেই বোঝা যায়, এদের পিছনে অনেক কালের অধ্যবসায় রয়েছে। কপিল প্রসাদ গোঁফজোড়াকে কেমন করে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে, লখাইর কাছে তা এক বিচিত্র রহস্য।

কয়েদীদের কাছেই লখাই শুনেছে, বেনারস শহরে কপিল প্রসাদের গোটা দশেক পাকা ইমারত আছে। গাঁয়ে হাজার বিঘা ক্ষেতি আছে। প্রজা আছে। কপিল প্রসাদ জমিদার। শুধু জমিদার নয়, রীতিমত রইস আদমী।

শিকারী বিড়ালের যেমন গোঁফ, রইস আদমীর তেমনি চোখের কোল। চোখ দেখেই লখাই টের পেয়েছিল। কয়েদীদের মুখে শুনে নিঃসন্দেহ হল।

এক খুবসুরত বাইজী নিয়ে কপিলপ্রসাদের সঙ্গে বাঙলা মুল্লুকের আর এক রইস আদমীর রেষারেষি বাঁধে। রেষারেষিটা শেষ পর্যন্ত আক্রোশে দাঁড়াল। বেনারস শহরের এক সড়কে দুপুরবেলায় পর পর দুটা গুলি করে বঙ্গালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে দিয়েছিল কপিলপ্রসাদ। যে নারী তার ভোগ্যা, সে নারীর অন্য দাবীদারকে সে ক্ষমা করে না।

পুলিসের হাতে নিজেই ধরা দিয়েছিল কপিলপ্রসাদ। আদালতে বিচার হল। সারা জীবনের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এল সে।

রসিয়ে রসিয়ে কপিলপ্রসাদের কিসসাটা বলে কয়েদীরা। তারপর কিসসার নায়কের উদ্দেশে সসম্ভ্রমে বলে, 'কপিলজী বড় মরদ হৈ—'

পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রয়েছে কপিলপ্রসাদ। কি যে করছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না লখাই।

হঠাৎ কপিলপ্রসাদের গোঙানিটা তীব্র হয়ে উঠল।

এবার লখাইর চোখে পড়ল।

কপিলপ্রসাদের কণ্ঠার ঠিক উপরেই গভীর এক গলক্ষত। সারাদিন মস্ত এক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ক্ষতটা ঢেকে রাখা হয়। সেই ব্যাণ্ডেজটাই এখন খুলে ফেলেছে কপিলপ্রসাদ। বাঁকানো একটা লোহার শলা গলক্ষতে ঢুকিয়ে ঘুঁটে দিচ্ছে। শুকিয়ে আসা ক্ষতটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে; ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

লখাই শিউরে উঠল। কাঁপা কাঁপা স্বরে ডাকল, 'কপিলজী—'

'কৌন, কৌন রে?'

চমকে ঘুরে বসল কপিলপ্রসাদ।

'আমি, আমি লখাই।'

'ও, বস ঐ খাটিয়ার ওপর।'

কপিলপ্রসাদকে অনেকটা আশ্বস্ত দেখায়। আস্তে আস্তে সে বলে, 'একটু সবুর কর, ভাল করে ঘা-টা খুঁচিয়ে খুন ঝরিয়ে নি।'

শুকনা ক্ষতটা কাঁচা করে, রক্তারক্তি বাধিয়ে খাটিয়াটার উপর এসে বসল

কপিলপ্রসাদ। চুমড়ানো গোঁফে গোটা দুই চাড়া মেরে বলল, 'খুব তাজ্জব বনে গিয়েছিস লখাই !'

লখাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল। হাঁ না—কিছুই বলল না।

দু চার দিনের পরিচয়েই লখাই বুঝেছে, মেজাজ খোশ থাকলে কপিল-প্রসাদ দিল খুলে দেয়। নিজে এতবড় একটা জমিদার এবং রইস আদমী, সেটা বেমালুম ভুলে যায়। তখন দুনিয়ার সব মানুষই তার ইয়ার-দোস্ত।

গলক্ষতটা খুঁচিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়েও মেজাজ কিন্তু খোশই আছে কপিলপ্রসাদের। সে বলল, 'শুকনা ঘা-টা খুঁচিয়ে আবার কাঁচা করে ফেললাম কেন, তাই ভাবছিস ?'

'হাঁ—' ফস করে লখাইর মুখ থেকে ছুটে গেল শব্দটা।

'জানিস তো আমি রইস আদমী ; জমিদার।'

'হাঁ।'

'তামাম জিন্দগী ফুর্তিফার্তা করে কাটিয়েছি। আরাম আর খেয়ালখুশিতে, আওরত আর শরাবে ডুবে রয়েছি।' একটু থামল কপিলপ্রসাদ। চোখ বুঁজে পুরা অতীতটা একবার যেন ঘুরে এল। তারপর আবার শুরু করল, 'নাঃ, সেই জিন্দগীটা আর ফিরবে না। কালা পানির কয়েদখানায় সে রোজগুলো কোথায় পাব ?'

একটু যেন আপসোসের সুরই ফুটল কপিলপ্রসাদের গলায়। হঠাৎ সব আক্ষেপ ঝেড়েঝুড়ে মনটা সাফ করে ফেলল সে, 'ছোড় শালে ও কথা।'

লখাই চুপচাপ আজব মানুষটার কাণ্ড দেখতে লাগল।

লখাই যে পাশে বসে রয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের কাছেই নিজে যেন জবানবন্দী দিতে শুরু করল কপিলপ্রসাদ, 'কয়েদখানার সব সইতে পারি। হুইলখানি টানতে পারি, রম্বাস ছিঁচতে পারি, নারকেলের ছোবড়া ছিলে তার বার করতে পারি, পাথর ভেঙে সড়ক বানাতে পারি। লেকিন খানা! ও তো খানা না—হারাম, দুশমন! ও খানা আমি সইতে পারি না। ও খানা পেটে গেলে বাপের নাম ভুলে যাই। জান লবেজান হয়ে যায়। সিকমেনভেরায় (হাসপাতালে) আচ্ছা খানা মেলে। জেলের খানার ডরেই তো গলায় ঘা বানিয়ে সিকমেনভেরায় এসে রয়েছি।'

কিছুক্ষণ ভারিক্কী চালে চতুর হাসি হাসল কপিল প্রসাদ। আবার আরম্ভ করল, 'এই ঘা-টাই আমাকে বাঁচিয়েছে। না হলে কবে মরে কৌত হয়ে

যেতাম। বুঝলি লখাই, ঘা-টা যখন শুকিয়ে আসে, শলা মেরে মেরে কাঁচা করে দি।'

কয়েদীদের মুখে লখাই শুনেছে, কপিল প্রসাদ জেল হাসপাতালের স্থায়ী বাসিন্দা। এখন বুঝছে, কপিলপ্রসাদের গলক্ষতটার সঙ্গে তার মরাবাঁচা জড়িয়ে আছে। এই ঘা-টাই তাকে জেল হাসপাতালের স্থায়ী রোগী বানিয়ে রেখেছে। যতকাল সে বাঁচবে, হয়ত ততকালই তাকে জেলের এই হাসপাতালেই কাটাতে হবে।

কপিলপ্রসাদের পাশাপাশি আর একটা কয়েদীর কথা হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ল লখাইর। সে পরাঞ্জপে। লখাইর মনে হল, পরাঞ্জপের সঙ্গে কোথায় যেন কপিলপ্রসাদের একটা সাঙ্ঘাতিক রকমের মিল রয়েছে।

কপিলপ্রসাদ ডাকল, 'এ লখাই—'

'হাঁ কপিলজী—'

'তোকে ঘায়ের কথাটা বললাম। আর কারুকে বলিস না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লখাই জানাল, এ কথা সে কারুকেই জানাবে না।

যে জোরাল বিজ্ঞাপনটার জোরে কপিলপ্রসাদ হাসপাতালের স্থায়ী বাসিন্দা হতে পেরেছে, সেই গলক্ষতটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল লখাই।

সকাল হয়ে গিয়েছে। দিনের প্রথম রোদ এসে পড়েছে সেলুলার জেলের মাথায়।

দরজার ফাঁকে পেটি অফিসার নসিমুল গণির মুখ দেখা গেল। লখাইকে নিতে এসেছে সে।

আঠাশ

মাঝখানে আরো একটা দিন টানা ঘুমে কাবার করে দিল লখাই।

তারপরেই শুরু হল।

পেটি অফিসার নসিমুল গণি সেই যে ভেবে রেখেছিল, এখনও ভোলে নি
স্মৃতিটা তার বড় তুখোড়। লখাইকে সে বুঝিয়ে ছাড়বে আন্দামানের দরিয়া
কত পানি, বুঝিয়ে দেবে সেলুলার জেলের আসল স্বরূপখানা কি বস্তু
ব্যারামের কোন ওজর, কোন বায়নাক্কাই তাকে টলাতে পারল না।

পরের দিন সকালেই সড়ক বানানোর 'ফাইলে' লখাইকে জুতে দেওয়া হল

কাঞ্জিপানি খাওয়ার পর বর্তন ধুয়ে কয়েদীরা কাতার দিয়ে দাঁড়াল। পে
অফিসার নসিমুল গণি 'ফাইল' ভাগ করে দিল। 'ফাইল' হল দল।

বিশটা কয়েদী, একটা জবাবদার, একটা জমাদার আর একটা
পেটি অফিসার—মোট তেইশটা কয়েদী নিয়ে একটা 'ফাইল'। এই 'ফাইলে'
কাজ দেওয়া হয়েছে লখাইকে।

এর মধ্যে রোদ বেশ তেতে উঠেছে। বেলা চড়েছে।

পাঞ্জাবী পেটি অফিসার 'ফাইল' নিয়ে সেলুলার জেলের বাইরে এল

ফোনিক্স উপসাগরের কাছে সড়ক বানাবার কাজ চলছে।

পাঞ্জাবী পেটি অফিসার মুনিয়া সিংএর হেফাজতে 'ফাইল'টা ফোনি
বে'র দিকে রওনা হল।

সেলুলার জেলের বাইরে কয়েদীদের সারি সারি ব্যারাক। এগুলি
নাম 'বিজন'; কোন কোনটার নাম 'টাপু'। ডাইনে বাঁয়ে অনেকগুলি 'বিজ
এবং 'টাপু' রেখে লখাইদের ফাইলটা এবারডীন বাজারে এসে পড়ল
বাজারের গা ঘেঁষে বস্তি। বস্তির মধ্য দিয়ে চড়াই উতরাই বেয়ে প্যাঁচা
প্যাঁচানো সরু পথ সিধা ফোনিক্স উপসাগরের দিকে গিয়েছে।

বস্তি পেরিয়ে যে সড়ক মিলল, তার দুপাশে রেন-ট্রি, নারকেল বন। মা
মাঝে বিরাট বিরাট খাদ মেলে। সেই সব খাদে হাওয়াই বুটির জঙ্গল আগ
থেকেই জন্মে রয়েছে। সড়কের দু পাশ থেকে ভিজা ভিজা নোনা মাটির গ
এবং জঙ্গলের গন্ধ উঠে আসছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে

এই দ্বীপে বসন্ত এসে পড়বে। তার নিশান স্বরূপ হাওয়াই বুটির জঙ্গলে নীল নীল ফুল ফুটতে শুরু করেছে।

আকাশটা ঝক ঝক করে। এখন একখণ্ড মেঘের আঁচড়ও সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন এই দ্বীপের আকাশ আশ্চর্য নীল, আশ্চর্য শূন্য।

বাইশটা কয়েদী পাঞ্জাবী পেটি অফিসারের পিছনে সমতালে কদম ফেলছে।

কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লখাইর। ঘাড় গুঁজে সামনের কয়েদীটার পিছন পিছন চলেছে সে।

হঠাৎ পাশ থেকে সরু ফিস ফিস গলায় কে যেন ডাকল, 'লখাই দাদা—'

ঘাড় তুলে লখাই দেখল, তোরাব আলী।

তোরাব আলী আবার বলল, 'সড়ক বানাবার 'ফাইলে' তোকেও জুড়ে দিল!'

'হাঁ।'

বিড় বিড় করে তোরাব আলী বলতে লাগল, 'তোকেও খতম করে ফেলবে শালারা।'

এরপর অনেকটা পথ চুপচাপ পাশাপাশি চলল দুজনে।

সামনের একটা বাঁক পার হয়ে তোরাব আলী আবার ডাকল, 'লখাই দাদা—'

'হাঁ—'

'আর পারি না, নিঘঘাৎ আমি মরে যাব। দু দিন গলায় রশি দেবার চেষ্টা করলাম, দু দিনই ওয়ার্ডার শালা টের পেয়ে রশি কেড়ে নিল। আর পারি না লখাই দাদা।' তোরাব আলী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'আই হারামী, চুপ মার।' লখাই খেঁকিয়ে উঠল।

অন্য দিন হলে থেমে যেত তোরাব আলী। আজ যেন সে মরীয়া হয়ে ফোঁপাতে শুরু করেছে। ফোঁপানিটা তার বেড়েই চলেছে।

বিরক্ত, ক্রুদ্ধ চোখে তোরাব আলীর দিকে তাকাল লখাই। পিনিকের ব্যারামে শরীরটা এমনিতেই তার কাহিল হয়ে রয়েছে। মনটাও বিশেষ সজুত নয়। তোরাব আলীর ফোঁপানিতে সে ক্ষেপে উঠল, 'ভাগ শালে—'

তোরাব আলী বিচলিত হল না। যেমন চলছিল, তেমনই চলতে লাগল।

বিড় বিড় করে সমানে বকতে লাগল, 'আর পারি না। আজ দিলে যা আছে
করে বসব।'

একটু পরেই 'ফাইল'টা কোনিস্ক উপসাগরে এসে পড়ল।

এ পারে খানিকটা সমতল জায়গায় ছোট্ট একটা 'মেরিন'। ও পারে
ন্যাড়া টিলায় কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কাঠের বাড়ি। মাঝখানে নীল জলে
উপসাগরটা ঢুকে পড়েছে। উপসাগরে এখন ঢেউ ওঠে কি ওঠে না।

'মেরিনে'র পাশ দিয়ে লম্বা একটা সড়ক বানাবার কাজ চলছিল। চারদিকে
ইতস্ততঃ ভাঙা পাথরের স্তূপ, গুটিকয়েক হাতে টানা রোলার, সড়ক দুরুস
করার দুরমুশ।

পাঞ্জাবী পেটি অফিসার দশ জন কয়েদী আর জবাবদারকে পাঠালে
ডিলানিপুরের কোয়ারিতে। ঝাঁকা ভরে ভরে তারা পাথর বয়ে আনবে
পাঁচ জন হাত-রোলার টানবে। চার জন দুরমুশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সড়ক
সমান করবে। বাকী দুজন পাথর ঢেলে ঢেলে সড়কের উপর সাজিয়ে দেবে
পেটি অফিসার কিছুই করবে না; সামনের একটা রেন-ট্রির ছায়ায় বসে
আরাম করবে, মাঝে মাঝে উঠে এসে হুকুমদারি করবে, গালি দেবে, সামান্য
ছুতোয় কীলঘুষা হাঁকিয়ে কয়েদীর হাড্ডি চুর চুর করে দেবে।

সড়ক তৈরির কাজ শুরু হল।

লখাই ও তোরাব আলী দুরমুশ দিয়ে সড়ক পিটবার কাজ পেল।

লখাই বলল, 'পেটি অফসার সাহেব—'

'কি বলছিস ?' পাঞ্জাবী পেটি অফিসার খেঁকিয়ে উঠল।

'আমার বোখার হয়েছিল, বড় কাহিল হয়ে পড়েছি। মেহনতের কাম
পারব না। একটু মেহেরবানি করে আমাকে দুসরা কাজ দিন।'

'কী কাজ ?' গোল গোল হিংস্র চোখে তাকিয়ে রইল পেটি অফিসার।

'একটু মেহেরবানি করে যদি সড়কে পাথর ঢালবার কাজটা দেন, আমি
বাঁচি।'

সড়ক তৈরির ব্যাপারে পাথর ঢালার কাজটাই সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে কম
মেহনতের। এই কাজটা কয়েদীদের পছন্দসই। কিন্তু পছন্দ হলেই তো এ কাজ
মেলে না। এ কাজ পেতে হলে পেটি অফিসারের পেয়ারের লোক হতে হয়।
পেটি অফিসারের পেয়ারের লোক হওয়া কি সোজা কথা। তার জন্য বহু

এলেম দরকার। নিয়ম করে প্রতি রোজ পেটি অফিসারের হাত পা ডলতে হয়, নিজের খানা থেকে ভাগ দিতে হয়, চুরিচামারি হাত সাফাই করে নেশার চীজ যোগাতে হয়।

সড়ক তৈরির কাজে পয়লা এসেই লখাই পাথর ঢালার কাজটা চেয়ে বসেছে! কিছুক্ষণ নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারল না পেটি অফিসার। রক্তাভ চোখ দুটো তার গোল্লা পাকিয়েই রইল।

লখাই আবার কাকুতি করল, 'একটু মেহেরবানি করে—'

লখাইর কথা শেষ হবার আগেই দুই চার ঘুষা বসিয়ে দিল পেটি অফিসার। তারপর খেঁকাতে লাগল, 'পয়লা এসেই শালে পাথর ঢালতে চায়!'

লখাইর গর্দানে দুই ঠাসানি পাছায় দুই লাথি হাঁকিয়ে পেটি অফিসার বলতে লাগল, 'আগে দুরমুশ ধর হারামীর বাচ্চা, চুপচাপ সড়ক দুরস্ত কর।'

লখাই বুঝল, আন্দামানের পেটি অফিসারের মনে মেহেরবানি বলে কোন পদার্থ নেই।

চারটে কয়েদী এক তালে দুরমুশ চালাচ্ছে। ধুপধাপ, এক টানা ভোতা ধাতব শব্দ উঠছে। দুরমুশের লোহায় পাথরের ঘা লেগে আগুনের ফুলকি ছুটছে।

সূর্যটা আকাশ বেয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে। উপসাগরের লোনা জল জলছে। সেদিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝলসে যায়।

তেজী রোদে মাথার চাঁদি যেন ফেটে যাচ্ছে। শেষ শীতের এই সকালেও কয়েদীদের গা বেয়ে গল গল করে ঘাম ছুটেছে। ঘাম-মাজা কালো দেহগুলি চক চক করছে।

ডাইনে বাঁয়ে, কোনদিকে না তাকিয়ে সমানে দুরমুশ চালাচ্ছে লখাই। দুরমুশের বাঁটের ঘষায় হাতের চেটো থেকে এক পর্দা চামড়া উঠে গিয়েছে। কাঁধ থেকে দুই হাত খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। বিবেকহীন স্নেহহীন এই দ্বীপটার উপর ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে মরীয়া হয়ে দেহের সমস্ত শক্তিতে সে যেন পাথর ভাঙছে।

তোরাব আলী দুরমুশ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত তার ওঠে কি ওঠে না। দুরমুশ চলে কি চলে না। দুরমুশ চালাবে কি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমানে সে ফোঁপাচ্ছে। চোখ থেকে লোনা জল শুকনা গাল বেয়ে ক্রমাগত ঝরছে।

রেন-ট্রির ছায়ায় বসে পেটি অফিসার আরাম করছে আর তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য রাখছে। কয়েদীদের কাজে সামান্য গাফিলতি দেখলেই লাফাতে লাফাতে উঠে আসছে। দুই চার লাথিতে তাদের টিট করে যথাস্থানে ফিরে যাচ্ছে।

এর মধ্যেই তোরাব আলীর পিঠে গোটা বিশেক ঘুষা এবং পাছায় গোটা দশেক লাথি পড়েছে। তবু তার পরাণে ডর ধরে না। কি যে তার হয়েছে, কে বলবে? উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে উপসাগরটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ফোনিক্স উপসাগরে গুটিকতক মোটর বোট, বার্জ, দুটো মাঝারি আকারের জাহাজ ভাসছে। এক পাশে খান দশেক জেলে ডিঙি বাঁধা। তোরাব আলীর লক্ষ্য জেলেডিঙিগুলির দিকে।

দুরমুশটা নামিয়ে কপাল থেকে ঘাম কাঁচিয়ে ফেলল লখাই। পিছন ঘুরে কনুই দিয়ে তোরাব আলীর পিঠে একটা গুঁতো মারল। বলল, 'অ্যাই শালা, উজবুক, ওদিকে চেয়ে কি করছিস! পাথর ভাঙ। নইলে পেটি অফসার এসে হাড়গোড় ভাঙবে।'

তোরাব আলী জবাব দিল না। যেমন ফোঁপাচ্ছিল, তেমনই ফোঁপাতে লাগল।

লখাই বলল, 'কি রে শালা, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছিস কেন?'

ফোঁপানিটা আর এক পর্দা চড়াল তোরাব আলী। ভাঙা ভাঙা বিকৃত গলায় সে বলল, 'দিলে যা আছে, আজ তা করব লখাই দাদা। আর সইতে পারি না। বিবির পেটের সেই ছানাটার কথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।'

লখাই আর কিছু বলল না। দুরমুশটা তুলে পাথর ভাঙতে লাগল।

দুপুরে লখাইরা সেলুলার জেলে খানাপিনা সারতে গেল। খানাপিনার পর ঘণ্টাখানেক আরাম করে আবার ফোনিক্স বে'তে ফিরে এল।

এখন বিকাল। আশ্চর্য! সকালের সেই ঝকঝকে ধারাল রোদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য কোন একটা সাজঘরে কতক্ষণ ধরে যে আয়োজন চলছিল, কে বলবে? এখন দিগন্ত পেরিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ ছুটে আসতে লাগল। মুহূর্তে আন্দামানের আকাশ এবং রোদ গ্রাস করে ফেলল। সকালের সেই শান্ত, নিস্তরঙ্গ উপসাগরটার চেহারা নিমেষে বদলে গিয়েছে। উন্মাদ বাতাসের উৎসাহ পেয়ে বিরাট বিরাট ঢেউ দ্বীপের উপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল। সোঁ সোঁ করে পাক খেয়ে খেয়ে

বাতাস ছুটছে। এক ঝাঁক সী-গাল পাখি উড়ে পালাচ্ছিল; বাতাসের ঘূর্ণি তাদের টেনে উপসাগরে ফেলে দিল। কড় কড় শব্দে বাজ চমকে গেল। আকাশটা আড়াআড়ি ফেড়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় গুরু গুরু ঘা পড়তে লাগল।

আন্দামানের আকাশ আর দরিয়াকে বিশ্বাস নেই। তার প্রকৃতিকে একেবারেই ভরসা করা চলে না। কখন যে দরিয়া উন্মাদ হয়ে উঠবে, আসমান বাওরা বনে যাবে, আগে থেকে হদিস মেলে না।

কয়েদীরা বলে, মেয়েমানুষের মতই আন্দামানের প্রকৃতি বিশ্বাসঘাতী, দুর্জ্ঞেয়।

এতক্ষণ নেপথ্যে আয়োজন চলছিল, এবার বেশ ঘটা করেই শুরু হয়ে গেল।

খানাপিনার চাপে আপনা থেকেই আঁখে নিদ ঘনিয়ে এসেছিল। রেন-ট্রির নীচে বসে ঢুলতে ঢুলতে বেশ সুখ ধরে গিয়েছিল পেটি অফিসারের। বাজের আওয়াজে সুখের নিদ ছুটে গেল। আকাশ এবং দরিয়ার চেহারা দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। চিল্লাতে লাগল, 'হালফা, হালফা উঠেছে। দরিয়া আসমান পাগলা বনে গিয়েছে। কয়েদীলোগ আ যা, জান বাঁচাতে হলে আ যা—'বলেই এবারডীন বস্তির দিকে ছুটতে লাগল পেটি অফিসার।

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাড়নায় পেটি অফিসারের পিছন পিছন কয়েদীরা ছুটল।

লখাইও ছুটতে যাবে, তার আগেই দুই হাতে তাকে জাপটে ধরল তোরাব আলী। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছুটিয়ে নেবার চেষ্টা করল লখাই। এই মুহূর্তে আন্দামানের দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি যখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে, মাথার উপর আকাশটা ক্রমাগত গর্জাচ্ছে, তখন কোথা থেকে যেন বেঁটে খাটো তোরাব আলীর দেহে অসুরের শক্তি নেমে এল। দুটো হাত লোহার দুটো মোক্ষম সাঁড়াশীর মত তাকে পিষে ফেলতে লাগল। কিছুতেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পাড়ল না লখাই।

তোরাব আলী বলল, 'আমার সঙ্গে চল লখাই দাদা—'

'কোথায়?'

উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে লখাইর মুখে কি যেন দেখল তোরাব আলী। তারপর বলল, 'লখাই দাদা, এমন সুবিধে এ জীবনে আর

পাবি না। পেটি অফসার চলে গিয়েছে। চল, আমরাও এই দ্বীপ থেকে পালিয়ে যাই।'

'কেমন করে?'

পালাবার কথায় লখাইর মনটা বিচলিত হয়ে পড়ল। সারাটা জীবন এই দ্বীপে সাজা খাটতে হবে। কোন দিন সেই বিবির বাজার, তার পরিচিত জগৎ, যাদের সঙ্গে তার আজন্মের সম্পর্ক, সেই সব মানুষগুলির মুখ দেখতে পাবে না।

কোন কালে কোন কিছুর কথা ভেবে মন খারাপ করাটা লখাইর ধাতে নেই। তেমন দুর্বল, স্পর্শাতুর মনই নয় তার। কিন্তু এই মুহূর্তটার কথাই অন্য। এই উন্মাদ দ্বীপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোরাব আলীর কথাগুলি শুনতে শুনতে লখাইর শিরায় শিরায় বিচিত্র এক উত্তেজনা বাজতে লাগল। আন্দামান আসার পর এই প্রথম হাজার মাইল দূরে বাঙলা দেশের সেই হেতমপুর গ্রামের জন্মভূমিটার কথা মনে পড়ল লখাইর। সেখানে কে এক বুড়ী, বুঝি বা ঠাকুমাই হবে, তার ধু-ধু স্মৃতি মনে পড়ল। এই সৃষ্টিছাড়া, বিচ্ছিন্ন দ্বীপটা থেকে পালিয়ে যাবার অদম্য, আকণ্ঠ এক ইচ্ছা তার বুকে তোলপাড় শুরু করে দিল। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল লখাই। তোরাব আলীর সঙ্গে সে পালাবে।

লখাই আবার বলল, 'পালাব, কিন্তু কেমন করে?'

তোরাব আলী জবাব দিল না। লখাইকে জাপটে ধরে টানতে টানতে উপসাগরের কিনারে নিয়ে এল। এবার আর নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না লখাই। পালিয়ে যাবার মধ্যে কোথায় যেন অদ্ভুত এক নেশা আছে, অসহ্য একটা সম্মোহ আছে।

জেলে ডিঙিগুলো এক পাশে বাঁধা ছিল। পাহাড় প্রমাণ ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে তারা সমানে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে।

তোরাব আলী বলল, 'চল লখাই দাদা, ডিঙিতে উঠি।'

লখাই চমকে উঠল। বলল, 'ডিঙিতে সমুদ্দুর পাড়ি দিতে চাস নাকি?'

তোরাব আলী বিচিত্র হাসি হাসল। বলল, 'এ ছাড়া গতি কি? জাহাজে চেপে কয়েদী আন্দামান আসতে পারে। সারা জীবনের মেয়াদ না ফুরালে ফিরবার জাহাজ কি মেলে?'

লখাই মনে মনে ভাবল, তোরাব আলীর কথাটা খুবই ঠিক।

কিন্তু এখন আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় গুরু গুরু ঘা পড়ছে। কড় কড় শব্দে কালো স্তূপাকার মেঘ ফেড়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে। প্রকৃতি বিপর্যয়ে আকাশ বাতাস উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের দুশমন ভীষণ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে পালিয়ে যাবার অন্ধ আকণ্ঠ ইচ্ছাটা একটু একটু করে নিবে আসতে লাগল।

তোরাব আলী লখাইর হাত ধরে টান মারল। বলল, 'চল—'

মুহূর্তে স্থির করে ফেলল লখাই, সে পালাবে না। ডিঙিতে এত বড় বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিতে হবে! দিক নেই, দিশারী নেই, দরিয়ার মর্জিতে কোন দিকে ভেসে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই। ভাবতে ভাবতে লখাইর অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। পালাবার ইচ্ছাটা বাষ্প হয়ে উবে গেল। তার মনে হল উন্মাদ দরিয়া ডিঙিতে পাড়ি দেবার মত পাগলামী আর নেই। নিজের উপর এমন হঠকারিতা সে করতে পারবে না। মনে হল, হাজার মাইল জোড়া ক্ষিপ্ত কালাপানির চেয়ে এই দ্বীপের আশ্রয় অনেক নিরাপদ, অনেক কাম্য। এই দ্বীপে সারা জীবন কয়েদই সে খাটবে।

তোরাব আলী এখন ভাবাভাবির বাইরে। বিবির পেটের ছানাটা ছাড়া তার চোখের সামনে এখন আর কিছুই নেই। কিন্তু সে আর ভাবতে পারছে না। সমুদ্রের এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখেও বুক তার কাঁপে না। ঝড়ের দরিয়া তাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে, এই খুশিতেই সে মশগুল, কৃতজ্ঞ। এত বড় বঙ্গোপসাগর বিবির পেটের ছানাটার কাছে একেবারেই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। পালাবার ইচ্ছাটা তার দুর্মর হয়ে উঠেছে।

ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে বাতাসের শাসানি মিশে এই দ্বীপকে তোলপাড় করে ফেলছে। আকাশটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

তোরাব আলী হাত ধরে টানল। বলল, 'আয়—'

কখন যে তাকে টেনে টেনে একেবারে জলের কিনারে নিয়ে গিয়েছিল, লখাই খেয়াল করতে পারে নি। এতক্ষণ অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে কাটিয়েছে।

হঠাৎ চমকে উঠল লখাই। বিরাট বিরাট ঢেউগুলি তার পায়ের উপর এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

তোরাব আলী আবার ডাকল, 'আয়—'

'না!' অস্ফুট গোঙানির মত একটা শব্দ ফুটল লখাইর গলায়। তারপরেই লাফ মেরে জলের কিনার থেকে শক্ত, শুকনা, নিরেট মাটিতে উঠে এল সে।

আশ্চর্য। তোরাব আলী এখন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে না। পিছন ফিরে লখাইকে আর সে টানল না, ডাকল না। সিধা উপসাগরে নেমে গেল। খানিকটা গিয়ে ডিঙিতে উঠল।

লখাই তাজ্জব বনে গিয়েছে। সে ভেবেই পায় না, এই উন্মাদ দরিয়া, বাতাসের এই নিদারুণ তাণ্ডব, এই ক্ষিপ্ত আকাশ—এর মধ্যে কোথা থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেবার মত এতখানি দুঃসাহস পেয়েছে তোরাব আলী!

ডিঙির রশি খুলে ফেলেছে তোরাব আলী। বঙ্গোপসাগরের এই সৃষ্টিছাড়া বিচ্ছিন্ন দ্বীপ থেকে নিজেকে ছিন্ন করে ফেলল সে।

লখাই চেঁচিয়ে উঠল, 'তোরা—আ—আ—ব—'

বাতাসের এক ঝাপটায় লখাইর ডাকটা মুছে গেল। সেই মুহূর্তেই, উপসাগরের জল যখন অন্ধকারে ঘন আলকাতরার মত হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ লখাইর চোখে পড়ল, বিরাট একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে তোরাব আলীর ডিঙিটা দুর্জয় বেগে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে। উপসাগরের মধ্য থেকে প্রাণফাটা, বিকট চিৎকার উঠল, 'খুদাতাল্লা—আ—আ—আ—'

অন্ধকারে তোরাব আলীর ডিঙিটা আর দেখা গেল না। বিপুল বঙ্গোপসাগর নিমেষে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

ফোনিক্স উপসাগরের পারে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল লখাই।

উনতিরিশ

এখন দুপুর।

কয়েদীরা খানাপিনা সেরে আরাম করছে।

এই দ্বীপের দুপুরটা বড় ক্লান্ত, মন্থর। দুনিয়ার সব আলস্য এখন সেলুলার জেলের উপর ভর করে বসেছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সড়ক পিটিয়ে, ছোবড়া ছিলে, ঘানি ঘুরিয়ে কয়েদীদের জের বার হয়ে গিয়েছে।

খানাপিনার পর অসহ্য এক ঝিমানির তাড়নায় কেউ ঢুলতে থাকে। সেলুলার জেলের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে কেউ এক টুকরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যে ভাবে, কে বলবে। কেউ আবার ঢোলেও না, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবেও না, টান টান হয়ে বারান্দায় শুয়ে চোখ বোঁজে।

যাদের প্রাণশক্তি অফুরন্ত, তারা খানপিনার পর অবরে সবরে জোট পাকিয়ে গুলতানি করে। কিস্‌সা-খিস্তি-তামাশায় নরক গুলজার করতে থাকে।

জনকতক কয়েদী লা ডিনের কুঠুরির সামনে বসে রয়েছে।

কুঠুরির ভিতরে লা ডিন, কুঠুরির বাইরে মোপলা হারামী বকরুদ্দিন, ভিখন আহীর, লখাই এবং আরো জনকতক কয়েদী দলা পাকিয়ে বসে আছে।

এখন এই দুপুরে আন্দামানের উপসাগর জ্বলছে, সেলুলার জেলের লাল লাল ইমারতগুলি জ্বলছে, দূরে মাউন্ট হ্যারিয়েট আর রস দ্বীপ জ্বলছে। দুটো সাগরপাখি সেণ্ট্রাল টাওয়ারের মাথায় ঝিম মেরে বসে রয়েছে।

লা ডিন বলছিল, 'যে সাল আমি এই আন্দামান এলাম, সে সালে পোর্ট ব্লেয়ার শহর এমন ছিল না। জঙ্গল থেকে জারোয়ারা এসে হানা দিত। পুলিস, কয়েদী আর জারোয়ায় লড়াই হত।' একটু থেমে আবার শুরু করে, 'কয়েদীরা জঙ্গল সাফ করতে লাগল, সড়ক বানাতে লাগল, কুঠিবাড়ি বানাতে লাগল, জংলী জারোয়ারা পশ্চিমদিকের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। শহর তৈরী হল। এই দ্বীপের যা কুছু দেখছ, সব বানিয়েছে কয়েদীরা। এই যে সেলুলার জেলে বসে রয়েছ, কয়েদীরাই এর জন্য ইট পুড়িয়েছে, ইট গেঁথে গেঁথে এই কয়েদখানা বানিয়েছে।'

মোপলা হারামী বকরুদ্দিন বলে, 'কয়েদীদের বানানো কয়েদখানায় কয়েদীদেরই রাখছে। এ যে আপনা জুতিসে আপনাকেই পিটছে।'

সেলুলার জেল সম্বন্ধে পুরান রসিকতাটাই করে বকরুদ্দিন। এ রসিকতা সব কয়েদীরই জানা। তবু সকলেই হাসে। হাসতে হাসতে হল্লা বাধিয়ে দেয়।

কদিন ধরে ভিখন আহীর লা ডিনের বশংবদ হয়ে পড়েছে। সমানে তাকে তোষামোদ করছে। খানাপিনা, ঘুম আর জেলের কাজ—এসব বাদ দিয়ে বাকী সময় সে লা ডিনের কাছে কাছে কাটায়। এর করণও আছে। লা-ডিন নিজের খানা থেকে মোটা একটা অংশ ভিখন আহীরকে দিয়ে থাকে।

ভিখন হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'এ উল্লুলোক, চিল্লাবি না।' তারপর লা ডিনের দিকে ঘুরে তোষামুদির সুরে বলে, 'লা ডিনজী, আপনার জিন্দগীর কথা বলুন। পয়লা থেকেই শুরু করুন।'

লা ডিন নিজের জীবনের কথা শুরু করে।

বিচিত্র মানুষ লা ডিন।

এই আজব কয়েদীর অতীতও আজব।

প্রথম জীবনে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন হয়ে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে লা ডিন। জাতকাট ভবঘুরে বলতে যা বোঝায়, লা ডিন ছিল তা-ই। শ্যাম-কম্বোডিয়া-মালয়ে, সুমাত্রা-জাভা-বলিদ্বীপে জীবনের অনেকগুলি বছর কেটে গিয়েছে তার। এই সব জায়গায় জীবিকার ধান্দায় কত পেশা কত ফিকিরই যে ধরেছে লা ডিন, তার ইয়ত্তা নেই। কখনও জাহাজের মাল্লা, কখনও রবার বাগানের কুলী, কখনও নারী ব্যবসার দালাল। কখনও মুক্তার চাষ করেছে, কখনও সমুদ্রে থেকে শেল তুলেছে, কখনও অক্টোপাশ এবং হাঙর মেরে বেড়িয়েছে। জীবনে কত পেশাই না সে ধরেছে। কিন্তু কোন পেশাই তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। জন্মাবধি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে নানা পেশায় নানা নেশায় মেতে মেতে জীবন সম্বন্ধে লা ডিনের দৃষ্টিভঙ্গিটা অদ্ভুত নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছে।

এই পরিণত বয়সে জীবনের অনেকখানি পেরিয়ে এসে লা ডিনের মনে হয়, একটা মানুষের মধ্যে কত অজস্র মানুষই না থাকে! কেউ দালাল, কেউ মাল্লা, কেউ কুলী, কেউ অক্টোপাশ মেরে বেড়ায়, কেউ মুক্তার চাষ করে। আবার কেউ—

নাঃ, ভাবনাটা ঠিকমত পোরে না। তার আগেই লা ডিনের মনে পড়ে; পিছনে আরো অনেকটা জীবন ফেলে এসেছে।

একটানা কিছুক্ষণ বলে যায় লা ডিন। আবার চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবে। ধূ ধূ অতীত থেকে হাতড়ে হাতড়ে স্মৃতির এক একটা খণ্ড তুলে আনে।

সঠিক মনে নেই, সুমাত্রা না কম্বোডিয়া—কোথা থেকে সে হঠাৎ একদিন বর্মার মান্দালয় শহরে ফিরে গিয়েছিল। মনে নেই, সেটা কোন সাল কোন তারিখ। শুধু মনে পড়ে, সেই বছরই ব্রহ্মরাজ থিবোর সৈন্যদলে সে নাম লেখায়। আর তারই কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে বর্মীদের তৃতীয়বার যুদ্ধ বাধে।

সেটা আঠার শ চুরাশী সাল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায় ইংরাজ তখন উন্মাদ, বিবেকহীন। এশিয়া মহাদেশের দিকে দিকে সম্পদ আর ভূমির লোভে সে তখন থাবা বাড়িয়েছে।

ধুরন্ধর ইংরাজ ফিকির খুঁজছিল। ইংরাজ এমন এক জাত, কস্মিন কালে যাদের ফিকিরের অভাব হয় না। ফিকির তার মিলেও গেল।

ব্রহ্মরাজ থিবো ফরাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন, বর্মা মুলুকে ব্রিটিশ বণিকেরা উৎপীড়িত হচ্ছে—এমন সব অজুহাত তুলে লর্ড ডাফরিণ যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

ইতিহাসে এরই নাম তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ।

কয়েক মাসের মধ্যে ইংরাজরা মান্দালয় দখল করল। রাজা থিবো সপরিবারে ভারতবর্ষে নির্বাসিত হলেন। এর বছর দুই পর আঠার শ ছিয়াশীতে ইংরাজরা উত্তর ব্রহ্মও অধিকার করে বসল।

এই সময়ের একটা স্মরণীয় ঘটনার কথা মনে পড়ে লা ডিনের। ব্রহ্মদেশের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রকাশ্যে এই যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল

বর্মা মুলুকে সে এক অপূর্ব দিন এসেছিল। মাতৃভূমি স্বাধীন রাখার জন্য বর্মী জোয়ানরা মৃত্যু পণে যুঝেছিল। দেশপ্রেমী সৈনিকের রক্তে মান্দালয়ের মাটি পিছল হয়ে গিয়েছিল।

লা ডিনের দুটো গুলি লেগেছিল। একটা গুলি কাঁধে বিঁধেছিল, আর একটা মাংসল উরু ভেদ করে গিয়েছিল। গুলির ক্ষত কবে শুকিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু কাঁধ এবং উরুতে দুটো গোলাকার কালো দাগ আজও ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সেই ভয়াবহ, রক্তাক্ত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কত বয়স হয়েছে লা ডিনের! দেহের বাঁধুনি ঢিলা হয়ে গিয়েছে। চামড়া শিথিল হয়ে ঝুলছে। মুখে অসংখ্য কালো কালো দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। চোখে মাছের আঁশের মত ছানি পড়তে শুরু করেছে।

সেটা আঠার শ ছিয়াশী আর এটা উনিশ শ এগার। মধ্যে পুরা পঁচিশটা বছর। স্মৃতির উপর পঁচিশ বছরের একটা পর্দা ঝুলছে। কত কথা ভুলে গিয়েছে লা ডিন। কত কথা আবছা, দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছে। কত ঘটনা নিঃশেষে নিঃশব্দে মন থেকে মুছে গিয়েছে। তবু পঁচিশ বছর আগের সেই রক্তই তো শিরায় শিরায় বয়ে চলে। কিন্তু সেদিনের রক্ত ছিল খরধার, দ্রুতবহ, জলন্ত। সেই রক্তই আজ নিরুত্তাপ, নিস্তেজ, মন্থর।

লা ডিনের জীবন আজ অন্য খাতে বইছে।

থিবোর যুদ্ধে বন্দী হয়ে আন্দামান এসেছিল লা ডিন। এই দ্বীপে তার দীর্ঘ চব্বিশটা বছর কেটে গিয়েছে। এখানে এসে আর একটা জীবনের খোঁজ পেয়েছে সে। তাপহীন, উত্তেজনাহীন বিচিত্র সে জীবন। সে জীবন পবিত্র, স্নিগ্ধ, পরামার্থ সন্ধানী। পোর্ট ব্লেয়ারের চাউঙে গিয়ে সে ফুঙ্গি হয়েছে। বার বছর তার ফুঙ্গি জীবন চলছে।

বার বছর আগে লা ডিনের সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন তার নিরাসক্ত ভিক্ষু জীবন।

আশ্চর্য! বার বছর পর লা ডিনকে আবার কয়েদ করা হয়েছে।

জীবনে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে লা ডিন। তবু থিবোর যুদ্ধের কথা ভাবতে বসে ছানিময় ঘোলাটে চোখ জোড়া ধক ধক করে। হাতের মুঠো পাকিয়ে আসে। দাঁতে দাঁতে হিংস্র শব্দ হয়। মন্থর রক্তের স্রোত আচমকা উন্মাদ বেগে ধমনীতে ঘা মারে।

ভিখন আহীর, বকরুদ্দিন, লখাই এবং আরো দু চারজন কয়েদী তাজ্জব হয়ে লা ডিনের জীবনের কিস্সা শোনে। এই দুর্জ্ঞেয় আজব কয়েদী, যে প্রথম জীবনে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে, যে মুক্তার চাষ করেছে, হাঙর অক্টোপাস মেরেছে, জাহাজের মাল্লাগিরি করেছে, রেণ্ডিবাড়ির দালালি করেছে, চুটিয়ে নেশা এবং নারীসঙ্গ করেছে, সে-ই আবার

বর্মামুলুকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে ইংরাজের গুলি খেয়েছে, সেলুলার জেলে কয়েদ খাটতে এসে ফুঙ্গি বনেছে। পরস্পর বিরোধী কত বৃত্তি, কত পেশাই না ধরেছে লা ডিন! তার জীবন কোনদিন একটি মাত্র খাত বেয়ে চলে নি, মুহূর্তে মুহূর্তে খাত বদল করেছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে যারা কয়েদ খাটতে আসে, তাদের জীবন মোটামুটি একটি খাত বেয়েই চলে। সে খাতটি হল জৈবিক এবং দৈহিক ক্ষুধার খাত। কামগন্ধি নারীমাংসে, চরসে-পিনিকে-গেঁজিয়ে-ওঠা মদে তাদের জীবনের সমস্ত চরিতার্থতা। নারী-নেশা-নির্বিচার হত্যা—এ সবের বাইরে জীবনের অন্য অর্থও যে আছে, সে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। এ সবের বাইরে বিশেষ কিছুই তারা বোঝে না।

লা ডিনের জিন্দগীর কথা শুনতে শুনতে কয়েদীরা তাজ্জব বনে যায়, অবাক হয়। কিছু বোঝে, বাকী সবখানিই তাদের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় বিষম জটিল এক ধাঁধার মত মনে হয়।

হঠাৎ ভিখন আহীর বলে, 'লা ডিনজী, বার বরষ আপনি ফুঙ্গি হয়েছেন। এত বরষ বাদ আপনাকে আবার কয়েদ করল কেন?'

উদাস স্বরে লা ডিন বলল, 'ফায়া মালুম।'

খানিকটা সময় যায়।

লা ডিন এদিক সেদিক তাকিয়ে কি যেন খোঁজে। গলার স্বরটা তার খাদে নামে, 'সেদিন মুন্সীজীর কাছে একটা কথা শুনলাম।'

গরাদের ওপাশের কয়েদীগুলো কান খাড়া করে বসে।

ভিখন বলে, 'কি কথা লা ডিনজী?'

'এবার আন্দামানে দুসরা কিসিমের কয়েদী আসছে।'

'দুসরা কিসিমের কয়েদী! সে আবার কি! কয়েদীর তো একই কিসিম। কোতল ডাকাইতি করে যে শালে লোক আন্দামান আসে, তারা তো এক কিসিমেরই কয়েদী।'

লা ডিনের ঘোলাটে অস্পষ্ট চোখজোড়া ধিকি ধিকি জ্বলছে। গলার স্বরটা অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে। গাঢ়, গম্ভীর গলায় লা ডিন বলে, 'এই জাহাজে যে কয়েদীরা আসছে, ইণ্ডিয়াকে আজাদ করার জন্য তারা ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করেছে।'

এতক্ষণ লা ডিনকে আর দশটা কয়েদীর মতই দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই

মুহূর্তে তার পরিবর্তন হয়েছে। গলার স্বর গম্ভীর শোনাচ্ছে, চাপা চাপা চোখ দুটো জলছে, খাড়া চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে, থ্যাবড়া নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে।

সেলুলার জেলের সমস্ত কয়েদীর মধ্যে লা ডিন এখন আশ্চর্য রকমের স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছে। তাকে চেনা হয়ত যায়, কিন্তু বোঝা বড় দুরূহ ব্যাপার।

বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য স্বরে লা ডিন আবার বলে, 'বর্মা মুলুককে আজাদ রাখতে এক রোজ ইংরাজদের সাথ আমরাও লড়াই করেছিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। কেউ আর কথা বলে না।

সেলুলার জেলের মাথায় রোদ ঝক ঝক করে। মাথার উপর বিরাট আকাশটাকে জলন্ত কাঁসার পাতের মত দেখায়। সেণ্ট্রাল টাওয়ারের চোখা ডগায় সাগর পাখি দুটো আগের মতই ঝিম মেরে বসে থাকে। উপসাগর থেকে একটানা ঢেউয়ের শাসানি ভেসে আসে।

গরাদের মোটা মোটা দুটো লোহা ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লা ডিন। তার চাপা কুতকুতে চোখ দুটো আন্দামানের আকাশ পার হয়ে কোথায় কোন এক দুর্জ্ঞেয় জগতে হারিয়ে গিয়েছে। তার চোখের সামনে এই সেলুলার জেল, কয়েদী, আকাশ—কিছুই নেই। সব মুছে নিরাকার হয়ে গিয়েছে।

ইণ্ডিয়াকে আজাদ করতে যারা ইংরাজদের সঙ্গে লড়ে আন্দামানে কয়েদ খাটতে আসছে, তাদের কথাই ভাবছে লা ডিন। মনে পড়ল, বর্মা মুলুকের মর্যাদা রাখতে তারাও একদিন ইংরাজদের সঙ্গে যুঝেছিল। লা ডিন চমকে উঠল। যারা ইণ্ডিয়াকে আজাদ করতে চায়, আর যারা বর্মাকে আজাদ রাখতে চেয়েছিল—তাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম এবং আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে।

থিবোর যুদ্ধের পর পঁচিশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। পঁচিশটা বছরে জীবনে কত ওলট পালটই না ঘটে গিয়েছে। আন্দামানে কয়েদ খাটতে এসে চাউঙে গিয়ে সে ফুঙ্গি হয়েছে। তবু পঁচিশ বছর আগে সেই আঠার শ ছিয়াশীতে থিবোর যুদ্ধের আগুন বুকের মধ্যে পুরে আন্দামান এসেছিল লা ডিন। সে আগুন এতদিন পরও নেবে নি। কালের অমোঘ প্রভাবে তার উপর খানিকটা ছাই জমেছে। শুধুমাত্র একটি ফুৎকারের অপেক্ষা। পঁচিশ বছরের সমস্ত ছাই উড়ে থিবোর যুদ্ধের স্মৃতি মুহূর্তে অগ্নিমুখ হয়ে

উঠবে। এই জাহাজের কয়েদীরা বুঝি বা সেই ফুৎকার হয়েই আন্দামানে আসছে।

গরাদের ওপাশে কয়েদীরা ফিস ফিস করে বলে, 'ইংরাজদের সাথ লড়াই করে কয়েদ খাটতে আসছে। শালেরা বড়া মরদ হৈ।'

ইংরাজ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েদীর মনে অদ্ভুত এক ধারণা আছে। যে ইংরাজ কয়েদীকে ফাঁসিতে লটকায়, দরিয়ার মধ্যে কয়েদখানা বানিয়ে সাজা খাটায়, গুলি মেরে পাঁজরা চুর চুর করে দেয়, যাদের একটি ইঙ্গিতে পাঠান পাঞ্জাবী পেটি অফিসাররা পাছার হাড্ডি ঢিলা করে দেয়, হাড্ডি থেকে মাংস খসিয়ে দেয়, তাদের মত বড় মরদ আর কে? সেই ইংরাজদের সঙ্গে যারা লড়াই করার মত কলিজার তাকত রাখে, তাদের মত হিম্মতদার তামাম দুনিয়া ঢুঁড়লে বুঝি মিলবে না। সাধারণ কয়েদীদের কাছে সেই সব হিম্মতদার মানুষগুলো রহস্য এবং বিস্ময়ের বস্তু। এই জাহাজেই তারা আন্দামান আসছে।

কৌতূহলে উত্তেজনায় কয়েদীদের চোখমুখ ঝকমক করে।

একটু পরই পেটি অফিসাররা এসে পড়ল। তাড়িয়ে তাড়িয়ে ডাণ্ডা হাঁকিয়ে, খিস্তি খাস্তা আর গালি দিয়ে কয়েদীদের কাজে পাঠিয়ে দিল।

একটা মতলব ভেঁজে ভিখন আহীর লা ডিনের কাছে এসেছিল। নানা কথার ঝামেলায় নিজের কথাটাই তার বলা হল না।

কাজে যাবার আগে ভিখন বলল, 'সন্ধ্যের সময় আমি আসব। আপনার সঙ্গে দু চারটে বাতচিত আছে।'

লা ডিন কিছুই বলল না। মাথাটা বাঁ দিকে কাত করল।

আন্দামানের আকাশে তখনও মরা মরা ফ্যাকাসে আলোর ছোপ লেগে রয়েছে। সকালে যে সূর্যটা একটা আগুনের গোলকের মত দরিয়া থেকে উঠে এসেছিল, একটু আগে অরণ্যের ওপারে সেটা টুপ করে ডুব মেরেছে। সাগর পাখিরা দ্বীপে ফিরে যেতে শুরু করেছে। উপসাগরের অগভীর জলে উড়ুক্কু মাছেরা বেলাশেষের বিষণ্ণ আলোটুকু মেখে শেষ খেলা খেলে নিচ্ছে।

এমন সময় ভিখন আহীর এল।

গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল লা ডিন। সেই দুপুর থেকে

একই ভঙ্গিতে বসে রয়েছে সে। তার চোখের সামনে দুপুরটা বিকাল হয়ে গেল। বিকালটা রঙ বদলাতে বদলাতে সন্ধ্যার দিকে ঢলে পড়েছে।

ফিস ফিস করে ভিখন ডাকল, 'লা ডিনজী—'

'হাঁ—কে?'

তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিল লা ডিন। ধড়মড় করে নড়ে চড়ে বসল।

ভিখন এবার স্পষ্ট করে বলল, 'আমি ভিখন।'

'বস।'

গরাদের ওপাশে বসে পড়ল ভিখন আহীর।

এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি। যখন করল, ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল লা ডিন। ভিখনের পোড়া ভুরুটা ফেটে গিয়েছে। রক্তমাখা থকথকে এক ডেলা হলদেটে চর্বি বেরিয়ে পড়েছে। পাটকিলে রঙের খানিকটা কাঁচা মাংস ভুরুটার উপর ঢিবির মত ফুলে ঝুলছে। পোড়া চোখটা বুঁজে গিয়েছে। পোড়া গালের কোঁচকানো চামড়ার উপর গাঢ় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। এখনও ফাটা ভুরু থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় তাজা রক্ত ঝরছে।

লা ডিন ককিয়ে উঠল, 'কি হয়েছে ভিখন!'

রক্তের বিন্দুগুলি ভুরু থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গাল বেয়ে ঠোঁটের উপর এসে পড়ছে ভিখনের। জিভ বার করে রক্ত চাটছে ভিখন।

লা ডিন এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কি হয়েছে ভিখন! এত খুন কেন?'

পোড়া, রক্তাক্ত, বীভৎস মুখে হাসল ভিখন। আস্তে আস্তে বলল, 'ও কুছু না লা ডিনজী। জাজিরুদ্দিন হারামীটার সাথ একটু হাতাহাতি হয়ে গেল। শালে ইটা হাঁকিয়ে আঁখ তুবড়ে দিয়েছে, খুন আর গোস্ত বার করে দিয়েছে। শালের সাথ সব সম্পর্ক তুড়ে দিয়ে এলাম। শালে ঠগ, বেতমীজ, জুয়াচোর, বেজন্মা। শালের মা-বাপের ঠিক নেই।'

এক দমে না থেমে শ' খানেক খিস্তি আউড়ে যায় ভিখন আহীর। তারপর টেনে টেনে হাঁপায়। হাঁপানির তাড়নায় বুকটা তোলপাড় করে।

ভিখন আবার বলে, 'শালের মুখের ঠিক নেই। মুখ থেকে কথা তো বার হয় না, ঘোড়ার পেচ্ছাব বার হয়।'

'কি হল ভিখন!' লা ডিন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

'শুনুন লা ডিনজী, ঐ জাজিরুদ্দিন হারামীটার পাল্লায় পড়ে ইসলামী বনেছিলাম। হিন্দু নাম বদলে মুছলমানী নাম নিয়েছিলাম। শালে কথা

দিয়েছিল, মুছলমান বনলে জেয়াদা খানা মিলবে। লেকিন—' বলতে বলতে ভিখন আহীর থামল।

লা ডিন বলল, 'লেকিন কী?'

'দু দশ রোজ জেয়াদা খানাই মিলেছে। কথামত দিনে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়েছি, কুরান শরীফের বয়েৎ আওড়েছি। পাক্কা ইসলামী বনে গিয়েছি।'

একটু থেমে কী যেন ভাবল ভিখন।

এতক্ষণে আকাশটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেক দূরে মাউণ্ট হ্যারিয়েটের চূড়াটা ঘিরে হাল্কা কুয়াশার একটা পর্দা নামতে শুরু করেছে। দূরে রস দ্বীপ, আরো দূরে নর্থ বে'র ত্রিকোণ মুখটা, নর্থ বে পেরিয়ে হ্যাভলক দ্বীপ—সব, সব কিছু আঁকা বাঁকা কয়েকটি আঁচড়ের মত দেখায়। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নর্থ বে, হ্যাভলক দ্বীপ, রস দ্বীপ দেখতে দেখতে ভিখন আহীর বলল, 'স্রেফ পেটের ভুখের জন্যে জাত দিয়েছিলাম, ধরম দিয়েছিলাম। হিন্দু ছিলাম সেলুলার কয়েদখানায় এসে মুছলমান বনলাম। শালে জাজিরুদ্দিন এ বেলা থেকে জেয়াদা খানা বন্ধ করে দিয়েছে। চার রোটিতে আমার মত মরদের কি পেট ভরে! আপনিই বলুন লা ডিনজী?'

গরাদের ফাঁক দিয়ে দু হাত ঢুকিয়ে লা ডিনের ডান হাতটা চেপে ধরল ভিখন। তার একমাত্র চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটে বেরিয়েছে।

অবাক হয়ে ভিখনের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লা ডিন। একটা কথাও বলছে না। পেটের ভুখের জন্য ধরম দেওয়ার মত তাজ্জবের কথা সে কস্মিনকালে শোনে নি।

ভিখন আহীর আবার শুরু করল, 'ইসলামী বনেছিলাম, জাজিদ্দরুিন আমার জাত ধরম মেরে নাম দিয়েছিল করিমুদ্দি। আজ থেকে আমি আবার হিন্দু বনলাম। জেয়াদা খানার জন্যে জাত দিয়েছিলাম। খানাই যদি না মেলে, বেফায়দা জাত মারব কেন?'

লা ডিন এবারও জবাব দিল না।

মাউণ্ট হ্যারিয়েটের চূড়াটা ঘিরে এতক্ষণ হাল্কা কুয়াশার একটা রেখা ছিল। অস্পষ্ট হলেও রস দ্বীপ আর হ্যাভলক দ্বীপটাকে দেখা যাচ্ছিল। এখন আর কিছুই চোখে পড়ে না। গাঢ় অন্ধকারে আন্দামানের আকাশ, সমুদ্র, উপসাগর এবং অরণ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

গরাদের এপাশে ওপাশে দুটো কয়েদী মুখোমুখি বসে রয়েছে।

আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে ভিখন আহীর ডাকল, 'লা ডিনজী—'

'হাঁ—'

'দুপুরে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। তখন দুসরা কয়েদী থাকায় বলতে পারি নি। এখন বলব?'

'বল।'

'আপনি আমাকে মেহেরবানি করবেন?'

'মেহেরবানি!'

'হাঁ হাঁ জী, রোজ আপনার খানা থেকে আমাকে ভাগ দেন। আপনি ফায়াজীর (বুদ্ধের) চেলা, ফুঙ্গি। ভাবছি—'

বাকীটা আর পূরণ করল না ভিখন। দু হাতে লা ডিনের ডান হাতটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরল।

লা ডিন বলল, 'কুছু বলবে ভিখন?'

'হাঁ জী।' ভিখন আহীরের স্বরটা অদ্ভুত শোনায়। পুরা একটা দম নিয়ে সে বলে, 'লা ডিনজী, আপনি খানা দিয়ে আমার জান বাঁচান, আমি আপনাকে কুছু দিতে চাই।'

'কি দিতে চাও?'

'ধরম।'

অনেকক্ষণ ধরে এই কথাটাই বলার উদ্যোগ করছিল ভিখন আহীর।

লা ডিনের গলাটা চমকে উঠল, 'ধরম!'

'হাঁ জী, আমি ফুঙ্গি বনব।'

বলতে বলতে বগলের তলা থেকে দুটো হলদে রঙের কাপড় আর কুর্তা বার করল। বলল, 'লা ডিনজী, ফুঙ্গিদের মত কাপড় ছুপিয়েছি। আমি ফুঙ্গি বনব; আপনার ধরম নেব।'

লা ডিন চুপচাপ বসে রইল। ভেবে ভেবে সে বুঝে উঠতে পারে না, কেমন করে ভিখন আহীর নামে এক কয়েদী স্রেফ পেটের ভুখের জন্য হিন্দু থেকে ইসলামী হয়, আবার ইসলামী থেকে বৌদ্ধ হয়।

জীবনে বহু দেখেছে লা ডিন। কিন্তু স্রিফ ভুখের জন্য একটা মানুষকে বার বার ধরম হারাতে ধরম খোয়াতে এই প্রথম দেখল।

তিরিশ

এখন আর সমুদ্রের দিকে তাকান যায় না।

সৃষ্টির আদি কাল থেকে বঙ্গোপসাগরের জলে কত লবণ যে মিশে রয়েছে, কেউ কোনদিন মেপে দেখে নি। সেই সমুদ্রজোড়া আকণ্ঠ, অফুরন্ত লবণ এখন জ্বলছে।

এখন দুপুর।

সকালে টিণ্ডালান পেটি অফিসারনীদের পাহারায় রস দ্বীপের সিকমেন-ডেরায় (হাসপাতালে) গিয়েছিল সোনিয়া। রোজই তাকে সুঁই (ইঞ্জেকসন) ফোঁড়াতে রস দ্বীপে যেতে হয়।

সকালে উপসাগর কত শান্ত ছিল। ছোট ছোট হাল্কা ঢেউগুলির মাথায় সোনালী রোদ দোল খাচ্ছিল। উড়ুক্কু মাছগুলি ফিনফিনে রূপালী ডানায় জল কেটে সাঁই সাঁই করে ছুটছিল।

এখন সমস্ত চেহারাটাই আগাগোড়া বদলে গিয়েছে।

যতদূর তাকানো যায়, শুধু কোটি কোটি ঢেউয়ের মাথা জ্বলে। এখন চারপাশের সমুদ্র ঘিরে একটা অসহ্য আগুনের স্রোত বয়ে চলেছে। লবণ-দরিয়া অগ্নিমুখ হয়ে রয়েছে। আন্দামানের আকাশে এখন এক টুকরো মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। আশ্চর্য নীল আকাশটা ঝকঝক করে। আগ্নেয় আকাশটা আগ্নেয় সমুদ্রে প্রতিফলিত হয়ে একটা অন্তহীন আগুনের উৎসব শুরু করে দিয়েছে।

দুপুরের রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দরিয়ার তেজ বাড়তে থাকে।

রস দ্বীপ থেকে এইমাত্র মোটর বোটটা সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার জেটিতে এসে ভিড়ল।

এতক্ষণ কোন দিকে নজর ছিল না সোনিয়ার। ঠোঁট দুটো কামড়ে দম বন্ধ করে একটা সাজ্ঘাতিক যন্ত্রণার বেগকে সামাল দিচ্ছিল। দম আটকে থাকতে থাকতে ফুসফুসটা ফেটে যাবার দাখিল হয়েছে। দাঁতের চাপে

ঠোঁটের মাংস কেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। তবু যন্ত্রণাটাকে বশে আনতে পারছে না সোনিয়া।

পেটি অফিসারনী এতোয়ারী সোনিয়ার কাঁধে হাত রাখল। কালো কালো এবড়ো খেবড়ো দুপাটি দাঁত মেলে সে হাসল। এতোয়ারীকে খুশী খুশী দেখাচ্ছে।

কাঁধের উপর হাত রেখে এতোয়ারী হাসল। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই সোনিয়ার। মুখও সে তুলল না, তুলতে পারল না। আসলে সেই যন্ত্রণাটাই তাকে কাবু করে ফেলেছে।

আস্তে একটা ঠেলা মেরে এতোয়ারী বলল, 'এ সোনিয়া—'

কাতর, অস্ফুট শব্দ ফুটল সোনিয়ার গলায়, 'হাঁ—'

'শালীর দিলে আজ বহুত ফুর্তি, তাই না?'

সোনিয়া জবাব দিল না। ঘাড় গুঁজে দু হাতে পেটটা চেপে ধরল।

'এ শালী, কথা বলছিস না কেন?'

'কি বলব?'

'দিলে তোর ফুর্তি জাগে নি?'

'কেন?'

'কেন! শালী নেকী, হারামী কাঁহাকা। দিল্লাগী করছিস?'

'না।'

ইতিমধ্যে রশিম্যান দড়িদড়া দিয়ে মোটর বোটটাকে ক্যাপস্টানের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে।

এতোয়ারীর কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে রেণ্ডিবারিক কয়েদখানার ভিতরে এসে পড়ল সোনিয়া।

তলপেটের সেই যন্ত্রণাটা কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না সোনিয়া। ফিনফিনে পাতলা চামড়ার তলায় চর্বি আর মাংস ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। ডেলাটা একটু একটু করে শক্ত হয়ে উঠছে। তারপর সেই নিরেট, কঠিন মাংসের ডেলাটা সমস্ত তলপেটটা জুড়ে অদম্য বেগে ছোটাছুটি শুরু করেছে। ডেলাটা ওলট পালট খাচ্ছে, রক্ত মাংসের স্তূপ ঠেলে সরিয়ে, শিরা উপশিরাগুলোকে তোলপাড় করে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। কিছুতেই, কোন উপায়েই তাকে ঠেকান যাচ্ছে না।

এতোয়ারী সস্নেহে বলল, 'এ সোনিয়া, দরদ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ অফসারনী, পেটটা ছিঁড়ে পড়ছে।'

'কুঠরিতে চল, ডলাই মলাই করে দেব।'

এই ক'দিনে পেটি অফিসারনী এতোয়ারীর মনে কিছুটা মায়া বসে গিয়েছে। আন্দামানের পেটি অফিসারনীর মন বলে কোন বস্তু নেই। যদিই বা থেকে থাকে, সে মন রসকষহীন, নির্মম নিরেট এমনই এক ঠাঁই, যেখানে মায়া, স্নেহ, মমতা নামে কিছুই জন্মায় না।

আন্দামান আসার আগে দু দুটো রেণ্ডি পাড়া চালিয়ে এবং সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানায় এত বছর পেটি অফিসারনীর কাজ করে মন বলে বস্তুটিকে খুইয়ে বসেছিল এতোয়ারী। সোনিয়াকে দেখে, সোনিয়ার সঙ্গে মিশে কেন জানি এতদিন পর খোয়ানো মনটাকে ফিরে পেয়েছে সে। আশ্চর্য, সেই মনে নিজের অজান্তে কখন যে মায়া বসেছে, কখন যে সোনিয়ার জন্য টান ধরেছে, ঠিক করে উঠতে পারে না এতোয়ারী।

কুঠুরিতে এসে কড়ুয়া তেল গরম করে তলপেটে সইয়ে সইয়ে ডলে দিল এতোয়ারী। যন্ত্রণার দাপট অনেক কমে এল।

দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমে কাটিয়ে দিল সোনিয়া। শরীরটা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে, তলপেটের ব্যথাটা মরেছে। বড় ভাল লাগছে সোনিয়ার।

মাথার চুলগুলি পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। সারাদিন তলপেটের সেই যন্ত্রণাটার ধকল গিয়েছে। শরীরটা বড় ক্লান্ত লাগছে। অলস, শ্রান্ত ভঙ্গিতে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে সোনিয়া। আকাশ দেখছে। গোয়েলেথ পাখিগুলি শূন্যে সাঁতার কাটতে কাটতে উপরের দিকে উঠছিল। কত উপরে ওঠা যায়, তারই একটা প্রতিযোগিতা যেন চলছিল পাখিগুলির মধ্যে। দেখতে বেশ লাগছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপের এই বিকালে দিল-মেজাজ খোশ হয়ে আছে সোনিয়ার।

এমন সময় আবার এল এতোয়ারী।

সোনিয়া ডাকল, 'এস অফসারনী।'

কম্বলের খুঁটটা টেনে সোনিয়ার পাশে বসে পড়ল এতোয়ারী। নরম গলায় বলল, 'আমার একটা কথা রাখবি সোনিয়া?'

'কী কথা?'

'আজ থেকে আমাকে অফসারনী বলে ডাকবি না।'

'তবে কি বলে ডাকব ?'

'বহীন বলে ডাকবি। আমি তোর বড় বহীন। ডাকবি তো ?'

'হাঁ।'

'খুদার নামে তিন কসম নে।'

'খুদার নামে তিন কসম নিলাম।'

'আজ থেকে আমরা বহীন।'

বলতে বলতে দু হাতে সোনিয়াকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে এতোয়ারী। এতোয়ারীর উষ্ণ, বিরাট বুকের ভিতর আরামে চোখ বুঁজে আসে সোনিয়ার।

পাঠান জেনানা এতোয়ারীর আজ যেন কি হয়েছে! এতোয়ারীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে তারই কথা ভাবতে ভাবতে তাজ্জব বনে যায় সোনিয়া।

খানিকটা পর সোনিয়াকে ছেড়ে দিল এতোয়ারী। কোথা থেকে দুটো রেশমী কালো ফিতে জুটিয়ে এনেছিল। মোগলাই ছাঁদে সেই ফিতে দিয়ে সোনিয়ার চুল বেঁধে দিল। তারপর সোনিয়ার মুখটা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মুগ্ধ গলায় বলল, 'বহীন, তুই বড় খুবসুরতী। তোর মাফিক সোন্দর কয়েদানী আন্দামানে কোনদিন আসে নি।'

সোনিয়া জবাব দিল না।

অনেকটা সময় চুপচাপ কাটল। সোনিয়া কি এতোয়ারী—কেউ একটা কথাও বলল না।

তারপর এতোয়ারীই প্রথম কথা বলল। রস দ্বীপ থেকে ফেরার সময় দুপুরে যে কথাটা জিজ্ঞাসা করে জবাব পায় নি, সেই কথাটাই নতুন করে পাড়ল, 'আজ তোর দিলে বহুত ফুর্তি, তাই না সোনিয়া ?'

'কেন ?' সোনিয়া পাল্টা প্রশ্ন করল।

'ছোকড়ি, তুই বড় দিল্লাগী জানিস।'

সোনিয়ার দুটো গাল টিপে ব্যথা ধরিয়ে দেয় এতোয়ারী। টেনে টেনে রসিয়ে রসিয়ে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে বলে, 'তুই শালী কিছুই যেন জানিস না! ডাক্তার সাব তোকে শাদীর কথা বলেছে না! তোর শাদী করা দরকার, শাদী না করলে ব্যারাম সারবে না।'

অনেক দিনের পুরানো ব্যারাম নিয়ে আন্দামান এসেছিল সোনিয়া। মুলুকে থাকতেই তলপেটটা যন্ত্রণায় চিন চিন করত। চর্বি এবং মাংসের একটা শক্ত পিণ্ড পেটের নাড়িগুলি ছিঁড়ে ফেঁড়ে ছুটে বেড়াত। মনে হত,

শরীর থেকে মাজা, পাছা, তলপেট, উরু, পুরা নীচের অংশটা খসে পড়বে। একবার যন্ত্রণা শুরু হলে বেহুঁশ হয়ে পড়ত সোনিয়া।

মুলুকে থাকতে সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) গিয়ে রোগটা সারায় নি সোনিয়া। ব্যথা উঠলে দাঁতে দাঁত চেপে সামাল দেবার চেষ্টা করেছে। না পারলে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। তবু সিকমেনডেরায় যায় নি। সিকমেনডেরা সম্বন্ধে অহেতুক অদ্ভুত এক ভয় ছিল সোনিয়ার মনে।

একদিন দ্বীপান্তরের সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছিল সোনিয়া। সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ব্যারামটাও এসেছিল। মুলুকে থাকতে যে ব্যারামটাকে পুষে রেখেছিল, বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে আসার পর সোনিয়ার সেই ব্যারামটা বিশগুণ চাগিয়ে উঠেছে। রস দ্বীপের সিকমেনডেরায় রোজ রোজ সুঁই নিয়েও কোন সুরাহা হচ্ছে না। যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে।

আজ ডাক্তার সাব বলেছে, সুঁই (ইঞ্জেকসন) কিংবা দাওয়াইতে সোনিয়ার এই ব্যারাম সারবার নয়। এর জন্য দরকার পুরুষসঙ্গ। শাদী না করলে মরদ মিলবে না; মরদ না হলে এই ব্যারামও ঘুচবে না। ডাক্তারসাব সোনিয়ার শাদীর সুপারিশ করে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে চিঠি পাঠিয়েছে। সোনিয়ার নসীব বড় ভাল। তা না হলে আন্দামানের কয়েদখানায় মাত্র পঁচিশ তিরিশ রোজ কাটিয়ে কেউ কি শাদী করার হুকুম পায়!

এতোয়ারী বলল, 'তোর শাদী হয়ে যাবে সোনিয়া। রেণ্ডিবারিক কয়েদখানা থেকে তুই চলে যেতে পারবি। লেকিন আমি কোন দিন এখান থেকে যেতে পারব না বহীন। এখানেই আমার জান জমানা শেষ হয়ে যাবে, জিন্দগী ফৌত হয়ে যাবে। চান্নু সিংয়ের সঙ্গে শাদী খারিজ করে বড় ভুল করেছি বহীন। ভুলটা কোন দিন শোধরাতে পারব না। তকদিরটাই আমার খারাপ।'

এতোয়ারীর মুখেচোখে করুণ আক্ষেপ ফুটে বেরোয়। বুকটাকে তোলপাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দেখেশুনে মনটা যেন কেমন করে ওঠে সোনিয়ার। এতোয়ারীর একটা হাত বুকের মধ্যে টেনে আস্তে আস্তে সে বলে, 'ভাবিস না বহীন, দিলকে তখলিফ দিস না। আবার তোরও শাদী হবে। কয়েদখানা থেকে তুইও ছুটা পাবি।

'না না, বিলকুল ঝুট। কোনদিন আমি আর এই দোজখ (নরক) থেকে বেরুতে পারব না।'

পাঠান জেনানা এতোয়ারী হাউ হাউ করে কাঁদে। তার সমস্ত যন্ত্রণা, আক্ষেপ এবং ব্যথা বুক মুচড়ে মুচড়ে চোখ ফেটে লোনা জল হয়ে ঝরতে থাকে।

অনেকক্ষণ কেউ কথা খুঁজে পায় না।

এক সময় কামিজ দিয়ে চোখ মুছে এতোয়ারী বলে, 'মঙ্গলবার শাদীর প্যারিড (প্যারেড) হবে। মনে আছে?'

'হাঁ—'

'চান্নু সিং আসবে—'

চোখ নামিয়ে সোনিয়া আস্তে শব্দ করে, 'হাঁ—'

সোনিয়ার থুতনিটা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে খ্যা খ্যা শব্দে এতোয়ারী হাসে। বলে, 'চান্নুর নাম শুনেই আঁখ নামালি! এ শরমবালী, আঁখ তোল।'

সোনিয়া মুখ তোলে।

এতোয়ারী বলতেই থাকে, 'মনে রাখিস সোনিয়া, মঙ্গলবারে চান্নু আসবে। তার শিরে লাল সাফা (পাগড়ি) থাকবে, হাতে লোহার কাঙনা থাকবে। সফেদ (সাদা) কাপড়-কুর্তা পরে চান্নু আসবে।'

সোনিয়া জবাব দেয় না।

রোদের রঙ মরে আসে। আন্দামানের আকাশ আবছা, অস্পষ্ট হয়ে যায়। অশান্ত উপসাগরের গর্জন ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে।

খানিকটা পর সোনিয়াকে একা রেখে এতোয়ারী উঠে পড়ল।

নিজের মনের গতিক বুঝে উঠতে পারছিল না সোনিয়া। কি সে করবে, কি তার করা উচিত—কিছুই স্থির করতে পারছিল না।

ঘাড়টা কাত করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সোনিয়া ভাবছিল।

মনের উপর দিয়ে দমকা বাতাসের ঝাপটানির মত অনেকগুলো শিথিল অসম্বদ্ধ ভাবনা এলো পাথাড়ি ছুটছে। একটা ভাবনার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই, যোগ নেই, পারম্পর্য নেই। আবার মনে হয়, টুকরা টুকরা ভাবনাগুলো একটা পুরা, অখণ্ড চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ। একটার সঙ্গে অন্যটার আশ্চর্য মিল রয়েছে, যোগ রয়েছে, সঙ্গতি রয়েছে।

ডাক্তারসাবের একটা মাত্র কথায় চারদিক থেকে এতগুলো ভাবনা যে তার দিলটাকে ঠেসে ধরবে, আজ সকালে রস দ্বীপে সুঁই (ইঞ্জেকসন) নিতে যাবার আগে কি একবারও ভেবেছিল সোনিয়া ? তাকে শাদী করতে হবে ! নইলে ব্যারাম সারবে না !

আন্দামানের আকাশটা অন্ধকার হয়ে আসে। মিট মিটে অসংখ্য তারা দেখা দেয়। রস দ্বীপ থেকে সার্চ লাইটের তীব্র আলো এসে পড়ে উপসাগরে। মনে হয়, বিরাট একটা আলোর বল্লম সিসোস্ট্রেস উপসাগরের উপর দিয়ে রস দ্বীপ আর পোর্ট ব্লেয়ারকে গেঁথে রেখেছে।

আন্দামানের রাত্রির মহিমা বোঝা বড় দুরূহ ব্যাপার। দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র এই রাত্রি।

রাত্রির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ সেই মরদটার কথা মনে পড়ে সোনিয়ার। সেই মরদটা—যে বিশ বিশটা ভঁইস চরাত, লোটা লোটা সিদ্ধি ঘুঁটে ঢক ঢক করে গিলত, মাঝ রাত পর্যন্ত বাজখাঁই বদখত গলায় গাইত, বেলা দুপুর পর্যন্ত রশির খাটিয়ায় ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাত। সেই মরদটা, যার নাম রামদেও তিওয়ারী। সেই মরদটা, যে তার হাতে জান দিয়েছে। সেই মরদটা, আন্দামানে এসেও যাকে ভোলা যায় না, যার স্মৃতি হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে তার দিল বিকল করে ফেলে। সেই মরদ, যে বেদরদী, বেতমীজ, শয়তান !

আশ্চর্য; ডাক্তারসাব শাদীর কথা বলার পর থেকে তার কথাটাই ঘুরে ঘুরে মনে আসছে। কেন এমন হয় ? ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সোনিয়া। রামদেও তিওয়ারীর সঙ্গে ব্রিজলালের কথাও মনে আসে। সেই ব্রিজলাল, বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো যার নাক, পাকানো শরীর, দুমড়ানো পিঠ, ধারাল চোখ, সোনা বাঁধানো দাঁত, গলায় চুনোট করা চাদর, চোখের কোলে ব্যাভিচারের পাকা কালি—পুরাদস্তুর রইস আদমী। সেই ব্রিজলাল—যার কথায় সে রামদেওয়ের চাপাটিতে ধুতুরার বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

রামদেও আর ব্রিজলালের কথা ভাবে সোনিয়া। তার চোখ দুটো ধিকি ধিকি জ্বলে। ডাক্তারসাব শাদীর কথা বলেছে, অথচ দুটো আদমীর একটাও আজ নেই। রামদেও মরেছে। আর ব্রিজলাল ?—নরকের কুত্তাটা কত লোভ দেখিয়েছিল, কত মজাদার কথা বলেছিল। পাটনা শহরে নিয়ে তাকে পাক্কা মোকামে রাখবে, আচ্ছা আচ্ছা মিঠাই খাওয়াবে, রেশমী কাপড় পরাবে,

বায়োস্কোপের খেল দেখাবে, তাকে শাদী করবে। কত খোয়াবই না দেখিয়েছিল হারামীটা! রামদেও মরার পর সেই যে ব্রিজলাল ভাগল, আর তার পাত্তাই মিলল না।

হঠাৎ ভাবনাটা অন্য খাত বেয়ে চলল। একটু আগে এতোয়ারী বলে গিয়েছে, মঙ্গলবার শাদীর প্যারেডের সময় চান্নু সিং আসবে। সেই চান্নু সিং, যে তার জন্যে পুলিসের ডাণ্ডা খেয়ে অনেক খুন দিয়েছে। চান্নু সিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে লখাইর কথা মনে পড়ল। এলফিনস্টোন জাহাজে পুরা একটা রাত তার পাশে কাটিয়েছে সোনিয়া। ঝড়ের দরিয়ার সেই সাথীটাকে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে সোনিয়ার। শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়, প্রাণ বাঁচাতেই হবে। প্রাণ বাঁচাবার উন্মাদ তাড়নায় সোনিয়া ঠিক করে ফেলে, যাকে হোক, শাদী করে ফেলবে। আবার মনে হয়, কাকে শাদী করবে?

হঠাৎ রামদেও, ব্রিজলাল, লখাই, চান্নু সিং—সকলের উপর ভয়ানক ক্ষেপে ওঠে সোনিয়া। এই দ্বীপ, এই দরিয়া, এই দুনিয়ার সমস্ত কিছুর উপর অদ্ভুত আক্রোশে মনটা ভরে যায়। কপালের দুপাশে দুটো অবাধ্য রগ সমানে লাফায়। রগদুটো টিপে ধরে বাইরে তাকায় সোনিয়া।

বাইরে আন্দামানের রহস্যময় রাত্রি আরো রহস্যময় হয়েছে।

একত্রিশ

গারাচারামা গাঁওয়ে রাত্রি নামল।

অন্ধকারে ডি-কুনহার কুঠিবাড়িটার নির্দিষ্ট আকার মুছে গিয়েছে। বর্মী প্যাগোডার মত বাড়িটা একটা স্তূপের মত দেখায়।

সামনের নারঙ্গী গাছে একটা রাত-অন্ধ বাদক পাখি ককিয়ে ককিয়ে ডাকতে থাকে। বিকট শব্দ করে বকরা হরিণের পাল পাহাড় থেকে উপত্যকায় নেমে আসে। অরণ্যের দিক থেকে বন-ধুতুরার ঝাঁঝাল গন্ধ ভেসে আসতে থাকে।

ডি-কুনহার কুঠিতে ছোট একটা লণ্ঠন জ্বলছে। নীলচে রঙের মৃদু আলোটাকে ঘিরে পাঁচটা মাথা গোল হয়ে বসেছে।

পাঁচজনের একজন হল ডি-কুনহা। একজন ফাই মঙ বর্মী, এবারডীন বাজারে যার কাঠ আর বেতের আসবাবের দোকান আছে। একজন পল, মালয়ী খ্রীষ্টান। একজন ইন্দোচীনী, বাকী লোকটা জাহাজের সারেঙ; নোয়াখালি জেলার মুসলমান। নাম সোনা মিঞা।

ফিস ফিস কথা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাঁচটা মাথা ঝুঁকে পড়ে এক হয়ে যাচ্ছে। কি এক দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিল করতে পাঁচটা মানুষ ডি-কুনহার কঠিবাড়িতে জড় হয়েছে, কে বলবে?

ডি-কুনহা বলল, 'কি সোনা মিঞা, আবার যে দরিয়ায় এলে! সেবার মুলুকে ফিরবার সময় না বলে গেছলে, আর কোনদিন জাহাজে উঠবে না! খুদার নামে ক'টা কসম খেয়েছিলে! সব ভুলে মেরেছ মিঞা?'

সোনা মিঞা মানুষটা জবর শৌখিন। চোখা সুর, হাতের পাতায় মেহেদী মাখা, চোখের কোলে সুর্মার নিপুণ টান। কলিদার কুর্তা থেকে আতর গুলাবের গন্ধ ছুটছে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে, সুগন্ধি মসলার খুসবু বেরুচ্ছে। মাথায় নক্সিকাটা ফুলদার ফেজ।

সোনা মিঞা জবাব দিল না। অল্প একটু হাসল।

ডি-কুনহা বলল, 'তামাম জিন্দগী দরিয়ায় দরিয়ায় ভেসে মাটিতে বুঝি মন বসে না মিঞা সাহেব?'

'হু, খাঁটি কথা কয়েছেন।'

মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দেয় সোনা মিঞা। সোনা মিঞা যত কথা বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি হাসে। যত হাসে, তার দুগুণ মাথা নাড়ে। অজস্র হাসে, অজস্র মাথা নাড়ে সোনা মিঞা।

ডি-কুনহা বলল, 'জাহাজীর কাছে দরিয়াই ঘর, দরিয়াই কবর। দরিয়ার টান ঠেকান কি সোজা কথা! কি বল মিঞা?'

'হু, বড় খাসা কথা কয়েছেন।'

যথারীতি প্রচুর হাসে সোনা মিঞা।

একটু আগের প্রশ্নটাই আবার করে বসে ডি-কুনহা, 'তবে আবার যে দরিয়ায় এলে সোনা মিঞা?'

'ঘর দিলেরে বশ করাতে পারল না ডি-কুনহা সাহেব। বশ করাবেই বা কেমন করে?'

'কেমন কেমন?'

চার পাশ থেকে চার ইয়ার ঘন হয়ে আসে।

দরিয়ার মানুষের একটা বিচিত্র ভাষা আছে। ইন্দোচীনী হোক, মগ হোক, মালয়ী হোক, জাভানীজ হোক—সকলেই সেই ভাষাটা বোঝে। জিন্দগীর বিশ পঁচিশটা বছর দরিয়ায় দরিয়ায় কাটিয়েও সেই ভাষা পুরাপুরি রপ্ত করতে পারেনি সোনা মিঞা। পয়লা পয়লা তার ধারণা ছিল, তাবত দুনিয়ায় একটি মাত্র বুলি চালু আছে; সেটি নোয়াখালি জেলার বিচিত্র বঙ্গ বুলি। জাহাজীর কাজ নিয়ে যেবার প্রথম নোয়াখালি জেলা ছেড়ে আকিয়াব গেল সোনা মিঞা, সেইবারই তার মনে হয়েছিল, দুনিয়াটা এক আজব কারখানা বটে! এখানে যত আদমী তত বুলি।

তামাম জীবনে জাহাজে জাহাজে কত জায়গায় ঘুরেছে। মোম্বাসা গিয়েছে, পোর্ট ভিক্টোরিয়া গিয়েছে, পোর্ট এডেন, ম্যাডাগাস্কার, সিঙ্গাপুর, কলম্বো, সুয়েজ, পোর্ট ইসমাইলিয়া—কত বন্দরে যে তাদের জাহাজ ভিড়েছে, কে তার হিসাব রাখে? অতশত মনেও নেই সোনা মিঞার।

পয়লা পয়লা কসম খেয়ে জেদ ধরেছিল সোনা মিঞা, নোয়াখালি জেলার বঙ্গ বুলিটি ছাড়া গলা দিয়ে আর কিছু বার করবে না। জাহাজীর কাজ নিয়ে আকিয়াব যাবার সময় বাপজান বলে দিয়েছিল, 'গলা দিয়ে হারাম খানা নামাবে না; গলা দিয়ে হারাম বুলি বার করবে না।'

বাপজানের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে সোনা মিঞা। হারাম খানা খায় না। হারাম জানে দুসরা বুলি দূরে ঠেকিয়ে রাখে।

কিন্তু দরিয়ার প্রতাপ বড় সাঙ্ঘাতিক। ধীরে ধীরে কখন যে দরিয়া তার নিজের বুলিটা গিলিয়ে ফেলেছে, সোনা মিঞা আদপেই টের পায় নি। নোয়াখালি জেলার টান দেওয়া সেই জাহাজী বুলি সোনা মিঞার গলায় কি বিচিত্রই না শোনায়!

চারপাশ থেকে ইয়ারেরা ছেঁকে ধরে, 'কেমন কেমন?'

ফেজটি খুলে মাথার ঠিক চাঁদির উপর সই করে বসাল সোনা মিঞা। তারপর মিঠিয়ে মিঠিয়ে বলে, 'ভাইজানেরা, সারা জিন্দগী দরিয়ায় দরিয়ায় ঘুরেছি। পোর্ট এডেনের সুন্দরীদের দেখেছি, পোর্ট ইসমাইলার ডানাকাটা পরীদের দেখেছি, জাভার খুবসুরতীদের দেখেছি। তামাম পোর্টের সুন্দরীদের গায়ের উম (গরম) আমার গায়ে লেগে রয়েছে। এই বয়সে মুলুকে ফিরা বুড়া পেঁচার নাখান (মত) এক বিবি নিয়া কাঁথা মুড়ি দিতে হয়! কপালে এত দুঃখুও আছে!'

সোনা মিঞা কপাল চাপড়ায়।

'চুক চুক চুক—' চারপাশ থেকে ইয়ারেরা কপট আপসোস জানায়।

সোনা মিঞা বলতেই থাকে, 'সুন্দরীদের টানে মুল্লুক ছেড়ে আবার দরিয়ায় ভাসলাম।'

ফেজটি আবার খোলে সোনা মিঞা। আবার চাঁদির উপর বসায়। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না।

'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা—'

চারপাশ থেকে ইয়ারেরা চিল্লাতে চিল্লাতে হাসতে হাসতে হল্লা বাধিয়ে দেয়।

খানিকটা পর হল্লা থামে। লণ্ঠনটাকে ঘিরে পাঁচটা মাথা এক হয়ে আসে। ফিস ফিস কথা আবার শুরু হয়।

বাইরে রাত্রি আরো গাঢ় হয়েছে। অরণ্য ফুঁড়ে ক্ষ্যাপা বাতাস ছুটে ছে। নারঙ্গী গাছের মাথায় সেই রাত-অন্ধ বাদক পাখিটা একটানা কিয়ে চলেছে। বকরা হরিণের পাল পাহাড় থেকে নেমে একেবারে -কুনহার বাগিচায় এসে ঢুকেছে।

ফিসফিস করে ভি-কুনহা বলল, 'সোনা মিঞার জাহাজ এবার কোথায় যাবে?'

‘পোর্ট ভিক্টোরিয়া।’

মাদ্রাজ থেকে সোনা মিঞার জাহাজ পোর্ট ভিক্টোরিয়া রওনা হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের মধ্যপথে জাহাজের কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ায় পোর্ট ব্লেয়ারে নোঙর গাড়তে হয়েছে। দু পাঁচ দিনের মধ্যেই সোনা মিঞার জাহাজ এখান থেকে ছেড়ে যাবে।

রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে গারাচারামায় ডি-কুনহার কুঠিবাড়িতে চলে এসেছে সোনা মিঞা। মনে মনে মতলবও একটা ভেঁজে এসেছে। ডি-কুনহা তার পুরানো দোস্ত। তার সঙ্গে অনেক কালের কাজ কারবার। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলোতে যাবার পথে জাহাজ যদি পোর্ট ব্লেয়ারে ভেড়ে, সোনা মিঞা একবার অন্তত ডি-কুনহার কুঠিবাড়িতে আসবেই।

ডি-কুনহা বলল, ‘পোর্ট ভিক্টোরিয়া তো যাচ্ছ, কিছু মাল চলবে মিঞা সাব?’

‘হাঁ-হাঁ, মালের খোঁজেই তো এসেছি। আছে কিছু?’

‘আছে আছে।’ গলাটা ঝুপ করে খাদে নেমে যায় ডি-কুনহার, ‘লেকিন খুব সাবধান দোস্ত। তুমি তো অনেক দিন পোর্ট ব্লেয়ারে আস নি। এখানে এখন বহুত কড়াকড়ি। পুলিস আমার ওপর নজর রেখেছে। খুব সাবধান ইয়ার।’

‘আরে পুলিসের কথা ছাড়ান দাও!’

মুখে চোখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফোটে সোনা মিঞার। কাঠের দেওয়ালে একদলা থুথু ছুঁড়ে সে বলে, ‘এক বন্দরের মাল আর এক বন্দরে খালাস ক[illegible] মাথার চুল পাকাইয়া ফেললাম। এই বয়সে পুলিসের ডর ভাল লাগে না জী[illegible]

‘তোমাকে আমি চিনি দোস্ত। তোমার মাফিক হুঁশিয়ার আদমী খু[illegible] কম দেখেছি। তবু একটু সাবধান থাকতে হবে।’

সোনা মিঞা জবাব দেয় না।

ডি-কুনহা বলে, ‘কি মাল চাই?’

‘আওয়া-বিল পাখির বাসা আর কোকেন।’

‘কতটা দেব?’

‘এক এক কিসিমের মাল পাঁচ পাউণ্ড করে, মোট দশ পাউণ্ড।’

‘ঠিক আছে।’ একটু ইতস্তত: করে ডি-কুনহা বলে, ‘লেকিন একটা কথা তুমি আমার সাচ্চা দোস্ত, তোমাকে আমি পুরা বিশ্বাস করি। তবু দামট নগদ দিতে হবে।’

দরাজ গলায় হেসে ওঠে সোনা মিঞা। বলে, 'এই কথা!'

'হাঁ হাঁ মিঞাসাব। দু দফে আমি ঠকেছি। আমার এক চীনা দোস্ত কলকাত্তা থেকে হঙকঙ যাবার পথে এখানে এসেছিল। দশ পাউণ্ড আফিং আর সাত পাউণ্ড কোকেন নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, হঙকঙ থেকে ফিরে দামটা দিয়ে যাবে। দু বরষ পার হয়ে গিয়েছে, লেকিন চীনা কুত্তাটা আজও ফেরে নি।'

একটু দম নিয়ে ডি-কুনহা বলতে থাকে, 'আর এক শালা বর্মী এডেন পোর্টে যাচ্ছিল—'

মধ্য পথেই সোনা মিঞা ডি-কুনহাকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'বর্মী শালার কথা কইতে হবে না। সিধা কথাটা সিধা করেই কয়েন হার্মাদ সাব। নগদা টাকা চাই, এই বাত তো?'

কামিজের চোরা জেব (পকেট) থেকে এক গোছা নোট বার করে সোনা মিঞা। ফিস ফিস করে বলে, 'দাম কত?'

'হাজার রুপেয়া।' নোটগুলো দেখতে দেখতে চোখজোড়া ধক ধক করে ডি-কুনহার।

গুনে গুনে এক হাজার টাকা সামনের টেবিলের উপর রাখে সোনা মিঞা। তারপর বলে, 'মাল কই কুনহা সাব?'

'মালটা পানিঘাট আছে।'

ছোঁ মেরে টেবিলের উপর থেকে টাকাগুলো তুলে জেবের ভিতর পুরে ফেলে সোনা মিঞা। প্রচুর হেসে প্রচুর মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে, 'আমিও একদফে অনেকগুলো রুপেয়া চোট খেয়েছি। এক শালার পো শালা ইন্দোনেশিয়ান মাল্লাকে পোর্ট শরাব কেনার জন্তে দু হাজার টাকা দিয়েছিলাম। মাল তো পেলামই না; রুপেয়াও গেল। খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছি সেই থেকে। আজকাল বাঁ হাতে মাল নিয়ে ডান হাতে রুপেয়া গুনে দি। আমার কারবার নগদা।'

ডি-কুনহার চোখ দুটো অদ্ভুত এক আক্রোশে দপ্‌ দপ্‌ করে। মুখটা ভয়ানক ক্রূর দেখায়। লালচে চুলে, ফুঁড়ে-ওঠা দুই হনুতে, দু পাটি ঝকঝকে দাঁতে ভয়াল হিংস্রতা ফুটে বেরোয়। হার্মাদ ডি-কুনহা এই মুহূর্তে দু তিন-শ বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে তার নৃশংস পূর্ব পুরুষ, যারা নাবী বাঙলায় নির্বিচার হত্যা এবং লুঠতরাজ চালাতে এসেছিল, তাদের মতই আদিম হয়ে উঠেছে।

লণ্ঠনের নিস্তেজ আলোতে আধা পশুগঠন আধা মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কোন বর্বরের মত মনে হয় তাকে।

ডি-কুনহার মুখের দিকে সোনা মিঞা ফিরেও তাকায় না। ফেজটা বার বার খুলে বার বার চাঁদিতে বসায়। এটা তার মুদ্রাদোষ। ফেজ পরা কিছুতেই আর পছন্দসই হয় না।

এক সময় সোনা মিঞা উঠে পড়ে, 'আজ যাই কুনহা সাব। অনেক রাত হল। আদাব আদাব।'

দাঁতে দাঁত চেপে ডি-কুনহা বলে, 'একটু বস মিঞা। মাল আজই পাবে, আমি পানিঘাট যাব। নগদ মাল দিয়ে নগদ রুপেয়া নেব।'

'আপনার যা মর্জি।'

চাঁদির মাথায় ফেজটা ঠিক করতে করতে বসে পড়ল সোনা মিঞা।

এবার ডি-কুনহা বাকী তিনজনের দিকে তাকাল। বলল, 'এই যে ফাই মঙ, তোমার কী মাল দরকার?'

'কোকেন। একটু বেশি করে দেবেন। আজকাল অনেক জাহাজ আসছে পোর্ট ব্লেয়ার। খালাসীরা এসব মাল চায়।'

'বহুত আচ্ছা।' বলেই আর একজনের দিকে মুখ ঘোরায় ডি-কুনহা, 'তুমি তো এবার রেঙ্গুন যাচ্ছ জন। ওদিকে কিছু চরস চালাবার বন্দোবস্ত কর।'

'ঠিক হায়।'

লণ্ঠনের নিরুত্তেজ আলোতে মালয়ী খ্রীষ্টান জনের মুখটা ব্রোঞ্জ মূর্তির মত কঠিন দেখায়। মুখের উপর কোন দাগ পড়ে না। কেমন যেন নির্বিকার মনে হয় তাকে। আস্তে আস্তে জন বলে, 'চরসের সঙ্গে কিছু পিনিক দিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা।'

এবার ইন্দোচীনীটার দিকে তাকাল ডি-কুনহা। চাপা কুত কুতে চোখ, সূচলো থুতনি থেকে লম্বা লম্বা কালো সুতোর মত কয়েক গাছা দাড়ি ঝুলছে। মাংসল গর্দান, বেঁটে বেঁটে হাত দুটো কি যেন আঁকড়ে ধরার জন্য বার বার মুঠা পাকিয়ে যাচ্ছে।

বছর খানেক আগে লোকটার সঙ্গে কার নিকোবরে জান পয়চান হয়েছিল ডি-কুনহার। লোকটার নাম চি-হো। চি-হো সুমাত্রা থেকে মুক্তার খোঁজে ডিঙি বেয়ে নিকোবর দ্বীপে এসেছিল। নিকোবর থেকে ডি-কুনহা তাকে আন্দামান নিয়ে আসে।

ইন্দোচীন। চি-হো মুলুকে থাকত না। থাকত পেনাঙে। চি-হো সাঙ্ঘাতিক দুঃসাহসী। মোটর বোট ভরসা করে সে বিপুল সমুদ্র পাড়ি দেয়। গত এক বছরে সে বার দশেক আন্দামান এসেছে। আন্দামানে এসে ডি-কুনহার কুঠিবাড়িতেই ওঠে সে। ডি-কুনহার সঙ্গে তার পাকা দোস্তি।

ডি-কুনহা বলল, 'তোমাকে চণ্ডুর নেশা ধরিয়েছি। নেশাটা কেমন ?'

চি-হো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'বহুত আচ্ছা নেশা।'

'পেনাঙে নেশাটার কেমন চল ?'

'দশ বিশজন যা চীনা আছে, তারাই চণ্ডুর নেশা করে। এ ছাড়া আর কারুকে চণ্ডু ফুঁকতে দেখি নি।'

'না না, এ চলবে না। দুনিয়ার সব আদমীকে নেশা ধরাতে হবে। নেশা না ধরালে আমাদের বিলকুল লোকসান। কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। পেনাঙে ফিরে জানা শোনা সব আদমীকে চণ্ডু ধরিয়ে দাও। বুঝলে ?'

মাথা নেড়ে চি-হো জানালে, সে বুঝেছে।

খানিকটা চুপচাপ। তারপর ডি-কুনহাই আবার শুরু করল, 'তুমি কবে পেনাঙে ফিরছ চি-হো ?'

'আজ রাতেই।'

'ঠিক আছে। এক পেটি চণ্ডু নিয়ে যাও।'

একটু পর চি-হো, ফাই মঙ বর্মী এবং জন—তিন জনকে তিনটে কাঠের পেটি দিল ডি-কুনহা। কাঠের তিনটি পেটির মধ্যে চোরাই চালানের জন্য নিষিদ্ধ নেশার মাল।

তিনটে পেটি নিয়ে তিনজন উঠে দাঁড়াল। বিদায় জানিয়ে দাম চুকিয়ে তিনটে মূর্তি ডি-কুনহার কুঠিবাড়ি থেকে অন্ধকারে নেমে গেল।

পেনাঙ, রেঙ্গুন, এবারডীন বাজার—রাত্রির অন্ধকারের সুযোগে গারাচারামা গাঁও থেকে নেশার তিনটে পঙ্কিল, কদর্য স্রোত তিন দিকে ছুটে গেল।

লণ্ঠনের নিস্তেজ আলোটাকে উস্কে তেজী করে নিল ডি-কুনহা

সোনা মিঞা বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেল হার্মাদ সাব।'

'হাঁ।' হঠাৎ ডি-কুনহা অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'এই তো এবার

পানিঘাট যাব। আওয়াবিল পাখির বাসা তো কুঠিতে রাখা যায় না। বহুত ঝামেলা। পুলিশ একবার টের পেলে—'

কথাটা আর পুরা করল না ডি-কুনহা। তবে গলার স্বরটা অনেকখানি খাদে ঢুকে রহস্যময় হয়ে গেল, 'রাত্রি বেশি না হলে এসব কাজে কি সুবিধে হয়!'

আরো খানিকটা পর দুজনে বাইরে বেরিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের সড়ক ধরল।

পিছনে ডি-কুনহার কুঠিবাড়িটা একটা অস্পষ্ট স্তূপের মতই দেখাচ্ছে।

পরের দিন সকালে অগাধ সমুদ্র থেকে উঠে এসে সূর্য যখন আকাশ বাইতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল।

ফোনিক্স উপসাগর থেকে ফেরী লঞ্চটা বাম্বু ফ্ল্যাটের দিকে যাচ্ছিল। লঞ্চের রশিম্যানই প্রথম দেখল।

হ্যারিয়েট পাহাড়ের একেবারে নীচের দিকে যেখানে লর্ড মেয়োর কবরের উপর কাঠের সাদা ক্রশটা পোঁতা রয়েছে, তারও অনেক নীচে নীল জলের উপসাগর। উপসাগরের ঠিক পারেই পানিঘাট।

এখন উপসাগরটা হ্রদের মতই শান্ত দেখায়।

উপসাগরের শান্ত জলে সোনা মিঞার মৃতদেহটা স্থির হয়ে রয়েছে। একটুও নড়ছে না।

ফেরী লঞ্চের রশিম্যান চিৎকার করে উঠল, 'মুর্দা (মড়া) মুর্দা—ইয়ে খুদা, সকাল বেলাতেই চোখে কি পড়ল!'

বত্রিশ

আর একটা ছুটির দিন এসে পড়ল।

এর আগের ছুটির দিনে জাজিরুদ্দিনের সঙ্গে বিরসার লড়াই হবার কথা ছিল। কিন্তু লড়াইটা হয় নি। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের একটা জরুরী কাজে সেদিন বিরসাকে কাদাকাচাঙ যেতে হয়েছিল। বুকের আচমকা একটা দরদের জন্য জাজিরুদ্দিন গিয়েছিল সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে)।

আজ সেলুলার জেলে বিরসাও আছে, জাজিরুদ্দিনও আছে।

বেশ কিছুক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে।

কয়েদীরা কাঞ্জিপানি খেয়ে, বর্তন ধুয়ে, নিজের নিজের কুঠুরি সাফসাফাই করে সাত নম্বর ব্লকের ওয়ার্কশপের সামনে জমায়ত হয়েছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা গুলতানি পাকাতে শুরু করেছে।

আজকের দিনটাকে ঘিরে উন্মাদনা এবং উত্তেজনার শেষ নেই।

বিরসা এবং জাজিরুদ্দিন এখনও এসে পড়ে নি। কিন্তু তাদের লড়াইর ব্যাপার নিয়ে কয়েদীরা দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে।

আজকের লড়াইতে যদি জাজিরুদ্দিন জেতে, তা হলে বিরসা জাত দিয়ে ইসলামী বনবে। বিরসা জিতলে জাজিরুদ্দিন হিন্দু হবে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একমাত্র এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপেই বুঝি এমন বর্বর লড়াই সম্ভব!

অসহ্য উত্তেজনায় কয়েদীরা তামাম রাত একদণ্ডও ঘুমাতে পারে নি। কে জিতবে? বিরসা না জাজিরুদ্দিন?

জাজিরুদ্দিনের হাত-পা বাঘের থাবার মত। বাঁকানো আঙুলের মাথায় নখগুলো এবং দু পাটি দাঁত সাঙ্ঘাতিক ধারাল। বাঘের মতই সে ক্ষিপ্র, চতুর, ভয়ানক। স্বভাবও বাঘের মতই। চক্ষের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপক্ষের গলার নলী নখ এবং দাঁতে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে দেখলে তার দুই চোখ উন্মাদ আনন্দে ভরে যায়।

অন্য পক্ষে বিরসার মাংসল শরীরে অফুরন্ত শক্তি। প্রতিপক্ষকে একবার জাপটে ধরতে পারলে, পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে চুরচুর করে ফেলবে। রদ্দা হাঁকাতে পারলে গর্দান বেঁকে যাবে।

বিরসা এবং জাজিরুদ্দিন, দু জনের মধ্যে কে জিতবে, কে তার হদিস দেবে?

এক দল কয়েদীর ইচ্ছা, বিরসা জিতুক। আর এক দলের ইচ্ছা, জাজিরুদ্দিন জিতুক। এই দু দল ছাড়া আরো অনেক কয়েদী আছে। তাদের বিরসা কি জাজিরুদ্দিন যেই জিতুক, সে ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই। দুর্দান্ত দুই মরদে লড়াই হবে—এতেই তারা খুশী, মশগুল।

সাত নম্বর ব্লকের ওয়ার্কশপের সামনে ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে কয়েদীরা গুলতানি করছে। কে জিতবে, কার জেতা উচিত—এ সব প্রশ্ন নিয়ে তাদের মধ্যে চিল্লাচিল্লি এবং হাতাহাতির অন্ত নেই।

এক জটলার এক কয়েদী বলছে, 'জাজিরুদ্দিনের মত এত বড় মরদ আন্দামানে কোন কালে কয়েদ খাটতে আসে নি।'

'কেমন কেমন?' চারপাশ থেকে অন্য কয়েদীরা তাকে ঘিরে ধরল।

'হুঁ-হুঁ—' তর্বিয়ত করে হাঁটুর মাথায় তাল ঠোকে কয়েদীটা। তারপর বলে, 'বুড়া ওয়ার্ডারজীর কাছে শুনেছি, চার পুরুষ ধরে জাজিরুদ্দিনরা আন্দামানে কয়েদ খাটতে আসছে।'

'কেমন কেমন?'

'জাজিরুদ্দিনের বাপজান, বাপজানের বাপজান এখানে কয়েদ খেটে গেছে।'

'সচ্ বলছিস?'

'হাঁ হাঁ, একেবারে সাচ্চা কথা।' কয়েদীটা কি ভেবে আবার বলতে শুরু করে, 'ব্লেয়ার সাহাব যখন এই শহর বানাতে এসেছিল, তখন জাজিরুদ্দিনের নানা আর নানার বাপজান একসাথ সাজা খাটতে এসেছিল। শালেরা চার পুরুষ ধরে আন্দামান আসছে।'

জটলার মধ্য থেকে কে যেন টিপ্পনী কাটল, 'আন্দামানটাই জাজিরুদ্দিন শালেদের।'

অন্য কয়েদীরা হাসতে হাসতে হল্লা বাধিয়ে দেয়।

প্রথম কয়েদীটা ধমকে চিল্লিয়ে সবাইকে থামিয়ে দেয়। তারপর বলে, 'চার পুরুষ ধরে শালেরা খুনী। জাজিরুদ্দিন একা বিশটা খুন করে এসেছে। জানিস, জাজিরুদ্দিন খালি নখ আর দাঁত দিয়ে খুন করে! নখ দিয়ে গলার নলীটা ছিঁড়ে রক্ত চুষে খায়। পাঁজরে জোড় পায়ে লাথি হাঁকিয়ে দম বন্ধ করে দেয়।'

কয়েদীরা তাজ্জব হয়ে জাজিরুদ্দিনের সাঙ্ঘাতিক কীর্তিকলাপের কথা শোনে।

কয়েদীটা বলতেই থাকে, 'কয়েদীরা পয়লা পয়লা আন্দামান এসে চুপচাপ থাকে। লেকিন জাজিরুদ্দিন দুসরা কিসিমের কয়েদী।'

'ক্যায়সা ক্যায়সা ?'

'এখানে এসে পয়লা রোজেই ঘুষা মেরে পেটি অফিসারের দাঁত ছুটিয়ে দিয়েছিল। বিশ রোজ এখানে কাটিয়েই জঙ্গলে পালিয়েছিল। দু বরষ পর আবার নিজে এসে ধরা দিয়েছে। কলিজায় কত তাগদ থাকলে ভাগোয়া কয়েদী ধরা দেয় বুঝিস শালেরা! জাজিরুদ্দিনের মাফিক এমন বড় মরদ আন্দামানে কোন কালে আসে নি।'

সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়।

অন্য এক জটলায় অন্য এক কয়েদী বলছে, 'বিরসা জরুর জিতবে।'

বিরসার উপর তার অসীম ভক্তি।

'কী করে বুঝলি ?' অন্য কয়েদীরা হল্লা করে ওঠে।

কয়েদীটা খেঁকিয়ে উঠল, 'শালেরা বিরসার কবজি আর উরু দেখেছিস ?'

কয়েদীগুলো একসঙ্গে চিল্লায়, 'না না—'

কয়েদীটা এবার বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাল। মুখে বলল, 'শালে মুরুখের পাল, কবজি আর উরু দেখলে তাগদ মালুম পাওয়া যায়। জাজিরুদ্দিনের মত বিশটা হারামীকে টিপে মারতে পারে বিরসা।' হঠাৎ গলাটা খাদে ঢুকে গেল, 'জানিস হিন্দু ধরমের মান রাখতে রামজী বিরসাকে আন্দামান পাঠিয়েছে। ও তোর আমার মাফিক নেড়ি খেড়ি কয়েদী না।'

চারপাশের কয়েদীগুলো ঘন হয়ে বসে। তাদের মুখে চোখে বিস্ময়, ভয় এবং কৌতূহল মেশা অদ্ভুত এক ভঙ্গি ফোটে। ফিস ফিস গলায় তারা বলে, 'তবে—'

হিন্দু ধর্মের মর্যাদা রাখতে স্বয়ং রামজী বিরসাকে আন্দামান পাঠিয়েছেন। আন্দামানের অন্য কয়েদীদের মত শুধু দ্বীপান্তরের সাজা খাটতেই আসে নি বিরসা। সে হচ্ছে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। আন্দামানে হিন্দু ধর্মের মান সম্ভ্রম সমস্ত কিছুই তার তাগদের উপর নির্ভর করছে।

বিরসা সম্বন্ধে গূঢ় এবং গোপন খবরটি দিয়ে সকলের মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করে বিজ্ঞ কয়েদীটা। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'বিরসা শালে যা তা আদমী না; সাচ্চা সিদ্ধিবাবা। জরুর সে জিতবে। জানিস বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ে কত রোজ সে ধ্যান করেছে!'

সবার শেষে সবচেয়ে গূঢ় এবং সবচেয়ে গোপন খবরটি দেয় কয়েদীটা, 'বিরসা আমাকে বলেছে, ও রামজীর সাথ মুলাকাত করেছে। রামজীর সাথ বাতচিত করেছে। রামজীই ওকে কালা পানির কয়েদখানায় পাঠিয়েছে।'

কেউ আর কথা বলে না। চারপাশের কয়েদীগুলো ঝিম মেরে বসে থাকে।

অন্য অন্য ছুটির রোজে ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে কয়েদীরা গুলতানি করে। পুরা দমে খিস্তি-খেউড়, কদর্য গালি, শরাবী কিসসা এবং আওরতী কিসসা চালায়। সেলুলার জেলের ছুটির রোজগুলিতে অশ্লীল রস গেঁজিয়ে উঠতে থাকে।

কিন্তু আজকের দিনটা ব্যতিক্রম।

আজ জাজিরুদ্দিন এবং বিরসা ছাড়া কয়েদীরা অন্য কোন প্রসঙ্গই তুলছে না। আন্দামানের পেনাল কলোনির জন্মকাল থেকে নারী এবং নেশার কিসসার যে ঢালা স্রোত বয়ে আসছিল, আজ তার মুখটা হঠাৎ যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

কয়েদীরা নেশা-নারী-খিস্তি-খেউড়—সমস্ত কিছু আজ ভুলেছে। বিরসা এবং জাজিরুদ্দিনকে ঘিরে তাদের যত মত্ততা তত উত্তেজনা। সেলুলার জেলের সমস্ত কয়েদী জাজিরুদ্দিন আর বিরসার লড়াইর ব্যাপারে মশগুল হয়ে রয়েছে। তাদের একঘেয়ে বন্দী জীবনে মাঝে মাঝে ছুটিছাটার দিনে কয়েদীতে কয়েদীতে এমন মজার লড়াই কিছুটা বৈচিত্র্য আনে।

প্রথমে বিরসাই এসে পড়ল।

এই দু সপ্তাহের ভিতর চেহারায় লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছে বিরসা। চাঁছা মাথার পিছন দিকে মোটা একটি টিকি গজিয়েছে। বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি এক গোছা হলদে রঙের পৈতা ঝুলিয়েছে। পৈতা এবং টিকি—বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দুর দুটো উগ্র প্রতীক সগৌরবে ধারণ করছে বিরসা। বঙ্গোপসাগরের এই কয়েদখানায় কোথা থেকে যে নরম গেড়ি মাটি জুটিয়েছে, সে-ই বলতে পারে। গেড়ি মাটি গুলে থ্যাবড়া নাকে, কপালে এবং বুকে মানা দেওভার চিত্তির এঁকেছে। ধারীওয়ালা ইজের এবং কুর্তা হলুদ রঙে ছুপিয়ে নিজেকে হিন্দু ধর্মের নিখুঁত একটি নেতা বানিয়ে ফেলেছে বিরসা।

বিরসার চালচলন, হাবভাব দেখলে মনে হয়, আন্দামানের কয়েদখানায় হিন্দুধর্মের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই তার আবির্ভাব।

সাত নম্বর ব্লকের ওয়ার্কশপের সামনে এসেই বিরসা হুঙ্কার ছাড়ল, 'জাজিরুদ্দিন শালে কিধর ?'

কেউ জবাব দিল না।

চারপাশে কয়েদীগুলো গুলতানি করছিল। বিরসার হুঙ্কারে সবাই চমকে তাকাল। মুহূর্তে গুলতানি, হল্লা, চিল্লাচিল্লি থেমে গেল।

আরো খানিকটা পর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জাজিরুদ্দিন এল।

আজকের লড়াইর জন্য সাজপোশাকের চূড়ান্ত ঘটা করেছে জাজিরুদ্দিন।

দুটো সপ্তাহ ধরে নখগুলোকে শানিয়েছে। চোখে সুর্মার ধ্যাবড়া টান মেরেছে, ভুরু দুটো পুরাপুরি কামিয়ে ফেলেছে। চোখা মুখ আরো চোখা করেছে। ইজেরটা কালো রঙে ছুপিয়ে লাল লাল ডোরা কেটেছে। কোথা থেকে খানদানী এক আলখাল্লা জুটিয়ে পুরা দেহটা ঢেকে রেখেছে।

বিরসার মতই জাজিরুদ্দিনকে দেখলে মনে হয়, আন্দামানের কয়েদখানায় ইসলামের সম্মান রাখার সমস্ত দায় তার উপর চাপিয়ে দুনিয়া যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। এর জন্য যতখানি কিম্মৎ দেওয়া দরকার, সে দেবে।

আলখাল্লার রশি ঢিলা করে খুলে ফেলল জাজিরুদ্দিন। তারপর বুকের উপর সশব্দে গোটা দশেক থাপ্পড় মেরে চিৎকার করে উঠল, 'ইয়া আল্লা রসুল, আমি তোমার সাচ্চা বন্দা।' আসমানের দিকে তাকিয়ে গলার স্বরটাকে শেষ পর্দায় তুলল জাজিরুদ্দিন। টেনে টেনে গানের সুরের মত করে আওড়াল, 'আমি খুদাবন্দ্। ইয়া খুদা, আমি তোমার বন্দা—'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

মাংসল উরুতে চটাপট চাপড় বসিয়ে বিরসা চিল্লাল, 'ইয়া বজরঙ্গবলী, ইয়া রামজী, কিরপা করে কবজিতে একটু তাগদ দে। জাজিরুদ্দিন শালেকে গুঁড়িয়ে ফেলি।'

চারপাশের কয়েদীরা হল্লা বাধিয়ে ফেলল।

কয়েদীদের জটলা ফুঁড়ে সেই কয়েদীটা উঠে পড়ল। সেই কয়েদীটা, যার নাম আজও কেউ জানতে পারে নি। যার গলায় লোহার তারের হাঁসুলিতে একটা চারকোনা কাঠের টুকরা ঝুলছে। কাঠের টুকরাতে খোদাই করা আছে তার নম্বর ; ৭০৩।

নাম জিজ্ঞাসা করলে কয়েদীটা বলে,'কয়েদীর আবার নাম কি রে শালেরা!' একটু দম নিয়ে বলে, 'নাম ধাম দরিয়ায় ডুবিয়ে কালাপানি এয়েছি! কয়েদীর নাম হল তার নম্বর। আমার নাম ১০৩ নম্বর। ঐ নামেই আমাকে ডাকবি।'

১০৩ নম্বরকে দেখে বুঝবার জো নেই, লোকটা মারাঠি না বালুচ, বর্মী না মালয়ী, পাঠান না মোপলা। বুঝবার জো নেই, লোকটা বৌদ্ধ না খ্রীষ্টান, মুসলমান না হিন্দু।

আজব চেহারার আজব কয়েদী মুণ্ডুটা চারপাশে ঘুরিয়ে হুমকে উঠল, 'চুপ মার হারামী লোক। শালেরা বেফায়দা খালি চিল্লাবে!'

কয়েদীদের হল্লা থামল।

১০৩ নম্বর জাজিরুদ্দিনের দিকে তাকাল। বলল, 'খুদার নামে সাত কসম খেয়ে বল, তুই হারলে হিন্দু বনবি।'

জাজিরুদ্দিন আওড়াল, 'খুদার নামে সাত কসম, হারলে হিন্দু বনব।'

১০৩ নম্বর এবার বিরসার দিকে ঘুরল। বলল, 'রামজীর নামে সাত কসম খেয়ে বল, তুই হারলে ইসলামী বনবি।'

বিরসা আওড়াল, 'রামজীর নামে সাত কসম, হারলে জরুর ইসলামী বনব। তামাম জিন্দগী ঐ শালে জাজিরুদ্দিনের জুতি চাটব।'

১০৩ নম্বর বলল, 'এবার তা হলে লড়াই বাধুক। এ বিরসা, এ জাজিরুদ্দিন —তোরা রাজীবাজী তো?'

বিরসা বলল, 'রাজীবাজী।'

জাজিরুদ্দিন বলল, 'রাজীবাজী।'

চারপাশে কয়েদীরা চিল্লায়, 'রাজীবাজী।'

সেলুলার জেলের ছুটিছাটার দিনগুলোতে এমন মজার লড়াই প্রায়ই বাধে। মরদেরা পরস্পরের তাগদ পরখ করে। তামাশা দেখার জন্য টিণ্ডাল, পেটি অফিসার, জমাদার এবং সিপাইরা জটলার মধ্যে ভিড়ে গিয়েছে। কয়েদীরা দুটো দলে ভাগ হয়েছে। এক দল জাজিরুদ্দিনকে উৎসাহ দিচ্ছে, অন্য দলটা বিরসাকে তাতাচ্ছে।

আসমানের দিকে মাথা তুলে জাজিরুদ্দিন চিল্লায়, 'বিরসা হারামী আ যা।'

বিরসাও সমানে চিল্লায়, 'জাজিরুদ্দিন কুত্তা আ যা।'

এর পরেই লড়াই বেধে গেল।

দুটো থাবা উচিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে বিরসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জাজিরুদ্দিন।

এক ঝটকায় তাকে ফেলে দিল বিরসা। বিরসা দৌড়ে এসে বুকে চড়বার আগেই লাফ মেরে উঠে পড়ল জাজিরুদ্দিন।

দুই জবরদস্ত মরদ দুদিক থেকে তড়পাচ্ছে, পাঁয়তারা ভাঁজছে। উরুর উপর সশব্দে ঝাপ্পড় কষাতে কষাতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। সুযোগ বুঝলেই কিলঘুষা হাঁকাচ্ছে। প্রতিপক্ষের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে দুজনই দুজনের চারদিকে ঘুরছে। সুবিধা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কয়েদীরা চিল্লাচ্ছে, 'এ জাজিরুদ্দিন, বিরসা শালের জান তুড়ে দে।'

কয়েদীরা চিল্লাচ্ছে, 'এ বিরসা, জাজিরুদ্দিন কুত্তাটার শির ছেঁচে দে।'

চিল্লানিতে হল্লায় আন্দামানের আসমান ফালা ফালা হয়ে যাবার দাখিল হয়েছে।

জাজিরুদ্দিন কি বিরসা—কোনদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। বিপক্ষের উপর দৃষ্টিটা স্থির রেখে সুযোগ খুঁজছে।

হঠাৎ বিরসার বরাতে সেই সুযোগটা এসে গেল। পিছু হটতে হটতে বাঁ পা পিছলে চিত হয়ে পড়ল জাজিরুদ্দিন। জাজিরুদ্দিনের বুকের উপর দুই জানুর ঠাসানি দিতে দিতে গলাটা টিপে ধরল বিরসা। জাজিরুদ্দিনের আধ হাতখানেক জিভ বেরিয়ে পড়েছে। চোখের ডেলা দুটো ঠিকরে বেরুবার উপক্রম হয়েছে। গলার শিরগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে উঠেছে। গালের কষ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। গলার মধ্য দিয়ে অস্ফুট, প্রায় অব্যক্ত এক কাতরানি ছুটে আসছে।

নিরেখ, ভীষণ মুখটা জাজিরুদ্দিনের মুখের কাছে ঝুঁকিয়ে বিরসা ভয়ানক স্বরে বলল, 'এ কুত্তার বাচ্চা, আমাকে না হারিয়ে দিতে চেয়েছিলি! এবার তোর জান চৌপট করে দি। দেখি কোন শালে তোকে বাঁচায়!'

মাথাটা একদিকে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। নির্জীবের মত পড়ে রয়েছে জাজিরুদ্দিন। বিরসার পুরু পুরু বিরাট থাবার ঠাসানিতে গলার শিরগুলো ছিঁড়ে পড়ার দাখিল হয়েছে।

মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা।

বিরসা বুঝি একটু ঢিলা দিয়েছিল। সেই ফাঁকে ক্ষিপ্র, চতুর জাজিরুদ্দিন জোড় পায়ে বিরসার তলপেটে লাথি হাঁকল। মস্ত শরীর নিয়ে উল্টে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিরসা। বিরসা উঠবার আগেই তার কাঁধের উপর লাফিয়ে পড়ল জাজিরুদ্দিন। দুটো থাবার দশটা নখ মাংসল কাঁধে গিঁথে দিল; ধারাল

দাঁতগুলো দিয়ে বিরসার পিঠটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর রক্তাক্ত দাঁতগুলো মেলে হাসল। বলল, 'শালে আমাকে হারাবে! কোন রামজী তোকে বাঁচায়, আমি দেখব।'

চারপাশ থেকে কয়েদীরা হল্লা করে উঠল, 'লড়াই জমে গেছে; বহুত মজাদার কিসিমের লড়াই। বড় আচ্ছা খেল।'

গোটা দশেক ঝাড়া মেরে কাঁধ থেকে জাজিরুদ্দিনকে নীচে ফেলে দিল বিরসা। ফেলেই বুকের মধ্যে জাপটে ধরল। লম্বা লোহার সাঁড়াশীর মত নিরেট, কঠিন দুটো হাতের পেষণে জাজিরুদ্দিনের পাঁজরের হাড়গুলো মট মট করে গুঁড়োতে লাগল।

বিরসা আস্তে আস্তে বলল, 'কেমন লাগছে রে শালে!'

জাজিরুদ্দিন চেঁচাতে লাগল, 'মর যায়েগা।'

দুই হাতে জাজিরুদ্দিনকে আরো জোরে পেঁচিয়ে ধরল বিরসা। বিরাট বুকের উপর ফেলে ডলতে লাগল, পিষতে লাগল। হাড্ডি চুর চুর করতে লাগল। জাজিরুদ্দিন সমানে চিল্লাতে লাগল, 'ছোড় দে, ছোড় দে বিরসা।'

বিরসা শয়তানী চালে হাসে আর বলে, 'আর শালা তোকে ছাড়ি! আর তোকে ঢিলা দি! এ্যায়সা বুরবক আমি না। পয়লা বল, 'হেরেছি', তবে ছাড়ব।'

চারপাশ থেকে কয়েদীরা হল্লা করছে, চিল্লাচ্ছে। সমানে উৎসাহ দিচ্ছে।

বিরসার বুকের মধ্যে জাজিরুদ্দিনের শরীরটা ভেঙে চুরে যেন দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। আধ হাতখানেক জিভ বেরিয়ে পড়েছে জাজিরুদ্দিনের। গলার মধ্যে একটা অবরুদ্ধ গোঙানি পাক খাচ্ছে। চোখ দুটো ঠিকরে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বুকের উপর জাজিরুদ্দিনকে একটু একটু পেষে বিরসা আর বলে, 'কি রে শালে নালায়েক, কেমন লাগছে?'

জাজিরুদ্দিন জবাব দেয় না।

বিরসা বলে, 'এখনও বল হেরেছি।'

'না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ফুট শব্দ করে জাজিরুদ্দিন।

'আচ্ছা শালে, দ্যাখ কেমন করে বাপের নাম ভোলাই? জান-জমানা চৌপট করে দি।' বলে আর বুকের উপর জাজিরুদ্দিনকে ডলতে থাকে

বিরসা। ডলানির গুঁতোয় হাড় গুঁড়োয়। জানটা বেরিয়ে পড়ার দাখিল হয়।

কয়েদীদের মধ্যে যারা বিরসার পক্ষে, তারা চিল্লায়, 'সাবাস বিরসা—'

যারা জাজিরুদ্দিনের পক্ষে, তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আর যারা জাজিরুদ্দিন কি বিরসা—কোন পক্ষেই নয়, যারা শুধু মজা দেখার তাগিদেই জমায়ত হয়েছে তারা চিৎকার করতে থাকে, 'সাবাস জওয়ান, সাবাস মরদ, জাজিরুদ্দিন শালেকে ফৌত করে ফেল।'

বিরসা বলে, 'এখনও বল হেরেছি।'

জাজিরুদ্দিন গোঙায়, 'না।'

'বল যত বরষ বাঁচবি, আমাকে বাপ বলে ডাকবি।'

জড়িয়ে জড়িয়ে এবার জাজিরুদ্দিন কি যে বলে ঠিক বোঝা যায় না। তার গর্দানটা ভেঙে বিরসার কাঁধের উপর ঢলে পড়েছে। অস্ফুট দুর্বোধ্য স্বরে থেকে থেকে গোঙাতে থাকে জাজিরুদ্দিন।

বিরসা আবার বলে, 'কি রে শালে, এন্তেকাল এসে গেল না কি ?'

ঠিক এই সময়েই ঘটে গেল ঘটনাটা।

জাজিরুদ্দিনের সঙ্গে অনেকগুলো "D" টিকিট মার্কা সাকরেদ নানা মতলবে সর্বক্ষণ ঘুর ঘুর করে। তদেরই একজন হল ভুটিয়া। লোকটা জাতে হিন্দু, মুলুক নাসিক। হঠাৎ সাত নম্বর ব্লকের ওয়ার্কশপের পিছন থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠল ভুটিয়া। ছুটতে ছুটতে জাজিরুদ্দিনের কাছে এসে পড়ল। চক্ষের পলকে কামিজের তলা থেকে কি যেন বার করে জাজিরুদ্দিনের থাবায় গুঁজে দিল।

ভাঙা গর্দানটা তারপরেই খাড়া হয়ে উঠল জাজিরুদ্দিনের। মেরুদণ্ড সিধা করে অন্তিম, হিংস্র আক্রোশে জাজিরুদ্দিন গর্জায়। ঝটকা মেরে নিজেকে ছুটিয়ে নেবার চেষ্টা করে জাজিরুদ্দিন। কিন্তু বিরসার জাপটানির মধ্য থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নেওয়া অত সোজা নয়। তারপরেই তার থাবাটা আকাশের দিকে উঠে গেল। জাহাজ-ভাঙা এক টুকরা লোহা পাথরে ঘষে ঘষে ছোরার মত শানিয়ে এনেছে ভুটিয়া। জাজিরুদ্দিনের থাবায় ভাঙা লোহার সেই ফলাটা ঝিলকিয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে কেউ কিছু বুঝবার আগেই চারপাশের পাঁচ শ জোড়া চোখকে স্তব্ধ করে দিয়ে জাজিরুদ্দিনের হাতের সেই ধারাল চোখা লোহার পাতটা বিরসার তলপেটে আমূল ঢুকে গেল। তাজা গাঢ় রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটল।

'হা-আ-আ-আ—মর গিয়া—'

বিকট, প্রাণফাটা একটা চিৎকার করে উঠল বিরসা।

বিরসার চিৎকারে বিন্দুমাত্র টলল না জাজিরুদ্দিন ; এতটুকু বিচলিত হল না। নরম মাংসল তলপেটে ধারাল লোহার ফলাটা ঢুকিয়ে চিরে চিরে অনেকখানি ফাঁক করে ফেলল। ঘন, তেজী রক্তের সঙ্গে ডেলা ডেলা হলদেটে মাংস বেরিয়ে আসছে। মেটে রঙের যকৃত আর নীল নীল পাকানো প্যাচানো এক দলা নাড়িভুড়ি ঝপ করে পড়ে গেল। খাদ্যনালীটা ছোরার পোঁচে ছিঁড়ে গিয়েছিল। খানিকটা অজীর্ণ থকথকে খাদ্যের পিণ্ড বেরিয়ে এল। পিত্তটা ফেঁসে গিয়েছিল। নীলচে তরল রস ছড়িয়ে পড়ল। বোঁটকা দুর্গন্ধে সেলুলার জেলের বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

'হা-আ-আ-আ—মর গিয়া—'

বিরসার বিরাট দেহটা পাক খেতে খেতে ঘাসের ময়দানে আছড়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ঘাসের উপর মুখ গুঁজরে গোঙাচ্ছিল বিরসা। এক সময় গোঙানি একেবারেই থামল। দেহটা নিস্পন্দ হয়ে গেল।

রক্ত, থকথকে অজীর্ণ খাদ্য, ডেলা ডেলা হলদেটে চর্বি এবং মাংস আর নীল পিত্তের রসে মাখামাখি হয়ে পড়ে রয়েছে বিরসা। এক ঝাঁক বড় বড় নীল মাছি বিরসার নিস্পন্দ দেহটার উপর ভন ভন করে উড়তে লাগল।

বিরসাকে দেখতে দেখতে একটা হিংস্র তৃপ্তির হাসি জাজিরুদ্দিনের মুখে খেলতে লাগল। তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল জাজিরুদ্দিন। দুই হাতে বার দশেক তুড়ি বাজাল। তারপর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা নখসমেত বিরসার কাঁধে গিঁথে আস্তে একটা ঠেলা মারল জাজিরুদ্দিন। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল, 'শালে বড় মরদ এসেছে! এ জিন্দগীতে আর আমাকে হারাতে হবে না।'

আকাশের দিকে চোখা নুরওয়ালা মুখটা তুলল জাজিরুদ্দিন, 'দুসরা জিন্দগীতে আবার তোর সাথ মুলাকাত হবে বিরসা। সেদিন কে জেতে কে হারে, বোঝা যাবে। তুই জিতলে আমি তোর জুতি চাটব, আমি জিতলে তুই আমার জুতি চাটবি। এক কথা, পাক্কা বাত বিরসা। মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত। হাঃ-আঃ-আঃ—'

বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে এই আট শ কুঠুরির সেলুলার জেলটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে বিকট শব্দে হাসতে লাগল জাজিরুদ্দিন। হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে জাজিরুদ্দিন কী পাগল হয়ে যাবে!

চারপাশের কয়েদীগুলো নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের পাতা

তাদের নড়ছে না। জাজিরুদ্দিন আর বিরসার মজাদার লড়াইর পিছনে এমন একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার যে লুকিয়ে ছিল, আগেভাগে কেউ কি সন্দেহ করতে পেরেছিল ?

সেই কয়েদীটা, যাকে দেখে বুঝবার জো নেই, সে হিন্দু না মুসলমান, বৌদ্ধ না খ্রীষ্টান, মারাঠী না পাঠান, মোপলা না পাঞ্জাবী—সে-ই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙল, 'বিরসা শালে জান দিল !'

কেমন এক ধরনের উদাস আক্ষেপের সুর ফুটল তার গলায়।

চারপাশের কয়েদীগুলো দলা পাকিয়ে নিষ্ক্রিয় এবং অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের সামনে বিরসার নিস্পন্দ দেহ এবং এত খুন দেখেও তারা পুরাপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না।

আচমকা সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা ছুটে গেল।

সবগুলো কয়েদী একই সঙ্গে একই স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'মর গিয়া মর গিয়া। জাজিরুদ্দিন বিরসাকে কোতল কর দিয়া।'

জটলা ভেঙে কয়েদীরা চারদিকে ছুটতে লাগল। চিৎকার, হল্লা এবং চিল্লানি—সব শব্দ একাকার হয়ে আকাশের দিকে উঠছে।

একটু পর পুলিস-জমাদার-হাবিলদার, জেলার এবং জেল সুপারিণ্টেনডেণ্ট—সবাই ঝাঁক বেঁধে এসে পড়ল।

বিরসার মৃতদেহটা ঘিরে নীল নীল মাছিগুলো সমানে ভন ভন করছে। রক্তের কেমন একটা আঁশটে গন্ধ ছুটছে। ঐ গন্ধটাই আরো মাছি জুটিয়ে আনছে।

জাজিরুদ্দিন সমানে হাসছে আর বলছে, 'শালে বড় মরদ এয়েছে ! শালে বড় উস্তাদ এয়েছে !'

তার থাবায় রক্তাক্ত ছোরার ফলাটা দুপুরের রোদে ঝলকাচ্ছে।

চারপাশের কয়েদীরা চিল্লাতে চিল্লাতে দূরের ব্লকগুলোতে পালিয়ে গিয়েছে।

জাজিরুদ্দিনের হাতে লোহার হাতকড়া পড়ল। দুটো পুলিস আর দুটো জমাদার বেতের মোটা ডাণ্ডা দিয়ে গুঁতোতে গুঁতোতে জেলার সাহেবের অফিসের দিকে নিয়ে গেল তাকে।

এক কদম এগোয় জাজিরুদ্দিন, তিন কদম পিছায়। আর সমানে চিল্লায়, 'আমি হলাম জাজিরুদ্দিন। দুনিয়ায় কত লড়াই আমি জিতেছি। আর ঐ বিরসা শালে আমাকে হারাতে চায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ—'

গলা কাটিয়ে হেসে ওঠে জাজিরুদ্দিন। হাসির দাপটে দেহটা দুমড়ে বেঁকে যায় তার। জিভটা আধ হাতখানেক বেরিয়ে পড়ে।

পুলিস এবং জমাদাররা জাজিরুদ্দিনকে টেনে হিঁচড়ে জেলার সাহেবের অফিসে ঢোকায়।

সাত নম্বর ব্লকের ছোট্ট ময়দানে বিরসার দেহটা পড়েই থাকে। রক্ত জমে থকথক করে। আরো মাছি এসে জোটে। রক্তের মধ্যে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ডানা জড়িয়ে তারা ডুবে যায়।

এখন দুপুর। সূর্যটা দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে। তেজী রোদে বিরসার মৃতদেহটা তাততে থাকে।

এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছে লখাই। তারপর ভয়ে সঙ্গে ছুটে দূরের ব্লকগুলোর দিকে পালিয়ে গিয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপ ধর্মের মহিমা এমন করেই পুরাপুরি বজায় রাখে। এখানে সমস্ত কিছুই সৃষ্টিছাড়া।

তেত্রিশ

আজ মঙ্গলবার।

মঙ্গলবার মঙ্গলবার সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় 'ম্যারেজ প্যারেড' হয়।

কম্বলের তলা থেকে মাথা বার করে আকাশটাকে দেখবার চেষ্টা করল সোনিয়া। এখনও রোদ ওঠে নি। সূর্য ওঠার আগে অল্প অল্প আলো এবং প্রচুর অন্ধকার মিশে আকাশটাকে আবছা করে রেখেছে।

শীতের এই শেষ দিনগুলোতে দ্বীপের মাথায় কুয়াশা পড়তে থাকে। গাঢ় কুয়াশার নীচে দ্বীপ এবং সমুদ্র নিরাকার, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

রস দ্বীপটাকে এখন দেখা যায় না। উপসাগরের নীল জল কি দূরের সমুদ্রও চোখে পড়ে না।

পাথুরে দেওয়ালে উন্মাদ উপসাগর অবিরাম মাথা কোটে। শুধু তার শব্দ শোনা যায়। নারকেল বনে ক্ষ্যাপা বাতাস এলোপাথাড়ি ছুটতে থাকে।

কান খাড়া করে বাতাস আর দরিয়ার গর্জন শোনে সোনিয়া।

একটু একটু করে আকাশ থেকে গাঢ় কুয়াশার স্তর ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যেতে থাকে। রস দ্বীপটাকে এখন একটা ধোঁয়ার পাহাড়ের মত মনে হয়। উপসাগরের নীল ঢেউগুলো চিক চিক করতে থাকে। কম্বলের তলা থেকেই সোনিয়া দেখতে পায়, আটলান্টা পয়েন্টের মাথায় সেলুলার জেলের লাল বাড়িটা কুয়াশার মধ্য থেকে ফুটে বেরুতে শুরু করেছে।

কুয়াশা ফুঁড়ে ফুঁড়ে সোনার তারের মত রোদের রেখা এসে পড়েছে মুখের উপর। সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার উপর দিয়ে এক ঝাঁক সী-গাল পাখি এই সকালেই খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। সকালের নরম রোদ, আকাশের গায়ে আটকে-থাকা সী-গাল পাখি, দূরের আবছা রস দ্বীপটা—এগুলো বড় ভাল লাগছে সোনিয়ার। মুখের উপর রোদ পড়ছে। তবু কম্বল টেনে রোদ ঠেকাবার চেষ্টা করল না সোনিয়া।

পেটি অফিসারনী এতোয়ারী এসে হাজির হল। সোনিয়ার কম্বলে জাঁকিয়ে বসে বলল, 'আঁই মাগী, দিলটা খুব খোশ রয়েছে, না?'

'কেন ?'

'আঁই শালী, দিল্লাগী করছিস !'

'কই দিল্লাগী করলাম !'

'কই দিল্লাগী করলাম !' একদৃষ্টে সোনিয়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল এতোয়ারী। তারপর হেসে ফেলল। বলল, 'মাগীর দিলে বহুত ফুর্তি।'

'ফুর্তি কেন ?'

'মাগী বলে কি ! ফুর্তি কেন ? আজ শাদীর 'প্যারিড' হবে।' একটু দম নিয়ে এতোয়ারী শুরু করে, 'কমিশনার সাহাব তোকে শাদী করার 'পারমিশ' (পারমিশন) দিয়েছে। নসীবটা তোর বড় আচ্ছা। এত তাড়াতাড়ি কেউ শাদীর 'পারমিশ' পায় না।'

বাইরের দিকে তাকায় এতোয়ারী। সমুদ্র ও দ্বীপ কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। উপসাগর, রস দ্বীপ এবং অনেক দূরের সমুদ্র পেরিয়ে এতোয়ারীর দৃষ্টিটা কোন একটা দুর্নিরীক্ষ্য দিগন্তে উধাও হয়ে যায়। বহু দূর থেকে যেন গলার স্বরটা ভেসে আসতে থাকে তার, 'চান্নু সিংকে তুই পাবি সোনিয়া। আদমীটা বড় ভাল। আদমীটার ইমান আছে, দিল আছে আবার রুপেয়াও আছে। চান্নুকে শাদী করে তোর বহুত সুখ হবে। আমার কথাটা মনে রাখিস।'

সোনিয়া জবাব দেয় না।

এরপর অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। সোনিয়া আর এতোয়ারী পরস্পরের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ দু-হাতে সোনিয়াকে জাপটে ধরে এতোয়ারী। বলে, 'চান্নুকে শাদী করে ছ'টা রোজ কাটিয়েছিলাম। আমার খুনে রেণ্ডিপাড়ার বিষ রয়েছে। ঘরে দিল বসাতে পারি নি। আদমীটাকে একটু সুখ দিতে পারি নি। চান্নুকে শাদী করে তুই তাকে সুখ দিস সোনিয়া।'

যে নারী আন্দামান আসার আগে দু-দুটো রেণ্ডিপাড়া চালাত, দা রাহাজানি-খুন-খারাপির বিষ যার রক্তের মধ্যে বীজাণুর মত মিশে আছে, সাত বছর সাউথ পয়েণ্ট জেলে কয়েদ খেটেও যার স্বভাব বিন্দুমাত্র বদলায় চান্নু সিংকে শাদী করেও ঘরে যে দিল বসাতে পারে নি, আজ গলায় অদ্ভুত এক আক্ষেপ ফুটছে, 'জীবনটা আমার বরবাদ হয়ে গেল সোনিয়া !'

'বরবাদ হবে কেন? তুমি 'রেণ্ডিবারিক' কয়েদখানার পেটি অফসারনী। মাসে মাসে তলব (মাইনে) পাও। তোমার কত দাপট!'

'আমি পেটি অফসারনী! আমার কত দাপট! মাসে মাসে তলব পাই! সব ঠিক সোনিয়া, আবার সবই ঝুটা।'

দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখটা গুঁজে দেয় এতোয়ারী। জবরদস্ত পেটি অফিসারনীর বুক ফেটে বুঝি আঁশু ছুটবে।

এতোয়ারীর একটা হাত ধরে সোনিয়া আস্তে আস্তে বলে, 'সব ঝুটা কেন বহীন?'

'বহীন, আওরতের মরদ ছাড়া উপায় নেই। বিশোয়াস (বিশ্বাস) করে নিজের জান-জমানা-জিন্দগী কারো হাতে তুলে দিতে না পারলে সুখ নেই, শান্তি নেই।' একটু থেমে কি যেন ভাবে এতোয়ারী।

হয়ত সে ভাবে, দু-দুটো রেণ্ডিপাড়া চালানোর মধ্যে, খুনখারাপি-দাঙ্গা-রাহাজানির মধ্যে, কি পেটি অফিসারনীগিরির মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত সুখই নেই। আজকাল বয়স হয়েছে, রক্ত ঝিমিয়ে পড়েছে। হিসাব এসেছে জীবনে। সেই হিসাবের আলোতেই একটা নতুন সত্যের চেহারা দেখেছে এতোয়ারী। হয়ত সে ভাবে, সমস্ত মত্ততা যখন ঘুচে যায়, সফেন রক্ত থেকে যখন দু-দুটা রেণ্ডিপাড়ার বিষ মুছে যেতে থাকে, জোরালো নেশা ছুটে যাবার মত যখন দাঙ্গা-রাহাজানির কথা মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন প্রয়োজন একটি নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। প্রয়োজন এমন একটি পুরুষের, যাকে বিশ্বাস করা চলে, যার হাতে জিন্দগীটা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

হঠাৎ এতোয়ারী বলে, 'আমার আর কোন উপায় নেই। তামাম জীবন এই রেণ্ডিবারিক কয়েদখানায় কাটাতে হবে। কোনদিন আর বেরুতে পারব না।'

সমস্ত উপায় খুইয়ে জীবনের বিরাট একটা সত্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এতোয়ারী। আস্তে আস্তে সে বলতে থাকে, 'আমি যে ভুলটা করেছি, তুই সেটা করিস না বহীন। চান্নুকে ভালবাসবি, ঘরে দিল বসাবি। জিন্দগীটা আমার মত বরবাদ করে দিস না।'

অদ্ভুত এক আবেগে গলাটা বুঁজে গেল এতোয়ারীর।

সোনিয়ার কে জানে কেন মনে হয়, চান্নু সিংএর সঙ্গে মাত্র ছ'টা রোজ কাটালেও এতোয়ারীর দিলে তার স্থায়ী, অক্ষয় ছাপ পড়েছে। চান্নুকে সে

ভুলতে পারে নি। চান্নুর জন্ত তার দিলে অফুরন্ত মহব্বৎ। হঠাৎই আবার আর একটা প্রশ্ন জাগে সোনিয়ার মনে। কাকে বেশি ভালবাসে এতোয়ারী? চান্নু সিংকে না নিজের জিন্দগীকে? সোনিয়ার মনে হয়, জিন্দগীর জন্তও বুঝি এতোয়ারীর অগাধ, অথৈ ভালবাসা।

কেশে গলাটা সাফ করে নেয় এতোয়ারী। বলে, 'এবার উঠে পড় সোনিয়া। একটু পরই 'প্যারিড' শুরু হবে। গোসল করে নে। তারপর সাফা কাপড়াকুর্তা পরবি। আমি তোকে সাজিয়ে দেব। নে, জলদি কর।'

ফস্ করে সোনিয়া বলে বসে, 'আমি শাদী করব না পেটি অফসারনী।'

'কেন?' এতোয়ারী খেঁকিয়ে উঠল, 'ছোকড়ি শাদী না করলে 'রেণ্ডিবারিক' জেলে পচে পচে মরবি যে! তোর ব্যারাম হয়েছে, শাদী না করলে এ ব্যারাম সারবে না।'

সোনিয়ার দুটো ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম, দুর্বোধ্য একটি হাসি ফোটে। আশ্চর্য! হাসিতে এতটুকু শব্দ নেই। সোনিয়ার হাসিতে কি আছে, কে জানে?

হাসির নমুনা দেখে মেজাজটা ঠিক রাখতে পারে না এতোয়ারী। ক্ষেপে ওঠে সে। খানিকটা অশ্লীল, কুৎসিত খিস্তি করে সে বলে, 'মাগী, শাদী না করলে ঐ রামপিয়ারী কুত্তীটা তোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।'

রামপিয়ারীর নাম শুনেই আন্তরাত্মাটা শিউরে উঠল সোনিয়ার। ফিস ফিস করে সে বলল, 'শাদী করব না, ঠিক এ কথা বলতে চাই নি।'

'তবে কী বলতে চাইছিলি?'

এতোয়ারীর কথায় খেয়াল নেই সোনিয়ার। সে ভাবছিল। রামপিয়ারীর নাম শুনেই বুকের মধ্যে সেই যে কাঁপ ধরেছে, এখনও থামে নি। অদ্ভুত এক ভয় মেরুদণ্ড বেয়ে খাড়া ঝিলিকের মত উঠছে, নামছে।

এতোয়ারী চিল্লায়, 'আঁই মাগী, কি বলতে চাইছিলি?'

'শাদী করব। লেকিন চান্নুকে না।'

'কেন?'

'দিল চান্নুকে শাদী করতে চায় না।'

'কেন?'

'দিলই বলতে পারে।'

অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে সোনিয়া। রামপিয়ারীর ভয় কেটে যেতে

শুরু করেছে। সেই দুর্বোধ্য হাসি চিকন একটি রেখায় দুই ঠোঁটের মধ্যে ফুটি ফুটি করছে।

বিচিত্র নারী সোনিয়া। কৌতুকে কি তামাশায় যখন সে মেতে ওঠে, তখন তাকে বোঝা যায় না। সোনিয়ার দিলের অগাধ অতলে কী আছে কে বলবে?

এতোয়ারী আর কথা বাড়ায় না। তাড়া লাগায়, 'ওঠ্, ওঠ্ সোনিয়া, কয়েদানী গুনতির সময় হয়েছে। একটু পর শাদীর 'প্যারিড' শুরু হবে।'

আজ সকালেই গোসল সেরে নিল সোনিয়া।

গোসল সারবার পর কাঞ্জিপানি খেয়ে বর্তন ধুয়ে রাখল। তারপর শাদীর প্যারেডের জন্য তৈরী হতে লাগল।

কালো কালো চুলগুলি মাজা ছাপিয়ে নীচে পড়েছে। পরিপাটি করে দীর্ঘ চুলে একটি বাহারে খোঁপা বাঁধল। একটু আগে এতোয়ারী অনেকগুলো হাওয়াই বুটির ফুল দিয়ে গিয়েছিল। খোঁপার উপর ফুলগুলি গিঁথে দিল। কোথা থেকে একটু সুর্মা আর মেহেদী জুটিয়েছিল, সোনিয়াই জানে। চোখের কোলে সুর্মার সরু টান মারল, হাতের পাতায় মেহেদীর রস মাখল। দিন দুই আগে ক্ষার দিয়ে কেচে শাড়ি আর কুর্তা সাফ করে রেখেছিল। কুঁচি মেরে শাড়ি পরল। শুকনা এক টুকরা কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুখখানা চকচকে করে তুলল।

এখন আর সোনিয়াকে চেনাই যায় না। সামান্য কয়েকটি উপকরণ। তারই কারসাজিতে সোনিয়ার দেহে এক মোহময়ী জাদুকরী ফুটে বেরিয়েছে।

অনেক, অনেকদিন পর নিজেকে সাজিয়েছে সোনিয়া। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

রামদেও তিওয়ারীকে মনে পড়ল সোনিয়ার। মনে পড়ল ব্রিজলালকে। না না, তারা আজ আর কেউ না। দিলের মধ্যে অতীতের অসহ্য স্মৃতিগুলোকে পুষে নিজেকে অবিরত কষ্ট দিয়ে কী লাভ? নতুন করে জীবন শুরু করবে সোনিয়া। জীবন থেকে অতীতকে কেটে ছেঁটে বাতিল করে দেবে। অতীতের জন্য আজ থেকে আর মোহ নেই, দুঃখ নেই, জ্বালা নেই। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে তার জিন্দগী আজ নতুন করে জন্ম নিয়েছে। এই দ্বীপ তাকে ঘর দেবে, একটি পুরুষ দেবে, বেঁচে ওঠার উপায় দেবে।

পেটের মধ্যে ডেলা ডেলা মাংস ইটের টুকরার মত শক্ত হয়ে তোলপাড় করতে থাকে। দুঃসহ এক যন্ত্রণা নাড়িগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে মাংস এবং চর্বির মধ্য দিয়ে শির শির করে ছুটতে থাকে। যন্ত্রণাটা যখন চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন একটা ধারাল ছোরা দিয়ে পেটটাকে ফেঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, গলায় রশি দিয়ে কি দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পায়। এ এক দুরারোগ্য স্ত্রীব্যাধি। পুরুষসঙ্গ ছাড়া এ রোগের আসান নেই। তাই কমিশনার সাহেব শাদীর অনুমতি দিয়েছেন।

রোগ সেরে যাবে। একটি পুরুষকে ঘিরে নতুন করে বেঁচে উঠবে। বেঁচে ওঠার অন্ধ, উন্মাদ নেশায় বুঁদ হয়ে রইল সোনিয়া। বাঁচা ছাড়া জীবনের অন্য সব কিছু ভুলে গেল।

কালা পানির এই দ্বীপটাকে, নিজের জিন্দগীটাকে, এই সকালটাকে হঠাৎ বড় ভালবেসে ফেলল সোনিয়া।

অনেকক্ষণ নিজের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল সোনিয়া। নানা ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় জমাচ্ছিল। আচমকা লখাইর কথা মনে পড়ল। ঝড়ের দরিয়ার সেই সাথীটার কথা মনে পড়লেই দিলটা কেমন যেন উদাস উদাস লাগে।

কিন্তু আজকের দিনটাই আলাদা। এর স্বাদ-গন্ধ-বর্ণই স্বতন্ত্র। জীবনের অন্য দিনগুলোর সঙ্গে আদৌ এর মিল নেই।

সোনিয়ার মনে হল, ঝড়ের দরিয়ায় একটা রাত একটি পুরুষের সঙ্গে কাটালেই দিলে দাগ পড়া উচিত নয়। অনায়াসে দিল থেকে লখাইর ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে দিল সোনিয়া।

বিশেষ কোন পুরুষ নয়, এত বড় দুনিয়ার যে কোন একটি পুরুষকে নিয়ে এই 'রেণ্ডিবারিক' কয়েদখানার বাইরে কোথাও নতুন করে জীবনটাকে শুরু করার আশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে সোনিয়া।

সোনিয়ার মনের অবস্থাটা যখন এই রকম, ঠিক তখনই টিণ্ডালান রামপিয়ারীর দেখা মিলল।

রামপিয়ারী কখন যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সোনিয়া খেয়াল করতে পারে নি।

মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে রামপিয়ারী আস্তে ডাকল, 'এ সোনিয়া।'

মুখটা ঘুরিয়েই চমকে উঠল সোনিয়া।

রামপিয়ারীর গোল গোল পাতাহীন চোখ স্থির হয়ে জলছিল। কেমন এক ধরনের বিহ্বল, নেশাতুর দৃষ্টি ফুটে রয়েছে সে চোখে।

রামপিয়ারীর জলন্ত চোখ দুটোর পিছনে একটা স্পষ্ট অর্থই থাকে। চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সোনিয়া।

রামপিয়ারী বুঝেই উঠতে পারছে না, কেমন করে কোন ভোজবাজিতে সোনিয়া এমন খুবসুরতী হয়ে গেল। মুগ্ধ, জড়ানো স্বর ফুটল রামপিয়ারীর গলায়, 'এ লেড়কি, একেবারে জাদুকরী বনে গিয়েছিস!'

সোনিয়া জবাব দিল না।

রামপিয়ারী বলতে লাগল, 'এত খুবসুরতী সেজেছিস কেন? দেখে দেখে দিলের ধড়কানা বন্ধ হয়ে যায়! কেমন করে এমন খুবসুরতী বনলি?'

সোনিয়া এবারও জবাব দিল না।

রামপিয়ারী পা ঘষতে ঘষতে সোনিয়ার কাছে চলে এল। ফিস ফিস করে বললে, 'সোনিয়া, তুই জাদু জানিস; জরুর জাদু জানিস। তাই না?'

অস্ফুট স্বরে সোনিয়া বলে, 'কি জানি?'

'জানিস জানিস—' দুই হাতে সোনিয়াকে জাপটে ধরে রামপিয়ারী বলতে থাকে, 'নইলে সারা রাত আমার আঁখে নিদ আসে না কেন? সারা রাত তোর কথা ভাবি সোনিয়া।'

সোনিয়া চুপ করে থাকে।

অনেকক্ষণ রামপিয়ারীও আর কিছু বলে না।

বেলা চড়ছে। দ্বীপের মাটি তেতে উঠতে শুরু করেছে। ঝকঝকে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড ধূসর রঙের মেঘ ভেসে চলেছে। সকালের প্রথম রোদে মেঘের টুকরাগুলি জলছে।

সিসোস্ট্রেস উপসাগরে সিঙ্গাপুর-গামী একটা বিরাট জাহাজ এসে ভিড়েছে। জাহাজের মাস্তলটা জলছে। মাস্তলের ডগায় একটা সাগরপাখি জলছে।

হঠাৎ রামপিয়ারী বলল, 'আজ শাদীর 'প্যারিড' হবে।'

'জানি।'

'জানিস!' কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখায় রামপিয়ারীকে। তারপরেই চকিত হয়ে উঠল সে, 'কি জানিস?'

'আজ শাদীর 'প্যারিড' হবে।'

এবার একেবারে ভিন্ন কথা পাড়ল রামপিয়ারী। পাতাহীন চোখজোড়া

আগে থেকেই জলছিল। জলন্ত চোখের তারা দুটো সোনিয়ার মুখের উপর স্থির রেখে তাকাল সে। চোয়াল দুটো কঠিন হল। হনু দুটো খাড়া হয়ে ফুঁড়ে বেরুল। মুখ চোখের ভঙ্গি নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে রামপিয়ারীর চেহারায় আশ্চর্য এক পরিবর্তন দেখা দিল।

রামপিয়ারী বলল, 'আমার কাছে একটা কথা লুকিয়ে রেখেছিলি কেন ?'

'কী কথা ?'

'তুই শাদীর 'পারমিশ' (পারমিশন) পেয়েছিস।'

সোনিয়া চুপ করে রইল।

'শালী খচরী, আমাকে এ কথাটা বলিস নি কেন ?' রামপিয়ারী গর্জে উঠল।

'এমনি বলি নি।' আবছা গলায় বলল সোনিয়া।

'এমনি বলি নি !' রামপিয়ারী ক্ষেপে উঠল, 'মনে করেছিলি, তুই না বললে আমি টের পাব না ! শালী, তোর জান তুড়ব।'

বলতে বলতেই সোনিয়ার মুখে মাথায় সমানে কীল-ঘুষা চালায় রামপিয়ারী।

কাতর স্বরে সোনিয়া বলে, 'আমাকে মেরো না টিণ্ডালান।'

সোনিয়ার স্বরে কি আছে কে জানে ? সঙ্গে সঙ্গে কীলঘুষা থামায় রামপিয়ারী। গলাটা হঠাৎ নরম করে ফেলে, 'জানিস, আমি 'রেণ্ডিবারিক' কয়েদখানার টিণ্ডালান। কিছুই আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবি না সোনিয়া।'

একদৃষ্টে সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করে রামপিয়ারী। তারপর বলতে থাকে, 'তুই শাদী করিস না সোনিয়া।'

'শাদী না করলে আমার ব্যারাম সারবে না।'

'ঝুট !'

'ডাক্তার সাহাব বলেছে।'

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে রামপিয়ারী। তারপর মুলাইম গলায় বলে, 'শাদী যদি করতেই হয়, আমাকে কর। তোকে রুপেয়া দেব, গয়না দেব।'

পাতাহীন চোখদুটো ধিকি ধিকি জলে রামপিয়ারীর। সে চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করে সোনিয়া। যতটা বোঝে, তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বোধ্যই থাকে।

রামপিয়ারী আবার বলে, 'আজ শাদীর 'প্যারিড' হবে। লেকিন তুই 'প্যারিডে' দাঁড়াবি না।'

'দাঁড়াব তো। মরদ নিয়ে ঘর করতে আমার সাধ হয় না?'

দাঁতে দাঁত ঘষে রামপিয়ারী। চাপা, তীব্র স্বরে বলে, 'মরদে কোন সুখ! মরদ! মরদ! মরদ নইলে জমানা বুঝি বেচাল হয়ে যায় মাগীর!'

'হাঁ।'

কেমন একটা জেদ যেন সোনিয়াকে পেয়ে বসে। সে বলে, ' 'প্যারিডে' আমি জরুর দাঁড়াব। নইলে এই 'রেণ্ডিবারিকে' থাকলে তুমিই আমাকে খতম করবে।'

নির্মম চোখে চেয়ে থাকে রামপিয়ারী। সে বুঝেই উঠতে পারে না, কেমন করে সোনিয়া এতটা দুঃসাহসী হতে পারে? তার মত সাঙ্ঘাতিক একটা টিণ্ডালানের মুখের উপর জেদ দেখাবার শক্তি কোথা থেকে সোনিয়া পেল, ভেবে ভেবে তাজ্জব বনে যায় সে।

ভয়ানক গলায় রামপিয়ারী বলে, 'সাফ কথাটা শুনে রাখ। 'প্যারিডে' দাঁড়াবি না।'

'দাঁড়াব।'

'আচ্ছা! কেমন করে দাঁড়াস, আমি দেখব!'

সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানার মাথায় সকালের রোদ এসে পড়েছে।

রামপিয়ারী বেরিয়ে পড়ল। তার দীর্ঘ দেহ আর দীর্ঘতর একটি ছায়া একাকার হয়ে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল।

একটু পরেই 'ম্যারেজ প্যারেডে'র সময় হয়ে গেল।

সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানার ছোট্ট ময়দানটা সতেজ ঘাসে ঘাসে এক টুকরা সবুজ গালিচার মত দেখায়। ময়দানটার চারপাশ থেকে অনেকগুলো নারকেল গাছ সিধা আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। নারকেল গাছের মাথায় রোদ আর বাতাস এসে পড়েছে।

আজকের দিনটি বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর।

এত বড় আকাশে দু চার টুকরা ধূসর রঙের মেঘ ছাড়া বাকী সব কিছুই নিষ্কলঙ্ক নীল। অনেক শূন্যে ডানা স্থির রেখে এক ঝাঁক গোয়েলেথ পাখি বাতাসে সাঁতার কাটে।

ময়দানটার এক দিকে গুটিকতক কুর্সি। কুর্সির উপর জাঁকিয়ে বসেছেন ডাক্তার, সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার মেম জেলার, সেলুলার জেলের সাহেব জেলার, জেল সুপারিনটেনডেন্ট। তাঁদের পাশে পুলিস-জমাদার-হাবিলদারদের বাহিনী। উল্টা দিকে টিণ্ডালান, পেটি অফিসারনী আর ওয়ার্ডারনীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ময়দানের উপর কাতার দিয়ে জন বিশেক পুরুষ কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে। এরা সকলেই সরকার থেকে সেলফ্ সাপোর্টার্স টিকেট পেয়েছে। পেয়েছে শাদী করার আইনসিদ্ধ অধিকার।

মেম জেলার উঠে দাঁড়ালেন। হাতের ইঙ্গিতে একটা টিণ্ডালানকে ডাকলেন। টিণ্ডালানটা কাছে এলে বললেন, 'কয়েদানীদের নিয়ে এস।'

একটু পর কয়েদিনীদের নিয়ে ফিরে এল টিণ্ডালানটা।

প্রায় পনের জন কয়েদিনী পুরুষ কয়েদীদের মুখোমুখি দাঁড়াল। এরাও শাদী করার 'পারমিশ' (অনুমতি) পেয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে স্বয়ম্বরের বিচিত্র ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল।

একটা টিণ্ডালান হাঁকল, 'এ মরদানা কয়েদী, এ জেনানা কয়েদানী—আপনা আপনা আদমী পছন্দ কর। আপনা আপনা সাথী বেছে নে, দেখে নে, বাজিয়ে নে, রাজীবাজী করিয়ে নে।'

এর পরই ম্যারেজ প্যারেড শুরু হল। শুরু হল অদ্ভুত এক স্বয়ম্বর পর্ব।

কয়েদিনীদের সঙ্গে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে সোনিয়া। দুর্জ্ঞেয় এক ভয়ে বুকের মধ্যটা দুরু দুরু করে, হৃদপিণ্ডটা তোলপাড় শুরু করে দেয়। নাকের ডগায় কণায় কণায় ঘাম ফুটে ওঠে। মাথা তুলে পুরুষ কয়েদীদের মধ্য থেকে মনের মত একজনকে যে পছন্দ করবে, সে সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে সোনিয়া। যে নারী কোতল করে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে কালা পানি আসতে ডরায় নি, বাকী জীবনের জন্য একটি পুরুষ বেছে নিতে তার বুক এত কাঁপে কেন?

সরমে-ঘামে-ভয়ে-আতঙ্কে জর্জর দেখায় সোনিয়াকে।

কয়েদী এবং কয়েদিনীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে টিণ্ডালানটা আবার চিল্লায়

'সরমের মাথা খা লেড়কীরা। আপনা আপনা মরদ পছন্দ কর। লেড়কারা, সরমবালীদের সরমের মাথা খেতে শিখিয়ে দে।'

একে একে পুরুষ কয়েদীরা সোনিয়ার সামনে দিয়ে যায়। ফিস ফিস করে প্রত্যেকেই বলে, 'মুখ তোল জেনানা।'

মুখটা তুলতেই তো চায় সোনিয়া, কিন্তু পারে কই?

একটু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কয়েদীটা হয়ত প্রশ্ন করে, 'নাম কি তোমার?'

সোনিয়া জবাব দেয় না। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত নেই তার। চোয়াল দুটো যেন আটকে গিয়েছে।

একে একে প্রায় সবগুলো কয়েদীই সামনে এসে দাঁড়ায়। একই প্রশ্ন করে। জবাবের জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অন্য কয়েদিনীর দিকে চলে যায়।

কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না সোনিয়া, কিছুই শুনছে না। সমস্ত কিছুই আবছা, ঝাপসা, অস্পষ্ট। কোন কিছুর যেন আকার নেই; নির্দিষ্ট, স্পষ্ট কোন চেহারা নেই।

স্মৃতি থেকে রামদেও তিওয়ারী নামে একটা দুর্বহ অতীতকে ঝেড়ে মুক্ত হতে চেয়েছিল সোনিয়া। আশ্চর্য, সেই মানুষটাকেই এখন সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে। এই সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানা, এই বিচিত্র স্বয়ম্বর, সামনের উপসাগর, দূরের দরিয়া পেরিয়ে তার মনটা ফিরে গিয়েছে সেই দেহাতী গাঁওখানায়। যেখানে রামদেও তিওয়ারী বিশ বিশটা ভঁইস চরাত, লোটা লোটা সিদ্ধি ঘুঁটে ঢক ঢক করে গিলত, মেজাজটা বদখত হয়ে গেলে তারস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাটনা শহর থেকে শিখে আসা সেই গানটা গাইত। 'সৈঁয়া গয়্যা রফককা সাথ—'

রামদেও তিওয়ারীকে আজ বড় বেশী করে মনে পড়ছে। আদমীটা তার বুকে মুখ গুঁজে একটু শান্তি পেতে চেয়েছিল, তার মহব্বতের মধ্যে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু—

পুরাপুরি আর ভাবতে পারে না সোনিয়া। তার আগেই একটা ভারি নরম গলা কানে আসে, 'মুখ তোল্ সোনিয়া।'

নিজের নামটা শুনেই চমকে ওঠল সোনিয়া। মুখ তুলেই আর একবার চমকায়। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিকট চেহারার চান্নু সিং। মুখে মাথায় অনেকগুলো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

চান্নু সিং মুলাইম করে হাসল, 'আমাকে চিনতে পারছিস না সোনিয়া?

আমি চান্নু সিং। বলেছিলাম, মাথায় লাল সাফা (পাগড়ি) বেঁধে আসব। এই ছাখ লাল সাফা।'

'হাঁ।' ঘাড় কাত করে সোনিয়া বলল, 'চিনতে পেরেছি।'

ছুটো কুতকুতে রক্তাভ চোখে খুশি যেন ঝিক করে জ্বলে উঠল চান্নু সিংএর। আঙুল চালিয়ে দাড়িগুলো আঁচড়ে আঁচড়ে আদর করল সে। তারপর বলল, 'তোর জন্মে কত খুন দিয়েছি, পুলিসের কত ডাণ্ডা খেয়েছি। এই ছাখ এখনও ঘা শুকোয় নি; ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে।'

করুণাই বুঝি হয় সোনিয়ার। বিকট চেহারার চান্নু সিং যখন নরম স্বরে কাকুতি করে, তখন বিদ্রূপে এবং কৌতুকে ঠোঁট ছুটো বেঁকে যায়। আশ্চর্য, একটু আগের ভয়-আতঙ্ক-সরম এখন আর নেই। সোনিয়া ছুই ঠোঁটের ফাঁকে একটি সূক্ষ্ম হাসিকে টিপে টিপে মারতে থাকে।

সোনিয়ার মন বড় তাজ্জবের বস্তু। কখন যে সে মন তামাশায় কৌতুকে মাতবে, কখন যে খুশিতে রাঙিয়ে উঠবে, আবার কখন যে যন্ত্রণায় সেই মন থেকে অলক্ষ্যে খুন ঝরবে, নিজেই কি হদিস পায় সোনিয়া? মুহূর্তে মুহূর্তে তার মন বদলায়, মেজাজ বদলায়, নিমেষে নিমেষে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির খাত বেয়ে তার মন ছুটে চলে। এই হয়ত কৌতুক, এই বিদ্রূপ, এই যন্ত্রণা আবার এই অকারণ অবারণ খুশি।

বিচিত্র নারী সোনিয়া।

একটু আগে রামদেও তিওয়ারীর ভাবনায় মনটা ভারী হয়ে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে বেমালুম ভুলে গেল সোনিয়া। চান্নু সিংকে নিয়ে মেতে উঠল।

সোনিয়া বলল, 'আমার জন্মে বহুত খুন দিয়েছ মরদ?'

'হাঁ-হাঁ—বহুত খুন।'

'আমার জন্মে আর কি দিতে পার?'

'আর কি দেব?'

স্থূল মনোধর্মের চোয়াড়ে মানুষ চান্নু সিং। সোনিয়ার কথার সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচ সে বোঝে না। হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সেই প্রশ্নটাই আবার করে, 'তোর জন্মে আর কী দেব?'

'ভেবে বল দিকি মরদ, আমার জন্ম আর কী দিতে পার?'

অনেকক্ষণ চোখ পিট পিট করে কত কি যে ভাবে চান্নু সিং, তার ইয়ত্তা

নেই। ভেবে ভেবে ঠিকই করে উঠতে পারে না, কী দিলে সোনিয়ার মত তাজ্জবের নারী খুশী হবে?

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে চান্নু সিংএর। শেষ পর্যন্ত ভাবনা ছেড়ে দিয়ে কাতর স্বরে বলে, 'তুই বল্ না, কী দেব?'

'জান দিতে পার মরদ?'

'ওয়া গুরুজী কি ফতে!'

চান্নু সিং চেঁচিয়ে উঠল, 'জান দিলে তোকে পাব কেমন করে?'

সোনিয়া জবাব দিল না। তার যা চিরকালের স্বভাব, ঠোঁটের ফাঁকে হাসি টিপে টিপে মারা, তাই করল।

এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল চান্নু সিং। চড়া গলায় সে বলল, 'তোর কথা আমি বুঝি না। আমার সিধা কথাটার সাফ জবাব দে।'

'কী কথা?'

'আমাকে শাদী করবি তো? রাজীবাজী?'

'রাজীবাজী হতে পারি, লেকিন তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও।' সরাসরি চান্নু সিংএর মুখের দিকে তাকাল সোনিয়া। বলল, 'শাদী তো করতে চাও! পুরা দিলটা দিতে পারবে তো মরদ?'

চান্নু সিংএর বিরক্ত মুখে ভ্রূকুটি ফুটল। চাপা তীব্র স্বরে সে বলল, 'দিল কেমন করে দেব? এ কি কাপড়া গয়না, যে হাতে করে দেব। তোর কথা আমি বুঝি না।'

এবার ব্যাপারটা সহজ করে দেয় সোনিয়া, 'আমাকে পেয়ার করবে তো মরদ? আমার জন্যে তোমার দিলে মহব্বৎ আছে?'

খুশিতে চান্নু সিংএর গোঁফদাড়ি-ভরা বিরাট মুখটা আলো হয়ে যায়। জড়ানো জড়ানো কেমন যেন আবেগের স্বর ফোটে তার গলায়, 'জরুর পেয়ার করব। যেদিন পয়লা তোকে দেখেছি, সেদিন থেকেই পেয়ার করতে লেগেছি।'

'সচ্ (সত্যি) বলছিস?'

'জরুর সচ্, গুরুজী কসম।'

হঠাৎ সোনিয়া বলে বসে, 'তা হলে তোমাকে শাদীই করব মরদ। আমি রাজীরাজী।'

চান্নু সিং সোল্লাসে চিল্লায়, 'রাজীরাজী?'

'হাঁ।'

টিণ্ডালানটা শকুনের মত ধারাল চোখে নজর রাখছিল। যেই শুনল দু পক্ষই 'রাজীরাজী,' অমনি টেনে টেনে চেঁচাল, 'এ মরদ, এ জেনানা—এবার দূরে গিয়ে দিলের কথা বল। হাল হকিকতের খবর জেনে নে। যা, উধারে গিয়ে বস। পেয়ার মহব্বতের কথা বলে দুজনে দুজনের দিলে ফুর্তি দে।'

সবুজ ময়দানটা নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ।

এক একটা নারকেল গাছের নীচে এক এক জোড়া নারী এবং পুরুষ বসে রয়েছে। কালা পানির এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাকী জীবনের জন্য তারা এক একটা সাথী বেছে নিয়েছে।

নারকেল গাছগুলির নীচে বসে তারা জান-জমানার কথা বলছে। পরস্পরের দিলমর্জির খবর জানছে। হাল-হকিকতের কথা বলছে।

দূরের একটা নারকেল গাছের তলায় গিয়ে বসল চান্নু সিং আর সোনিয়া।

জেলার, সুপারিন্টেনডেন্ট, পুলিস-হাবিলদার-জমাদার, টিণ্ডালান পেটি অফিসারনীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখছে। ভব্যতার সীমা পেরিয়ে বেচাল হবার উপায় নেই কারো।

চান্নু সিং বলল, 'হাবরাডীন (এবারডীন) বাজারে একটা চা-খানা খুলেছি। রোজ দু টাকা লাভ হয়। গারচারামা গাঁও-এ সিরকার (সরকার) থেকে ঝুপড়ি তুলেছে। একটা ঝুপড়ি ভাড়া নিয়েছি। সেখানে আমরা থাকব।'

'হাঁ।'

'নয়া নয়া শাড়ি আর গয়না কিনেছি তোর জন্যে।'

'হাঁ।'

'যেদিন সিরকার (সরকার) তোকে নিয়ে যাবার 'পারমিশ' (পারমিশন) দেবে সেদিন শাড়ি-গয়না নিয়ে আসব।'

'হাঁ।'

'আমার তিন শ রুপেয়া আছে, সাতটা দামী পাথর আছে। সব তোকে দেব।'

'আচ্ছা।'

'রাজীবাজী তো?'

'রাজীবাজী।'

শেষ শীতের এই দিনটা বড় ভাল লাগছে সোনিয়ার। বিকট চেহারার

চান্নু সিংকে ভাল লাগছে। তীব্র, ধারাল রোদ এসে পড়েছে মুখে। শিরায় শিরায় রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে। নেশার ঘোরের মত মনে হচ্ছে সমস্ত কিছু। এই রোদ, চান্নু সিং, এই বিচিত্র ম্যারেজ প্যারেড—সব মিলিয়ে কালা পানির এই তাজ্জব দুনিয়াটাকে হঠাৎ বড় ভালবেসে ফেলল সোনিয়া।

আরো খানিকটা পর দুজনে উঠে পড়ল।

মেম জেলার এবং সাহেব জেলার দুজনের নাম লিখে নিলেন।

নিয়ম অনুযায়ী ম্যারেজ প্যারেডে দাঁড়াবার আগে সোনিয়া এবং চান্নু সিংএর ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

জেলাররা বললেন, 'এক সপ্তাহ বাদ সোনিয়াকে নিতে আসবে চান্নু সিং। সোনিয়াকে নিয়ে সিধা এখান থেকে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে যাবে। সেখানে রেজিস্ট্রি করিয়ে এক সপ্তাহ এক সাথ থেকে রস দ্বীপে চিফ্ কমিশনারের অফিসে যাবে। সেখানে ফাইনাল রেজিস্ট্রি হবে। এই এক সপ্তাহের মধ্যে যদি বনিবনা না হয়, তবে এ শাদী টুটবে। ইয়াদ থাকবে?'

জেলাররা বাঁধা গত আউড়ে যায়।

চান্নু সিং এবং সোনিয়া—দুজনেই ঘাড় কাত করে জানাল, 'হাঁ, ইয়াদ থাকবে।'

জেলাররা বললেন, 'এবারে টিপছাপ দাও।'

দুখানা ছাপানো দরখাস্তে সোনিয়া এবং চান্নু সিং টিপছাপ দিল।

হঠাৎ চমকে উঠল সোনিয়া। সাপের হিসানির মত একটা শব্দ আসছে। শব্দটা সোনিয়ার অত্যন্ত চেনা।

ঘুরে দাঁড়াল সোনিয়া। দেখল, তাঁতঘরের পিছন থেকে একজোড়া পাতাহীন চোখ তার দিকে চেয়ে রয়েছে। সে চোখে নিষ্ঠুর, সাঙ্ঘাতিক দৃষ্টি ফুটে রয়েছে।

সোনিয়া শিউরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। এবার দৃষ্টিটা আর একজনের মুখের উপর গিয়ে পড়ল। সে এতোয়ারী।

একটা নারকেল গাছ দু হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এতোয়ারী। ঘাড়টা ভেঙে ঝুলে পড়েছে। অস্বাভাবিক নির্জীব ভঙ্গিতে শরীরটা ঝুঁকে আছে।

একদৃষ্টে চান্নু সিংকে দেখছে এতোয়ারী। চোখের তারা দুটো চক চক করছে তার।

দেখতে দেখতে সোনিয়ার বুকের মধ্যে নরম আওরতী দিলটা মোচড় খেয়ে উঠল।

একটু পর পুলিস-জমাদার-হাবিলদার, সেলুলার জেলের সাহেব জেলার, জেল সুপারিন্টেনডেন্ট এবং পুরুষ কয়েদীরা সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার বাইরে বেরিয়ে গেল।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আজকের মত বিচিত্র স্বয়ম্বর পর্ব শেষ হল।

চৌত্রিশ

ফাঁসির আসামীদের জন্য পাশাপাশি তিনটে সেল।

তারই একটার গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জাজিরুদ্দিন। আকাশে কী দেখছে সে-ই জানে।

এই দ্বীপে বসন্ত এসে পড়েছে।

উত্তর পশ্চিম দিগন্ত পার হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ধূসর রঙের মেঘ আন্দামানের আকাশে হানা দিতে শুরু করেছে। মৌসুমী মেঘ আকাশের এক দিক থেকে আর এক দিকে পাড়ি জমায়। সাগরপাখিরাও পাড়ি জমিয়েছে। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলোকে তারা বুঝি মনে করেছে অচেনা কোন পাখির ঝাঁক। মেঘেদের নাগাল পাবার জন্য পাখিরা অনেক, অনেক শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

জাজিরুদ্দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু তার দৃষ্টির সামনে যেন আকাশ, সাগরপাখি কি মৌসুমী মেঘ ছিল না। সে ভাবছিল।

কাল ভোরে তার ফাঁসি হবে। এখন দুপুর। আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা সে এই দুনিয়ার আলো দেখবে, ফুসফুসে এই দুনিয়ার বাতাস টানবে।

এই পৃথিবীটার সঙ্গে তার চল্লিশ না পঁয়তাল্লিশ বছরের সম্পর্ক, ঠিক মনে পড়ছে না। আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে এতদিনের পুরানো সম্পর্কটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

এর জন্য বিন্দুমাত্র আপসোস নেই জাজিরুদ্দিনের। একটা দীর্ঘশ্বাসও তার পড়ছে না, দিলটা এতটুকু বিকল হচ্ছে না।

অদ্ভুত এক উত্তেজনায় সমস্ত মনটা ভরে রয়েছে জাজিরুদ্দিনের। বিরসা তার ধরম নিতে চেয়েছিল। তার প্রতিফলও সে পেয়েছে।

কাল তার ফাঁসি হবে। এর জন্য এতটুকু দুঃখ নেই। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে অন্য কারণে। ফাঁসির সেলের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই প্রথম তার মনে হল, বিরসাকে না মারলেই হত। নিজের নিজের ধরম নিয়ে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা হয়ত একেবারেই অসম্ভব ছিল না।

বিরসাকে খুন করেছে জাজিরুদ্দিন। বিচারে তার ফাঁসি হয়েছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জাজিরুদ্দিন ভাবছিল। জান সে দেবে, কিন্তু ধরম দেবে না। ধরম দেওয়ার মত গুণাহ্ আর নেই।

বঙ্গোপসাগরের এই কয়েদখানায় ধর্মের মর্যাদা রাখার জন্য ফাঁসির দড়িতে ঝোলা ধরম দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশী কাম্য।

সূর্যটা এখন সরাসরি সেলুলার জেলের মাথায় এসে উঠেছে। খা খা করছে রোদ। আকাশের দিকে আর তাকানো যায় না।

চোখ নামিয়ে সাত নম্বর ব্লকের ওয়ার্কশপের দিকে তাকাল জাজিরুদ্দিন। দেখল, ওয়ার্কশপের গা ঘেঁষে গেটের দিকে চলেছে লখাই।

জাজিরুদ্দিন ডাকল, 'এ লখাই—'

লখাই থমকে দাঁড়াল। চারদিকে চনমন করে তাকাল। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কোন দিক থেকে ডাকটা আসছে।

জাজিরুদ্দিন এবার খেঁকিয়ে উঠল, 'এ শালে কুত্তা, এই দিকে ছাখ্—এই যে আমি—ফাঁসি কুঠরির ভেতর। আয়—আয়—'

গুটি গুটি পায়ে জাজিরুদ্দিনের সেলের সামনে এসে দাঁড়াল লখাই।

জাজিরুদ্দিন অল্প অল্প হাসছে।

বিরসাকে খুন করার পর সেই যে পুলিস-জমাদাররা জাজিরুদ্দিনকে জেলার সাহেবের অফিসে ঢুকিয়ে ছিল, তারপর থেকে সেলুলার জেলে আর তাকে দেখা যায় নি।

একদৃষ্টে নির্নিমেষ চোখে জাজিরুদ্দিনকে দেখছিল লখাই।

জাজিরুদ্দিন সমানে হাসছে। আর বলছে, 'এ শালে লখাই, নালায়েক বুদ্ধু কাঁহাকা; ফাঁসির কুঠরিতে আমাকে দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিস, না?'

লখাই জবাব দিল না।

'আরে বুদ্ধু, কাল আমার ফাঁসি। সেই যে বিরসা কুত্তাটাকে খতম করেছিলাম—'

কথাটা পুরা না করে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল জাজিরুদ্দিন।

হাসির দাপট কমলে জাজিরুদ্দিন আবার শুরু করল, 'ছাখ লখাই, বিরসার নসীবে ছিল, আমার হাতে কোতল হবে। যা নসীবে আছে, তা তো হবেই।'

গলাটা অস্বাভাবিক ভারী শোনায়। চোখের তারা দুটো চক চক করে। আকাশের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে জাজিরুদ্দিন।

জাজিরুদ্দিন যেন জাদু করেছে লখাইকে। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। জাজিরুদ্দিনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করে।

এবার গাঢ়, ভাঙা ভাঙা স্বরে জাজিরুদ্দিন বলে, 'কাল আমার ফাঁসি হবে, সে জন্যে আপসোস নেই। দিলে আমার বহুত সুখ,বহুত ফুর্তি। বুঝলি লখাই, কালা পানির এই কয়েদখানায় আমি আমার ধরমের মান রাখতে পেরেছি।'

লখাই যে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে হুঁশ নেই জাজিরুদ্দিনের। লখাই যেন উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে কথাগুলো সে নিজেকেই বলছে, নিজেকেই শোনাচ্ছে। বিরসাকে কোতল করার পিছনে নির্ভরযোগ্য যুক্তি খাড়া করে যাচাই করে নিচ্ছে।

'জান থাকতে আমি ধরম দেব না।' একটু থামে জাজিরুদ্দিন। সেলের গরাদের দিকে লখাইকে টেনে আস্তে আস্তে বলে, 'বুঝলি লখাই, যত রোজ বাঁচবি, ধরম দিবি না। ধরমের চেয়ে বড় চীজ এই দুনিয়ায় কিছু নেই। ধরম জানের চেয়ে বড়। কথাটা ইয়াদ রাখিস।'

আশ্চর্য! অবাক হয়ে লখাই ভাবে, এই জাজিরুদ্দিনই একদিন হঠাৎ কোথা থেকে এসে সেলুলার জেলের কয়েদীদের ধরে ধরে ধরম নিতে চেয়েছিল।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে জাজিরুদ্দিন। গরাদের ফাঁক দিয়ে এদিকে সেদিকে নজর ফেলে কাকে যেন খুঁজছে।

লখাই বলল, 'কাকে খুঁজছিস?'

'পেটি অফসার শালে এখনও তো হাজমকে (নাপিতকে) নিয়ে এল না। দেখছিস, দাড়ির রোঁয়াগুলো কেমন বেড়েছে! গালে ফুটছে।' হঠাৎ জাজিরুদ্দিন ক্ষেপে উঠল, 'শালে এলে এ্যায়সা লাথ হাঁকব, বাপের নাম ভুলে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

এবার লখাই বলল, 'আমি যাই। ফোনিক্স বে'তে গিয়ে সড়ক বানাতে হবে। জবাবদার দাঁড়িয়ে আছে।'

গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বার করে লখাইর ঘাড়টা ধরে ফেলল জাজিরুদ্দিন। খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে কুত্তা, কোথায় যাচ্ছিস?'

'যাঃ, বেশ কথা কইছিস! কাজে যাব না?'

'যাবি যাবি, জিন্দগীভর তো কামই করবি। লেকিন জিন্দগীভর কি

আমাকে পাবি রে শালে!' গলার স্বরটা কেমন যেন শোনায় জাজিরুদ্দিনের, 'কাল সকালেই তো দুনিয়া থেকে খসে পড়ব।'

এমন যে সাঙ্ঘাতিক জাজিরুদ্দিন, এই মুহূর্তে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যটা মোচড় খেয়ে ওঠে লখাইর। অদ্ভুত এক বেদনাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

নিজের অলক্ষ্যে, অজান্তে কখন যেন পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। পুরানো মনটা, পুরানো ধারণাগুলি আশ্চর্যভাবে বদলে যাচ্ছে। তা না হলে লখাইর বিবেকহীন, বর্বর মনে সহানুভূতি জন্মায় কেমন করে? এক কালে আদিম অর্ধ পশুগঠন মানুষের মত মন ছিল লখাইর। সেই মনে একটু একটু করে নরম অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে। দুশমন লখাইর মন স্পর্শাতুর এবং অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছে। না হলে জাজিরুদ্দিনের জন্য বুকের মধ্যটা মোচড় খেয়ে ওঠে কেন?

ফাঁসির আসামীদের সেল তিনটের পাশে মস্ত এক রেন-ট্রি। ছোট ছোট গোল গোল পাতার মধ্য দিয়ে চিকরি-কাটা রোদ এসে পড়েছে। সেলুলার জেলের মাথায় বিরাট আকাশের নীল টুকরাটা জ্বলছে। আকাশের নীলে আটকে-থাকা এক ঝাঁক সমুদ্র শকুন পুড়ছে। ওয়ার্কশপের টিনের চালাটা ঝলসে যাচ্ছে।'

প্রথমে আকাশ দেখল জাজিরুদ্দিন। সমুদ্র শকুন দেখল। তারপর দৃষ্টিটা রেন-ট্রি, চিকরি-কাটা রোদ, ওয়ার্কশপের ঝকঝকে টিনের চালের উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে লখাইর মুখের উপর এসে পড়ল।

হঠাৎ যেন মনে পড়ল জাজিরুদ্দিনের। সামান্য উত্তেজিত দেখাল তাকে। সে বলল, 'যে যে কাজ করার জন্যে দুনিয়ায় এসেছিলাম, সব করেছি। যাকে যে কথা দিয়েছি, সব রেখেছি। লেকিন—'

'লেকিন কী?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লখাই।

'লেকিন একটা কথা রাখতে পারলাম না লখাই।' জাজিরুদ্দিনের গলায় আক্ষেপ ফোটে।

'কী কথা?'

'চামু সিংকে কথা দিয়েছিলাম, তার সাথ সোনিয়ার শাদীর ব্যবস্থা করব চামু শালাও বলেছিল, সোনিয়ার সাথ তার শাদীর ব্যবস্থা করলে আমি য চাই তা-ই দেবে। লেকিন কথাটা রাখতে পারলাম না।'

সোনিয়ার সঙ্গে চান্নু সিংয়ের শাদীর কথা শুনে লখাই চমকে উঠল।

লখাই কিছু বলবার আগেই জাজিরুদ্দিন আবার বলতে শুরু করল, 'কাল সকালে তুনিয়া থেকে আমার ঠিকানা হারিয়ে যাবে। একটা সাচ্চা দোস্তের কাজ করবি লখাই?'

একদৃষ্টে লখাইর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জাজিরুদ্দিন। দৃষ্টিটা যেন কেমন হয়ে উঠেছে। গাঢ়, অদ্ভুত স্বরে সে বলল, 'কাল আমার ফাঁসি, সময়ও আর নেই। খুদার নামে তিন কসম খেয়ে আমাকে কথা দে লখাই।'

'কী কথা?'

'চান্নুর সাথ তুই সোনিয়ার শাদীর ব্যবস্থা করে দিবি।'

লখাইর তু-হাত চেপে ধরল জাজিরুদ্দিন। বলতে লাগল, 'কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারলে ফাঁসিতে লটকেও আমার সুখ হবে না। বল দোস্ত, আমার কথা রাখবি।'

এমন যে জবরদস্ত লখাই, খুনখারাপি, রাহাজানি, মেয়েমানুষ চুরি, নারী-মাংসের ব্যবসা চালানো,ধর্ষণ—কোন কিছুতেই যে পিছু হটে না, এই মুহূর্তে সে জাজিরুদ্দিনের সামান্য প্রশ্নের জবাবটা পর্যন্ত দিতে পারল না।

তুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিল জাজিরুদ্দিন। বলল, 'বল দোস্ত, বল শালে—'

এবারও জবাব দিল না লখাই।

খানাপিনার পর আরামের জন্য কয়েদীরা যে ঘণ্টাখানেক সময় পায়, তা কাবার হয়ে এসেছে। ফাঁসির আসামীদের পাহারা দেয় যে সিপাইটা সে যেন কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র এসে পড়েছে। লখাইকে দেখে সে তাড়া লাগায়, 'এ কুত্তা ভাগ—'

ওয়ার্কশপের ওপাশ থেকে পেটি অফিসার জবাবদাররা চিল্লাচিল্লি লাগিয়েছে, 'এ শালে লখাই—কামে যাবি না?'

জাজিরুদ্দিনের হাত থেকে নিজের হাত তুটো ছুটিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ওয়ার্কশপের দিকে পালিয়ে গেল লখাই। পিছন দিকে আর একবারও মুখ ঘোরাল না।

দাঁতে দাঁত ঘষে জাজিরুদ্দিন গর্জে উঠল, 'হারামীকা বাচ্চে—'

তখনও দক্ষিণ আন্দামানের আকাশে বিকালের নিস্তেজ রোদ ছিল। সাগরপাখিরা ক্লান্ত ডানায় বাতাস মাপছিল। উপসাগরের বিরাট বিরাট

ঢেউগুলির মুখে শাসানি ছিল। আটলাণ্টা পয়েণ্টের নারকেল গাছগুলির পাতা ঝিলমিল করছিল। ফোনিক্স বে'র জল কেটে কেটে উড়ুক্কু মাছগুলি রূপার তীরের মত দিগ্বিদিকে ছুটছিল। মাউণ্ট হ্যারিয়েটের মাথায় অরণ্যের চেহারাটা দুর্বোধ্য হতে শুরু করেছিল। পানিঘাটে লর্ড মেয়োর কবরের সেই সাদা ক্রুশটা দেখা যাচ্ছিল কি যাচ্ছিল না।

এমন সময় সেলুলার জেলে ফিরে এল লখাইরা।

আজকের মত ফোনিক্স উপসাগরের পারে সড়ক বানাবার কাজ চুকল।

ওয়ার্কশপের পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে লখাইর চোখে পড়ল। সেলের গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জাজিরুদ্দিন। রোদের তেজ কেমন করে আস্তে আস্তে মরে আসছে, কেমন করে তার জীবনের শেষ দিনটা একটু একটু করে নিবে যাচ্ছে, বুঝি বা তাই দেখছিল।

কাল রাত কাবার হবার আগেই ফাঁসি হয়ে যাবে জাজিরুদ্দিনের। শেষ দিনের মত ছোট্ট কুঠুরি থেকে বিরাট আকাশ আর দুনিয়াটাকে যতখানি দেখে নেওয়া যায়, সাধ মিটিয়ে দেখছিল জাজিরুদ্দিন। কাল দুনিয়া থেকে মুছে যাবে সে। আন্দামানের এই আকাশ, উপসাগর, সিন্ধুশকুন, এই নিদারুণ সেলুলার জেল—সব, সবই পড়ে থাকবে। কত কালের পুরানো এই দুনিয়া, এই ভয়ানক বঙ্গোপসাগর, সারি সারি অসংখ্য দ্বীপ—সমস্ত কিছুই থাকবে। ঘুরে ঘুরে অব্যর্থ নিয়মে আজকের এই বিকালটির মত কত বিকাল আসবে। আজকের মতই সিন্ধুসারসগুলো বাতাস মাপতে মাপতে কোথায় চলে যাবে। আজকের মতই রোজ রোজ দিনের রঙ মজিয়ে দিয়ে রোদ মরে যেতে থাকবে। উপসাগরে এমনই হালফা উঠবে, নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ টিলাগুলির মাথায় এমন করেই উন্মাদ বাতাস ক্রমাগত ঘা মারবে।

বুঝি বা শেষ দিনের মত দুনিয়ার সব রঙ দেখে নিচ্ছে জাজিরুদ্দিন, সব শব্দ শুনছে, সব গন্ধ শুঁকছে, ফুসফুস ভরে যতখানি পারছে বাতাস টানছে।

ওয়ার্কশপের গা ঘেঁষে এগুতে এগুতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল লখাই। হঠাৎ জাজিরুদ্দিনের নজর পড়ল। হাতের ইশারায় লখাইকে ডাকল সে।

দুপুরে জাজিরুদ্দিনের হাত থেকে নিজেকে ছুটিয়ে একরকম পালিয়েই গিয়েছিল লখাই। এখন কিন্তু গুটি গুটি পায়ে তার কুঠুরিটার সামনে এসে দাঁড়াল। যে মানুষটার কাল ফাঁসি, হয়ত বা তার জন্য মায়া জন্মে থাকবে লখাইর মনে।

লখাই দেখল, দাড়িগোঁফ কামিয়ে পরিষ্কার হয়ে রয়েছে জাজিরুদ্দিন। চিকন একজোড়া গোঁফ, সূক্ষ্ম ঘুর। চাঁছা গাল চকচক করছে। মাথায় পরিপাটি টেরি বাগানো।

জাজিরুদ্দিন হাসল। বলল, 'ভয় নেই লখাই। দোস্তের কাজ আর করতে বলব না। চান্নু সিংএর সাথ সোনিয়ার শাদীর ব্যবস্থা তোর করতে হবে না।'

লখাই তাজ্জব বনে গিয়েছে।

জাজিরুদ্দিন দাড়িগোঁফ চেঁছেছুলে মুখটাকেই সাফ করে নি, রেশমী লুঙ্গি পরেছে, কলিদার পাঞ্জাবী পরেছে, মাথায় লাল টকটকে একটা শৌখিন ফেজ চড়িয়েছে।

সেলুলার জেলের কর্তৃপক্ষের মনে কিঞ্চিৎ করুণাই হয়ে থাকবে।

কয়েদখানার ভিতরে কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট ধারীওয়ালা ইজের এবং কামিজ ছাড়া অন্য কিসিমের কাপড়-কুর্তার ব্যবহার বে-আইনি। কিন্তু যে কয়েদী কাল সকাল হবার আগেই ফাঁসির দড়িতে লটকাবে, তার জন্য বুঝি বা নিয়ম কানুন সামান্য ঢিলা করা যায়।

কলিদার পাঞ্জাবী, রেশমী লুঙ্গি আর লাল টকটকে ফেজে জীবনের শেষ শখটা মিটিয়ে নিচ্ছে জাজিরুদ্দিন।

একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে লখাই।

জাজিরুদ্দিন বলল, 'কী দেখছিস শালে!'

লখাই জবাব দিল না।

জাজিরুদ্দিন বলতে লাগল, 'তুই ভাবছিস, কালই তো লোপাট হয়ে যাব। তাহলে ক'টা ঘণ্টার জন্য এমন সাজগোজ করলাম কেন?'

'হাঁ—'

অস্ফুট একটা শব্দ করল লখাই।

'কাল দিন-দুনিয়ার মালেকের দরবারে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়ায় এসে কী করলাম, তার হিসেব দিতে হবে। বুঝলি লখাই—' টেনে টেনে দম নেয় জাজিরুদ্দিন। আবার শুরু করে, 'কয়েদখানার এই কাপড়-কুর্তা পরে, দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা এই বদখত চেহারা নিয়ে দিন-দুনিয়ার মালেকের কাছে হাজির হওয়া যায় না। তাই সাফা লুঙ্গি-কামিজ-ফেজ পরলাম।'

খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে জাজিরুদ্দিন।

খানিকটা সময় চুপচাপ।

জাজিরুদ্দিনই স্তব্ধতা ভাঙে, 'এ লখাই, এতক্ষণ আসমানের দিকে চেয়ে চেয়ে কী ভাবছিলাম বল দিকি?'

'কী জানি?'

'বুঝলি বুদ্ধু, নালায়েক—ভাবছিলাম, জিন্দগীটা মস্ত এক তামাশা, বড়িয়া এক দিল্লাগী। আজ তোর সাথ কথা বলছি, কাল আর আমাকে দেখবি না।'

হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল জাজিরুদ্দিন।

আন্দামানের আকাশ থেকে রোদ মুছে গিয়েছে। যে বিষণ্ণ নিস্তেজ আলোটুকু সেণ্ট্রাল টাওয়ারের মাথায় আটকে ছিল, তা-ও আর নেই।

বিকালটা মজে মজে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে লখাই আর জাজিরুদ্দিন। দু-জোড়া চোখ স্থির হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রয়েছে। দু-জোড়া চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি ফুটে বেরিয়েছে।

বিকালের খানা আনে নি লখাই। মনটা তার সজুত নেই।

কাল সকাল হবার আগেই জাজিরুদ্দিন ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে। যতবার ভেবেছে, ততবারই লখাইর মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। মন থেকে জাজিরুদ্দিনের ভাবনাটা কিছুতেই সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ভাবনাটা তাকে পাকে পাকে পেঁচিয়ে ধরছে। অবোধ্য যন্ত্রণার মত, বলা যায় মারাত্মক এক নেশার মত ভাবনাটা তাকে বুঁদ করে রেখেছে।

পুরা রাত্রি একটা মুহূর্ত ঘুমাতে পারল না লখাই।

বঙ্গোপসাগরের হিম হিম বাতাস, রোঁয়াওয়ালা ভারী কম্বলের উষ্ণ আরাম—টানা ঘুমের পক্ষে এত আয়োজন থাকা সত্ত্বেও ঘুমাতে পারল না লখাই। বিছানার উপর ছটফট করে কাটাল। অন্য অন্য দিন ওয়ার্ডার মোহর গাজীর সঙ্গে অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত কথাবার্তা বলে লখাই, গল্প করে, মিজাজির খবর নেয়। কিন্তু আজ আর কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। জাজিরুদ্দিনের ভাবনাটা মাথার মধ্যে একটা চোখা ফলার মত ক্রমাগত বিঁধছে।

শেষ রাত্রির দিকে লখাইর চোখের পাতাদুটো জুড়ে এসেছিল।

আটলান্টা পয়েন্টের মাথায় বিরাট সেলুলার জেলটা এখন নিস্তব্ধ। একটানা, অবাধ ঘুমের নীচে সেটা তলিয়ে রয়েছে।

অন্ধকার আর কুয়াশা ফুঁড়ে দিনের প্রথম রোদ এখনও বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসে পৌছাতে পারে নি। কয়েদখানাটা নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে এখনও ফুটে বেরোয় নি।

আচমকা শেষ রাত্রির সেলুলার জেলটাকে এবং কুয়াশা আর অন্ধকারের নীচে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাকে ভীষণভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে চিৎকার উঠল, 'আল্লা-আ-আ—আমি এক খুদাবন্দ—'

ধড়মড় করে উঠে বসল লখাই। তারপর দৌড়ে গরাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

জাজিরুদ্দিনের ফাঁসি হয়ে গেল।

এ এক নিদারুণ দ্বীপ!

লড়াই করে এখানে নিজের ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এখানে ধর্মের জন্য চাকুর ফলায় জান দেয় বিরসা। ধর্মের জন্যই এখানে জাজিরুদ্দিন ফাঁসির দড়িতে ঝোলে।

চাকুর ফলায় এবং ফাঁসির দড়িতে এই বর্বর দ্বীপের মহিমা অব্যাহত থাকে। সভ্যতা থেকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপ ধর্মের মর্যাদা এমন করেই অক্ষুণ্ন রাখে। এই দ্বীপে এটাই একান্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

পঁয়ত্রিশ

মানস সরোবর থেকে যাযাবর পাখিরা শীতের তাড়নায় পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চলে এসেছিল। শীতের আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছে। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে লক্ষ লক্ষ ডিম পেড়ে আবার তারা মানস সরোবরে ফিরে যাচ্ছে।

আন্দামানের উপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল বাতাসে ভাসতে ভাসতে পাখিরা উড়ে চলেছে।

যাযাবর পাখিরা যখন আন্দামানের উপর দিয়ে পাড়ি জমায়, তখনই এই দ্বীপে বসন্ত আসে।

এবারও আন্দামানে বসন্ত এসে পড়ল।

এ সময় যাযাবর পাখিরাই শুধু আসে না, দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে ধূসর রঙের রাশি রাশি মেঘ উড়ে আসতে থাকে। মেঘের টুকরাগুলি একাকার হয়ে যায়, জমাট বাঁধে, তারপর ফুলে ফুলে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলে।

এবার পাখিরাই এসেছে। এখন পর্যন্ত মেঘেদের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

•

একটু আগে সকাল হয়েছে।

সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার বড় টিলাটার মাথায় বসে রয়েছে সোনিয়া।

কয়েদখানার কাজ আর করতে হবে না। সব ব্যাপারে এখন থেকে মকুব। খানিকটা পর চান্নু সিং নিতে আসবে সোনিয়াকে।

টিলার মাথায় বসে মানস সরোবরের যাযাবর পাখিদের দেখছিল সোনিয়া। অনেক উঁচু দিয়ে তারা ঝাঁক বেঁধে চলেছে। পাখিরা ওড়ে না, ডানা নাড়ে না, বাতাসে অবিরাম ভাসে। ভেসে ভেসে আকাশের তল্লাশ নিতে নিতে তারা এগিয়ে চলে।

পাখিদের ডানার রঙ যে কি, এত নীচু থেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সোনিয়া।

ও পাশে খানিকটা দূরে জনকতক কয়েদিনী তাঁত বুনছে। একতালে

মাকুর শব্দ উঠছে। খটাখট, খটাখট। আর এক পাশে আরো কয়েকজন কয়েদিনী কোপরার জন্য নারকেল কাটছে।

কোন দিকে লক্ষ্য নেই সোনিয়ার। পাখিদের ডানার দুর্বোধ্য রঙটা যে ঠিক কি, বুঝবার উৎসাহ পর্যন্ত নেই।

সোনিয়া ভাবছিল।

খানিকটা পর চান্নু সিং তাকে নিতে আসবে। মঙ্গলবার শাদীর প্যারিড হয়ে গিয়েছে। চান্নু বলে গিয়েছিল, আজ ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসবে। নয়া কাপড়া আনবে, সোনার টিকুলি আনবে, রূপার কাঙনা (বালা) আনবে, মল আনবে, গুজরিপঞ্চম আনবে, হার আনবে। খুসবুওয়ালা তেল আনবে। একেবারে শাদীর দুলহানটি সাজিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে তাকে ডেপুটি কমিশনারের অফিসে নিয়ে যাবে। সেখানে গুরুজীর নামে কসম নিয়ে ছাপানো কাগজে (ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম্) বুড়ো আঙুলের টিপছাপ মেরে শাদীটা পাকা করে নেবে।

আজ সোনিয়ার শাদী।

দিল ঠিক বশে নেই সোনিয়ার। আজ যে চান্নু সিংএর সঙ্গে তার শাদী —এ কথা ভেবেও তেমন ফুর্তি হচ্ছে না।

যে নারী কোতল করে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছে, তার দিল বড় বিচিত্র বস্তু! চান্নুর সঙ্গে তার শাদী হবে, সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় আর তাকে আটক থাকতে হবে না, পুরানো দিনের মত আবার সে ঘর পাবে, সংসার পাবে, একান্ত অনুগত একটি পুরুষ পাবে। সেই মঙ্গলবার শাদীর প্যারিড হয়েছে, আজ আর এক মঙ্গলবার। মাঝখানে পুরা সপ্তাহটা নয়া শাদীর কথা ভেবেছে সোনিয়া, চান্নু সিংএর কথা ভেবেছে। এত ভেবেও দিলে সুখ নেই। অবুঝ এক ব্যথা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ব্যথাটা যে কেন, সঠিক বুঝে উঠতে পারে না সোনিয়া।

যতবার নতুন শাদীর কথা ভেবেছে সোনিয়া, ততবার সেই বেদরদী মানুষটাকে মনে পড়ে গিয়েছে। সেই রামদেও তিওয়ারী। রামদেও-এর হাত থেকে এতদূর এসেও নিস্তার মিলছে না। অসহ্য আকণ্ঠ এক যন্ত্রণার মত তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে লোকটা।

খানিকটা পর গাড়ি নিয়ে আসবে চান্নু সিং।

সোনিয়া ভাবল, সে যাবে না। হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে

রামদেও তিওয়ারীর ভাবনা যতই তাকে বিঁধুক, সবই সে সইবে। যে গুনাহ্ সে করে এসেছে, তার পুরা সাজা সে নেবে।

সোনিয়া ঠিক করে ফেলল, চান্নু সিংএর সঙ্গে সে কিছুতেই যাবে না। গাড়ি ফিরিয়ে দেবে। শাদীর প্যারিডে সে রাজীবাজী হয়েছিল। আজ সেই রাজীবাজী খারিজ করে দেবে।

পাশ থেকে ফিস ফিসানি শোনা গেল, 'এ সোনিয়া—'

চমকে ঘুরে বসল সোনিয়া। দেখল, টিণ্ডালান রামপিয়ারী তার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। দুজনের মধ্যে আধ হাতের ফারাকও নেই।

আগের মতই ফিস ফিস করে ডাকল রামপিয়ারী, 'এ সোনিয়া—'

সোনিয়া জবাব দিল না। তার অন্তরাত্মাটা শিউরে উঠেছে।

রামপিয়ারী আবারও ডাকল, 'এ শালী, খচরী—'

মুখটা ফাঁক হয়ে গেল সোনিয়ার। অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল, 'হাঁ—'

'শালী রেণ্ডি মাগী—এক জনে তোমার মন ওঠে না। বিশজন মরদ না হলে তোমার সুখ নেই। ঢেমনী, কুত্তী!'

সোনিয়ার গলাটা ধরে এক টানে তাকে নিজের দিকে আনল রামপিয়ারী। মাঝখানের আধ হাত ফারাকটা এখন আর নেই।

রামপিয়ারী ফুঁসে উঠল, 'এ সোনিয়া, সাতটা দিন তাকে তাকে রয়েছি। সুবিধে করে তোকে ধরতে পারছি না। ঐ ঢেঙী খচরী হারামীর বাচ্চী হাবিজাকে পাহারাদারনী রেখেছিলি। এইবার বাপের শাদী মায়ের নিকাহ্ এক সাথ দেখিয়ে ছাড়ব।'

যে দিন প্রেমার খানা ছিনিয়ে খেয়ে তার চোয়াল ফাটিয়ে রেণ্ডিবারিক কয়েদখানার সবগুলো টিণ্ডালান আর পেটি অফিসারনীর সঙ্গে একাই যুঝেছিল হাবিজা, সে দিন থেকেই মেম জেলার তাকে পেটি অফিসারনী করে দিয়েছে। আর সেদিন থেকেই রামপিয়ারীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সোনিয়াকে পাহারা দিচ্ছে হাবিজা। এই ক'দিন সোনিয়ার কাছে ঘেঁষতে পারে নি রামপিয়ারী। হাবিজার দাপটে সোনিয়ার কাছে ঘেঁষার উপায়ও ছিল না।

রামপিয়ারী দাঁতে দাঁত ঘষল। পাতাহীন গোল গোল চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে। চাপা খ্যাসখেসে গলায় সে ডাকল, 'এ সোনিয়া—'

'হাঁ—' সোনিয়ার স্বর ফোটে কি ফোটে না।

'তা হলে চান্নুকেই তুই শাদীই করবি?'

একটু আগে সোনিয়া ঠিক করেছিল, চান্নুর গাড়ি সে ফিরিয়ে দেবে। রামদেও তিওয়ারীর অসহ্য ভাবনা নিয়ে এই সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় তামাম জীবন সে সাজা খাটবে। কিন্তু এই মুহূর্তে রামপিয়ারীকে দেখতে দেখতে আগের সেই মতটা বদলে ফেলল সোনিয়া। চান্নু সিংএর সঙ্গেই সে আজ চলে যাবে। জান বাঁচাতে হলে না গিয়ে কোন গতি নেই।

রামপিয়ারী খেঁকিয়ে উঠল, 'চান্নুর সাথ তা হলে আজ যাবি ?'

সোনিয়ার মুখ থেকে শব্দটা ছুটে গেল, 'হাঁ—'

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না রামপিয়ারী। বিস্ময়ে মুখটা ফাঁক হয়ে বিরাট একটা হাঁ হয়ে আছে। পাতাহীন চোখের তারাদুটো স্থির হয়ে জ্বলছে।

রামপিয়ারী বুঝেই উঠতে পারছে না, তার মুখের উপর কথা বলার মত এতখানি সাহস কোথায় পেল সোনিয়া ?

সোনিয়া বিড় বিড় করে বলতে লাগল, 'জরুর যাব।'

'শালী !'

সাপের মত হিসিয়ে উঠল রামপিয়ারী। সাপের মতই পাতাহীন চোখ-দুটো ঝিক ঝিক করতে লাগল।

হঠাৎ এক জেদে পেয়ে বসল সোনিয়াকে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই সোনিয়াকে নিতে আসবে চান্নু সিং। এখন আর রামপিয়ারীকে ডরায় না সোনিয়া। ভয়ডর তার ঘুচে গিয়েছে। এতদিন রামপিয়ারীর সামনে পড়লে বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠত, মুখে কথা জোগাত না।

রামপিয়ারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কথাটা বলার সাহস কোনদিনই হত না, এই মুহূর্তে সেই কথাটাই কত সহজে বলতে পারল সোনিয়া, 'জরুর যাব, নইলে তুমিই আমাকে খতম করবে টিণ্ডালান।'

রামপিয়ারী দাঁতে দাঁত চাপল, 'হারামীকা বাচ্চী—'

সোনিয়া মরীয়া হয়ে উঠল, 'সাধে কি আর এতোয়ারী বহীন তোমাকে ও কথা বলে ?'

'কী বলে কুত্তীটা ?'

'তুমি না কি আওরত না, দুসরা কিছু !'

রামপিয়ারীর দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছে না। গলার শিরগুলো

পাকিয়ে পাকিয়ে জেঁাকের মত ফুলে উঠেছে। আঁখ ফেটে যেন খুন ছুটবে। অদম্য, অসহ্য রাগটাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছে না রামপিয়ারী। ফোঁস ফোঁস করে গরম নিশ্বাস পড়ছে।

রামপিয়ারী খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি আওরত না তো কী?'

'তুমি যে কী, তা তুমিই জানো।'

এর পর অনেকটা সময় কেউ আর কিছু বলল না। পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য! অন্য অন্য দিন রামপিয়ারীর পাতাহীন চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারত না সোনিয়া। কিন্তু আজ যেন তার কি হয়েছে! কোথা থেকে খানিকটা দুঃসাহস যেন তার উপর ভর করে বসেছে।

হঠাৎ রামপিয়ারী বলল, 'তোর কাছে একটা সিধা জবাব চাই।'

'কিসের জবাব?'

'চান্নুর সাথ তুই তা হলে যাবিই?'

'জরুর।'

'কয়েদখানার বাইরে না গেলে তোর সুবিস্তা হবে কেন কুত্তী। বাইরে যেতে পারলেই তো কত মরদ জুটবে। মাগী রেণ্ডি কাঁহাকা!'

সোনিয়া রুখে দাঁড়াল, 'হোঁশিয়ার হয়ে কথা বলবে টিণ্ডালান। গালি দেবে না বলছি। ভাল হবে না।'

'শালী, তিন রোজের ছোকড়ি, আমাকে হোঁশিয়ার করছে। অনেক সয়েছি, আর না। জান আজ তোর তুড়ব।' রামপিয়ারী সমানে চিল্লাতে লাগল, 'রেণ্ডিবারিক কয়েদখানায় যখন এসে ঢুকেই পড়েছিস, আর আমার দিল যখন তোর জন্যে মজেই বসেছে তখন আর এখান থেকে জান নিয়ে বেরুতে দেব না। চান্নু সিং তোকে নিয়ে মজা লুটবে, তা হবে না।'

একটু যেন ভয়ই পেল সোনিয়া। কাঁপা গলায় বলল, 'করবে কী?'

'দ্যাখ মাগী কী করি!'

বলতে বলতে দুই থাবায় সোনিয়ার চুলের মুঠি বাগিয়ে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলল রামপিয়ারী।

সোনিয়া বলল, 'আমাকে মেরো না টিণ্ডালান।'

'মারব না কী লো মাগী! না মারলে তুই কী সজুত থাকবি! চান্নুর জন্যে তোর দিল বিগড়েছে। না পেটালে তোর বিগড়ানো দিলটা কী আমার দিকে ঝুঁকবে?'

সোনিয়া সমানে চিল্লায়, 'মেরো না, মেরো না—'

এবার আর জবাব দেয় না রামপিয়ারী। এক হাতে সোনিয়াকে মাটির উপর ঠেসে রাখে। অন্য হাতে পাশ থেকে এক টুকরো কাঠ যোগাড় করে নেয়। তারপর সোনিয়ার মুখে-মাথায়-পিঠে—সমস্ত দেহে কাঠের টুকরাটা দিয়ে একটার পর একটা ঘা মেরে যায়।

প্রথমে দুই হাত বাড়িয়ে কাঠের টুকরাটা ঠেকাচ্ছিল আর চেঁচাচ্ছিল সোনিয়া, 'মেরে ফেলল, মেরে ফেলল—জান চৌপট করে দিল।'

চারপাশ থেকে কয়েদিনীরা ছুটে এসেছিল। কিন্তু টিণ্ডালান রামপিয়ারীর সেই ভয়ানক খাণ্ডার মূর্তির দিকে চেয়ে কেউ এগিয়ে এল না।

নাক মুখ ফেটে রক্ত ঝরছে। এতক্ষণ দু হাতে মার ঠেকাচ্ছিল সোনিয়া। এখন হাত দুটো ঝুলে পড়েছে। এতক্ষণ চেঁচাচ্ছিল। এখন গলা বেয়ে অস্ফুট একটা গোঙানি উঠে আসছে।

কাঠের টুকরাটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে রামপিয়ারী বিড় বিড় করে বলল, 'হারামীর বাচ্চী, চান্নুর কাছে যাবে! যা না শালী—'

ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের ভাঙা ভাঙা ধারাল নখটা সোনিয়ার মাংসল হাতে গিঁথে একটা ঠেলা মারল রামপিয়ারী।

সোনিয়ার হুঁশ নেই। জ্ঞান হারিয়ে গোঁ গোঁ করে গোঙাচ্ছে।

এবার এক কাণ্ড করে বসল রামপিয়ারী। সোনিয়ার নরম নধর দেহটা পাঁজা কোলে করে বুকের উপর তুলে নিল। তারপর ছুটতে ছুটতে জেলের হাসপাতালে চলে গেল। নিজের হাতে রক্ত ধুয়ে, ঘা সাফ করে ওষুধ লাগাল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধল। এদিক ওদিক তাকিয়ে যখন বুঝল ধারে কাছে কেউ নেই, তখন এক দমে সোনিয়ার মুখে গোটা বিশেক চুমু খেয়ে বলল, 'তোকে কত পেয়ার করি, তা তুই বুঝিস না ছোকড়ি। তোকে নিজের কাছে সারা জিন্দগী রাখতে চাই বলেই তো এমন করে মারলাম।'

বেহুঁশ সোনিয়ার কাছ থেকে জবাব মিলল না।

বিচিত্র মন রামপিয়ারীর! সে মন সর্পিল পিচ্ছিল এবং অন্ধকার গলি ঘুঁজিতে অবিরাম ছুটে বেড়ায়।

রামপিয়ারীর মনে কী আছে, কে বলবে?

খানিকটা পর সূর্যটা যখন সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে, ঠিক তখনই

সাউথ পয়েন্ট জেলখানার ফটকে চান্নু সিংএর ঘোড়ার গাড়ি থমকে পড়ল। কোচোয়ান রাশ টেনে ঘোড়া থামাল।

চান্নু সিংএর দিলে আজ বেজায় ফুর্তি। সোনিয়ার মত খুবসুরতী জওয়ানী পাবে। সোনিয়াকে পাবার নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে চান্নু সিং।

সোনিয়ার জন্য গুজরিপঞ্চম এনেছে, মল এনেছে, হার এনেছে, কাঙনা এনেছে। রেশমী শাড়ি, সিলওয়ার আর কাঁচুলি এনেছে চান্নু সিং। গারাচারামা গাঁও-এ একখানা সরকারী ঘর ভাড়া করে এসেছে। সোনিয়াকে নিয়ে সেখানেই তুলবে, এমন একটা ইচ্ছা আছে চান্নুর মনে।

রেণ্ডিবারিক কয়েদখানার ফটকে পারমিশন কার্ড দেখিয়ে ভিতরে ঢুকল চান্নু সিং। একটু পর যখন সে বেরিয়ে এল, তখন তার জবরদস্ত বিরাট চেহারাটা একেবারে চুপসে গিয়েছে। টলতে টলতে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে পড়ল চান্নু সিং। ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ উঠল। ভাঙা ভাঙা পাথুরে সড়কে ছুটো ঘোড়া প্রাণপণে গাড়ি টানতে লাগল। গাড়িটা সিসোস্ট্রেস উপসাগরের পার ধরে এবারডীন বাজারের দিকে চলে যাচ্ছে।

একলাই ফিরে গেল চান্নু সিং। সোনিয়া তার সঙ্গে আসে নি। রামপিয়ারীর মার খেয়ে হাসপাতালে সেই যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে সোনিয়া, এখন পর্যন্ত জ্ঞান ফেরে নি।

ছত্রিশ

যাযাবর পাখিরা মানস সরোবরে ফিরে গিয়েছে। আন্দামানের আকাশে এখন তাদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে রাশি রাশি মৌসুমী মেঘ আন্দামানের আকাশে উড়ে এসেছিল। সেই মেঘগুলি জমাট বেঁধে অনড়, নিশ্চল হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে আকাশজোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় ঘা পড়ছে। গুর গুর আওয়াজে মেঘ ডাকে। সমুদ্রের অতল তলা থেকে একটা সোঁ সোঁ গম্ভীর গর্জন ঠেলে বেরিয়ে আসে। আকাশ আর সমুদ্র একযোগে শাসাতে থাকে।

দ্বীপে বসন্ত এসে পড়েছে। বছরের শেষ ঋতুটা কারসাজি করেছে, পৃথিবীর যেখানে যতটুকু মাটি আছে, সব ভেঙেচুরে রসাতলে পাঠিয়ে দেবে।

মোট দু-শ চারটে দ্বীপ। একটানা বিপুল জলরাশির মধ্যে টুকরা টুকরা ভূখণ্ডগুলি ক্ষীণ প্রতিবাদের মত মাথা তুলে রয়েছে। বছরের শেষ ঋতুতে প্রকৃতি হঠাৎ ক্ষেপে উঠে মতলব করেছে, এই প্রতিবাদগুলোকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবে। আকাশ-ভরা জমাট মেঘে আর ফুলে ফুলে ওঠা বিশাল সমুদ্র জুড়ে ধ্বংসের আয়োজন চলছে।

সিকমেনডেরা (হাসপাতাল) থেকে পিনিকের ব্যারাম সারিয়ে এসে দিনকতক সড়ক বানানোর কাজ করল লখাই।

সড়ক বানাবার পর রম্বাস ছেঁচার কাজ পেল লখাই। রম্বাস হল এক ধরনের বিষাক্ত বন্য উদ্ভিদ। পুরু এবং দীর্ঘ একটি ডাঁটার মত। রম্বাসের সবুজ ডাঁটাটি বিষের রসে সরস এবং পুষ্ট হয়ে থাকে। যে সব কয়েদী তুখোড় হারামী, তাদের রম্বাস ছিঁচতে দেওয়া হয়। রম্বাসের উপর মুগুরের ঘা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত রস ছিটকে কয়েদীর সারা শরীরে লাগে। যেখানে রম্বাসের রস লাগে, সেখানে দগদগে ঘা হয়ে যায়।

পেটি অফিসার নসিমুল গণি ভেবে রেখেছিল, লখাইকে সেলুলার জেলের মহিমা টের পাইয়ে দেবে, বুঝিয়ে দেবে দরিয়ায় কত পানি। সে কথা ভোলে নি সে।

দিন তিনেক রম্বাস ছিঁচল লখাই। সারা শরীরে ঘা হল।

এর পর হুইল ঘানিতে জোড়া হল লখাইকে। রোজ ঘানি ঘুরিয়ে পুরা পনের পাউণ্ড সরষের তেল বার করতে হয়।

জের বার হয়ে যাবার উপক্রম হল লখাইর। শরীরটা ভয়ানক কাহিল হয়ে পড়েছে। লোহার বিরাট ঘানিটা টানতে টানতে এক এক সময় মনে হয়, বুকটা ফেটে প্রাণটা বেরিয়ে পড়বে। তখন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করে।

সড়ক পিটিয়ে, রম্বাস ছেঁচে আর হুইল ঘানি টেনে দিনগুলো কোনক্রমে পার করে দিচ্ছিল লখাই।

হঠাৎ একদিন সকালে ছুটতে ছুটতে পেটি অফিসার লখাইর কুঠুরিতে এল। হুইল ঘানি টানতে যাবার জন্য তৈরী হয়ে বসে ছিল লখাই।

মুলাইম স্বরে পেটি অফিসার বলল, 'আজ থেকে তোকে আর হুইল ঘানি টানতে হবে না লখাই। জেলার সাহেব তোর ওপর মেহেরবানি করেছে।'

বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল লখাই।

পেটি অফিসার নসিমুল বলল, 'আ বে মুরুখ, আজ থেকে ফরেস্টের কাজে যাবি। ফরেস্টের কাজে বহুত মজা। কাজ কম, আরাম বেশি।'

'হুঁ।' অস্ফুট একটা শব্দ করল লখাই।

'জবাবদারির কাম মিলবে।'

'হুঁ।'

'তলব (মাইনে) মিলবে।'

'হুঁ।'

'নসীব তোর বড় আচ্ছা। পয়লাই কেউ জবাবদারির কাজ পায় না জেলার সাহেব তোর ওপর মেহেরবানি করেছে।' একটু থামে পেটি অফিসার পাকানো সূঁচালো গোঁফে চাড়া মারে। ধূর্ত চোখে লখাইর ভাবগতিক লক্ষ করে। তারপর আবার শুরু করে, 'তোকে কত পেয়ার করি লখাই জেলার সাহেবকে খুশামোদ করে তোকে এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছি।'

পেটি অফিসারের খিস্তি আর ডাণ্ডার গুঁতো খেতেই কয়েদীরা অভ্যস্ত তার মুখে এমন তোয়াজ আর তোষামুদির কথা কেমন যেন বেসুরো শোনায় মনটা ভয়ানক সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে লখাইর। তাকে ফরেস্টের কাজে পাঠিয়ে পেটি অফিসার নসিমুল গণি কোন দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিল করতে চায়, কে বলবে ?

পেটি অফিসার আবার বলে, 'ফরেস্টে চলে যা লখাই। এমন সুযোগ

এ জিন্দগীতে আর পাবি না। এখন গেলে এক মাস কয়েদ খেটেই 'আন্দামান রিলিজ' পেয়ে যাবি।'

এখানে নয়া কয়েদীদের দু মাস বিশ দিন সেলুলার জেলে আটক থাকতে হয়। তারপর ছাড়া পেয়ে তারা 'বিজন' কি 'টাপু'তে অর্থাৎ কয়েদী ব্যারাকে আসে। কেউ কেউ ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজে জঙ্গলের 'বীটে' চলে যায়।

দু মাস বিশ দিন পর কয়েদীরা ছাড়া পায়। এই ছাড়া পাওয়ার নাম আন্দামান রিলিজ'। 'আন্দামান রিলিজ' পেলে টিণ্ডাল আর পেটি অফিসাররা কথায় কথায় ডাণ্ডা হাঁকাতে পারে না। কয়েদীদের চলাফেরা, আচার আচরণের উপর যে বাধা আর নিষেধের কড়াকড়ি থাকে, তার খানিকটা শিথিল করে দেওয়া হয়।

'আন্দামান রিলিজ' মানে সাজা থেকে রেহাই পাওয়া নয়। 'টাপু' কি বিজন'ও এক ধরনের কয়েদখানা। তবে 'টাপু' কি 'বিজনে' এলে কয়েদীরা খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

'আন্দামান রিলিজ' পেয়ে সেলুলার জেলের বাইরে এসে কয়েদীরা যাবেই বা কোথায়? জঙ্গলে ঢুকলে হিংস্র জংলীরা তীরের ফলায় জান নেবে। সমুদ্রে নামলে হাঙরেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, অক্টোপাসেরা আটটা বিষাক্ত শুঁড়ের চাপে পিষে মারবে।

তবু টিণ্ডাল পেটি অফিসারদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে কয়েদীরা আন্দামান রিলিজে'র জন্য একটি একটি করে দিন গোনে। উন্মুখ হয়ে থাকে।

সারা রাত্রি এক দণ্ড ঘুমাতে পারল না লখাই। খালি ভাবল। মাথার ভিতর অসংখ্য চিন্তা জটলা পাকাল, তোলপাড় করল, দাপাদাপি করে বেড়াল।

লখাইর মাথাটা গরম হয়ে উঠল।

শেষ রাত্রে উপসাগর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে এসে মাথাটা জুড়িয়ে দিল।

পুরা রাত্রিটা ভেবে ভেবে লখাই ঠিক করে ফেলল, ফরেস্টের কাজেই যাবে। ফরেস্টের কাজে যত দুর্ভোগই থাক, সেখানে অন্ততঃ টিণ্ডাল পেটি অফিসার নেই। সেখানে রস্বাস ছেঁচা কি হুইল ঘানি টানার ঝামেলা নেই।

হঠাৎ সোনিয়ার কথা মনে পড়ল। লখাই ভাবল, 'আন্দামান রিলিজ' তাকে পেতেই হবে।

সাঁইত্রিশ

কাল বিকালে ফরেস্টের কাজে এসেছে লখাই। একরকম তোষামোদ করেই পেটি অফিসার নসিমুল গণি তাকে ফরেস্টে পাঠিয়েছে।

সেলুলার জেল থেকে বেরুবার একটা সুযোগ মিলেছে। সুযোগটা পাওয়া মাত্র পুরাপুরি কাজে লাগিয়েছে লখাই।

শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মাইল বিশেক দূরে এই জায়গাটা; যার নাম তুষণাবাদ। এই তুষণাবাদেই ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের 'বীট' বসেছে।

'বীট' অর্থে বেতপাতার চাল, বাঁশের বেড়া আর বাঁশের পাটাতনের গুটিকতক ঝুপড়ি। ফরেস্ট গার্ড, জবাবদার আর কুলীদের সাময়িক আস্তানা।

তুষণাবাদ অঞ্চলে ইদানীং জঙ্গল 'ফেলিং' অর্থাৎ বন কাটা শুরু হয়েছে। অরণ্য সংহার করে মানুষ মাটির দখল নেবে। এখানে গড়ে উঠবে গাঁও, কুঠিবাড়ি, ক্ষেতিবাড়ি—পুরাদস্তুর একটি বন্দী উপনিবেশ, সরকারী পরিভাষায় যার নাম 'পেনাল কলোনি'।

কত কালের এই আন্দামান দ্বীপ! কবে যে বঙ্গোপসাগরের অথৈ অতল থেকে এই দ্বীপ মাথা তুলেছিল, ইতিহাসের নজর সেখানে পৌছায় না।

হাজার হাজার বছর ধরে ইতিহাস জন্মের বহুকাল আগে থেকে এই দ্বীপ অরণ্যের ঘাঘরায় লজ্জা ঢেকে আসছে।

আন্দামানের অরণ্য; জটিল, কুটিল, ভয়ঙ্কর। কত কাল ধরে কত বনস্পতি এখানে মাথা তুলেছে। দিনে দিনে অরণ্যের সংসার বেড়েছে। এই দ্বীপপুঞ্জ যেদিন বিপুল সমুদ্র ফুড়ে মাথা তুলেছিল, সেদিন এদের দখল নেবার জন্য দ্বিতীয় কোন দাবীদার জোটে নি, হয়ত সেদিন থেকেই আষ্টে পৃষ্ঠে শিকড়ে বাকড়ে জড়িয়ে ধরে অরণ্য এই দ্বীপে তার দখল কায়েম করেছে।

সেই অরণ্য 'ফেলিং' শুরু হয়েছে।

কাল তুষণাবাদ এসেছে লখাই। মাঝখানে একটা দিন পার হয়ে গিয়েছে।

এখন যাই-যাই বিকাল। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। জঙ্গলের ওপাশে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিরাট বিরাট প্যাডক আর গর্জন গাছগুলির মাথায় ম্লান, বিষণ্ণ একটু আলো আটকে রয়েছে।

জবাবদার, ফরেস্ট গার্ড, কুলী—এখানে সবাই কয়েদী। দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে সবাই কালাপানির কয়েদ খাটতে এসেছিল।

কয়েদীরা জঙ্গল সাফ করে উপনিবেশ বানাচ্ছে।

সাজার মেয়াদ ফুরাবার পর কয়েদীরা ঘরসংসার পাতবে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে। আগে থেকেই জঙ্গল নির্মূল করে তার ভূমিকা করে রাখা হচ্ছে।

আন্দামানের উপনিবেশ বাড়ছে।

ফরেস্টের কাজে এসে প্রথমেই 'পারমোশ' (প্রোমোশান) পেয়েছে লখাই। কুলী নয়, একেবারে জবাবদার হয়ে বসেছে।

কুলীরা বিচিত্র স্বর আউড়ে আউড়ে করাত চালাচ্ছে, 'হেঁই-হেঁই-হেঁইও—'

'হেঁই-হেঁই-হেঁইও—'

বিরাট একটা পেমা গাছের ডালপালা ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে। এখন কুলীরা মূল গুঁড়িটায় করাত চালাচ্ছে।

কুলীদের বিচিত্র স্বর ছাপিয়ে মাঝে মাঝে জবাবদারের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, 'হুদি-হুদি-হুদি—'

সঙ্গে সঙ্গে বন বিভাগের হাতীরা বোঙা (গাছের গুঁড়ি) ঠেলতে ঠেলতে একপাশে স্তূপাকার করতে থাকে।

পুরা একটা টহল মেরে ঝুপড়িতে ফিরে এল লখাই।

মাসখানেক ধরে ভুষণাবাদে 'ফেলিং' শুরু হয়েছে। খানিকটা জায়গা সাফ করে ফেলা হয়েছে। সাফ অংশটুকুর পরই আবার জঙ্গল; দুর্ভেদ্য, দুর্বোধ্য, জটিল। সেই জঙ্গল ফুঁড়ে পৃথিবীর আলো ঢোকে না। সেই জঙ্গল বিঁধে মানুষের নজর ভিতরে পৌছায় না।

দক্ষিণ আন্দামানের এই ছায়াগভীর অরণ্যে কিং কোব্রা আর সরীসৃপের চোখে জ্বলন্ত ফসফরাস ছাড়া কোন আগুনই নেই। পেমা গাছের অন্ধকার কোটরে পেঁচার চোখ ধক ধক করে। স্যাঁতসেঁতে পিছল মাটিতে বিষাক্ত কানখাজুরার পাল পেট টেনে টেনে চলে। জঙ্গলের মাথা থেকে ঝুপ করে জোঁকের দলা পড়ে। এই প্রথম তারা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে।

আর আছে জারোয়া। ঝোপের আড়াল থেকে হয়ত একটা কালো কুচকুচে মুখ দেখা দিয়ে হঠাৎই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। হ্যাঁ, মানুষেরই

মুখ। উলঙ্গ, অসভ্য, বর্বর মানুষ। এরাই আন্দামানের আদি বাসিন্দা। নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন, আন্দামানের এই অসভ্য জাতিটি পৃথিবীর আদিমতম জাতিগুলির অন্যতম।

কালো কালো, খর্বাকৃতি এই 'নেগ্রীটো' জাতের মানুষগুলি তুমি, আমি কি আর দশজন ভদ্র মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজেদের হাজার মাইল দূরে সরিয়ে রেখেছে। মনে হয়, পৃথিবীর প্রথম অরণ্য দক্ষিণ আন্দামানের এই ভুষণাবাদেই জন্মেছিল। আর এই অরণ্য দিনে দিনে দুর্ভেদ্য হয়ে পৃথিবীর আদিম সন্তানদের আশ্রয় দিয়েছে, সভ্যতার সব আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছে। সভ্যতার আলো কোনদিন তাদের নাগাল পায় না।

সেই অরণ্য নির্মূল করা হচ্ছে।

ঝুপড়ির সামনে বসে জঙ্গলের দিকে তাকাল লখাই। দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মাথার মধ্যে এক রাশ ভাবনা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

এখানে জবাবদারির কাজ পেয়েছে। কুলী খাটানো, হাতী খাটানো, জঙ্গল পোড়াবার সময় তদারক করা—এই সব হল জবাবদারির কাজ। এ কাজে ঝামেলা কম, মেহনত কম, তখলিফ কম। তবু পেটি অফিসার কেন যে তাকে জঙ্গলে পাঠিয়েছে, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না লখাই।

রোদ মরে আসছে। জঙ্গলের মাথায় ম্লান আলোটুকু নিবে যাচ্ছে। দক্ষিণ আন্দামানের এই অরণ্য একটা ধূসর পর্দার নীচে হারিয়ে যেতে বসেছে। সমস্ত আকাশ জুড়ে সাদা কুয়াশার একটি চিকন রেখা দেখা দিয়েছে।

লখাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না, জঙ্গলে এই আরামের নোকরিতে পাঠিয়ে পাঠান পেটি অফিসার কোন দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিল করতে চায় ?

পেটি অফিসারের কথাই ভাবছিল লখাই। আর দেখছিল, রোদের তাপ জুড়িয়ে দিয়ে সব আলোটুকু নিবিয়ে বিরাট একটা কারসাজি করেই যেন বিকালটা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠল লখাই।

সারি সারি অনেকগুলো ঝুপড়ি। তাদের একটার মধ্যে থেকে গোঙানির শব্দ আসছে। থেমে থেমে টেনে টেনে অনেকক্ষণ পর পর কে যেন কাতরে

উঠছে। করুণ, বিষণ্ণ অথচ ভয়ানক সেই কাতরানির শব্দ কোন ঝুপড়িটা থেকে যে উঠে আসছে, ঠিক করতে পারছে না লখাই।

কিছুক্ষণ কান খাড়া রাখল লখাই। শুধু কাতরানির শব্দই নয়, লখাইর মনে হল, দুর্বোধ্য ভাষায় কে যেন বিড় বিড় করে বকছে আর অনেকক্ষণ পর পর গোঙাচ্ছে। অদ্ভুত এক বিলাপের মত শোনাচ্ছে। চারপাশের নিঝুম জঙ্গলে বিলাপের রেশটা ছড়িয়ে পড়েছে।

তুষণাবাদের এই জঙ্গলে কালই এসেছে লখাই।

এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের এই 'বীটে' সারি সারি অনেকগুলো ঝুপড়ি। নিজের ঝুপড়িটা ছাড়া অন্য কোন ঝুপড়িতে এখনও ঢুকে দেখে নি লখাই।

লখাই উঠে পড়ল। খুঁজে খুঁজে 'বীটে'র শেষ মাথায় এল।

এটাই 'বীটে'র শেষ ঝুপড়ি। গোঙানিটা এখান থেকেই আসছে।

ঝুপড়িটা আশ্চর্য রকমের ছোট এবং নীচু। সামনের দিকে একটা ফোকর ছাড়া আলো এবং বাতাস চলাচলের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

ফোকরটা সুড়ঙ্গের মত। এক রকম হামাগুঁড়ি দিয়েই ভিতরে ঢুকল লখাই।

এক পাশে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের কাচ যে কতকাল সাফ করা হয় নি, কে তার হদিস দেবে? ফলে লণ্ঠন থেকে যত না আলো পাওয়া যাচ্ছে, তার চেয়ে ঢের বেশী পাওয়া যাচ্ছে ধোঁয়া। ঘোলাটে অনুজ্জ্বল খানিকটা আলো এবং প্রচুর ধোঁয়ায় ঝুপড়ির ভিতরটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকে। এখানে দম আটকে আসে। এখানে কিছুই স্পষ্ট নয়।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা স্বর শোনা গেল, 'কোন? কোন রে?'

আতিপাঁতি করে খুঁজে ঝুপড়ির এক কোণে একটা দড়ির খাটিয়া দেখতে পেল লখাই। খাটিয়ার উপর এক জোড়া জ্বলন্ত, তীব্র চোখের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

এক পা এক পা করে খাটিয়াটার কাছে এগিয়ে এল লখাই। দেখল, বেঁটে আকারের একটা কঙ্কাল খাটিয়ার উপর চিত হয়ে রয়েছে। কঙ্কাল হয়ত ঠিক নয়, মাংসহীন হাড়ের উপর ঢিলা চামড়া আঁটা একটা দেহ। দেহটা শুকিয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। কিন্তু এই শীর্ণ, শুকনা দেহে আশ্চর্য দুটো চোখ এখনও টিকে আছে। চাপা, কুতকুতে চোখজোড়া অস্বাভাবিক তীব্র এবং অন্তর্ভেদী।

লখাইর মনে হল, খাটিয়ার উপর থেকে চোখ দুটো তার বুকের মধ্যে সিধা ঢুকে গিয়ে তন্ন তন্ন করে সব কিছু দেখে নিচ্ছে।

খাটিয়ার লোকটা বলল, 'তুই কৌন? কেন ঢুকেছিস আমার ঝুপড়িতে? মজা দেখতে? আমি খতম হয়ে যাচ্ছি আর তুই—'

হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল লোকটা। শীর্ণ দেহ নিঙড়ে অতি দুর্বল, ক্ষীণ একটি গোঙানি ছাড়া কিছুই বেরুল না। লোকটা বিড় বিড় করে গালি দিতে লাগল, 'শালে, কুত্তার বাচ্চে, হারামীর বাচ্চে, কেউ বাঁচবে না। এই আন্দামানবালা সবাই লোপাট হয়ে যাবে। আমাকে এখানে এনে বুখার দিয়ে খতম করছে শালেরা!'

কাশির একটা দমক এল। শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে গেল। চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। কাশতে কাশতে উঠে বসল লোকটা। কিছুতেই কাশিটাকে বাগে আনতে পারছে না।

ঝুপড়ির আবছা রহস্যময় আলোতে লোকটাকে অমানুষিক দেখাচ্ছে। এই মুহূর্তে লখাইর বুকের মধ্যটা ছম ছম করে উঠল।

কেশে কেশে অনেক ক্ষণ পর ধাতস্থ হল লোকটা। কুত্তার মত জিভ বার করে টেনে টেনে হাঁপাতে লাগল। তারপর বকতে শুরু করল, 'কেউ জীন্দা থাকবে না, এংরাজলোক সবাইকে এখানে এনে মারবে। হাঁ—তুই দেখিস—'

হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরল। কেশে কেশে হয়রাণ হয়ে পড়েছিল। বুকে হাতের চাপ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের মারাত্মক লাফালাফিটাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

ধুঁকতে ধুঁকতে লোকটা আবার বলল, 'তুই কে?'

'আমি জবাবদার লখাই।'

'লখাই! তুই এখানে!'

লোকটা যেন চমকে উঠল।

লখাই অবাক হয়ে গিয়েছে। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোতে লোকটাকে চিনতে পারা যাচ্ছে না। কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারছে না, কোথায় কবে এই লোকটাকে সে দেখেছিল? কেমন করে এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল?

লোকটা আবার বলল, 'আমাকে চিনতে পারছিস না লখাই! আমি মণ্ড চো।'

'মঙ চো!'

'হাঁ। তোর ইয়াদ নেই? এক সাথ এক জাহাজে আমরা কালা পানির কয়েদ খাটতে এসেছিলাম।'

'আঁই হারামী, তুই মঙ চো!'

'হাঁ হাঁ জরুর।'

দুটো সমস্যার কোন সুরাহাই করে উঠতে পারছে না লখাই। সঠিক সমাধানে পৌছতে পারছে না।

প্রথমত, আন্দামানের কয়েদখানায় যখন তারা দ্বীপান্তরী সাজা খাটতে আসে, তখন এই বর্মী হারামীটা দরিয়া দেখে ভয়ে কাঁদছিল। লখাইর কনুইর গুঁতো খেয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় হাউ মাউ করে কি যে বলেছিল, লখাই বোঝে নি। বর্মা মুলুকের ভাষাটা ছাড়া দুনিয়ায় অন্য কোন ভাষার যে চল আছে, দু মাস আগেও তা জানত না মঙ চো। আশ্চর্য, সেই মঙ চো-ই দু মাসে আন্দামানী হিন্দুস্তানী বুলি পুরাপুরি রপ্ত করে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত, এলফিনস্টোন জাহাজের চার নম্বর হ্যাচের উপর বসে যে মঙ চো কাঁদছিল, সে এক তাগড়া বর্মী জোয়ান। তার চওড়া কাঁধে, পেশল বুকে, মাংসল দেহে অফুরন্ত শক্তির আভাষ। তার মোঙ্গল সুলভ পীতাভ রঙে, খাড়া হনুতে অদ্ভুত এক কাঠিন্য ফুটে ছিল। এলফিনস্টোন জাহাজের সেই মঙ চো আর এই মঙ চো-র মধ্যে কত তফাত! কিছুতেই দুই মঙ চো'কে এক করে মেলাতে পারছে না লখাই।

লখাই বলল, 'তোর হাল এমন হল কেন মঙ চো?'

'ব্যারামে।'

'কী ব্যারাম?'

'হলদে জ্বর।' মঙ চো বলতে লাগল, 'সেলুলার কয়েদখানায় আসার দু রোজ বাদেই পেটি অফসার আমাকে জঙ্গলের কাজে পাঠিয়েছে। এখানে এসেই ব্যারামে পড়েছি। এই ছাখ, শুকিয়ে চিমসে মেরে গিয়েছি। আমি আর বাঁচব না লখাই।'

একটু থামল মঙ চো। টেনে টেনে দম নিতে লাগল।

লখাই বলল, 'বাঁচবি না কেন?'

'এই ব্যাপামে ধরলে কেউ বাঁচে না। কত কয়েদী এই জঙ্গলের কাজে এসে খতম হয়ে গিয়েছে! হাঁ—'

মঙ চো আর খাড়া বসে থাকতে পারল না। দড়ির খাটিয়ায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ মড়ার মত নিস্পন্দ হয়ে রইল সে। তারপর আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল। বলল, 'পালিয়ে যা লখাই। জান যদি বাঁচাতে চাস, এই জঙ্গল থেকে আজই ভেগে পড়। নইলে তোর হালও আমার মত হবে।'

লখাই শিউরে উঠল।

মঙ চো বলতে লাগল, 'পেটি অফসাররা বেছে বেছে তাগড়া তাগড়া তাকদদার কয়েদী জঙ্গলে পাঠায়। দু মাহিনার (মাসের) মধ্যে তারা এই ব্যারামে পড়ে। পয়লা পয়লা হাত-পা ফুলে হলদে হয়ে যায়। তারপর ব্যারামী কয়েদী চুপসাতে থাকে। শুকাতে শুকাতে আমার হাল হয়। আখেরে খতম হয়ে যায়।'

'সত্যি বলছিস!'

'জরুর সত্যি। ফায়া কসম। তুই নয়া এসেছিস জঙ্গলে। জঙ্গলের হালচাল জানিস না। এই ব্যারামে পড়লে মরে যাবি, জরুর মরবি। আজই, এক্ষুনি পালা লখাই। নইলে—'

মঙ চো'র কথা পুরা হবার আগেই ডিম ডিম শব্দে টিকারা বেজে উঠল। কাল রাতে এই টিকারার শব্দ শুনেছে লখাই। অরণ্যের কোন গভীর থেকে যে এই শব্দটা উঠে আসছে, লখাই ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

ভয়ার্ত গলায় মঙ চো চেঁচিয়ে উঠল, 'জারোয়া, জারোয়া—'

'জারোয়া কী?'

'ল্যাংটো জংলী, তীর ধনুক দিয়ে তারা মানুষ ফোঁড়ে। যা লখাই, বাঁচতে হলে পালিয়ে যা। না হলে জংলী আর ব্যারামের হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাবি না।' উন্মাদের মত চেঁচায় মঙ চো।

কিছুক্ষণ বোবার মত দাঁড়িয়ে রইল লখাই। তারপর গুঁড়ি মেরে বাইরে বেরিয়ে এল।

ডিম—ডিম—ডিম—

এক সঙ্গে বিশটা টিকারায় যেন ঘা পড়ছে। গম্ভীর, ভীষণ শব্দটা অরণ্যের আত্মা থেকে উঠে এসে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মণ্ড চো'র ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকাল লখাই। কিন্তু কোথা থেকে যে টিকারার শব্দটা উঠছে, কে বলবে?

'ফেলিং' চলছিল। করাত-কুড়াল ফেলে ভীত, সন্ত্রস্ত কুলী আর জবাবদাররা হল্লা করতে করতে ঝুপড়ির দিকে ফিরে আসছে, 'জারোয়া—জারোয়া—'

'জারোয়া—জারোয়া—'

লখাইর পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে কুলী জবাবদাররা—যে যার ঝুপড়িতে ঢুকে পড়ল। লখাই যে কী করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। মণ্ড চো'র ঝুপড়ির সামনে উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে রইল।

অনেক আগেই সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। এখন পয়লা রাত।

আবছা অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। বিকালে আকাশ জুড়ে কুয়াশার ফিনফিনে একটা পর্দা ছিল। সেই ফিনফিনে পর্দা এখন ঘন একটা স্তরের মত এই দ্বীপের উপর চেপে বসেছে। সাদা ধোঁয়ার মত কুয়াশা উড়ছে।

আকাশের পুব থেকে পশ্চিমে এক দল মৌসুমী হানাদার মেঘ চলেছে। মেঘে চিড় ধরিয়ে ফিকে ফিকে আবছা চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

এখন কিছুই স্পষ্ট নয়। এখন দক্ষিণ আন্দামানের এই অরণ্য আশ্চর্য দুর্জ্ঞেয়। লখাইর মনে হল, রাত্রির এই অরণ্য কী একটা সাঙ্ঘাতিক রহস্যকে যেন আড়াল করে রেখেছে।

ডিম—ডিম—ডিম—

সমানে টিকারা বাজছে। টিকারার শব্দ, ফিকে ফিকে চাঁদের আলো, অস্পষ্ট অবোধ্য জঙ্গল—সব মিলিয়ে অনিবার্য একটা কিছু ঘটতে চলেছে। লখাইর মনে হল, কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অন্তরাত্মাটা ছম ছম করে লখাইর।

ডিম—ডিম—ডিম—

টিকারা বেজে চলেছে।

হঠাৎ বিরাট একটা থাবা পড়ল লখাইর কাঁধে। চাপা, কর্কশ স্বরে কে যেন বলল, 'নালায়েক বুদ্ধু কাঁহাকা! মরার ইচ্ছা হয়েছে!'

সাঁ করে লখাই ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, ফরেস্ট গার্ড আবর খান পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আবর খান আবার বলল, 'মরতে চাস?'

'না।' লখাইর গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল।

'তবে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? শিগগির ঝুপড়িতে ঢোক।'

দু চোখে উদ্‌ভ্রান্ত, বন্য দৃষ্টি। তামাটে, কঠিন মুখ রেখাময়। খাড়া চোয়াল, মাংসল গর্দান, থ্যাবড়া নাক। মোটা মোটা আঙুলের ডগায় ভাঙা ভাঙা নখ। অবিন্যস্ত পিঙ্গল চুল মাথাময় ছড়িয়ে রয়েছে। এই হল আবর খানের চেহারা নমুনা

কাঁধ ধরে টানতে টানতে সামনের একটা ঝুপড়ির ভিতর লখাইকে ঢুকিয়ে দিল আবর খান। ভাঙা ভাঙা নখগুলো লখাইর মাংসল কাঁধে গিঁথে গিয়েছিল। চামড়া ফেঁসে রক্ত ঝরছে। জ্বালা জ্বালা করছে।

বাঁশের একটা মাচানে বসে পড়ল লখাই। পাশের মাচানে বসল আবর খান।

আবর খান বলল, 'সন্ধ্যার পর আর বাইরে থাকবি না লখাই।'

'কেন?'

'এ সময় জারোয়ারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে।

ডিম—ডিম—ডিম—

এক তালে টিকারা বেজে যায়।

লখাই বলে, 'কোথায় টিকারা বাজছে?'

'বুশ পুলিসের ক্যাম্পে।'

'বুশ পুলিসের ক্যাম্প কোথায়?'

'হুই যে—' লখাইকে ঝুপড়ির ফোকরটার সামনে নিয়ে এল আবর খান। হাত বাড়িয়ে সামনের দিকটা দেখাল। অনেকটা দূরে অরণ্যের প্রান্ত ঘেঁষে ধোঁয়ার স্তূপের মত কয়েকটা ঝুপড়ি দেখা যায়। গুটি কয়েক মশাল জ্বলছে। অন্ধকারে জমাট-বাঁধা কয়েক ফোঁটা রক্তের মত দেখায় মশালের আলোগুলোকে।

ডিম—ডিম—ডিম—

টিকারার বাজনা জোরালো হয়ে উঠেছে।

আবর বলল, 'জঙ্গলে কোপ মারলেই জারোয়ারা ক্ষেপে ওঠে। জারোয়ারা এই জঙ্গলের বালবাচ্চা।'

হঠাৎ বুশ পুলিসের ক্যাম্পের দিক থেকে হল্লা উঠল, 'হো—ও—ও—ও—'

অন্ধকার আর কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মশালের আলোগুলো ক্রমাগত এদিক ওদিক ছুটছে। এতক্ষণ হল্লার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আচমকা প্রাণফাটা একটা চিৎকার উঠল। 'আ—মর গিয়া, মর গিয়া—'

আবর খান অস্থির হয়ে উঠল, 'জরুর জারোয়া।'

লখাইর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'জারোয়া!'

'হাঁ—হাঁ—জরুর।'

আবর খান বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লখাইও এল। আবর খান বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

লখাই আঁতকে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'বুশ পুলিসের ক্যাম্পে।'

'ওখানে জারোয়া এসেছে। মাত্ যাও—'

আবর খান হাসল। বলল, 'আ রে মুরুখ, বিশ তিরিশ বছর আন্দামানের জঙ্গলে রয়েছি। জঙ্গলে থেকে থেকে আমি জংলী বনে গিয়েছি। জংলীকে জংলী মারবে না। যা যা, এখন ঝুপড়ির অন্দর যা।'

লখাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে আবার বাইরে এল আবর খান। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে বুশ পুলিস ক্যাম্পের দিকে ছুটল। মুহূর্তে কুয়াশা আর অন্ধকার এই আজব ভয়ডরহীন মানুষটাকে গ্রাস করে ফেলল।

এখন সকাল।

গাঢ় কুয়াশার স্তরগুলি রোদের ঘা লেগে ছিঁড়ে যেতে শুরু করেছে।

আবর খান এসে ডাকাডাকি লাগাল, 'এ লখাই—লখাই হো—'

কম্বলের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েছিল লখাই। আবরের হাঁকা-হাঁকিতে ধড়মড় করে উঠে বসল।

ততক্ষণে আবর খান ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

লখাই বলল 'কী ব্যাপার খান সাহেব?'

'ওঠ ওঠ—জলদি চল—'

লখাইর একটা হাত ধরে টানতে টানতে বুশ পুলিস ক্যাম্পের দিকে ছুটল আবর খান।

বুশ পুলিসের ক্যাম্পটা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের 'বীটের' মতই। বেতপাতার

চাল, বাঁশের পাটাতন এবং বাঁশের বেড়ার গুটিকতক ঝুপড়ি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে।

বুশ পুলিসের ক্যাম্পে এসে পড়েছে লখাই আর আবর খান।

কাল রাত্রে এখানেই ডিম-ডিম করে টিকারা বেজেছিল। এখানেই মশালের আলো দেখতে পেয়েছিল লখাই। এখান থেকেই প্রাণফাটা চিৎকার আর হল্লা উঠেছিল।

এই ক্যাম্পে আছে দশ জন বর্মী বুশ পুলিস আর একজন জমাদার।

ক্যাম্পের সামনে বর্মী পুলিসগুলো জটলা করছে। ফিস ফিস করে দুর্বোধ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। একটি বর্ণও তার বুঝতে পারল না লখাই।

হঠাৎ লখাইর চোখে পড়ল একটা কালো, বেঁটে, উলঙ্গ মানুষকে ঝুপড়ির একটা বাঁশের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে। দু চোখে উন্মাদ বন্য দৃষ্টি। থাবার মত বাঁকানো হাত-পা। লম্বা লম্বা ধারাল নখ। এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে মানুষটা। তার ছোট ছোট চাপা চোখে ভীষণ এক আক্রোশ ফুঁসছে।

থেকে থেকে লোকটা কেমন এক ধরনের অস্ফুট শব্দ করে উঠছে।

লখাই বলল, 'ওটা কে?'

আবর খান বলল, 'ওটাকে দেখাবার জন্যই তো তোকে নিয়ে এলাম। ওটা একটা জারোয়া, কাল রাতে ধরা পড়েছে।'

আটত্রিশ

ফরেস্ট গার্ড আবর খানের মত মানুষ সারা জীবনে আর একটিও দেখে নি লখাই।

কতকাল ধরে দক্ষিণ আন্দামানের এই জঙ্গলে পড়ে রয়েছে, নিজেও বলতে পারবে না আবর খান। দশ বছর? পনের বছর? বিশ বছর? না, সঠিক হিসাব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক কাল জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়েছে। সভ্য ভব্য দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগই নেই। তোমার আমার পৃথিবীতে যে নিয়মে বা সময়ের যে মাপে বছর পোরে, সে নিয়ম বা মাপ জঙ্গলে খাটে না। জঙ্গলের নিয়ম কানুন আলাদা। জঙ্গলে থেকে থেকে সময়কে মিনিট-সেকেণ্ড-ঘণ্টা কি মাস-বছর দিয়ে মাপ-জোখ করতে ভুলে গিয়েছে আবর।

লখাই যখন জিজ্ঞাসা করে, 'কত বছর জঙ্গলে কাটল খান সাহেব?'

আবর খান জবাব দেয়, 'দশ বিশ সাল তো হল।'

কখনও কখনও বলে, 'পঁচিশ তিরিশ সালও হতে পারে।'

কবে, কোন সালে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে সাজা খাটতে এসেছিল, একেবারেই মনে নেই আবর খানের। হাজার চেষ্টা করেও সে মনে করতে পারে না, কী অপরাধে তার দ্বীপান্তরী সাজা হয়েছিল।

দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে আবর খান। পিছনের জীবনের বিশেষ কিছুই মনে নেই তার। মুলুক তার কোথায়, মালাবার না লুধিয়ানা, সঠিক খেয়াল করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলে লাল লাল দাঁত মেলে উৎকট হাসি হাসে। বলে, 'জংলীর আবার মুলুক কী? জঙ্গলই আমার মুলুক। হাঃ-হাঃ-হাঃ—'

শুধু এটুকু মনে আছে, যখন সে আন্দামান আসে, তখনও সেলুলার জেল বানানো হয় নি। ভাইপার দ্বীপের জেলে দু মাস কয়েদ খেটে ফরেস্টের কাজে আসে আবর খান। প্রথমে ছিল কুলী, তারপর জবাবদার। তারপর আর

একটা পারমোশ (প্রমোশন) পেয়ে এখন হয়েছে ফরেস্ট গার্ড। এ জন্ত আবর খানের ক্ষতিও নেই ভ্রূক্ষেপও নেই।

এত বড় তুনিয়ায় ইয়ার-বন্ধু-রিস্তাদার—কেউ নেই আবর খানের। বেশী টাকা তার দরকার নেই। আর 'পারমোশ'ও (প্রোমোশনও) দরকার নেই।

বিশ তিরিশ বছর জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে দিল আবর খান। এতগুলো বছরে বার পাঁচ সাত মাত্র গিয়েছে শহর পোর্ট ব্লেয়ারে। শহরে একদিনও তার মন বসে নি। শহরের মানুষগুলোকে কেমন যেন আজব আজব লাগে। বিশ তিরিশ বছর আগের সেই শহরও কি আর তেমন আছে? পোর্ট ব্লেয়ারে কত নয়া নয়া কুঠি উঠেছে, টিলার গা বেয়ে কত সড়ক ছুটেছে। পুরানো সেই শহরটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। শহরের জমানা, কেতা, হালচাল —কেমন যেন তুর্বোধ্য ধাঁধার মত মনে হয়েছিল আবর খানের। জঙ্গলে পালিয়ে এসে সে বেঁচেছে।

বছর কয়েক আগে শেষবারের মত পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছিল আবর খান। দেখে এসেছে আটলাণ্টা পয়েণ্টের মাথায় সেলুলার জেল বানানো হচ্ছে।

তারপর আর যায় নি শহরে।

চারপাশে খাড়া খাড়া মাথা তুলে আন্দামানের জঙ্গল আবর খানকে বাকী তুনিয়া থেকে আলাদা করে রেখেছে। জঙ্গলের ওপারে শহরে বন্দরে, সভ্য মানুষের পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে, সে সম্বন্ধে আদৌ কোন মাথা ব্যথা নেই। সে সম্বন্ধে আবর খান একেবারেই উদাসীন।

লখাই হয়ত জিজ্ঞাসা করে, 'খান সাহেব কী শাদী-উদি করেছ?'

'হাঁ তো। এই জঙ্গলের সাথ আমার শাদী হয়েছে।'

'তুমি বড় তামাশা কর খান সাহেব।'

'আরে না না লখাই। এই জঙ্গলের সাথ জরুর আমার শাদী হয়েছে। বিবি বলিস, লেড়কা বলিস, আর ইয়ার-বন্ধুই বলিস—এই জঙ্গলই আমার সব। তা না হলে এই জঙ্গল ছেড়ে তুনিয়ার কোথাও যেতে পারি না কেন?'

আবর খানের গলাটা অদ্ভুত শোনায়। তার গাঢ়, ভারী, কাঁপা কাঁপা স্বরে এতটুকু তামাশা নেই। আস্তে আস্তে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলি বলে যায় আবর খান।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে লখাই। আবরের কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু পুরাপুরি বুঝে উঠতে পারে না।

সারাটা দিন কুলী খাটিয়ে, হাতী খাটিয়ে এবং জবাবদারি করে কাবার করে দেয় লখাই। ফুরসত পেয়ে যখনই সে ঝুপড়িতে ফেরে তখনই কোথা থেকে যেন আবর খানও এসে পড়ে। লোকটা যেন ওত পেতেই থাকে।

সে বলে, 'চল লখাই, তোকে জঙ্গল চিনিয়ে আনি।'

'চল।'

ফুরসত পেলেই লখাইকে জঙ্গলে নিয়ে যায় আবর খান। ঘুরে ঘুরে গাছ চেনায়। কোনটা প্যাডক, কোনটা চুগলুম, কোনটা গর্জন—একে একে কত গাছ কত লতাই না চিনে ফেলে লখাই!

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলে আবর যেন মাতাল হয়ে যায়; বেহুঁশ হয়ে পড়ে। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে হাঁটতে থাকে।

অন্য অন্য সময় আবর খানকে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু জঙ্গলে ঢুকলে কী এক দুর্বোধ্য রহস্য যেন তার উপর ভর করে বসে।

ফিস ফিস করে আবর খান বলতে থাকে, 'বুঝলি লখাই, জঙ্গলই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। জান-জমানা-জিন্দগী—যাই বলিস, জঙ্গলই আমার সব।'

একই ঝুপড়িতে আবর খান আর লখাই থাকে।

জবাবদারি করে আর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দিন কাটে লখাইর। রাত্রে পাশের মাচানে শুয়ে শুয়ে জঙ্গল সম্বন্ধে কত মজার মজার কথাই না বলে আবর খান! বুশ পুলিস ক্যাম্পে ডিম-ডিম করে টিকারা বাজে। এক সময় আবরের কথা আর টিকারার আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে লখাই।

কিন্তু আজ আর ঘুম আসছে না।

রোঁয়াওলা কম্বলের নীচে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে লখাই। কপালের দু পাশে দুটো অবাধ্য রগ সমানে লাফাচ্ছে। কিছুতেই তাদের বাগ মানাতে পারছে না লখাই।

একটু আগ পর্যন্ত পাশের মাচান থেকে সমানে বকর বকর করেছে আবর খান। এখন একেবারেই চুপচাপ। খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছে।

বুশ পুলিস ক্যাম্পে টিকারার বাজনাটা কেমন যেন ঝিমিয়ে আসছে। কুলীদের ঝুপড়িতে গান-বাজনা কি হল্লায় কেমন যেন ভাঁটা পড়েছে।

কম্বলের উষ্ণ আরামে চোখ বুঁজে ঘুমাবার চেষ্টা করল লখাই। কিন্তু না, ঘুম আসছে না। ঘুম বুঝি আজ আর আসবে না।

একবার বিবির বাজারের মোতি ঢুলানির কথা ভাবতে চেষ্টা করল লখাই। আর একবার সোনিয়াকে মনে করতে চাইল। কিন্তু না, এখন ভাবার মত মনের অবস্থাই নয় লখাইর। আজ দারুণ খাটুনি গিয়েছে। পাঁচ দিন ধরে পঁচিশটা কুলী সমানে করাত চালিয়ে বিরাট একটা প্যাডক গাছকে আজ ধরাশায়ী করতে পেরেছে। তারই জবাবদারি করতে করতে দিনটা কাবার হয়ে গিয়েছে।

আরো কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল, লখাই বলতে পারবে না। হঠাৎ তার মনে হল, কোথা থেকে যেন সর্ সর্ শব্দ আসছে।

মাথার উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলল লখাই। দেখল, আবর খান পা টিপে টিপে ঝুপড়ির বাইরে চলে যাচ্ছে।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। কিন্তু না, আবর খান ফিরল না। আন্দামানের এই ভীষণ জঙ্গলে এত রাত্রে কোথায় গেল সে? মনের ভিতর হাজার তোলপাড় করেও একটা সদুত্তর খাড়া করতে পারল না লখাই।

হঠাৎই লখাইর মনে পড়ল, আন্দামানের জঙ্গলে রাত্রি যখন নিস্তব্ধ হয়ে আসে, তখনই জংলী জারোয়ারা 'বীটে' এসে হানা দেয়।

জঙ্গল সাফ করে সভ্য মানুষ তার অধিকার বাড়িয়ে চলেছে। তার দাবীর শেষ নেই। তার দাবীর মুখে জঙ্গল নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই আদিম বাসিন্দাদের পৃথিবী দিনে দিনে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। জঙ্গল যত সাফ হচ্ছে, জংলীদের আক্রমণ আর প্রতিবাদ ততই বাড়ছে। বর্বর জংলীদের প্রতিবাদ বড় মারাত্মক। রাত্রি যখন গম্ভীর হতে থাকে, ঠিক তখনই তারা 'বীটে' হানা দেয়। ধারাল তীরের মুখে প্রতিবাদ জানায়।

জারোয়াদের কথা যতই ভাবছে, ততই অজ্ঞেয় এক ভয় লখাইকে কাবু করে ফেলছে।

এখনও ফিরল না আবর খান।

এক সময় আস্তে আস্তে উঠে পড়ল লখাই। কখন যে ঝুপড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে, খেয়াল নেই।

অন্য ঝুপড়িগুলোতে লণ্ঠন জ্বলছে। কুলীরা খানা পিনা এবং হল্লা—

একসঙ্গে তিনটেই চালাচ্ছে। সব ঝুপড়িগুলোতেই একবার মুখ বাড়াল লখাই। না, কোথাও নেই আবর খান।

আবছা চাঁদের আলোয় খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আবর খানকে বার করল লখাই। পাঁচ দিন ধরে বিরাট একটা প্যাডক গাছকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়েছিল। একটা খণ্ডের উপর উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে রয়েছে সে।

লখাই চেঁচিয়ে উঠল, 'খান সাহেব—'

আবর খান চমকে উঠল, 'কে ?'

একটু আগের সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা তার কেটে গিয়েছে। মুখটা ঘুরিয়ে সে বলল, 'ও তুই, বস। বুঝলি লখাই, এই প্যাডক গাছটা আমার বিশ তিরিশ বছরের সাথী। পুরানো সাথীটাকে দেখতে এসেছিলাম। এক রোজ আমার হাল এটার মতই হবে।'

লখাই বলল, 'খান সাহেব, ঝুপড়িতে ফিরবে না ?'

'কেন ?'

ফিস ফিস করে লখাই বলল, 'জারোয়া এলে—'

কী ভেবে কথাটা আর পুরা করল না লখাই।

অল্প একটু হাসল আবর খান। আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'তোকে তো হামেশাই বলি লখাই, বিশ তিরিশ বছর জঙ্গলে থেকে আমি জংলী বনে গিয়েছি। জংলীকে জংলীরা মারবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল আবর খান। লখাইর হাত ধরে একরকম টেনেই তুলল। তারপর বলল, 'দিনের জঙ্গল তো দেখেছিস। চল, আজ তোকে রাতের জঙ্গল দেখিয়ে আনি।'

কিছু একটা বলতে চাইল লখাই। কিন্তু তার আগেই তাকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে ফেলেছে আবর খান।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই কুলীদের সঙ্গে 'বীটে'র ঝুপড়িতে ফিরে যায় লখাই। জারোয়ার ভয়ে সারা রাত আর বেরোয় না। তাই রাত্রির অরণ্য সে কোনদিন দেখে নি।

লখাই জানে না, কিন্তু আবর খান জানে, মুহূর্তে মুহূর্তে অরণ্যের রূপ বদলায়, চরিত্র বদলায়। সকালে যে অরণ্য শান্ত, নির্বিকার, দুপুরে সে-ই আবার জ্বলন্ত, হিংস্র, রাত্রে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়। বিশ তিরিশ বছর জঙ্গলে

ঘুরে ঘুরে এই বিচিত্র রূপ আর বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে অরণ্যের আত্মাকেই বুঝি খুঁজে ফিরছে আবর খান।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুজনে এগিয়ে চলে। একবার চড়াই একবার উতরাই। টিলার পর টিলা। রাত্রির অরণ্য দুটি মানুষকে কোথায় নিয়ে চলেছে, কে বলবে? অরণ্যের মনে কি আছে কে জানে?

ডালপালা এবং পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা আবছা আবছা চাঁদের আলো এসে পড়েছে। একটা চিত্রাল হরিণই বুঝি দুলে দুলে সামনে দিয়ে চলে গেল। কোথায় একটা রাত-অন্ধ তিরাপ পাখি ককিয়ে উঠল। ভিজে মাটির গন্ধ, বুনো ফুলের ঝাঁঝাল গন্ধ, রাত্রির গন্ধ—সব গন্ধ এক হয়ে নাক ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

একটু আগেও কুলীদের হল্লা শোনা যাচ্ছিল, বুশ পুলিস ক্যাম্পে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো চোখে পড়ছিল। এখন আর কুলীদের হল্লা শোনা যাচ্ছে না, আলো দেখা যাচ্ছে না। চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত কী দুটো মানুষ অরণ্যের আত্মার মধ্যে এসে পড়ল!

এখানে পৃথিবীর আলো-বাতাস-শব্দ, কিছুই পৌছায় না। এখানে পৃথিবীর মানুষ আসে না। মানুষের শব্দে, স্পর্শে এই আদিম অরণ্যের শান্তি টুটে যায়।

অন্ধকারে জঙ্গলের স্পষ্ট আকার বোঝা যায় না। চার পাশ থেকে তার স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু তাকে ঠিক বোঝা যায় না। দুর্বোধ ভাষায় অবিরাম সে যেন কী বলে! অরণ্যের রাত্রি বিচিত্র এক জাদুকরী। সে যেন আবর খানকে জাদু করেছে। কী এক নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে আছে সে।

যে মন নিয়ে জঙ্গলে বুঁদ হওয়া যায়, সে মন হয়ত আবরের আছে, কিন্তু লখাইর নেই। অদ্ভুত এক ভয় তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। রাত্রির আবছা, দুর্বোধ্য জঙ্গল যতই সে দেখছে, ততই অন্তরাত্মাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

গুছিয়ে, পরস্পর সামঞ্জস্য রেখে ভাবতে জানে না লখাই। চারপাশের জঙ্গল আকাশের দিকে খাড়া খাড়া মাথা তুলেছে। সেই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সে শিউরে উঠল। হয়ত তার মনে হল, এই জঙ্গল আর ফরেস্ট গার্ড আবর খান—দু জনে কারসাজি করে তাকে ইয়ার-বন্ধু, নারী-নেশা-সুখ-উত্তেজনা—পৃথিবীর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

ফিস ফিস চাপা গলায় লখাই ডাকল, 'খান সাহেব—'

'হুঁ—'

ঘোরের মধ্য থেকে জবাব দিল আবর খান। তারপরই চুপ করে গেল।

লখাই আবার ডাকল, 'খান সাহেব—'

এবার চটকা ছুটে গিয়েছে আবর খানের। সে বলল, 'কী বলছিস লখাই?

'ঝুপড়িতে ফিরব।'

লখাইর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে চাইল আবর খান। শব্দ করে হাসল। বলল, 'ডর লাগছে?'

'হুঁ।'

'তবে চল।'

'বীটে'র দিকে ফিরতে ফিরতে আবর খান বলতে লাগল, 'বুঝলি লখাই, জঙ্গলের মত শাস্তি তোকে কেউ দিতে পারবে না। পয়লা পয়লা জঙ্গলকে ডর লাগবে। আমার মত বিশ তিরিশ বছর জঙ্গলে থাকলে বুঝবি, জঙ্গলের মত খাঁটি দোস্ত আর নেই।'

লখাই জবাব দিল না।

এবার আবর খানের স্বরে আক্ষেপ ফুটল, 'সিরকার (সরকার) মতলব করেছে, আন্দামানের জঙ্গলে সাফসাফাই করে গাঁও বসাবে, ক্ষেতি বানাবে। জঙ্গল সাফ হলে আমি যে কোথায় যাব!'

চুপচাপ আবর খানের পিছু পিছু চলতে লাগল লখাই।

আন্দামানের জঙ্গল আর আবর খান একটু একটু করে দুর্দান্ত লখাইকে জুড়িয়ে ফেলতে লাগল।

উনচল্লিশ

ফরেস্টের এই 'বীটে' আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল।

জবাবদারি করে, বন পুড়িয়ে, কুলি খাটিয়ে, হাতী খাটিয়ে পুরা দিনটা শেষ করে ফেলে লখাই। খানাপিনার পর রাত্রে যতক্ষণ জেগে থাকে, বুশ পুলিস ক্যাম্পের টিকারার শব্দ শোনে। মশালের আগুন দেখে। চোখ বুঁজে এক এক সময় বিবির বাজারের মোতি ঢুলানির কথা ভাববার চেষ্টা করে। কখনও কখনও সোনিয়ার কথা মনে পড়ে তার।

কিন্তু মোতি ঢুলানি কি সোনিয়ার জন্য মনটা ঠিক আগের মত বিকল হয় না লখাইর।

এক একটা সময় আসে, মনটা যখন আশ্চর্য নিরাসক্ত হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন কিছুর জন্য তখন মোহ থাকে না, আসক্তি থাকে না। আজকাল লখাইর মনের অবস্থা অনেকটা এই রকম হয়ে পড়েছে। টাকাপয়সা, নেশা, নারী—কোন কিছুর জন্যই সে আজকাল অস্থির, উন্মাদ হয়ে পড়ে না। অস্থির উন্মাদ হলেই বা উপায় কী? এই জঙ্গলে কে তার নেশা যোগাবে? এখানে কোথায় মিলবে মেয়েমানুষ? জঙ্গলে আসার পর মনের দিক থেকে অনেকটা স্থিরতা এসেছে লখাইর। খুব সম্ভব শান্ত, আরণ্যক পরিবেশের একটা অমোঘ প্রভাব আছে। দক্ষিণ আন্দামানের এই অরণ্য আর ফরেস্ট গার্ড আবর খান লখাইকে অনেকখানি শান্ত করে ফেলেছে।

এই অরণ্য খুনিয়ারা লখাইর অস্থির, ভীষণ মনটাকে একটু একটু করে বুঝি বা জুড়িয়েই ফেলত। ঠিক এমন সময়ে এল উজাগর সিং।

ফরেস্ট অফিসার উজাগর সিংকে লখাই এর আগে দেখে নি। এমন যে ফরেস্ট গার্ড আবর খান, বিশ পঁচিশটা বছর যে আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে দিল, এখানকার সব কিছুই যার জান পয়জান, পয়লা পয়লা উজাগরকে সে-ও চিনতে পারে নি। কিন্তু উজাগর ঠিকই চিনেছিল আবর খানকে। শয়তানের চোখ তো!

পাঞ্জাবী উজাগর পাগড়ী সামাল করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই ফরেস্ট গার্ড?'

আবর খান জবাব দিল, 'হাঁ অফসার সাহিব।'

'তোমাকে কোথায় দেখেছি, মালুম হচ্ছে।'

শান্ত, নির্বিকার স্বরে আবর খান বলল, 'জঙ্গলে বিশ পঁচিশ বছর কাম কাজ করছি। কোথাও দেখে থাকবেন।'

'না না, জঙ্গলে না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল। দাড়ির জঙ্গলে দু হাতের দশটা আঙুল ঢুকিয়ে খামচা মেরে ধরল। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় কাটল। হঠাৎ দুই হাত মাথায় তুলে চেঁচিয়ে উঠল উজাগর সিং, 'ইয়াদ ছিল না; এবার ঠিক ধরেছি। পঁচিশ বছর আগে তুমি আর আমি কালাপানির কয়েদ খাটতে এসেছিলাম। ইয়াদ আছে?'

উজাগর সিংয়ের স্মৃতি বড় তুখোড়। ঠিক চিনেছে। আস্ত দুশমন যে!

এবার একটু একটু মনে পড়ল আবর খানের। আন্দামানে তারা একই সঙ্গে একই জাহাজে এসেছিল বটে। পঁচিশ বছর আগে দুজনেই ছিল দ্বীপান্তরের কয়েদী। এখন সে ফরেস্ট গার্ড, আর উজাগর ফরেস্ট অফিসার। দুজনের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কিন্তু এই ফারাকটা এক কথায় ঘুচিয়ে দিলে উজাগর সিং। 'তু মেরা দোস্ত আবর। সেই রোজগুলোর কথা মনে পড়ে? যখন দুই দোস্ত কয়েদখানায় পাশাপাশি বসে নারকেলের ছোবড়া ছিলে কুটে তার বার করতাম, ছইল ঘানি টানতাম। রম্বাস ছিঁচতাম—'

বিহ্বল স্বরে আবর খান বলল, 'অফসার সাহিব—'

উজাগর খেঁকিয়ে উঠল, 'ছোড় তেরি অফসার সাহিব! আমি শালে উজাগর—'

ফরেস্ট অফিসার দিন দশেক থাকবে তুষণাবাদের 'বীটে'। জঙ্গল সার্ভে করে নির্দেশ দিয়ে যাবে। সেই অনুযায়ী 'ফেলিং' শুরু হবে।

নামেই ফরেস্ট অফিসার, আদতে জঙ্গলের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নেই উজাগর সিংয়ের। বনবিভাগের কানুন মানলে ফরেস্ট অফিসারকে জঙ্গলেই থাকতে হয়। কিন্তু কানুন মানছে কে? নিয়ম কানুনের বান্দা কোন কালেই নয় উজাগর সিং। পুরা বছর শহর পোর্ট ব্লেয়ারেই সে কাটায়। মাঝে মাঝে 'ফেলিং' কি 'সার্ভে'র সময় জঙ্গলে আসে।

আসার সময় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পেটি ভরে বিলাতী শরাব এনেছিল উজাগর সিং। পুরা দশটা রোজ এই জঙ্গলে কাটাতে হবে। ফুর্তি নেই, ফার্তা নেই, নাচাগানা নেই, সবচেয়ে যেটা আসল, সেই আওরতই নেই। চারদিকে পাহাড়ের চড়াই উতরাইতে খালি বন আর বন। গহীন, গভীর নিরালোক জটিল অরণ্য। দিদু আর প্যাডক, টমপিং আর গর্জন, পেমা আর জারুল গাছের জটলা। এর মধ্যে উজাগর সিংয়ের মত দুরন্ত ফুর্তিবাজের দিন কাটে কেমন করে!

বিলাতী শরাবের দুআয় নেশার অভাব মিটেছে। কিন্তু নারীসঙ্গহীন পুরা দশটা দিন এই জঙ্গলে কাটাতে হবে, এমন একটা বিশ্রী ভাবনায় মেজাজটা বিগড়ে ছিল। নারীমাংসের অভাব নেশা দিয়ে কতটা পূরণ করা যায়, সেই কথাই ভাবছিল উজাগর সিং।

ঝুপড়ির মধ্যে বসে সমস্ত সকাল নির্জলা দারু গিলেছে। থাবা থাবা ঝলসানো পাখির মাংস খেয়েছে উজাগর।

এখন দুপুর।

খানাপিনার পর জঙ্গল সার্ভে করার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী কুলী জবাবদার নিয়ে ফরেস্ট অফিসারের ঝুপড়ির সামনে এল আবর খান। বাইরে থেকে ডাকল, 'অফসার সাহিব—'

'কৌন মূর্তি রে?'

'আমি আবর জী—'

সোল্লাসে হল্লা করে উঠল উজাগর, 'আরে আও আও ইয়ার। অন্দর আ যাও—'

ঝুপড়ির মধ্যে চলে এল আবর খান। বাঁশের মাচানের উপর জাঁকিয়ে বসে রয়েছে উজাগর সিং। চোখ দুটো টকটকে লাল, আরক্ত। মাচানের নীচে গোটা তিনেক শূন্য বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে।

উজাগরের হাতে একটা আধা শূন্য বোতল। আবর খানের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পী লেও ইয়ার—'

'নেহী জী, আমি দারু খাই না।'

উজাগরের মুখচোখের হালচাল কেমন যেন বদলে গেল। এর চেয়ে আবর খান যদি তার শির বরাবর একটা ডাণ্ডা বসিয়ে দিত, জরুর সে খুশী হত। শরাব খায় না, এ কেমন মানুষ! দিল্লাগী করছে না তো হারামীটা!

উজাগর আবার সাধল, 'লেও লেও ইয়ার, সরম ছোড় জী—'

'নেহী নেহী, আপনি দারু পী লিয়ে—'

'আরে ইয়ার একা একা কী নেশা করা যায়! সাথী চাই, সাথী—'

'অফসার সাহিব, শরাব আমি বিলকুল খাই না। আমার কাছে শরাব হারাম।'

'শরাব হারাম! হোঃ-হোঃ-হোঃ—'

খ্যা খ্যা করে বিকট শব্দে হেসে উঠল উজাগর সিং। হাসির তোড়ে বিরাট মাংসল ভুঁড়িটা দোল খেতে লাগল।

উজাগর আবার বলল, 'এমন তাজ্জরের কথা শুনি নি। আ রে ইয়ার শরাব হারাম না, আরাম। বহুত বহুত মজাদার আরাম—'

আবর খান জবাব দিল না।

এবার খেঁকিয়ে উঠল উজাগর, 'উল্লু, বুদ্ধু, নালায়েক কাঁহাকা! শরাব না গিললে দিল মর্জি ঠিক থাকে! তবিয়ত আচ্ছা থাকে! সব বেচাল হয়ে যায় না!'

আবর খান চুপচাপ বসে রইল।

উজাগর বলতে লাগল, 'কোন কথা আমি শুনতে চাই না। লেকিন এক সাথী চাই; নেশার সাথী। নেশার ব্যাপারে তুই তো শালে নালায়েক বুরবক। দেখি সাথী মেলে কি না?'

টলতে টলতে উঠে পড়ল উজাগর সিং। নেশার দাপটে নিজেকে খাড়া রাখতে পারছে না। মাচানের খুঁটি ধরে টাল সামলাতে সামলাতে বোধ হয় নেশার সাথীর খোঁজেই ঝুপড়ির বাইরে এল সে।

পিছু পিছু আবর খানও বেরিয়ে এসেছে।

ঝুপড়ির সামনে কুলী জবাবদাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গল 'সার্ভে' করতে যাওয়ার কথা ছিল।

রোমশ ভুরু দুটো কুঁচকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কুলী জবাবদারদের পরখ করল উজাগর সিং। দুলতে দুলতে তাদের সামনে এসে বুক গর্দান এবং হাতে টিপে টিপে দেখতে লাগল। খুব সম্ভব তারা কতটা মজবুত, নেশার ঘা কতটা সইতে পারবে—টিপে টিপে এ সবই পরখ করছে উজাগর।

একেবারে শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল লখাই। তার হাত টিপে বুকের সিনা দেখে উজাগর সিং বেজায় খুশী। লখাইকে খুব পছন্দ হয়েছে তার।

উজাগর বলল, 'তুই কৌন ?'

পিছন থেকে আবর খানই লখাইর জবাবটা দিয়ে দিল, 'ও লখাই, ফরেস্টের জবাবদার।'

'বহুত আচ্ছা।'

লখাইর একটা হাত পাকড়াল উজাগর সিং। বলল, 'চেহারা নমুনা তো মোষের মত করে ফেলেছিস। তা এই চেহারায় কী কী কাম পারিস ?'

'জবাবদারি পারি, বোডা (গাছের গুঁড়ি) টানতে পারি, করাত চালিয়ে—'

উজাগর সিং গর্জে উঠল, 'উল্লু, বুদ্ধু, হারামী—এ সব কামের কথা কে শুনতে চায়! শালের বাচ্চে শালে, নেশা করতে পারিস ?'

অবাক হয়ে উজাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লখাই। কি জবাব পেলে উজাগর খুশী হবে, বুঝতে পারছে না।

লখাইর মুখে বিরাট এক ঘুষা হাঁকিয়ে উজাগর সিং বলল, 'জবাব দিতে পারছিস-না! আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখছিস শুয়ারকা বাচ্চা? উল্লু, নেশা করতে পারিস ? শরাবী নেশা ?'

ঘুষা খেয়ে ঘুরে পড়েছিল লখাই। মুখে হাত বুলাতে বুলাতে উঠে দাঁড়াল। ফিস ফিস করে বলল, 'হাঁ জী। ও তো—'

'ঠিক হায় ইয়ার।' লখাইকে পাঁজাকোলে তুলে ঝুপড়ির ভিতর নিয়ে এল উজাগর। বলল, 'তু মেরে সাচ্চা দোস্ত।'

লখাইকে একটা মাচানের উপর বসিয়ে আবার বাইরে এল উজাগর সিং। কুলী জবাবদারদের নিয়ে আবর খান দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উজাগর বলল, 'আজ আর জঙ্গল সার্ভে হবে না। তোমরা যাও।'

বলেই ঝুপড়িতে ঢুকল উজাগর। সামনের দিকের বাঁশের ঝাঁপটা টেনে বন্ধ করে দিল।

উজাগর সিং এল লখাইর জীবনে।

চল্লিশ

কতকাল পর মদ গিলছে লখাই!

দু মাস হল বঙ্গোপসাগরের এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল সে। তারও আগে দেশের কয়েদখানায় পুরা তিনটে বছর আটক থেকেছে। এই তিন বছর দু মাসে এক ফোঁটা মদ পড়ে নি তার গলায়। অবশ্য এর মধ্যে যে নেশা করে নি, এমন একটা নির্জলা মিথ্যা লখাই কিছুতেই বলতে পারবে না। ভিখন আহীর তার অনেক দিনের সাকরেদ। সে-ই চুরি চামারি, হাতসাফাই কি ফিকিরবাজি করে একটু চরস কি একটু চণ্ডু কি এক টিপ গাঁজা যোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু লুকিয়ে একটু আধটু নেশা করে জুত পায় না লখাই। তা ছাড়া নেশার যা রাজা, সেই মদই এই তিন বছর দু মাসে এক ফোঁটা জোটাতে পারে নি সে। কয়েদখানায় মদ জোটানো কি সোজা কথা! কাজে কাজেই চুটিয়ে নেশা করতে পারে নি লখাই।

কতকাল পর মদ গিলতে বসেছে লখাই!

মদের স্বাদই সে ভুলে গিয়েছিল। গলার শিরগুলো, তৃষ্ণার্ত স্নায়ুগুলো মদের অভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে দড়ি পাকাতে বসেছিল।

গলার মধ্যে এক একটা বোতল উপুড় করছে লখাই; আর সঙ্গে সঙ্গে গলনালীর মধ্য দিয়ে তরল আগুন ছুটে যাচ্ছে। কপালের দু পাশে তামার তারের মত সরু সরু রগগুলো চিন চিন করে যেন ফেটে পড়ছে।

উন্মাদের মত মদ খাচ্ছে লখাই।

উল্টা দিকের একটা মাচানে বসে সমানে দারু গিলছে উজাগর সিং। নেশার ঘোরে চোখ মেলতে পারছে না। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে উঠছে, 'এ লখাই দোস্ত—'

'হাঁ—'

'শির টলছে?'

'না।'

'আঁখ লাল হয়েছে?'

'না।'

'সাবাস।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

দাঁত দিয়ে বোতলের ছিপি খুলে দু জনে নির্জলা শরাব গলার মধ্যে ঢেলে দেয়। উজাগর আর লখাই যেন পাল্লা দিয়ে মদ গিলছে।

উজাগর আবার ডাকে, 'আ রে ইয়ার—'

'জী।' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় লখাই

'ক' বোতল সাফ করলি ?'

'তিন।'

'সাবাস।'

টলতে টলতে বাঁশের মাচান থেকে উঠে আসে উজাগর সিং। লখাইর পিঠে বিরাট এক থাপ্পড় কষিয়ে বাহবা দেয়, 'সাবাস জওয়ান, তুই আমার খাঁটি দোস্ত, আর সব ঝুটা। তোর মত নেশাড়ী সাথী এই পয়লা দেখলাম।'

নির্জলা দারুর নেশার সঙ্গে উজাগরের বাহবাটা বড় ভাল লাগে লখাইর।

এবার উজাগর সিং খাতির করে বলল, 'পাশে এস ইয়ার, এতদূর থেকে কি দোস্তি মহব্বতির কথা হয়!'

উজাগরের মাচানে এসে বসল লখাই।

উজাগর বলল, 'কত রোজ এই জঙ্গলে রয়েছ ইয়ার ?'

'বিশ পঁচিশ রোজ।'

'শাদী উদি করেছ ?'

'জী না।'

'বয়স কত ?'

'তিরিশ চল্লিশ হবে।'

উজাগর সিং চিৎকার করে উঠল, 'তিরিশ চাল্লিশ বছর বয়স, এখনও শাদী কর নি ?'

'জী না।'

খানিকটা সময় কাটে। চোখ বুঁজে কি যেন ভাবে উজাগর সিং। তারপর হঠাৎ বলে, 'এই জঙ্গলে তো রয়েছ, তা মেয়েমানুষ পুষেছ ?'

উজাগরের কথাগুলি পুরাপুরি বোঝে নি লখাই। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। যখন বোঝে নারী এবং নেশাঘটিত

ব্যাপারে এই লোকটা তাকে উৎসাহই দেবে, কোন বিপদেই ফেলবে না, তখন বলে, 'না, এই জঙ্গলে কোথায় পাব মেয়েমানুষ!'

'ওয়া গুরুজীকা ফতে! আওরত ছাড়া দিন কাটে কেমন করে? এমন তাজ্জব কথা কোনদিন শুনি নি।'

লখাই জবাব দিল না।

উজাগর সিং আবার বলল, 'আমার তো এক রোজও য়ুয়ানী মেয়ে মানুষ ছাড়া চলে না। দশটা রোজ এই জঙ্গলে যে কেমন করে কাটাবো, গুরুজী মালুম।'

একটা হাত লখাইর গর্দানটার উপর রাখল উজাগর সিং। নিজের দিকে লখাইকে একটু টানল। হঠাৎ তার গলার স্বরটা ঝুপ করে খাদে নামল, 'লখাই দোস্ত—'

'জী অফসার সাহিব—'

'তুষণাবাদের আগে এক গাঁও আছে। তার নাম তো পুট মুট (পোর্ট মোয়াট)?'

'হাঁ জী।'

'পুট মুটে (পোর্ট মোয়াট) তুমি গেছ কোনদিন?'

'হাঁ জী। দু দিন আগে ফরেস্ট গার্ডের সাথ একবার গেছলাম।'

'পথ দেখিয়ে আমাকে পুট মুটে (পোর্ট মোয়াটে) নিয়ে যেতে পারবে?'

'নিঘ্‌ঘাৎ পারব।'

'সাবাস, সাবাস।'

দুই হাতে লখাইকে জড়িয়ে ধরে হল্লা করে উঠল উজাগর সিং, 'গুরুজীর মেহেরবানিতে জঙ্গলে তোমার মাফিক দোস্ত পেয়েছি। লেকিন তুমি যদি একটু মেহেরবানি না কর, জঙ্গলে জিন্দগী বেকার হয়ে যাবে।'

রক্তে রক্তে নির্জলা বিলাতী মদের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। কপালের দু পাশে দুটো অবাধ্য রগ সমানে লাফাচ্ছে। চোখের ডিম দুটো লাল হয়ে উঠেছে। মাথাটা অল্প অল্প টলছে। অনেকদিন পর চুটিয়ে নেশা করেছে লখাই। নেশা করতে বসে মাত্রাটা ঠিক রাখতে পারে নি সে। তবু পাকা নেশাড়ী লখাই। নেশার ব্যাপারে মাত্রা হারালেও হুঁশটা পুরা বজায় আছে। আস্তে আস্তে সে বলল, 'কী বলছেন অফসার সাহেব?'

স্বর আরো খাদে নামল উজাগরের। এক রকম ফিসফিসই শোনাল,

'পুট মুটের (পোর্ট মোয়াট) চৌধুরীর নাম তো মঙ ফা। লোকটা বর্মী।
তাই না?'

'হাঁ জী।'

'মঙ ফা'র একটা খুবসুরতী শালী আছে। শালীটা রাঁড় (বিধবা); নাম
মিমি খিন। মিমি খিন বহুত খুবসুরতী। আসার সময় তাকে দেখে এসেছি।'
একটু থেমে উজাগর বলে, 'তুমি মিমি খিনকে দেখেছ ইয়ার?'

'জী না।'

'দেখেছ দেখেছ!'

নেশার ঘোরে অদ্ভুত এক কথা বলে উজাগর সিং, 'না দেখলেও দেখেছ
দোস্ত। তাগড়া খুবসুরতী যুয়ানী নতুন করে আর কী দেখবে? দিনরাত যে
লেড়কীর খুয়াব দেখ, দিনরাত তোমার আঁখের সামনে যে ঘুরে বেড়ায়, সে-ই
মিমি খিন।'

উজাগর সিংয়ের কথাগুলো পুরাপুরি শুনেছে লখাই। কিন্তু বুঝে
উঠতে পারে নি। বিড় বিড় করে সে বকছে, 'আঁখের সামনে যে ঘুরে
বেড়ায়—'

উজাগরের চোখ দুটো ধক ধক করছে। চাপা, তীব্র স্বরে সে বলল, 'ও
ইয়ার, জোয়ানী মাগীটাকে যে চাই—'

জড়ানো, দুর্বোধ্য স্বরে লখাই বলল, 'কেমন করে?'

উৎকট, বিকট আওয়াজে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসল উজাগর সিং। হাসির
দমকে মাংসল রোমশ উদর নাচতে লাগল। হাসির চোট কমলে বলল, 'বিশ
পঁচিশ রোজ জঙ্গলে থেকে একেবারে জংলীই বনে গিয়েছিস লখাই। বুদ্ধু
মুরুখ কাঁহিকা!'

একটু দম নিয়ে উজাগর আবার শুরু করল, 'রুপেয়া, রুপেয়া দিলে
আসমানের চাঁদ মেলে। আর এ তো মঙ ফা'র রাঁড় শালী, মরদে ঠোকরানো
এক আওরত।'

'ঠিক ঠিক—'

মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দেয় লখাই। মাথাটা নাড়তে হচ্ছে, না নেশার
দাপটে আপনা থেকেই সেটা নড়ছে, বুঝবার জো নেই।

নেশায় বেচাল হয়ে পড়েছে। তবু উজাগরের কথাগুলো শুনতে শুনতে
লখাইর মনে হল, এই ফরেস্ট অফিসারটার সঙ্গে কোথায় যেন ভিখন আহীরের

আশ্চর্য রকমের একটা মিল রয়েছে। এখন, এই মুহূর্তে সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না লখাই।

অনেকটা সময় কাটে।

নেশাটা পুরাপুরি জমে উঠেছে। চোখ বুঁজে ভাম মেরে বসে রয়েছে দু জনে।

হঠাৎ উজাগর সিং বলল, 'চল লখাই, আজ রাতে একটু ফুর্তি করে আসি।'

'কোথায়?'

'পুট মুট (পোর্ট মোয়াট)। আমি এদিকের পথ চিনি না। তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

'যাব।'

বাঁ দিকে মাথা হেলিয়ে সায় দিল লখাই।

এখন পয়লা রাত।

দুপুর থেকে লখাই আর উজাগর নেশা করছে। বিকালের দিকে নেশার ভাবটা ফিকে হয়ে এসেছিল। পর পর দু বোতল গলায় ঢেলে নেশাটাকে আবার চাঙ্গা করে নিয়েছে। দুপুরে চোখে লাল রঙ ধরেছিল। লাল আর সাদা হল না।

'বীটে'র ঝুপড়িগুলিতে লণ্ঠন জ্বলছে। রাঁচী কুলী আর জবাবদারদের নাচা, গানা, বাজনা আর বেপরোয়া হল্লা তুমুল হয়ে উঠেছে। এই নিঝুম, স্তব্ধ অরণ্যে হল্লা করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। নইলে অরণ্যের স্তব্ধতা তাদের বোবা বানিয়ে দিত। শুধু কী সে জন্যই তারা হল্লা করে? জীবন এবং মৃত্যুর সীমান্তে তারা থাকে। যে কোন মুহূর্তে জারোয়ার তীরে তাদের জান যেতে পারে। বোধ হয় হল্লা করে জারোয়ার ভয় ভুলে থাকতে চায় তারা।

বুশ পুলিসের ক্যাম্পে মশাল জ্বালানো হয়েছে।

ডিম-ডিম-ডিম—

অন্য দিনের মতই একতালে টিকারা বাজছে।

লখাইকে সঙ্গে নিয়ে পোর্ট মোয়াট রওনা হল উজাগর সিং।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ।

দু হাতে ডালপালা সরিয়ে, পায়ে টক্কর আর মাথায় গুঁতো খেতে খেতে

দু জনে এগিয়ে চলেছে। ধারাল কাঁটার ঘা'য়ে চামড়া ছিঁড়ছে, খুন ঝরছে পায়ে বিছা কামড়াচ্ছে। অরণ্যের মাথা থেকে দলা পাকিয়ে থোকায় থোকায় জোঁক পড়ছে গায়ে। মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে কতকালের সাধ যে তারা মিটিয়ে নিচ্ছে! তবু ভ্রূক্ষেপ নেই, হুঁশ নেই। ফুর্তির নেশায় দু জনে মশগুল হয়ে রয়েছে, শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। মঙ ফা'র জোয়ানী শালীটার কথা ভাবছে উজাগর সিং। ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

অন্য অন্য দিন আবর খানের সঙ্গে জঙ্গলে আসে লখাই। জঙ্গলে ঢুকলেই অদ্ভুত এক ভয় তাকে ঘিরে ধরত। কিন্তু আজ নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। মদের নেশা, মেয়েমানুষ নিয়ে সম্ভাব্য ফুর্তির নেশা, সব মিলিয়ে আকণ্ঠ, অসহ্য এক উত্তেজনায় এগিয়ে চলেছে লখাই।

জঙ্গলে পঁচিশটা দিন কাটিয়ে লখাইর মনে হয়েছিল, সে জুড়িয়ে যেতে বসেছে। প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব নিয়মে জীবনটাকে ভোগ করে। লখাইরও জীবনটাকে ভোগ করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি ছিল। আবর খানের সংস্পর্শে এসে সেটা ভুলতে বসেছিল লখাই।

উজাগর সিং এসে আবার তাকে তাতিয়ে তুলেছে। যে নিয়মে উজাগর জীবনকে ভোগ করতে চায়, মোটামুটি লখাইও সেই নিয়মের পক্ষপাতী। উজাগর আসাতে নিজের চরিত্র এবং জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে লখাই।

পথ চলছে আর সমানে বকর বকর করছে উজাগর, 'বুঝলি ইয়ার, এই জিন্দগীর আয়ু দু দশ রোজ। তাই কোন পরোয়া নেই। খানা খাও, নেশা কর, নাচা কর, গানা কর, হল্লা কর, আওরতের সাথ ফুর্তিফার্তা কর। তার পরেই তো ফৌত হয়ে যাবে। কোন পরোয়া নেই। জিন্দগীর মানে কী জানিস লখাই?'

'কী?'

'ফুর্তি।'

'ফুর্তি?'

'হাঁ হাঁ, জরুর ফুর্তি। শরাব গিলে আওরতের সাথ ফুর্তি। একটু থেমে উজাগর বলে, 'ফুর্তি কোথায় মেলে জানিস?'

'না।'

'আরে মুরুখ, ফুর্তি এই দুনিয়ার দুটো চীজে মেলে। শরাবে আর মেয়ে-
। হাঃ-হাঃ-হাঃ—'
দক্ষিণ আন্দামানের এই অরণ্যকে ভয়ানক ভাবে চমকে দিয়ে খ্যা খ্যা করে
সে ওঠে উজাগর সিং।

পৃথিবীর আদিম অরণ্য বুঝি এই আন্দামানেই জন্মেছিল। সেই অরণ্যের
ধ্য দিয়ে দুটো প্রাগৈতিহাসিক বর্বর যেন আদিম ফুর্তির খোঁজে চলেছে।

একচল্লিশ

এটা উনিশ শ এগার সাল।

এবারডীন বাজারে এতদিন মোট পাঁচখানা দোকান ছিল। পুরনো কয়েদী সুলেমান মোপলার কাপড়ের দোকান, ফাই মঙ বর্মীর কাঠ এবং বেতের আসবাবের দোকান, মাদ্রাজী চীনা রেড্ডির সরাইখানা, মারোয়াড়ী খুবলালের চাল-ডাল-মসলার দোকান, আর বাঙালী খ্রীষ্টান গোমেসের প্রবাল-শামুক-শঙ্খ, হরেক রকম সামুদ্রিক কড়ির দোকান।

এবার আরো একটা দোকান বসেছে। চান্নু সিংয়ের চা-খানা।

টিনের চাল, প্যাডক কাঠের দেওয়াল, বাঁশের নীচু নীচু মাচানে খদ্দেরদের বসার ব্যবস্থা। এই হল চান্নু সিংয়ের চা-খানার চেহারা নমুনা।

সামনে বিরাট এক চুল্লীর মাথায় তামাম দিন জল ফোটে। জল ফুটে ফুটে সাদা ধোঁয়ার আকারে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

সারা আন্দামানে এই একটা মাত্র চা-খানা।

এখন বিকাল।

এবারডীন বাজারের মধ্য দিয়ে একটা সড়ক সিসোস্ট্রেস উপসাগরের দিকে চলে গিয়েছে। সড়কটার দু পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিরাট বিরাট কয়েকটা রেন-ট্রি।

গরম জলে এনামেলের পেয়ালাগুলি ধুচ্ছিল চান্নু সিং। আর সামনের সড়কটার দিকে তাকাচ্ছিল। এখন রোদ ঝিমিয়ে পড়েছে। রেন-ট্রির গোল গোল পাতাগুলি বিকালের রোদ মেখে চিকমিক করছে।

আর খানিকটা পরেই 'মেরিন' ডিপার্টমেন্ট ছুটি হয়ে যাবে। খালাসী-রশিম্যান-বোটম্যানরা চা খেতে আসবে। শুধু কি 'মেরিনে'র জাহাজীরাই আসবে, ট্রানস্পোর্টের কুলী-জবাবদাররা আসবে, সেলুলার জেলের পেটি অফিসার-টিণ্ডাল-জমাদার-ওয়ার্ডরেরা আসবে। শহর পোর্টব্লেয়ার থেকে দূরে দূরে পেনাল সেটেলমেণ্ট গড়ে উঠেছে। পাহাড়গাঁও, গারাচারামা, লম্বা লাইন—নানা গাঁও বসেছে। উপনিবেশ এখন জম জমাট। সাজার মেয়াদ ফুরাবার পর অনেক কয়েদী সেখানে বিয়ে শাদী করে সংসারী হয়ে বসেছে।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছে। পেনাল কলোনি থেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চার পাঁচ মাইল ঠেঙিয়ে পুরানো কয়েদীরা রোজ বিকালে চান্নু সিংয়ের চা-খানায় আসে। একটা পয়সার বদলে এনামেলের এক পেয়ালা চা নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দেয়। এটা তাদের শখ। ঠিক শখ নয়, বিলাস বলাই বুঝি ঠিক।

চা-খানার নীচু নীচু মাচানে এক এক পেয়ালা চা নিয়ে খদ্দেররা জাঁকিয়ে বসে। অনেক রাত পর্যন্ত তারা চুটিয়ে আড্ডা মারে। খিস্তি-খাস্তা, কিসসা-গুজব, অশ্লীল গুলতানিতে চান্নু সিংয়ের চা-খানাটা মশগুল হয়ে থাকে।

একটু পরেই খদ্দেরেরা এসে পড়বে।

একবার পেয়ালা ধুচ্ছে, একবার চা-চিনি-দুধের সরঞ্জাম হাতের কাছে গুছিয়ে রাখছে, যাতে দরকার মত হাত বাড়ালেই সব কিছু পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে যে পাত্রে টগবগ করে জল ফুটছে, তার ঢাকনা ফাঁক করে চাপ চাপ বাষ্প বের করে দিচ্ছে। এখন মরার ফুরসত পর্যন্ত নেই চান্নু সিংয়ের।

চা-ছাঁকনিটা সাফ করতে করতে চান্নু সিং ভাবল, একটা নোকর রাখা দরকার। যদি দু পাচ টাকা তলবও (মাইনে) দিতে হয়, তাতেও সে রাজী। একা সব দিক সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না সে। এঁটো পেয়ালাগুলি ধুয়ে দিলেও তার কাজের অনেকখানি আসান হয়। হ্যাঁ, একটা নোকরই রাখবে চান্নু সিং।

শুধু ছোট এই চা-খানাই নয়, চান্নু সিংয়ের সাধ অনেক বড়। তার স্বপ্ন ছোট মাপের এই চা-খানাতেই আটকে নেই।

ছোট মাপের চা-খানাটা একদিন বিরাট একটা হোটেল হয়ে যাবে। রোটি-গোস্ত-তড়কা-মিঠাই—যে খানা চাই, সব কিছু মিলবে।

একবার মুম্বুই শহরে গিয়েছিল চান্নু সিং। সেখানে বিরাট এক সরাইখানা দেখেছিল। সেখানে বিজলী বাতি জ্বলে, সেখানে কত খদ্দের আসে। হরেক কিসিমের খানা, হরেক কিসিমের মানুষ। খানা জুগিয়ে জুগিয়ে হোটেলের নোকরগুলো হয়রাণ হয়ে পড়ে। তাজ্জব হয়ে চারদিক দেখেছিল চান্নু সিং। তার চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। সরাইখানার এক কোণে উঁচু এক গদী। সেখানে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে মালিক বসে ছিল। সামনে বিরাট এক কাঠের বাক্স। বাক্সের পেটটা নোট আর রেজগিতে ঠাসা।

মুম্বুই শহরের সেই হোটেল দেখার পর থেকেই চান্নু সিং খোয়াব দেখতে

শুরু করেছে। দুনিয়ার যেখানেই সে থাক, সেই হোটেলের মত একটা হোটেল সে খুলবেই। মালিকের গদীটা তার বড় মনে ধরেছে। তেমন একটা গদীও বানিয়ে নেবে চান্নু সিং। গদীতে জাঁকিয়ে বসে খদ্দেরদের কাছ থেকে দাম আদায় করবে, সব দিকে নজর রাখবে।

সিসোস্ট্রেস উপসাগরের দিকে যে সড়কটা চলে গিয়েছে, সেটা এখন ধু-ধু করছে। বিকালের রোদ মরে এসেছে। খানিকটা ছায়া ছায়া বিবর্ণ আলো রেন-ট্রিগুলোর মাথায় আটকে আছে।

চান্নু সিং সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার দৃষ্টিটা পাথুরে সড়ক, রেন-ট্রি এবং অনেক দূরের আকাশ পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন দেখছে সে।

চান্নু মনে মনে হিসাব করছিল। মোট তিন শ' টাকা তার জমেছে। আর শ দুই টাকা জোটাতে পারলেই এবারডীন বাজারে একটা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে হোটেল খুলে বসবে।

পাথুরে সড়কে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ উঠল। চান্নু সিংয়ের স্বপ্নটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল। একটা বলদে-টানা গাড়ি পাথরে টক্কর খেতে খেতে চড়াই ভাঙছে।

শেষ পর্যন্ত বলদের গাড়িটা চান্নুর চা-খানার সামনে এসে দাঁড়াল। ছইয়ের ভিতর থেকে কে যেন ডাকাডাকি লাগিয়েছে, 'এ চান্নু—চান্নু—'

খোয়াবে বাগড়া পড়ায় মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছে চান্নুর। সে খেঁকিয়ে উঠল, 'কৌন, কৌন রে হারামী?'

'আমি মাউ খে—'

ছইয়ের ভিতর থেকে লাফ মেরে নীচে পড়ল মাউ খে।

এবার কিন্তু খুব খুশী হয়ে উঠল চান্নু সিং। দুই হাত বাড়িয়ে চিল্লাল, 'আও ইয়ার—'

গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে চা-খানায় ঢুকল মাউ খে।

চান্নু সিং বলল, 'পাঁচ রোজ তোর পাত্তা নেই। পুট বিলাসের (পোর্ট ব্লেয়ারের) সব আদমীর কাছে তোর কথা জিগ্যেস করেছি। লেকিন কোন শালে তোর খবর বলতে পারে না।'

ইতিমধ্যে একটা মাচানের উপর উবু হয়ে বসে পড়েছে মাউ খে। ঘাড়টা ভেঙে দুই হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে।

চান্নু সিং মাচানটার কাছে এগিয়ে এল। মাউ খে'র পিঠে হাত রেখে আস্তে একটা ঠেলা মারল। ডাকল, 'এ মাউ খে—'

মাউ খে অস্ফুট শব্দ করল, 'হাঁ—'

'পাঁচ রোজ কোথায় ছিলি?'

'ভুষণাবাদের জঙ্গলে গিয়েছিলাম।'

'কাঁহে?'

'ভাইটাকে দেখতে।'

'কাকে? মঙ চো'কে?'

'হাঁ।'

হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলছে না মাউ খে। কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে সে।

এবার ক্ষেপে উঠল চান্নু সিং। দুই হাতে মাউ খে'কে ঝাঁকানি মেরে চিল্লাতে লাগল, 'নালায়েক, বুদ্ধু কাঁহাকা! শির তুলছিস না কেন?'

আস্তে আস্তে মাথাটা তুলল মাউ খে। তার চাপা কুতকুতে চোখ দুটো টকটকে লাল; কেমন যেন ভিজা ভিজা। খুব সম্ভব হাঁটুতে মাথা গুঁজে সে কেঁদে থাকবে।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ মাউ খে'র দিকে তাকিয়ে রইল চান্নু সিং। কি বুঝল, সে-ই জানে। হঠাৎ গলার স্বরটাকে খানিকটা নরম করে ফেলল, 'কী হয়েছে রে মাউ খে? কেঁদে কেঁদে আঁখ লাল করেছিস!'

'চান্নু ভেইয়া, ভুষণাবাদের জঙ্গলে গিয়েছিলাম। মঙ চো'কে দেখে এলাম—'

একটু থামল মাউ খে। কি যেন ভাবল, তারপর শুরু করল, 'ভাইটা ভারী বোখারে পড়েছে। গোস্ত শুকিয়ে গিয়েছে। স্রিফ ক' খানা হাড্ডি আছে। এত দুব্‌লা (দুর্বল) যে রশির খাটিয়া থেকে উঠতে পারে না, দিনরাত শুয়ে থাকে।'

'হাঁ।' একটা কেমন যেন শব্দ করল চান্নু সিং।

'জরুর মরে যাবে মঙ চো। একদম খতম হয়ে যাবে। দু রোজও আর টিকবে না। আন্দামানের জঙ্গল বোখার দিয়ে ভাইটাকে খতম করে ফেলল রে চান্নু।'

'হাঁ।'

'এ জঙ্গল বহুত হারামী—বহুত দুশমন—'

বলতে বলতে ফুঁসে উঠল মাউ খে, ফুঁসতে ফুঁসতে কেঁদে ফেলল। একটানা বলে যেতে লাগল, 'আমার আর কেউ নেই। ঐ একটা মোটে ভাই। ভেবেছিলাম, ভাইটা যখন আন্দামানেই কয়েদ খাটতে এল, তখন এক সাথ থাকব। লেকিন জঙ্গল তাকে খতম করে ফেলল। জঙ্গল কিতনা বড় দুশমন, আমি দেখব। এই দুশমনের সাথ মুলাকাত করব।'

মাউ খে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'আন্দামান হোমস্'এর নোকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি চান্নু।'

কাদাকাচাঙ না হাডোর ওদিকে কোথায় যেন সরকার থেকে 'আন্দামান হোমস্' বসানো হয়েছে, চান্নু সিং ঠিক জানে না। জঙ্গল থেকে জারোয়া, আরোয়া, ওঙ্গে, গ্রেট আন্দামানীজ—নানা জাতের আদিবাসীদের ধরে ধরে সেখানে আদব কায়দা শিখিয়ে, শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে সভ্যভব্য বানানো হচ্ছে।

মাউ খে 'আন্দামান হোমস্'-এ নোকরি করে। পাকা সরকারী নোকরি। চান্নু সিংয়ের চা-খানায় আসার আগে সেই নোকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছে সে।

চান্নু সিং বলল, 'নোকরি তো ছাড়লি, লেকিন এখন কী করবি?'

'ফরেস্টে নোকরি নেব। সিরকার (সরকার) জঙ্গল কাটাচ্ছে। জঙ্গল আমার ভাইকে খতম করেছে, আমি জঙ্গলকে খতম করব। হাঁ—জরুর।'

ডাইনে বাঁয়ে—দু পাশে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগল মাউ খে।

বিড় বিড় করে চান্নু সিং বকতে লাগল, 'শালে পাগলা কাঁহাকা—'

মাউ খে সমানে কাঁদছে।

মাউ খে'র কান্না চান্নু সিংয়ের মত জবরদস্ত পাঞ্জাবীকে কিছুটা কাবু করে ফেলেছিল। দিলটা খানিকটা নরমও বুঝি হয়েছিল তার। কিন্তু সে আর কতক্ষণ?

চান্নু সিং হচ্ছে সেই ধাতের মানুষ, কোন দিন কোন কারণে যে কান্না কি মন খারাপ কি মুষড়ানো ভাব সইতে পারে না। তার ধারণা, কান্না, মন খারাপ—এ সব হচ্ছে মেয়েমানুষের ব্যাপার। যে সত্যিকার পুরুষ, প্রকৃত মরদানা, সে কেন কাঁদবে? সে চাকু চালাবে, ঘুষা হাঁকাবে, অন্য লোককে কাঁদিয়ে মজা দেখবে। চোখ থেকে যার আঁশু বেরোয়, সে কি শালে পুরুষ! সে মাগীরও বেহদ্দ!

চান্নু সিংয়ের জীবন দর্শন বুঝি অনেকটা এই রকম। খানিকটা ক্রুর এবং অমার্জিত হলেও তার চিন্তাধারায় নিরাসক্তি মেলে। কে মরল, কে বাঁচল, তার জন্য ভেবে ভেবে অহেতুক মাথাব্যথা করা তার ধাতে নেই। তার মতে নিজের বুঝটা পুরাপুরি বুঝে নাও। নিজের ভোগের জন্য, উপভোগের জন্য, দরকার হলে ছিনিয়ে নাও। দুনিয়ার কেউ যখন তোমাকে মেহেরবানি করে কিছুই হাতে তুলে দিচ্ছে না, তখন মেরে কেটে যেমন করে পার, আদায় কর। আদায় করা কি সোজা কথা! প্রতি মুহূর্তে তোমার ভোগের জন্য এটা দরকার, ওটা দরকার। মেয়েমানুষ দরকার, শরাব দরকার, চণ্ডু-চরস-পিনিক দরকার, কাপড়া-খানা দরকার। তোমার দিলের খুশির জন্য মহব্বৎ দরকার। তোমার এত দরকার। দরকারের জিনিসগুলো জোটাতে তুমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছ, তোমার কালঘাম ছুটছে। এর মধ্যে সময় কোথায় তোমার, ভাই-বন্ধু, ইয়ার-রিস্তাদারের জন্য বেফায়দা চোখ থেকে আঁশু বার করার? সময় নেই। অন্যের জন্য তুমি যদি মন খারাপ করে থাক, শুধুই কেঁদে যাও, তা হলে আঁশু দিয়ে একটা দরিয়া বানাতে পারবে। কিন্তু তোমার জন্য ভাবে কে? প্রতি মুহূর্তে তোমার ভোগ এবং উপভোগের জিনিসগুলি যোগায় কে? তাই কোন ব্যাপারে কোন পরোয়া নেই। ইয়ার, নিজের ধান্দায় নিজের চিন্তায় মানুষ বুঁদ হয়ে আছে। তার উপর অন্যের ভাবনা শিরে চাপলে উপায় থাকবে? অন্যের জন্য, সে যে-ই হোক, কেঁদে কেঁদে নিজেকে কাবু করে ফেলা আর যাই হোক বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মোটামুটি এই সব চিন্তার খাত ধরেই চান্নু সিংয়ের জীবন দর্শন চলে।

মাউ খে'র কাঁধে একটা হাত রেখে চান্নু বলল, 'আরে ইয়ার, কাঁদ মাত। এক রোজ মানুষ পয়দা হয়, আর এক রোজ মরে। এই তো দুনিয়ার কানুন। তুই কেঁদে কি ভাইয়ের মরা ঠেকাতে পারবি?'

'না।'

'তবে শালে কাঁদছিস কেন? যার যখন সময় হবে, তখন সে জরুর মরবে। তবে কেঁদে ফায়দাটা কী?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মাউ খে। ধরা ধরা বিমর্ষ গলায় বলে, 'ঠিক কথা, কেঁদে কুছু ফায়দা নেই।'

'সাবাস দোস্ত।'

উৎসাহে মাউ খে'র পিঠে বিরাট এক থাপ্পড় বসায় চান্নু সিং। তারপর বলে, 'দিল খুশ রাখো পেয়ারে।'

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা বানিয়ে ফেলে চান্নু সিং। পেয়ালাটা মাউ খে'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'গরম চা পী লেও; মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

চান্নু সিংয়ের কাছে এসে বিষণ্ণ, মুষড়ানো ভাবটা কেটে যেতে থাকে মাউ খে'র। ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে জুড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকে সে।

এতক্ষণ রেন-ট্রিগুলোর মাথায় বিকালের নিস্তেজ আলোটুকু আটকে ছিল। রেন-ট্রির ছোট ছোট গোল গোল পাতাগুলো চিকমিক করছিল। এখন পাতলা কুয়াশার একটা পর্দা নেমেছে। সামনের পাথুরে সড়কটা যেখান থেকে ঢালু হয়ে সিসোস্ট্রেস উপসাগরের দিকে নামতে শুরু করেছে, সেখানটা কেমন যেন আবছা হয়ে গিয়েছে।

এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন এবারডীন বাজারের উপর দিয়ে কোন দিকে যেন উড়ে গেল। ভোর হলেই এই পাখিরা সাগরে চলে যায়। আবার দিন যখন ফুরিয়ে আসে, রোদ যখন মরে যায়, ঠিক সেই সময় সাগর থেকে তারা এই দ্বীপে ফিরে আসে।

চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে ফেলল মাউ খে। বিমর্ষ, মুষড়ানো ভাবটা এখন একেবারেই কাটিয়ে ফেলেছে সে।

মাউ খে ডাকল, 'এ চান্নু—'

'হাঁ—'

চুল্লীতে কয়লা দিয়ে আঁচটাকে গনগনে করে তুলল চান্নু সিং। তারপর মুখটা তুলে বলল, 'হাঁ, কী বলছিস মাউ খে?'

'পিয়ারীলাল এসেছিল?'

'না।' বিরক্ত গলায় গজ গজ করতে লাগল চান্নু সিং, 'ছ রোজ আগে সেই যে তোর সাথ এসেছিল, আর এদিকে ভেড়ে নি। হারামী কুত্তা, শালের মা-বাপের ঠিক নেই। কথা দিয়ে কথা রাখে না।'

'হুঁ।' অস্ফুট একটা আওয়াজ করল মাউ খে।

চান্নু সিং খেঁকিয়ে উঠল, 'হুঁ কী রে শালে—'

'না, বলছিলাম ছ রোজ তা হলে সোনিয়ার কোন খবর পাস নি ?'

বিরস মুখে চায়ু জবাব দিল, 'না।'

'তবে আমি উঠি।'

'কাঁহে ?'

'একটু ডিলানিপুর যাব। পিয়ারীলালকে পেলে তোর কাছে ধরে আনব।'

'বহুত আচ্ছা। জলদি যা দোস্ত।'

বাঁশের মাচান থেকে নেমে পড়ল মাউ খে।

বয়াল্লিশ

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগেই খদ্দেররা হুড়মুড় করে এসে পড়ল। 'মেরিন' থেকে জাহাজী-খালাসীরা এল। ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টের কুলী-জবাবদাররা এল। সেলুলার জেলের টিণ্ডাল-পেটি অফিসারেরা এল।

দু পাঁচ জন সিপাই-জমাদারও এসেছে। তাদের খুব খাতির করে বসিয়েছে চান্নু সিং।

সামনের সড়কটা একেবারেই আবছা হয়ে গিয়েছে।

দু পাশে দুটো গ্যাসের বাতি জ্বলছে।

চা-খানার ঠিক পিছনেই হাওয়াই বুটির জঙ্গল। সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়িয়া পোকা আর মশা উঠে আসতে শুরু করেছে।

অদ্ভুত খাটতে পারে চান্নু সিং। তিনটে মানুষের কাজ সে একাই করছে। চা ছাঁকছে, পেয়ালা ধুচ্ছে, চুল্লীতে কয়লা দিয়ে দিয়ে আঁচটাকে জীইয়ে রাখছে। এরই মধ্যে সমানে খদ্দেরদের চায়ের যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় সন্ধ্যা পার হয়ে গেল।

যত রাত হচ্ছে, খদ্দেরও ততই বাড়ছে। বাড়িয়া পোকা আর মশার উৎপাতও সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

চান্নু সিংয়ের চা-খানায় পুরাদমে আড্ডা চলছে। মশা আর বাড়িয়া পোকার উৎপাত অগ্রাহ্য করে খদ্দেররা গুলতানি পাকাতে থাকে।

খিস্তি-তামাশা-হল্লায় চা-খানাটা মশগুল হয়ে রয়েছে।

কে একজন বলল, 'একটা সাচ্চা খবর বলছি।'

পাশ থেকে ইয়ারেরা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'কী, কী, কী—কী খবর?'

'এবার জাহাজ ভরে বিলাতী শরাব আর খুবসুরতী জোয়ানী লেড়কী আসছে।'

গ্যাসের আলোতে চারপাশের মানুষগুলোর চোখ চক চক করে। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঝুট।'

'ঝুট তো ঝুট। মুন্সীজী নিজের মুখে বলেছে।'

এবার চারপাশের ইয়ারেরা প্রথম লোকটার গা ঘেঁষে বসে। বলে, 'ঠিক বলছিস ? মুন্সীজীর মুখে ঠিক শুনেছিস তো ?'

'আরে ইয়ার, জরুর শুনেছি। সিরকার (সরকার) এবার খাসা মতলব করেছে।'

বলেই চুপ করে গেল লোকটা। তারিয়ে তারিয়ে চায়ের পেয়ালায় একটার পর একটা চুমুক দিতে লাগল। তারপর চারপাশের মুখগুলোর উপর দিয়ে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে গেল।

লোকটা ওস্তাদ গল্প বলিয়ে। তবিয়ত করে সে শুধু চায়েই চুমুক দিতে থাকে। সরকার যে কি খাসা মতলবটা করেছে, সে সম্বন্ধে একটি কথাও আর বলে না।

চারপাশের ইয়ারেরা অস্থির হয়ে উঠেছে। তাদের কৌতূহল আর বাগ মানছে না। একসঙ্গে তারা হল্লা বাধিয়ে ফেলে, 'কি রে শালে, বলছিস না কেন ? সিরকারের (সরকারের) খাসা মতলবটা কী ?'

'সিরকার (সরকার) মতলব করেছে, এক এক কয়েদীকে দুটো করে জোয়ানী দেবে। আর ভরপেট বিলাইতী শরাব খাওয়াবে।'

'সচ্ (সত্যি) বলছিস ?'

চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে ঘষে ঘষে মুখ মুছল লোকটা। তারপর বলল, 'বিলকুল ঝুট। এ জাহাজে জোয়ানী লেড়কীও আসবে না, শরাবও আসবে না। মোষ আর ঘোড়া আসবে।'

'তবে যে বললি—শালে, হারামী, শয়তান কাঁহাকা!'

ইয়ারেরা সমানে চিল্লাতে থাকে।

লোকটা আর কিছুই বলে না। অন্ধকার সড়কটার দিকে তাকিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো নাচাতে থাকে।

আর একটা মাচানে আর এক কিসিমের গল্প চলছিল।

একজন গম্ভীর স্বরে বলছে, 'গারাচারামা গাঁও-এর সিদ্ধিবাবা একটা বড় তাজ্জবের কথা বলেছে।'

'কী, কী, কী—' চারপাশের লোকগুলো তাকে ঘিরে ধরে।

'দুনিয়ার এন্তেকাল (শেষ সময়) এসে গিয়েছে। একটা মানুষও আর বাঁচবে না। ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে, বাঁড় (বন্যা) হবে। ভেঙেচুরে দুনিয়া দরিয়ার নীচে চলে যাবে।'

'সচ্?'

'জরুর সচ্। লেকিন একটা কথা, এই আন্দামান দ্বীপ ঠিকই থাকবে। দুনিয়ার সবাই মরবে, আমরাই খালি টিকে থাকব।'

'সচ্?'

লোকটা এবার আর জবাব দিল না।

কোন দিকে নজর দেবার ফুরসতটুকু পর্যন্ত নেই চান্নু সিংয়ের। খদ্দেরদের সমানে চায়ের যোগান দিচ্ছে। আর ঘন ঘন সড়কটার দিকে তাকাচ্ছে। তাকাচ্ছে আর ভাবছে, এবারডীন বাজারের এই ছোট্ট চা-খানাটা এক রোজ মুম্বুই শহরের সেই বিরাট সরাইখানাটার মত হয়ে যাবে। তখন অনেক পয়সার মালিক হবে চান্নু সিং। কিন্তু এত পয়সা এত দৌলত কার জন্য? মধ্যে মধ্যে এই রকম একটা দার্শনিক চিন্তার উদয় হচ্ছে। সে নিজে তো একা মানুষ। খানা-আস্তানা বাবদ তার আর ক'টা পয়সার দরকার?

যতই ভাবছে, মেজাজটা ততই বদখত হয়ে যাচ্ছে।

ইয়ারগুলো মাচানে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি মেরে বসে গুলজার করছে। রাত বাড়ছে। বাড়িয়া পোকা আর মশাগুলো জ্বালিয়ে মারছে। কিন্তু কোনদিকে হুঁশ নেই চান্নু সিংয়ের। সামনের সড়কটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল সে। কতক্ষণ হল পিয়ারীলালের খোঁজে বেরিয়েছে মাউ খে! এখনও তো ফিরছে না!

চাপা, তীব্র গলায় চান্নু গালি দিল, 'শালে, কুত্তীকা বাচ্চে—'

অনেক রাত্রে আড্ডা ভাঙল।

খদ্দেররা যে যার আস্তানার দিকে রওনা হয়ে গেল। চান্নু ছাড়া চা-খানায় এখন আর কেউ নেই।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এখন পুরাদমে বসন্তের বাতাস বইছে। বাতাসে এখনও খানিকটা হিম হিম আমেজ মিশে আছে।

একটা মাচানের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রয়েছে চান্নু সিং। একদৃষ্টে সামনের এবড়ো খেবড়ো পাথুরে সড়কটার দিকে তাকিয়ে আছে।

দু পাশে গ্যাসের বাতি জ্বলছে। ফাই মঙ বর্মীর দোকানে, চীনা রেড্ডির সরাইখানায় আর খুবলালের দোকানে টিম টিম করে তেলের লণ্ঠন জ্বলছে। গোমেস আর সুলেমান মোপলার দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এবারডীন বাজারটা এখন একেবারেই নিস্তব্ধ।

ফাই মঙ বর্মীর দোকানে বুঝি জুয়ার আড্ডা বসেছে। মধ্যে মধ্যে সীসার গুটি চালার ভোতা ধাতব শব্দ উঠছে ; গব্‌গবা গব্‌। চাপা, ফিস ফিস স্বরে জুয়াড়ীরা কথা বলছে। অন্য অন্য-দিন খদ্দেররা চলে যাবার পর দোকান বন্ধ করে জুয়ার আড্ডায় যায় চান্নু সিং। জুয়াতে মাতলে হুঁশ থাকে না। এক একদিন রাতই কাবার করে ফেলে। জুয়ার নেশা বড় তুখোড় নেশা।

কিন্তু আজ জুয়াতে একেবারেই উৎসাহ নেই। মনের দিক থেকে এ ব্যাপারে তাগাদাই পাচ্ছে না চান্নু সিং।

উপসাগরের গর্জন ভেসে আসছে। বসন্তের বাতাস এলোপাথাড়ি ছুটেছে ; রেন-ট্রি গুলোর ঝুঁটি ধরে ইচ্ছামত নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছে। আকাশে একটি একটি করে অনেকগুলো তারা দেখা দিয়েছে।

কোন দিকে খেয়াল নেই চান্নু সিংয়ের।

প্রায় মাঝ রাত্রে পিয়ারীলালকে সঙ্গে নিয়ে চান্নু সিংয়ের চা-খানায় ফিরে এল মাউ খে।

একমাত্র ফাই মঙ বর্মীর দোকানটা ছাড়া বাকী দোকানগুলোতে লণ্ঠন নিবে গিয়েছে।

গাঢ়, ঘন অন্ধকারের নীচে এবারডীন বাজারটা তলিয়ে গিয়েছে।

লাফ মেরে উঠে পড়ল চান্নু সিং। বলল, 'এ শালে মাউ খে, কখন গিয়েছিস আর কখন ফিরলি, হুঁশ আছে? নালায়েক কুত্তা কাঁহাকা!'

'ঝুটমুট গালি দিবি না চান্নু। আগে আমার কথাটা শুনে নে। এখান থেকে পয়লা গেলাম ডিলানিপুরের টাপুতে। গিয়ে দেখলাম পিয়ারীলাল ভেইয়া নেই। গিয়েছে পাহাড়গাঁও। আমিও পাহাড়গাঁও ছুটলাম। পাহাড়গাঁও থেকে ধরে আনলাম ভেইয়াকে।'

দুই হাতে মাউ খে'কে জড়িয়ে ধরে চান্নু সিং। বিরাট মাংসল বুকের উপর তাকে ডলতে থাকে, পিষতে থাকে। ডলতে ডলতে পিষতে পিষতে সে বলে, 'তুই আমার পেয়ারে। লেড়কী হলে জরুর তোকে শাদী করে ফেলতাম মাউ খে।'

মাউ খে'কে ছেড়ে দিয়ে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল চান্নু সিং। খাতির করে

পিয়ারীলালকে একটা মাচানে বসাল। বলল, 'নমস্তে পিয়ারীলালজী, দিল তবিয়ত আচ্ছা? খুশ তো?'

'হাঁ জী।'

পিয়ারীলালের অনেক বয়স হয়েছে। তোবড়ানো গাল, কোঁচকানো চামড়া। সমস্ত মুখে সরু সরু কত যে দাগ, তার লেখাজোখা নেই। মনে হয়, একটা মাকড়সা যেন কত কাল ধরে জাল বুনে চলেছে। সামনের দিকে বিরাট একটা টাক; চাঁদির উপর ধবধবে সাদা কয়েকগাছা চুল। এত যে বয়স পিয়ারীলালের, তবু হাতের কবজী মজবুতই আছে, চোখের দৃষ্টি এখনও অটুট। মাড়ি থেকে এখন পর্যন্ত একটা দাঁতও আলগা হয়ে যায় নি। চেহারা দেখে পিয়ারীলালের সঠিক বয়স বার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

পঁচিশ তিরিশ বছর আগে কালা পানির এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল পিয়ারীলাল। কয়েদ খেটে একেবারে খাঁটি মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। মুলুক থেকে আসার সময় চরিত্রে যে সব দোষ, ত্রুটি এবং খাদ মিশে ছিল, সে সব ঘুচে গিয়েছে। পিয়ারীলাল এখন আসল, সাচ্চা মানুষ। এই একটা মাত্র কয়েদী, যে কোনদিন কয়েদখানার কানুন সম্বন্ধে একটা কথাও বলে নি। মুখ বুঁজে হুইল ঘানি টেনেছে, রম্বাস ছিঁচেছে, সড়ক সমান করেছে। যে খানা পেয়েছে, তাই খেয়েছে। পেটি অফিসার-টিণ্ডালরা কোনদিন এমন একটা ছুতো পায় নি, যার জোরে পিয়ারীলালকে ঠেঙিয়ে মজা পেতে পারে। সেলুলার জেলের খাতায় কোনদিন পিয়ারীলালের বিপক্ষে একটা রিপোর্টও ওঠে নি। জেলার, জেল সুপারিণ্টেনডেণ্ট পিয়ারীলালের উপর বেজায় খুশী। এত ভাল কয়েদী সেলুলার জেলে কোনদিন কয়েদ খাটতে আসে নি।

পনের বছরের মেয়াদে সাজা খাটতে এসেছিল পিয়ারীলাল। মুখ বুঁজে সাজা খাটার কিম্মৎও সে পেল। পুরা তিনটে বছর মকুব হল। মোট বার বছর কয়েদ খেটেই খালাস পেয়ে গেল পিয়ারীলাল। সরকার থেকে সেল্‌ফ্‌ সাপোর্টার্স টিকেট পেয়েছে। তবু শাদী করে নি সে। ডিলানিপুরের 'টাপু'তে থাকে আর সাউথ্‌ পয়েণ্ট কয়েদখানায় কয়েদিনীদের তাঁত বুনতে শেখায়। মাস গেলে পাঁচ টাকা তলব (মাইনে) পায়। এতেই কোন রকমে চালিয়ে নেয়। অল্পতেই সে তুষ্ট।

বড় খাঁটি মানুষ পিয়ারীলাল। তার শরাবের নেশা নেই, জুয়ার নেশা নেই। টাকার জন্য ফেরেববাজি, ফিকিরবাজি করতে সে জানে না। এ জন্য আন্দামানের কয়েদীরা তাকে খাতির করে, সমীহ করে। তারা বলে, 'পিয়ারীলালজী বড় আচ্ছা আদমী। একেবারে সাধুপীরের সামিল।'

পঁচিশ তিরিশ বছর বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কাটিয়ে দিল পিয়ারীলাল। কথায় বলে সঙ্গ গুণে রঙ ধরে। খুনিয়ারা-জালিয়াত-ঠগ-বদমাসদের সঙ্গে একত্রে কাটিয়েও তার মনে নতুন রঙ ধরল না। তার চরিত্রে একটি মাত্র পাকা রঙ। সে রঙটি হল নিখাদ খাঁটিত্বের। তার চরিত্র থেকে বদমাইসি, শয়তানি, দুশমনির রঙ চিরকালের জন্য মুছে গিয়েছে।

এক পেয়ালা চা বানাল চান্নু সিং। চায়ে প্রচুর দুধ আর চিনি মিশিয়ে উপরে মালাই ভাসিয়ে দিল। পিয়ারীলালের হাতে পেয়ালাটা দিতে দিতে বলল, 'ধরুন পিয়ারীলালজী।'

পেয়ালায় পয়লা চুমুক দিয়ে পিয়ারীলাল বলল, 'আমাকে কি দরকার?'

দুই হাত সমানে কচলাতে থাকে চান্নু সিং। বলে, 'হে-হে পিয়ারীলালজী আপনি তো সবই জানেন। সোনিয়ার সাথ আমার শাদী একদম পাক্কা হয়ে আছে। এ্যাদ্দিন শাদীও হয়ে যেত। লেকিন জখম হয়েই তো সোনিয়া সব গড়বড় বাধিয়ে দিল। বহুত দিন সোনিয়ার কোন খবর পাই না।'

পিয়ারীলাল অস্ফুট একটা শব্দ করল, 'হুঁ—'

'আপনি যদি একটা বন্দোবস্ত করে—'

চান্নু সিংকে কথাটা আর পুরা করতে দিল না পিয়ারীলাল। তার আগেই চায়ের পেয়ালাটা তার নাক বরাবর ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে উঠল, 'শালে উল্লুলোক, দুশমন বদমাস, এই জন্যে আমাকে দরকার?'

উত্তেজনায় শরীরটা কাঁপছে। এবার আস্তে আস্তে সে বলল, 'আমার ওপর মতলববাজি চলবে না। আমি যাচ্ছি।'

বাইরের দিকে দু কদম এগিয়ে গেল পিয়ারীলাল।

পাশের মাচানে বসে পিয়ারীলালের ভাবগতিক একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল মাউ খে। যখন সে দেখল, সব মতলবই প্রায় বানচাল হতে বসেছে, লাফ মেরে নীচে নেমে পিয়ারীলালের দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। বলল, 'গোসা হবেন না পিয়ারীলালজী। আপনি আমাদের বড়া ভাই।'

মাউ খে অতি ভুখোড় লোক। যেমন ধূর্ত, তেমনি মতলববাজ। চান্নু সিংয়ের সঙ্গে একই জাহাজে সে দ্বীপান্তরী সাজা খাটতে এসেছিল। চান্নু তার পুরানো দোস্ত। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে অনেক বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছে মাউ খে আর চান্নু। দুজনের মধ্যে পাকা দোস্তি গড়ে উঠেছে। দোস্তির কারণও আছে।

ভোঁতা চোয়াড়ে বুদ্ধির চান্নু সিং যখনই কোন মুশকিলে পড়ে, তখনই ধূর্ত মাউ খে মতলব যুগিয়ে, ফিকির বাতলে সব মুশকিলের আসান করে দেয়। এই কারণেই জবরদস্ত চেহারার চান্নু সিংয়ের সঙ্গে বেঁটে খাটো মাউ-খে'র এত পেয়ার। মাউ খে চান্নুর পাকা দোস্ত।

গারাচারামা গাঁও-এ একখানা ঘর ভাড়া করেছে চান্নু সিং। তার দিলে অনেক স্বপ্ন। সোনিয়াকে গারাচারামার কুঠুরিতে তুলে পাকা সংসারী হয়ে বসবে। তিন শ টাকা জমিয়েছে। আর শ দুয়েক টাকা জমাতে পারলেই এবারডীন বাজারের এই ছোট্ট চা-খানাটাকে বাড়িয়ে একটা মস্ত সরাইখানা বানিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু গুরুজীর ইচ্ছা অন্য। সোনিয়াকে আনতে দিনকয়েক আগে সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় গিয়েছিল চান্নু সিং। সেখানেই শুনেছিল, সোনিয়া জখম হয়ে সিকমেনডেরায় আছে।

সেদিন সোনিয়াকে আনতে পারে নি চান্নু সিং। সেই থেকেই সে বড় অস্থির হয়ে আছে। সোনিয়াকে একবার দেখতে পেলেও তার দিল জুড়াত। অনেক ফন্দি এঁটেও সে সুবিধা করতে পারে নি। বারকতক সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার চারপাশে ঘুর ঘুর করে এসেছে চান্নু সিং। কিন্তু সোনিয়ার দেখা মেলে নি। বরঞ্চ যতবার সে সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছে, ততবারই পাহারাদাররা ডাণ্ডা উচিয়ে তাকে অনেকদূর পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়েছে।

ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত একটা ফন্দি বার করেছিল মাউ খে। তার সাফ মগজে খাসা বুদ্ধি খেলে। মাউ খে খোঁজখবর নিয়ে জানল, পিয়ারীলাল রোজ সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানায় কয়েদিনীদের তাঁত বোনা শেখাতে যায়।

মাউ খে অনেক তোষামোদ করেছে পিয়ারীলালকে। তোষামুদিতে শেষ পর্যন্ত রাজীও হয়েছে পিয়ারীলাল। সে কথা দিয়েছে, এক রোজ চান্নু সিংয়ের

চা-খানায় সে যাবে। দিন কয়েক আগে একবার মাত্র এসেছিল। কথা দিয়েছিল আবার আসবে। কিন্তু সে আর আসে নি।

এর মধ্যে মঙ চো'কে দেখবার জন্য কয়েকটা দিন ভূষণাবাদের জঙ্গলে গিয়েছিল মাউ খে। পিয়ারীলাল আসে নি, মাউ খে'রও পাত্তা নেই। এই ক'টা দিন অদ্ভুত এক অস্থিরতায় কেটেছে চান্নু সিংয়ের। জুয়ার আড্ডায় গিয়ে সুখ হয় নি ; শরাব গিলে নেশা জমাতে পারে নি। জিন্দিগীটা কেমন যেন বিস্বাদ, বদখত হয়ে গিয়েছে। সোনিয়ার খবর না পাওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই, ফুর্তি নেই। তার কাছে সব কিছুই এখন বেতালা, বেখাপ্পা।

পুরানো কথাটা নতুন করে ঝালাতে লাগল মাউ খে, 'পিয়ারীলালজী, আপনি আমাদের বড়া ভাই—'

তীক্ষ্ণ, সন্দিগ্ধ চোখে একবার মাউ খে আর একবার চান্নু সিংকে দেখে নিল পিয়ারীলাল। তারপর বলল, 'কি মতলব তোদের ?'

'না না—কুছু মতলব নেই ; জরুর নেই।'

ডাইনে-বাঁয়ে দু-পাশে প্রচুর মাথা নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে, মাজা বাঁকিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত ভঙ্গি করে মাউ খে। চান্নুকে একটা ঠেলা মেরে বলে, 'তুই বল্ না চান্নু, আমাদের কোন মতলব আছে ?'

কাজ হাসিল করতে হবে। তাই চায়ের পেয়ালার ঘা খেয়েও চুপ চাপ মুখ বুঁজে এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চান্নু সিং। মাউ খে'র কথাটা কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দেয়, 'না না, জরুর না।'

পিয়ারীলাল বলল, 'তবে আমাকে এখানে ডেকে আনলি কেন ?'

মাউ খে বলল, 'আপনি আমাদের সাচ্চা বড়া ভাই। লেকিন বড়া ভাই, একটা খবর না দিলে ছোটা ভাইদের জান যে খতম হয়ে যাবে।'

'কি খবর ?'

কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করল পিয়ারীলাল। তার চোখ দুটো কুঁচকে রয়েছে।

'বাপ রে বাপ রে বাপ! পিয়ারীলালজী, আপনার আঁখ দেখলে ডর লাগে—আঁখ একটু মুলাইম করুন, নইলে ছোটা ভাইরা বিলকুল ঘাবড়ে যাবে।'

করতে হবে না, কি বলবি বল ?'

'পিয়ারীলালজী—'

সমানে দুই হাত কচলাতে থাকে মাউ খে। অনেক টালবাহানার পর বলে, 'সাউথ পয়েন্টে এক কয়েদানী আছে, তার নাম সোনিয়া। তার—'

মাউ খে'র কথাটা আর শেষ হয় না। তার আগেই চেঁচিয়ে ওঠে পিয়ারীলাল, 'থাম শালে, কয়েদানীর কথা আমার কাছে পুছবি না।'

'লেকিন বড়া ভাই—'

'কোন লেকিন নেই। আমি তোর কোন জন্মের বড়া ভাই রে হারামী!' পিয়ারীলাল ক্ষেপে ওঠে।

মাউ খে খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, 'গালি দিচ্ছেন বড়া ভাই; দিন গালি। ও তো আপনার মর্জি। লেকিন সোনিয়ার একটা খবর দিন।'

পিয়ারীলালকে এবার অনেকটা শান্ত দেখায়। সে বলে, 'ভেইয়ারা একটা কথা শোন, আমি কানুনের বন্দা। সিরকার (সরকার) আমাকে বিশোয়াস (বিশ্বাস) করে 'রেগুবারিক' কয়েদখানায় কাম দিয়েছে। কয়েদানীদের কথা বাইরের লোকের কাছে বলার কানুন নেই।'

দুই হাতে কপাল চাপড়ায় মাউ খে। বলে, 'লেকিন বড়া ভাই, স্রিফ কানুনের বন্দা হয়ে থাকলে তো জিন্দিগী বেচাল হয়ে যাবে। একটু দিলের বন্দা হোন।'

'কী বলছিস তুই মাউ খে?'

'বলছি, এই চান্নু আমার দোস্ত। ওর সাথ সোনিয়ার শাদী পাকা হয়ে আছে। সোনিয়ার জন্যে গারাচারামা গাঁও-এ কুঠি ভাড়া নিয়েছে। ক' রোজ আগে সোনিয়াকে আনতে 'রেগুবারিকে' গিয়েছিল চান্নু। কে নাকি সোনিয়াকে মেরে জখম করে ফেলেছে।' একটু দম নেয় মাউ খে। আবার বলতে থাকে, 'আপনিই বলুন বড়া ভাই, চান্নুর দিলটা সোনিয়ার জন্যে পাগলা বনে আছে কি না?'

'ও তো ঠিক কথা।' পিয়ারীলাল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'এই হাবরাডীন (এবারডীন) বাজারে রয়েছে দুলহা (বর), আর সাউথ পয়েন্টে রয়েছে দুলহান (কনে)। লেকিন কারো সাথ কারো মুলাকাৎ নেই। আপনিই বলুন বড়া ভাই, চান্নুর দিলটা বাওরা বনে আছে কি না?'

'হাঁ হাঁ, ও তো ঠিক।'

'তাই একটা কথা বলি পিয়ারীলালজী, ব্রিফ কানুনের বন্দা হয়ে কোন ফায়দা নেই। একটু দিলের বন্দা হোন। সোনিয়ার খবর বলুন।'

পিয়ারীলালকে এবার অনেক নরম দেখায়। আস্তে আস্তে সে বলে, 'সোনিয়া সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) আছে। জখমের ঘা শুকোতে আরও পাঁচ দশ রোজ লাগবে।'

একটু থামে পিয়ারীলাল। হঠাৎ কি যেন তার মনে পড়ে। এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে, 'লেকিন একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না মাউ খে —মনে হচ্ছে জরুর কোন গড়বড় আছে!'

'কি গড়বড়?'

'তুই যেমন সোনিয়ার খবরের জন্যে আমাকে তামাম আন্দামান ঢুঁড়ে বার করেছিস, তেমনি আর এক হারামীও সোনিয়ার খোঁজে আমার কাছে এসেছিল।'

এতক্ষণ একপাশে চুপচাপ বসেছিল চান্নু সিং। কান খাড়া করে পিয়ারীলাল আর মাউ খে'র কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'সে হারামীটা কে?'

পিয়ারীলাল বলল, 'ভিখন আহীর।'

'শালের কি মতলব? সোনিয়াকে দিয়ে তার কী হবে? সোনিয়া আমার আওরত। শালের জান তুড়ব।'.

চান্নু সিং উন্মাদ যেন হয়ে উঠল, 'কী জন্যে এসেছিল ভিখন আহীর? কী বলল?'

'ভিখন সোনিয়ার খবর জিগ্যেস করল। সোনিয়ার সাথ নাকি তার এক দোস্ত লখাইর শাদী ঠিক হয়ে আছে।'

'লখাই কুত্তাটা আবার কে?'

'লখাই এক কয়েদী। এখন নাকি সে ফরেস্টের কাজে তুষণাবাদে আছে।'

'ওয়া গুরুজীকা ফতে!' চান্নু সিং স্তব্ধ রাত্রির এবারডীন বাজারটাকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর একদমে শ' খানেক বাছা বাছা অশ্রাব্য গালি আউড়ে বলল, 'লখাই শালের জান তুড়ব।'

পিয়ারীলাল জবাব দিল না।

চান্নু আবার বলল, 'আপনি লখাইকে চেনেন পিয়ারীলালজী?'

'না।'

পিয়ারীলালের পাশে উবু হয়ে বসে রয়েছে মাউ খে। লখাইর নাম শুনেই সে চমকে উঠেছিল। যেটুকু সন্দেহ ছিল, তুষণাবাদের নাম শুনে সেটুকু ঘুচল। এবার সে বলল, 'আমি চিনি লখাইকে। তুষণাবাদের জঙ্গলে জবাবদারি করে লখাই।'

চান্নু বলল, 'সচ্?'

মাউ খে বলল, 'সচ্।'

পিয়ারীলাল চলে গিয়েছে।

এখন কত রাত, কে তার হদিস দেবে? গ্যাসের বাতি দুটোর চারপাশে বাড়িয়া পোকাগুলো সমানে ঘুরপাক খাচ্ছে। উপসাগরের গর্জনটা ক্ষীণ হয়ে হয়ে এবারডীন বাজার পর্যন্ত এসে পৌঁছচ্ছে। এতক্ষণ আকাশটা পরিষ্কার ছিল। এতটুকু মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। এই মুহূর্তে কোথা থেকে যেন বিরাট এক টুকরা মৌসুমী মেঘ সেখানে হানা দিতে শুরু করেছে।

বাঁশের মাচানে দুটো মূর্তি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রয়েছে। দুটোর একটা হল চান্নু সিং, অন্যটা মাউ খে।

চান্নু আর মাউ খে। দু জনে বড় সাচ্চা দোস্ত।

তেতাল্লিশ

এখন দুপুর।

জঙ্গলের দিক থেকে পুরা একটা টহল মেরে 'বীটে' ফিরে এল লখাই।

'বীটে'র সামনে খানিকটা জায়গা সাফ করে ফেলা হয়েছে। হাত-পা ছড়িয়ে সেখানে বসে পড়ল লখাই।

খানিকটা দূরে কুলীরা জঙ্গল পোড়াচ্ছে। চাপ চাপ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে—চারদিকে তাকাল লখাই। চারদিকেই অরণ্য জটিল হয়ে আছে। এই অরণ্যে পৃথিবীর আলো ঢোকে না, মানুষের নজর চলে না।

দক্ষিণ আন্দামানের এই জঙ্গল কবে যে মাটি ফুঁড়ে প্রথম মাথা তুলেছিল, সে সম্বন্ধে এতটুকু মাথাব্যথা নেই লখাইর।

এখন কোন ব্যাপারে তার হুঁশ নেই, খেয়াল নেই। ভুষণাবাদের এই 'বীটে'র সামনে বসে সেই লোকটার কথাই ভাবছে লখাই।

সেই লোকটা ছিল এক ওস্তাদ কালোয়াত। লখাইর সঙ্গে এককালে তার খুবই খাতির জমেছিল। লোকটা প্রায়ই বলত, 'বুঝলি লখাই, এই জীবনটা কালোয়াতী গানের জলদ্ একটা রেলার মত। একটু বেসুরা, বেতালা হবার জো নেই।'

আন্দামান আসার আগে লখাইর মনে হত, এমন একটা খাঁটি কথা কোন দিন সে শোনে নি। কথাগুলোর উপর তার অদ্ভুত এক বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস হয়ত ঠিক নয়, এক ধরনের অন্ধ মোহ ছিল।

আন্দামান আসার আগে চরসে-মদে-নারী মাংসে, শয়তানি-দুশমনি-রাহাজানি, দুনিয়ার তাবত নেশায় আকণ্ঠ ডুবে থেকে তার মনে হত, জীবনটা সত্যিই কালোয়াতী গানের জলদ্ রেলাই বটে। কোন মতেই এতটুকু বেতালা, বেখাপ্পা কি বেসুরা হবার উপায় নেই।

লখাইর জীবন চড়া একটা পর্দায় সাধা ছিল। আন্দামান আসার পর

সব ব্যাপারেই তাল কাটতে শুরু করেছে। এখানে না মেলে মেয়েমানুষ ; না করা যায় চুটিয়ে নেশা।

আধা পশুগঠন বর্বর নিজের প্রবৃত্তিগুলোকে খুশী করতে না পারলে যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, প্রথম প্রথম লখাইও তেমনি ক্ষেপে উঠত। এখন আর লখাই ক্ষেপে ওঠে না। ক্ষ্যাপামির বদলে তার মনে অদ্ভুত এক নিরাসক্তি দেখা দিয়েছে।

যে ক'টা দিন সেলুলার জেলে ছিল, মোটামুটি একরকম কেটে গিয়েছে। নানা জাতের, নানা ধাতের, নানা চেহারার, নানা বুলির বিচিত্র সব কয়েদী, এবং তাদের আজব আজব কাণ্ডকারখানা দেখতে মন্দ লাগত না লখাইর।

কিন্তু তুষণাবাদের জঙ্গল বড় অদ্ভুত!

এতকাল লখাইর ধারণা ছিল, নারী আর নেশার একটি মাত্র খাত ধরেই জীবন বয়ে চলে। অন্ততঃ চলা উচিত। এই জঙ্গলে এসে জীবন সম্বন্ধে পুরানো ধারণাটা বদলাতে শুরু করেছে। আজকাল মনে হয়, জীবন শুধু কালোয়াতী গানের রেলার মত জলদই নয় ; মাঝে মাঝে তার গতি ঢিমে তেতালা, মন্থর। এক একসময় জীবনের গতি আদৌ থাকে কি না, লখাই সঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

আন্দামানের এই অরণ্যে নারী-নেশা, পৃথিবীর সব সুখ, সব উত্তেজনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে লখাই।

এখানে সাথী বলতে জনকতক রাঁচী কুলী, দু এক জন ফরেস্ট গার্ড, একজন জবাবদার, জন দুই জমাদার। আর অরণ্যের প্রান্ত ঘেঁষে আছে একটা বুশ পুলিস ক্যাম্প। সেখানে থাকে জন কয়েক বর্মী পুলিস, দুজন জমাদার, একজন হাবিলদার। মোট চল্লিশটা প্রাণী। আর চারপাশ ঘিরে আছে দক্ষিণ আন্দামানের আদিম অরণ্য ; নির্বাক, নিরালোক, ভয়ঙ্কর।

সারাটা দিন তবু একরকম কাটে। হৈ হৈ করে জঙ্গল সাফ করতে, জবারদারি করতে, কুলী খাটাতে মোটামুটি খারাপ লাগে না। কিন্তু রাতগুলো আর কাটতে চায় না।

সারা রাত জারোয়াদের ভয়ে বুশ পুলিস ক্যাম্পে ডিম-ডিম শব্দে টিকারা বাজে। তুষণাবাদের এই অরণ্যের উপর তখন অদ্ভুত, অশরীরী এক ভয় ভর করে বসে। টিকারার শব্দ জঙ্গলের বাইরে বেরুবার পথ পায় না। অরণ্য সেই শব্দকে গ্রাস করে ফেলে।

অবস্থা যখন এই রকম, যখন দুর্বহ একটা বোঝার মত জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে ঢিমে তালে চলছিল লখাই, যখন নারী-নেশা-খুনখারাপি, পৃথিবীর সব উত্তেজনার স্বাদ বিলকুল ভুলতে বসেছিল, তখন ফরেস্ট অফিসার উজাগর সিংয়ের দেখা মিলল।

বিচিত্র মানুষ উজাগর সিং!

লখাইর মনে হল, ঢিমা তালের জীবনে আচমকা অন্ধ, উন্মাদ বেগ বইয়ে দিল সে।

নানা ভাবনা লখাইর মাথায় দলা পাকাচ্ছে।

দুপুরটা জ্বলছে। আকাশটাকে এখন পেটানো তামার পাতের মত দেখায়। জঙ্গলের মাথা জ্বলছে। আকাশে আটকে-থাকা সাগর পাখিগুলো বুঝি পুড়েই যাবে।

কোন দিকে নজর নেই লখাইর। ঝিম মেরে 'বীটে'র সামনে বসে রয়েছে সে।

'লখাই, এ লখাই—'

পিছনের কোন একটা ঝুপড়ি থেকে জড়ানো গলায় কে যেন ডাকছে।

লখাই চমকে উঠল, চনমন করে এদিকে সেদিকে তাকাতে লাগল। ডাকটা ঠিক কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না।

স্বরটা এবার আর এক পর্দা চড়ল, 'এ শালে, কুত্তীকা বাচ্চে, গান্ধেকো পাটঠে, এই যে ইধর—'

খিস্তির নমুনাতেই বোঝা গেল, লোকটা ফরেস্ট অফিসার উজাগর সিং।

'হাঁ জী—'

এবার এক রকম লাফ মেরেই উঠে পড়ল লখাই। খুঁজে খুঁজে উজাগর সিংয়ের ঝুপড়িতে এসে ঢুকল।

দিবারাত্রি শরাব গেলে উজাগর। সকাল থেকে এ পর্যন্ত মোট দুটো বোতল ফাঁকা করে ফেলেছে। পেটি থেকে আরো একটা বোতল বার করেছে। বোতলটার মুখ এখনও কাটা হয় নি। সেটাকে একবার উপরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, আবার লুফছে। শরাবের বোতল নিয়ে লোফালুফি খেলছে উজাগর সিং।

এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল লখাই। একটা হাত ধরে টেনে তাকে নিজের পাশে বসিয়ে দিল উজাগর। খুশী খুশী জড়ানো গলায় বলল, 'বস বস ইয়ার।'

খানিকটা চুপচাপ।

কামড়ে কামড়ে বোতলের ছিপিটাকে কেটে ফেলল উজাগর; তারপর সেটাকে গলার ভিতর উপুড় করে দিল। এবার কামিজের খুঁট দিয়ে মুখটা মুছে লখাইর দিকে তাকাল উজাগর, অনেকক্ষণ ধরে লখাইর মুখে কি যেন দেখতে লাগল।

আস্তে আস্তে উজাগর বলল, 'আজই আমি পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে যাব।'

'হাঁ জী।'

'এখানে আমার কাম খতম হয়েছে।'

'হাঁ জী।'.

দিন দশেক ভূষণাবাদের এই 'বীটে' রয়েছে উজাগর সিং। কেমন করে জঙ্গল 'ফেলিং' হবে, কোন গাছ কাটা চলবে, কোনটা চলবে না, ফরেস্ট গার্ড এবং জবাবদারদের ঠিকমত বুঝিয়ে দিয়েছে। এখানকার কাজ তার খতম। আজই সে পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে যাবে।

উজাগর সিং আবার শুরু করল, 'আমার নসীব বড় আচ্ছা। জঙ্গলে তোর মত সাথী না পেলে জিন্দগী বেকার হয়ে যেত।'

লখাই জবাব দেয় না।

উজাগর আপন খেয়ালেই বলে যায়, 'আজই আমি চলে যাব লখাই। যাওয়ার আগে তোকে দু চারটে কথা বলতে চাই। এই জঙ্গলে তুই সাচ্চা দোস্তের কাম করেছিস। রোজ রাতে তুই পথ দেখিয়ে মিমি খিনের কুঠিতে না নিয়ে গেলে জরুর মরে যেতাম। তুই আমার আসলী ইয়ার।'

মাথা নেড়ে লখাই সায় দেয়, 'হাঁ জী—'

একটু নড়েচড়ে বসে উজাগর সিং। তার থলথলে মাংসল ভুঁড়িটা দোল খায়। লখাইকে নিজের দিকে সামান্য টেনে সে বলে, 'আরে ইয়ার, কাছে তো এস। দূর থেকে কি দিলের কথা হয়?'

দু জনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

উজাগর বলতে থাকে, 'জিন্দগীভর হামেশা সব লোককে আমি একটা কথাই বলেছি লখাই। কথাটা কি বল দিকি?'

অনেকটা সময় জবাবের অপেক্ষায় থাকে উজাগর সিং। কিন্তু না, লখাইর জবাব মেলে না।

খুব একচোট খিস্তি করে উজাগর সিং, 'নালায়েক, বুদ্ধু, বুরবক! হরবখত

কথাটা বলছি; দুটো মোটে কথা! উল্লু, হারামী কাঁহাকা, কথা দুটো মগজে রাখতে পারছিস না! আরে কুত্তা, এ জিন্দগী এক রং-তামাশাকা খেল। এই আছে, এই নেই। ঠিক কি না?'

ভয়ে ভয়ে লখাই বলে, 'হাঁ জী—'

এই দশ দিনেই উজাগরের ধাত মোটামুটি বুঝে নিয়েছে লখাই। কখন, কোন কথায়, জবাবের একটু হেরফেরে সে ক্ষেপে উঠবে, আগে থেকে বুঝবার জো নেই। তাই সব সময় তটস্থ হয়ে থাকে লখাই। পারতপক্ষে সে কিছু বলে না। খুব হুঁশিয়ার হয়ে দু চারটে 'হাঁ জী' 'না জী'তেই কাজ চালিয়ে নেয়। উজাগর-চরিত বড় বিচিত্র বস্তু!

উজাগর বলল, 'হামেশা যে কথাটা বলি, সেটাই আবার বলছি। বুঝলি নালায়েক, কথাটা যে ক' দিন বাঁচবি, ইয়াদ রাখবি। ছাখ লখাই, এ জিন্দগীর আয়ু দু দশ রোজ। তাই কোঈ পরোয়া নেই। ফুর্তি ফার্তা, আওরত শরাবে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবি।'

উজাগর সিংয়ের জীবন দর্শনের উপর অটুট শ্রদ্ধা আছে লখাইর। উজাগর সিংয়ের জীবনবোধ আর তার জীবনবোধ হুবহু এক। উজাগর সিং জীবনটাকে যে পদ্ধতিতে ভোগ করতে চায়, সে ব্যাপারে পুরামাত্রায় সমর্থন আছে লখাইর।

উজাগর সিংয়ের জীবনদর্শনের উপর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সমর্থন—সবই তো আছে। কিন্তু দক্ষিণ আন্দামানের এই নিদারুণ জঙ্গলে জীবনকে উজাগর সিংয়ের নিয়মে ভোগ করার উপায় কী? সুযোগ কোথায়? ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে লখাইর। কপালের দু পাশে দুটো অবাধ্য রগ সমানে লাফাতে থাকে।

উজাগর ডাকে, 'এ লখাই—'

'হাঁ জী—'

'এই জঙ্গলে তুই না থাকলে দশটা রোজ বিলকুল বরবাদ হয়ে যেত। তোকে পেয়েছি বলেই ফুর্তিটা জমাতে পেরেছি।'

'হাঁ জী।'

'তুই বড় এলেমদার আদমী।'

'হাঁ জী।'

'ছাখ লখাই, আজই আমি এখান থেকে চলে যাব।' একটু দম নেয়

উজাগর সিং। হাতের আধাশূন্য বোতলটাকে গলায় ঢুকিয়ে বাকীটুকু শেষ করে ফেলে। তারপর শুরু করে, 'আজই যাব, লেকিন যাওয়ার আগে তোকে তিনটে বখশিস দিয়ে যাব।'

'হাঁ জী'—

উজাগর সিং বলে, 'আন্দাজ কর দিকি লখাই, কী বখশিস তোকে দেব?'

হাজার চেষ্টা করেও লখাই বুঝে উঠতে পারে না, কী বখশিস তাকে দিতে চায় উজাগর সিং। কিছুই বলে না সে। অবাক হয়ে উজাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

উজাগর সিং শয়তানী চালে খ্যা খ্যা করে হাসে। হাসির দাপটে তার চোখ দুটো বুঁজে যায়। হাসতে হাসতেই সে বলতে থাকে, 'তোকে নায়েক বানাতে পারলাম না লখাই। বুদ্ধুই রয়ে গেলি তুই। উজবুক কাঁহাকা!'

সস্নেহে লখাইর পিঠে এলোপাথাড়ি চাপড় মারতে মারতে উজাগর আবার শুরু করে। এবার তার গলাটা অনেকখানি খাদে ঢুকে যায়, 'বুঝলি উল্লু, তিন বোতল বিলাইতী শরাব তোকে দেব।'

'সত্যি বলছেন অফসার সাহিব?'

লখাইর চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল।

'সচ্ না তো ঝুট না কি রে শালে!'

উবু হয়ে কাঠের পেটি থেকে তিনটে বোতল বার করে উজাগর লখাইর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এই লে।'

উজাগরের হাত থেকে বোতল তিনটে একরকম ছিনিয়েই নেয় লখাই।

এবার হাতড়ে হাতড়ে কামিজের পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করল উজাগর। লখাইর হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে বলল, 'রুপেয়া আউর শরাব—দুটো চীজ তোকে দিলাম। আউর একটা চীজ তোকে দেব লখাই।'

'কী চীজ?'

'এখন বলব না। পরে দেব।'

'জী।'

আন্দামানের আকাশে কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে হীরামন পাখি এসে পড়েছে। ছোট ছোট পাখিগুলি বেজায় খুশিতে বাতাসে ডিগবাজি খায়। শুধু কি হীরামন; তিতির, গোয়েলেথ, বনটিয়া, চড়ুই—কত পাখিই

না এসেছে! ছোট ছোট পাখি। ছোট ডানা, নরম পালক, তুলতুলে হালকা দেহ।

আন্দামানের আকাশে মৌসুমী পাখিরা এসেছে।

এখন বিকাল।

আজকাল বিকাল থাকতে থাকতেই কুয়াশা পড়ে। কুয়াশার সাদা চিকন একটি পর্দা জঙ্গলটাকে কেমন যেন আবছা এবং দুর্জ্ঞেয় করে তোলে।

'বীটে'র সামনে কুলী-জবাবদার-জমাদার-ফরেস্ট গার্ডরা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এখনই ফরেস্ট অফিসার উজাগর সিং রওনা হবে। ব্যবস্থা হয়েছে, পোর্ট মোয়াটের সড়ক পর্যন্ত শরাবের পেটি, বিছানা এবং একটি পেটরা বয়ে নিয়ে যাবে লখাই। সেখান থেকে মোষের গাড়িতে পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে যাবে উজাগর সিং।

উজাগর সিং রওনা হল। মালপত্র মাথায় চাপিয়ে পিছু পিছু চলল লখাই।

প্রথমেই একটা হাওয়াই বুটির ঝোপ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল দুজনে। পায়ে পায়ে গুঁতো এবং মাথায় টক্কর খেতে খেতে চলেছে উজাগর আর লখাই।

জঙ্গলের ভিতর থেকে আকাশ দেখা যায় না। ডালপালা এবং পাতায় মাথার উপরে নিরেট একটা ছাদ হয়ে রয়েছে। সেই ছাদ ফুঁড়ে পৃথিবীর আলো ঢোকে না।

জঙ্গলের মধ্যে হিম হিম নীলাভ ছায়া। পায়ের নীচে স্যাঁতসেঁতে পিছল মাটি। সে মাটিতে একমাত্র সরীসৃপই জন্মায়। হিলহিলে দেহ নিয়ে এঁকে-বেঁকে শিকারের খোঁজে তারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের চোখে ফসফরাস জ্বলে। সরীসৃপের চোখে জ্বলন্ত ফসফরাস ছাড়া এই আদিম অরণ্যে আর কোন আলো নেই।

সরীসৃপের কামড় খেতে খেতে, জোঁকের পেটে তাজা রক্তের কর দিতে দিতে কখনও গুঁড়ি মেরে কখনও উবু হয়ে দু জনে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত পোর্ট মোয়াটের সড়কে এসে পৌছাল তারা।

জঙ্গলের ওপারে সূর্যটা কতক্ষণ আগে যে নেমে গিয়েছে, কে তার হদিস দেবে? সড়কের দু পাশে হাওয়াই বুটির ঝোপ। ঝোপের ভিতর এখন ঝিঁঝিদের একটানা বিষণ্ণ আলাপ শুরু হয়েছে।

এখন অনেক রাত।

আকাশের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত কেউ যেন আলকাতরার পোঁচ টেনে দিয়েছে।

পোর্ট মোয়াটের সড়কে উঠে উজাগর সিং বলল, 'আজ আর পোর্ট ব্লেয়ার ফিরব না লখাই। এখানেই রাত হয়ে গেল। পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে। তা ছাড়া দিল বলছে, রাতটা এই পুট মুটেই (পোর্ট মোয়াট) কাটিয়ে যাই।'

খ্যা খ্যা করে বিকট শব্দে হেসে উঠল উজাগর সিং।

লখাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

উজাগর আবার বলল, 'কোঈ পরোয়া নেই। আও ইয়ার, আমার পিছু পিছু আ যাও।'

উজাগর কদম ফেলছে আর বিড় বিড় করে সমানে বকছে, 'কোঈ পরোয়া নেই। ছনিয়া লুটেগা, মজা করেগা, ফুর্তি করেগা—'

পোর্ট মোয়াটের চৌধুরীর নাম মঙ ফা।

বড় সড়ক থেকে নেমে কয়েক কদম গেলেই মঙ ফা'র ঝুপড়ি মেলে।

উজাগর সিং সড়ক থেকেই চিল্লাতে লাগল, 'মঙ ফা, মঙ ফা রে—'

লণ্ঠন হাতে একটা মধ্যবয়সী বর্মী বেরিয়ে এল। বলল, 'আদাব, আদাব অফসারজী। আইয়ে—'

মঙ ফা'র ঝুপড়িতে আগে ঢুকল উজাগর সিং। পেঁটরা-পেটি মাথায় নিয়ে লখাইও ঢুকল।

ঝুপড়িটার সামনে ঢাকা বারান্দা। বারান্দায় বাঁশের পাটাতন, বাঁশের মাচান। পেটি-পেঁটরা নামিয়ে মাচানের উপর বসল লখাই।

দশ দিন ধরে সমানে উজাগর সিংয়ের সঙ্গে মঙ ফা'র ঝুপড়িতে এসেছে লখাই। এই মাচানটার উপর কখনও শুয়ে, কখনও বসে, বাড়িয়া পোকা আর মশার অবিরাম উৎপাত সয়ে পুরা দশটা রাত কাটিয়ে দিয়েছে। তারপর সকালে কুয়াশা আর অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যখন জঙ্গলের মাথায় লাল ছোপ ধরতে থাকে, তখন উজাগর সিংয়ের সঙ্গে ভূষণাবাদের 'বীটে' ফিরে গিয়েছে।

একমাত্র মঙ ফা ছাড়া এই ঝুপড়ির আর কাউকেই চেনে না লখাই।

ঝুপড়ির ভিতরেও সে ঢুকে দেখে নি। দশটা রাত বাইরের এই বারান্দায় বসেই কাটিয়ে দিয়েছে।

অন্য অন্য দিন যেমন হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

উজাগর সিং বলল, 'তুই এখানে বসে বসে আরাম কর লখাই। একটু পর মঙ ফা খানা দিয়ে যাবে। সুবেতে (সকালে) আবার মূলাকাত হবে।'

ঝুপড়ির ভিতরে ঢুকল উজাগর সিং। তার পিছু পিছু মঙ ফা।

আর মাচানের উপর অদ্ভুত আক্রোশে লখাইর চোখজোড়া জ্বলতে লাগল।

যাওয়ার সময় মঙ ফা লণ্ঠনটা নিয়ে গিয়েছে। অন্ধকারে বসে রয়েছে লখাই। একদৃষ্টে ঝুপড়ির ঝাঁপটার দিকে তাকিয়ে আছে।

উজাগর সিং আর মঙ ফা ভিতরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বাইরে থেকে বোঝা যায়, ঝুপড়ির ভিতর লণ্ঠন জ্বলছে। কঁ্যাচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প আলো আসছে।

হঠাৎ মনে হল, ভিতরে চাপা গলায় ফিস ফিস করে কারা যেন কথা বলছে। কান খাড়া করে বসল লখাই। কিন্তু না, একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

এবার এদিক সেদিক খুব ভাল করে দেখে নিল লখাই। না, কোথাও কেউ নেই। নিঃসন্দেহ হয়ে গুটি গুটি পায়ে বেড়ার গায়ে চোখ রাখল। কিন্তু কঁ্যাচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক এত সূক্ষ্ম, যার মধ্য দিয়ে মানুষের নজর চলে না।

কিছুই দেখা গেল না। অগত্যা হতাশ হয়ে আবার মাচানে ফিরে এল লখাই।

দশটা রাত ঝুপড়ির বাইরে এই মাচানটার উপর বসে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে লখাই। ঝুপড়ির ভিতরের রহস্য সে জানে না। তবে তার যতদূর আন্দাজ, ঝুপড়িটার ভিতর অনেকগুলো ছোট ছোট খুপরি আছে।

উজাগর সিংয়ের মুখে মিমি খিনের অনেক কিসসাই শুনেছে। কিন্তু তাকে এখন পর্যন্ত দেখে নি। মিমি খিনকে কেমন দেখতে, তার মেজাজ কেমন—ভাবতে চেষ্টা করল লখাই। হাজার চেষ্টা করেও মনের মধ্যে মিমি খিনের একটা পছন্দসই চেহারা খাড়া করতে পারে না সে। আর এই না পারার জন্যই মেজাজটা ভয়ানক ভাবে বিগড়ে যায়।

রাত যত বাড়ছে, মশা আর বাড়িয়া পোকাদের উৎপাতও ততই বাড়ছে।

আরো খানিকটা পর মঙ ফা এল। তার এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে একটা কাঠের বর্তন। বর্তনে ডেলা পাকানো খানিকটা ভাত, চিংড়ি মাছ ভাজা, আস্ত একটা পেঁয়াজ আর লাল টকটকে কিছুটা মাংসের সুরুয়া।

অন্য অন্য রাতের মত একটি কথাও বলল না মঙ ফা। কাঠের বর্তন আর লণ্ঠনটা লখাইর পাশে নামিয়ে রেখে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে ঝাঁপ এঁটে দিল।

কিছুক্ষণ বন্ধ ঝাঁপটার দিকে ভীষণ চোখে তাকিয়ে রইল লখাই। তারপর কে জানে কেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। কাঠের বর্তনটা তুলে গায়ের সমস্ত শক্তিতে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

সারা রাত বাড়িয়া পোকা আর মশাদের জ্বালায় একটু ঘুমাতে পারে নি লখাই। জেগে জেগেই রাত কাবার করে এনেছে।

শেষ রাত্রির দিকে চোখ আর মেলতে পারছিল না লখাই। চোখের পাতাদুটো যেন দু টুকরো ভারী পাথর হয়ে গিয়েছে।

দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা গুঁজে লখাই ঢুলছিল। আচমকা ঘাড়ের কাছে ঝাঁকানি খেয়ে ধড়মড় করে উঠল, 'কে, কে?'

'আ বে আমি। সকাল হয়ে গিয়েছে, এখনও শালে নাক ডাকাচ্ছিস!'

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে উজাগর সিং। চোখ দুটো ডলে জঙ্গলের দিকে তাকাল লখাই। দেখল, সকালের প্রথম রোদের ঘা লেগে কুয়াশা ছিঁড়ে যেতে শুরু করেছে।

উজাগর আবার ডাকল, 'এ লখাই—'

'হাঁ জী—'

'শালে আমি এখন পোর্ট ব্লেয়ার ফিরব। যাবার আগে তোকে আখেরী বখশিসটা দিয়ে যাব। আয় আমার সাথ।'

উজাগরের পিছু পিছু ঝুপড়ির ভিতর ঢুকল লখাই।

বাইরের মাচানে বসে লখাই যা আন্দাজ করেছিল, সেটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। ঝুপড়ির ভিতরে ছোট ছোট খান পাঁচেক খুপরি।

ঝুপড়ির মধ্যে ছেঁড়া ছেঁড়া, আবছা, হিম হিম অন্ধকার। বেড়া এবং পাটাতনের ফাঁক দিয়ে সাদা ধোঁয়ার মত এখনও কুয়াশা ঢুকছে। চারপাশ

থেকে 'নাপ্পি', আধা শুকনো শুই সাপের চামড়া এবং শুঁটকী মাছের দুর্গন্ধ ঝুপড়ির বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। বেড়ার গায়ে বাঁকানো বর্মী দা আর টাঙি ঝুলছে।

শেষ খুপরিতে এসে ঢুকল উজাগর সিং আর লখাই।

একটা বাঁশের মাচানের উপর জাঁকিয়ে বসল উজাগর সিং। বলল, 'শরাব আর রুপেয়া আগেই দিয়েছি। এই আমার আখেরী বখশিস—'

ওপাশের একটা মাচানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল উজাগর সিং।

বাইরের চড়া আলো থেকে ঝুপড়ির অন্ধকারে এসেছে লখাই। চোখে কেমন ধাঁধা লাগছে। আস্তে আস্তে ঝুপড়ির অন্ধকারটাকে চোখে সইয়ে নেবার পর যা দেখল, তাতে খাড়া মেরুদাঁড়াটার ভিতর দিয়ে একটা চমক খেলে গেল।

উজাগর বলল, 'এই হল মিমি খিন, আমার আখেরী বখশিস।'

ঝুপড়ির ভিতরের অন্ধকারটা এখন চোখে সয়ে গিয়েছে।

লখাই দেখল, ওপাশের মাচানটার উপর একটা বর্মী মেয়ে হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তার দেহটা থর থর করে কাঁপছে।

উজাগর সিং বলল, 'এ মিমি খিন, মুখ তোল—'

মিমি খিন মুখ তুলল না। ভাঙা ভাঙা, আবছা অদ্ভুত স্বরে বলতে লাগল, 'এখন তুমি যাও পাঞ্জাববালা। তোমার কাম তো মিটেছে।'

কান্নাকাটি আদৌ পছন্দ করে না উজাগর সিং, ভারি খারাপ লাগে। অথচ সে এলেই মেয়েটা কাঁদতে শুরু করবে! যতক্ষণ সে এখানে থাকবে, মিমি খিনের কান্না থামবে না। ধমকে, গালি দিয়ে, আদর করে কি ডর দেখিয়ে কান্নাটা থামাতে পারে না উজাগর সিং। উজাগর বুঝেই উঠতে পারে না, জোয়ানী মেয়েমানুষ খালি যদি কাঁদেই, তাদের মত দুরন্ত ফুর্তিবাজের চলে কেমন করে?

মিমি খিনের পিঠে একটা হাত রেখে বোঝাতে চেষ্টা করল উজাগর সিং, 'আ রে মুরুখ জেনানা, কাঁদছিস কেন? কেঁদে কোন ফায়দা? এ জিন্দগীর আয়ু তো দু চার রোজ। কেঁদেই জিন্দগী ফৌত করে ফেলতে চাস? কাঁদবিই যদি তো দুনিয়ায় এসেছিলি কেন? জানিস না, দুনিয়ায় কত মজা, কত ফুর্তি, কত রং তামাশার খেল! ফুর্তি কর জেনানা।'

'তুম যাও।'

এতক্ষণ কাঁপা কাঁপা ভাঙা গলায় টেনে টেনে কাঁদছিল। হাঁটুর ফাঁকে মুখ গোঁজা ছিল। সাঁ করে মুখটা তুলে কাতর, তীব্র গলায় ককিয়ে উঠল মিমি খিন, 'তুম যাও।' তার পরেই ঘাড় ভেঙে দুই হাঁটুর ফাঁকে আবার মাথাটা গুঁজে দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এক মুহূর্তের জন্যই মিমি খিনের মুখটা দেখেছে লখাই। আর দেখেই চমকে উঠেছে।

মিমি খিনের মুখের ছাঁদ আর দশটা বর্মী মেয়ের মত নয়। মাজা শ্যামলা রঙ। সুঠাম একটি নাক, টানা টানা দুটি শান্ত চোখ। সারা রাত কেঁদেছে মেয়েটা। তাই চোখ দুটো ফুলে রয়েছে। হঠাৎই লখাইর মনে হল, কালকের রাতটাই শুধু নয়, দশটা রাত ধরেই সমানে কাঁদছে মেয়েটা। দশটা রাতই কি শুধু, কত রাত যে কেঁদে কেঁদে পার করে দিয়েছে মিমি খিন, কে তার হিসাব দেবে?

সুঠাম একটি নাক, মাজা শ্যামলা রঙ, টানা টানা শান্ত দুটি চোখ, সব মিলিয়ে বড় বিষণ্ণ বড় করুণ একটি মুখ। লখাই ভাবতে চেষ্টা করল, কোথায় কবে যেন অবিকল এই রকম আরো একটি মুখ দেখেছে? ঠিক এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারল না লখাই।

লখাইর জীবনে উজাগর সিংয়ের ভূমিকা শেষ হল।

চুয়াল্লিশ

রামপিয়ারীর হাতে জখম হয়ে বেশ কিছু দিন জেল হাসপাতালে কাটাতে হল সোনিয়াকে। এখনও পুরাপুরি সেরে ওঠে নি। তবে জখমের ঘায়ের তেজ অনেকটা মরে এসেছে। দিন দুই হল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে সোনিয়া।

জখমের ঘা সেরে এলেও আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তলপেটের সেই যন্ত্রণাটা সাঙ্ঘাতিক বেড়ে উঠেছে।

এখন বিকাল।

আকাশে একদল মৌসুমী মেঘ দেখা দিয়েছে। টুকরা টুকরা মেঘগুলি এতক্ষণ ছন্নছাড়ার মত বাতাসের খেয়ালে ঘুরে মরছিল। হঠাৎ কী হল, তারা সব এক সঙ্গে মিলে মিশে আকাশের পশ্চিম কোণটাতে জমাট বেঁধে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে আকাশের চেহারাটা ভীষণ ভাবে বদলে যেতে লাগল।

জোট বেঁধে এক দল সাগরপাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। আচমকা আকাশের ভয়ানক চেহারাটা দেখে ভয় পেয়ে তারা কোনদিকে যে উড়ে পালাল, সোনিয়া বলতে পারবে না।

আকাশের পশ্চিম কোণে নিরেট মেঘের স্তূপটাকে দেখলে মনে হয়, যে কোন মুহূর্তে বেশ ঘটা করেই মারাত্মক একটা কিছু শুরু হয়ে যাবে।

সোনিয়া কিছুই দেখছিল না। মেঘ, আকাশ, সাগরপাখি—কোন কিছুই তার মনটাকে ছুঁতে পারছিল না। একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। চোখের তারা দুটো অস্বাভাবিক চক চকে। মনে হয়, জ্বলছে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রয়েছে সোনিয়া। কিন্তু না, রামপিয়ারী এখনও এল না। অন্য অন্য দিন এমন সময় তো রামপিয়ারী এসে পড়ে।

সোনিয়া অস্থির হয়ে উঠল।

ঠিক বিকাল বেলা, যখন সিসোস্ট্রেস উপসাগরে ছোট ছোট ঢেউয়ের ঘা লেগে সোনালী রোদ ভেঙে ভেঙে যেতে থাকে, ঠিক তখনই তলপেটটা চিন চিন করে ওঠে সোনিয়ার। প্রথমে চিন চিন করে, তারপর সেই চিন চিনে

ব্যথাটা বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়ে। শক্ত, নিরেট একটা মাংসের ডেলা নরম তলপেটটাকে ডলে মুচড়ে ওঠানামা করে। সোনিয়ার মনে হয়, দেহ থেকে তলপেটটা আলগা হয়ে খসে পড়বে।

আর ঠিক তখনই আসে রামপিয়ারী।

সোনিয়াকে জখম করে হাসপাতালে এনে আফিমের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে রামপিয়ারী। বিকালে তলপেটের ব্যথাটা যখন সোনিয়াকে কাবু করে ফেলতে থাকে, তখনই একটু আফিম দেয়। আফিমের নেশায় কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকে সোনিয়া। নেশার ঘোরে তলপেটের সেই ব্যথাটার কথা মনে থাকে না। আফিমের নেশা ব্যথার বোধটাকে ভোতা করে ফেলে।

বিকাল হলেই আজকাল অস্থির হয়ে ওঠে সোনিয়া। যতক্ষণ না রামপিয়ারী আসে, দরজার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

আজও তলপেটে চিনচিনানি শুরু হয়েছে।

বিছানায় খাড়া হয়ে উঠে বসল সোনিয়া। গলাটাকে যতটা সম্ভব লম্বা করে দরজার বাইরে যতদূর দেখা যায়, দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু না, রামপিয়ারী আসছে না।

ব্যথাটা বাড়তে শুরু করেছে। দু হাতে তলপেটটা ঠেসে ধরল সোনিয়া। তবু ব্যথাটা দাবানো গেল না।

প্রথমে ক্ষেপে উঠল সোনিয়া। চিৎকার করতে লাগল, 'শালী, হারামী, খচরী এখনও এল না। আমার পেটটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি জরুর মরে যাব।'

ব্যথাটা যত বাড়ছে, ততই হতাশ হয়ে পড়ছে সোনিয়া। তবে কি আজ রামপিয়ারী আসবে না!

যন্ত্রণাটা বাড়তে বাড়তে সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠল। সোনিয়ার শরীরটা বেঁকে দুমড়ে গিয়েছে। বিছানায় ওলট পালট খেতে লাগল সোনিয়া। দুই হাতে তলপেটটা খামচা মেরে ধরে গোঁ গোঁ করে গোঙাতে লাগল, 'মরে যাব, জরুর মরে যাব।'

চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। হাতের মুঠি থেকে তলপেটের মাংস খুলে গিয়েছে। গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বেরুচ্ছে না।

অসহ্য এক যন্ত্রণা সোনিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে।

সন্ধ্যা পার করে দিয়ে রামপিয়ারী এল।

সোনিয়ার শরীরটা তখন ধনুকের মত বেঁকছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সিধা হয়ে যাচ্ছে।

একটুক্ষণ বিছানাটার পাশে দাঁড়িয়ে রইল রামপিয়ারী। তারপর সোনিয়াকে তুলে খাড়া করে বসিয়ে দিল।

রামপিয়ারীকে দেখে সোনিয়া ক্ষেপে উঠল, 'শালী হারামী, পেটের দরদে আমি মরে যাচ্ছি। তোর হুঁশ নেই!'

বলতে বলতে রামপিয়ারীর মুখে চড় চাপড় কষাতে লাগল সোনিয়া। সোনিয়া যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য! আজ কিছুই বলল না টিণ্ডালান রামপিয়ারী। মুখ বুঁজে সোনিয়ার চড় চাপড় খেয়ে গেল। তার মুখে, তুটো পাতাহীন গোল গোল চোখে তুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম হাসি ফুটে বেরিয়েছে। রামপিয়ারীর মনে কি আছে, কে জানে?

সোনিয়া চেঁচাতে লাগল, 'আমার নেশা এনেছিস?'

'চুপ!'

তুই হাতে সোনিয়ার মুখটা চেপে ধরল রামপিয়ারী। চাপা গলায় বলল, 'চুপ মাগী, নেশার জন্ত বেহুঁশ হয়ে যায়! ইয়াদ রাখবি, এটা কয়েদখানা। নেশা নেশা করে চিল্লাবি না।'

বলতে বলতে কাগজের মোড়ক খুলে আফিমের ছোট একটা গুলি বার করল রামপিয়ারী। ঝাঁপিয়ে পড়ে রামপিয়ারীর হাত থেকে সেটা একরকম ছিনিয়েই নিল সোনিয়া। তারপর মুখে পুরে দিল।

আফিমের নেশায় অনেকটা সময় বুঁদ হয়ে রইল সোনিয়া। নেশাটা তলপেটের ব্যথাটাকে ভোতা করে দিয়েছে।

এবার আস্তে আস্তে চোখ মেলল সোনিয়া। ডাকল, 'এ রামপিয়ারী—'

'হাঁ—'

'আজ এত দেরী করে এলি কেন?'

মনস্তত্ত্বে অশিক্ষিত পটুত্ব আছে রামপিয়ারীর। ফিস ফিস করে সে বলল, 'তোর নেশার চীজ জোটাতে গিয়েছিলাম। তাই দেরী হয়ে গেল।'

আসলে ব্যাপারটা একেবারেই অন্ত। আফিম সে অনেক আগেই যোগাড় করে রেখেছিল। রামপিয়ারী শুধু দেখছিল, নেশার অভাবে কতটা কাবু

হতে পারে সোনিয়া! কতখানি কাহিল হতে পারে! ইচ্ছা করেই দেরীতে এসেছে সে।

সোনিয়া বলল, 'কাল থেকে তাড়াতাড়ি আসবি।'

রামপিয়ারী জবাব দিল না। তার মনের সর্পিল গলিঘুঁজিতে কোন দুর্জ্ঞেয় ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে? এই মুহূর্তে রামপিয়ারী কী ভাবছে, একমাত্র সে-ই বুঝি বলতে পারে।

একদৃষ্টে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রামপিয়ারী। তার গোল গোল পাতাহীন চোখজোড়া অস্বাভাবিক জ্বলছে।

বিবির বাজারের মোতি চুলানি প্রায়ই একটা কথা বলত, কাল ভুজঙ্গী। সোনিয়াকে দেখে কথাটা লখাইর মনে পড়ে গিয়েছিল।

লখাই জানে না, বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে কাল ভুজঙ্গীকে আফিমের নেশায় বশ করে ফেলেছে রামপিয়ারী।

পঁয়তাল্লিশ

এইমাত্র মুন্সীজীর মুখে সঠিক খবরটা পেলেন নওয়াজ খান।

পাঁচ বছর আগুপিছু কালাপানি পেরিয়ে তারা এই দ্বীপে এসেছিল। সেই সুবাদে মুন্সীজীর সঙ্গে নওয়াজ খানের অনেক কালের পরিচয়।

এই দ্বীপের অন্য কয়েদীদের মত মুন্সীজীও নওয়াজ খানকে খাতির করে। শুধু খাতিরই নয়, এখানে যা দুর্লভ, সেই ভালবাসাও আছে দু জনের মধ্যে। দেখা হলেই একে অন্যের কুশল জিজ্ঞাসা করে, দিল মর্জি, হাল হকিকতের খবর নেয়। অনেক কাল এক সঙ্গে একই দ্বীপের মাটিতে কাটিয়ে, ফুসফুসে একই নোনা বাতাস টেনে টেনে নিজেদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্কে গড়ে তুলেছেন নওয়াজ খান আর মুন্সীজী।

খাঁটি জাতের মানুষ মুন্সীজী। খানিকটা লেখাপড়াও শিখেছে। দু চার বছর হাই স্কুলেও না কি পড়েছিল।

ঝোঁকের মাথায় সাঙ্ঘাতিক একটা অপরাধ করে এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল মুন্সীজী। অপরাধের জন্য অনুতাপের অন্ত নেই তার। মুখ বুঁজে পুরা দশটা বছর কয়েদ খেটে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। পাপের যে বোধটা মনের উপর ভারী একটা পাথরের মত চেপে ছিল, সারা দিন নিজেকে অকথ্য নির্যাতন করে সেটাকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। দেওয়ালে কপাল ঠুকেছে। হাত-পা কামড়েছে। এক রকম নিজেকে পীড়ন করেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে মুন্সীজী।

পেটি অফিসার যখন ডাণ্ডা হাঁকিয়েছে, 'টিকটিকি'তে চাপিয়ে বেত মেরে যখন তার পাছার মাংস ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, বিস্বাদ কাঞ্জিপানি যখন গলা দিয়ে আর নামতে চায় নি, পাথর ভাঙতে ভাঙতে যখন হাত দুটো খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তখনও গলা দিয়ে একটা শব্দ বার করে নি মুন্সীজী। মুখ বুঁজেই থেকেছে। মুন্সীজীর মনে হয়েছে, এগুলো তার প্রাপ্য।

দশটা বছর কয়েদ খেটে আর নিজেকে নির্যাতন করে এখন খানিকটা স্থির

হয়েছে মুন্সীজী। তবু মাঝে মাঝে সেই অপরাধের বোধটা কোথায় যেন বিঁধতে থাকে। আর তখনই অস্থির হয়ে ওঠে মুন্সীজী।

বড় খাঁটি জাতের মানুষ মুন্সীজী। তা না হলে তার মত একটা সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে নওয়াজ খানের মত অসাধারণের বন্ধুত্ব হয় কেমন করে?

প্রায় নওয়াজ খানের মতই বয়স হবে মুন্সীজীর। মাথার চুলগুলো বকের পাখার মত সফেদ, সাদা। এত বয়স হয়েছে, তবু মেরুদণ্ডটি খাড়া, মজবুত। চওড়া কবজি, চোখের নজর ধারাল।

শাদী করে নি মুন্সীজী। শাদী করার ইচ্ছাও নেই।

মুন্সীজী সেলুলার জেলের রেকর্ড কীপার। কোন কয়েদী কখন বাইরে যায়, কোন 'ফাইলে' কত কয়েদী থাকে, রোজ কত মণ কোপরা কাটা হল, ক'টা বেতের কুর্সি বানানো হল, কোন কয়েদী ক'দিন ডাণ্ডা বেড়ির সাজা পেয়েছে, কোন কয়েদী ক' ঘা বেত খেল—এ সবের রেকর্ড রাখতে হয় তাকে। রেকর্ড রাখাই তার কাজ, তার নোকরি। এ জন্য মাসে মাসে সাত টাকা তলব পায় মুন্সীজী।

দু রোজের ছুটি নিয়ে মচ্ছি লাইনে গিয়েছিল মুন্সীজী। সেখান থেকে তাকে খুঁজে বার করেছেন নওয়াজ খান। সিসোস্ট্রেস উপসাগরের পারে একটা নারকেল বাগিচায় এসে বসেছে দু জনে।

চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে যতদুর দেখা যায় একবার দেখে নিল মুন্সীজী। না, আশে পাশে কেউ নেই। অনেকটা দূরে একদল কয়েদী উপসাগরের বাঁধ মেরামত করছে।

নিঃসন্দেহ হয়ে মুন্সীজী বলল, 'খবরটা সাচ্চা।'

নওয়াজ খান বললেন, 'ছোকরাদের বাহাদুর বলতে হবে। আমরা যা পারি নি, ওরা তা করে ফেলল। বাহাদুর; কী বল মুন্সীজী?'

'হাঁ হাঁ। ও তো ঠিক।'

'তুমি ঠিক জান,মেনল্যাণ্ডে (ইণ্ডিয়া) ইংরাজদের সাথ ভারী লড়াই হয়েছে?'

'সেই রকমই তো শুনেছি।'

'কী শুনেছ?'

নওয়াজ খান মুন্সীজীর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। উত্তেজনায় তাঁর চোখজোড়া চক চক করছে। হাতের মুঠি দুটো পাকিয়ে আসছে।

মুন্সীজী বলল, 'বাঙলা মুলুকে ইংরাজদের সাথ একটা ভারী লড়াই হয়েছে। বেশী দিন ইংরাজকে আর ইণ্ডিয়ায় থাকতে হবে না।'

'বল কি!'

'তাই তো মালুম হচ্ছে। লড়াইতে অনেক ইংরাজ বিলকুল খতম হয়ে গেছে। অবস্থা খুব খারাপ খান সাহেব।'

'কি করে বুঝলে?'

'চীফ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, জেলার আর সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব ঘন ঘন মুলাকাত করছে। কি একটা পরামর্শ যেন চলছে!'

নওয়াজ খান উদগ্রীব হয়ে উঠলেন, 'কি পরামর্শ করছে কিছু শুনেছ?'

'না খান সাহেব। তবে আন্দাজ করছি।'

সতর্ক চোখে চারদিক একবার দেখে নেয় মুন্সীজী। তারপর ফিস ফিস করে বলতে থাকে, 'বাঙলা মুলুকে ইংরাজদের সাথ যে লড়াই হয়েছে, মনে হয়, সে ব্যাপার নিয়ে কমিশনার সাহেবেরা খুব ঝামেলায় পড়েছে।'

'হুঁ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ নওয়াজ খান বললেন, 'তোমার কি মনে হয় মুন্সীজী, বাঙলা মুলুকে ইংরেজদের সাথ বেশ বড় লড়াই হয়েছে?'

'হাঁ, তাই তো মনে হয়।' মুন্সীজী বলতে লাগল, 'বড় লড়াই যদি না হবে, তবে জাহাজ ভরে কয়েদী আসবে কেন?'

সামনের দিকে তাকালেন নওয়াজ খান। সিসোস্ট্রেস উপসাগরের মাথায় এক ঝাঁক সাগরপাখি অহেতুক উড়ে বেড়াচ্ছে। তেজী রোদের টানে নীল জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। যতদূর তাকানো যায়, মনে হয়, সাদা কুয়াশা জমেছে। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, কুয়াশা নয়, বাষ্প উড়ছে।

কি যেন ভাবছিলেন নওয়াজ খান। নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকটা সময় পর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা মুন্সীজী, এবার জাহাজ তো বাঙলা মুলুক থেকেই আসছে?'

'হাঁ।'

'কবে আসছে?'

'বিশ পঁচিশ রোজের ভিতর এসে পড়বে।'

এক সময় উঠে পড়লেন নওয়াজ খান। সিসোস্ট্রেস উপসাগরের পার দিয়ে

যে সড়কটা আটলান্টা পয়েন্টে বাঁক ঘুরে ফোনিক্স বে'র দিকে চলে গিয়েছে, সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

ভোর হতে না হতেই ভিলানিপুরের কুঠি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন বন্দা নওয়াজ খান। আন্দামানের বাতাসে যে গুজবটা উড়ছিল, সেটার সত্যমিথ্যা যাচাই করার জন্য মচ্ছি লাইনে গিয়ে মুন্সীজীকে খুঁজে বার করেছেন। খাঁটি খবরটা নিয়ে এখন কুঠিতে ফিরছেন।

এখন দুপুর। হাঁটতে হাঁটতে ফোনিক্স উপসাগরের কাছাকাছি এসে পড়েছেন নওয়াজ খান।

ফোনিক্স উপসাগরটা জ্বলছে। অনেক দূরে লবণ-মেশা বিপুল দরিয়াটা জ্বলছে। ফোনিক্স উপসাগরের মাথায় বিরাট এক টুকরা নীল আকাশ জ্বলছে।

উপসাগরের পার দিয়ে সড়ক। চলতে চলতে একবার থমকে পড়লেন নওয়াজ খান। সাদা ভুরুর উপর হাত রেখে আকাশের দিকে তাকালেন। বুঝি বা বেলা কতটা হয়েছে, আন্দাজ করতে চাইলেন। তারপরেই আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

আকাশ জ্বলছে, সমুদ্র জ্বলছে। শুধু কি আকাশ আর সমুদ্র, নওয়াজ খানের মনে হল, শিথিল, কোঁচকানো চামড়ার তলায় অনেক, অনেক কাল পরে রক্তও জ্বলতে শুরু করেছে। ঠিক জ্বলছে না, ফুটছে। টগবগ করে ফুটছে।

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা সত্তর না আশী বছর ধরে সমানে টিক টিক করে বাজছে। সেটার অস্তিত্ব একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন নওয়াজ খান। কতকাল পর যেন হৃৎপিণ্ডটা আবার উন্মাদ বেগে লাফাতে শুরু করেছে। সরু সরু শিরা বেয়ে মন্থর, হিম হিম রক্ত তির তির করে বইত। সেই রক্তই হঠাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসে ধমনীতে ঘা মারছে।

অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন নওয়াজ খান।

নওয়াজ খান ভাবছিলেন। ছন্নছাড়া কতকগুলো ভাবনা তাঁর মাথায় ভর করেছে। একটু আগে মুন্সীজী যে খবরটা দিয়েছে, সেটার সঙ্গে এই ভাবনা-গুলোর আশ্চর্য যোগ আছে।

তিপান্ন বছর আগে একদিন বুকের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিয়ে এই দ্বীপে এসেছিলেন। বুকের সেই আগুনটাকে নিজের মধ্যেই ধরে রাখতে চান নি নওয়াজ খান। অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সেই আগুন কাদের দিয়ে যাবেন তিনি? এই দ্বীপে মাসে মাসে যারা কয়েদ খাটতে আসে, তারা কি মানুষ! তারা ঠগ্‌-লুঠেরা-খুনী; ইন্দ্রিয় আর আদিম প্রবৃত্তির বশ একদল বিচিত্র জীব। নওয়াজ খানের মনে হয়, মানুষের আকৃতির মধ্যে কতকগুলি কুৎসিত বর্বর প্রতি মাসে জাহাজ ভরে এখানে আসে। এরা সিপাহী বিদ্রোহের মহিমা বোঝে না, দেশের আজাদীর জন্য এদের মাথা ব্যথা নেই। কিছু নেশার চীজ আর নারী মাংস পেলেই এরা খুশী, তৃপ্ত। জীবনে এই-ই তাদের চূড়ান্ত চাওয়া। এর চেয়ে বেশী দাবী তাদের নেই। নারী-নেশা, অশ্লীল গুলতানি, খিস্তি-খেউর—এগুলির মধ্যেই তাদের যা কিছু মাহাত্ম্য। এর বাইরে তারা কিছুই বোঝে না, বুঝতেও চায় না।

প্রথম প্রথম ক্ষেপে উঠতেন নওয়াজ খান। গালি দিতেন, 'শালারা শরাব আর আওরত ছাড়া কিছুই বুঝিস না!'

নওয়াজ খানের গালি তারা গায়ে মাখত না। বরঞ্চ আমোদই লাগত তাদের। খ্যা খ্যা করে হেসে বলত, 'ঠিক ধরেছেন খান সাহেব, দুনিয়ায় ও দুটো চীজ ছাড়া কুছু নেই।'

অনেক বছর এই দ্বীপে থেকে, অনেক দেখে, অনেক ঠেকে এখন অনেক কিছু শিখেছেন নওয়াজ খান। এই মানুষগুলোর উপর ক্ষেপে উঠলে কোন লাভই হবে না। উপরন্তু এরা নাগালের বাইরে চলে যাবে।

এই মানুষগুলোর দেশ-কাল সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। দুনিয়ার কাছ থকে কতকগুলি উৎকট জৈবিক সুখভোগ ছাড়া এরা আর কিছুই শেখে নি।

নেশা আর নারী ছাড়া জীবনে অন্য মাহাত্ম্যও যে আছে, হাজার চেষ্টা করেও একথা এদের বোঝাতে পারেন নি নওয়াজ খান।

এই দ্বীপে এমন একটি মানুষ তাঁর চোখে পড়ে নি, যার মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের সেই আগুন তিনি রেখে যেতে পারেন।

সূর্যটা সরাসরি মাথার উপর এসে পড়েছে। উপসাগরটা ক্ষেপে উঠেছে। কিন্তু কোন দিকে খেয়াল নেই নওয়াজ খানের। আগের ভাবনাগুলোর খেই ধরে তিনি ভেবেই চলেছেন।

তেমন মানুষ কি তিনি পান নি, যার মধ্যে সিপাহী যুদ্ধের সেই আগুন দিয়ে যেতে পারেন? যে তাঁর জ্বালাটা বুঝতে চায়? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলেন নওয়াজ খান। জবাবটাও নিজের কাছ থেকেই পেলেন।

সেটা আঠার শ পঁচাশী কি ছিয়াশী সাল। সঠিক তারিখটা মনে নেই।

এই দ্বীপে থেকেই তিনি খবরটা পেয়েছিলেন। বর্মা মুলুকের মান্দালয়ে নাকি ইংরেজদের সঙ্গে বর্মীদের লড়াই হয়েছে। খবরটা এনেছিল একটা বর্মী শেল ডাইভার। মোটর বোট ভরসা করে লোকটা বিপুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দামান আসত। আন্দামানের দরিয়া থেকে নানা ধরনের শঙ্খ-কড়ি-শামুক —যাদের নাম টার্বো-ট্রোকাস-নটিলাস, তুলে নিয়ে রেঙ্গুনে বিক্রী করত। এটাই ছিল তার জীবিকা।

শেল ডাইভারটাই খবর দিয়েছিল, আজাদীর জন্য রাজা থিবো ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। লড়াইতে থিবো হেরে গিয়েছেন। থিবোর যুদ্ধের আসামীদের নাকি আন্দামান চালান দেওয়া হবে। সত্যিসত্যিই একদিন আন্দামানে খবর এল, থিবোর যুদ্ধের বন্দীরা আসছে।

সেই দিনগুলো অদ্ভুত এক উত্তেজনায় কাটছিল। নওয়াজ খান ভেবেছিলেন, থিবোর যুদ্ধের বন্দীরা এলেই কাজে নেমে পড়বেন। আঠার শ সাতান্নর যে আগুন নিয়ে তিনি আন্দামান এসেছিলেন, সে আগুন আত্মপ্রকাশের একটা পথ চায়। সেই পথই বুঝি এবার পাওয়া যাবে। ভেবেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের মতই একটা বিদ্রোহ করবেন এই দ্বীপে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, থিবোর যুদ্ধের বন্দীরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। যারা ভারতবর্ষকে আজাদ করতে চায়, আর যারা বর্মা মুলুককে আজাদ রাখতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য এক। তাদের শত্রুও এক। সে শত্রু ইংরেজ। নওয়াজ খানের মনে হয়েছিল, (এখনও মনে হয়) দেশের আজাদীর জন্য বর্মা এবং ভারতবর্ষকে এক হতে হবে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে সেই একতার ছোটখাটো একটা ভূমিকা তৈরী করে দিয়ে যাবেন তিনি।

রোজই আশায় উদ্বেগে সিসোস্ট্রেস উপসাগরের পারে আসতেন নওয়াজ খান। রোজই ভাবতেন, থিবোর যুদ্ধের বন্দী নিয়ে আজই জাহাজ আসবে। কিন্তু জাহাজ আর আসে না। শেষ পর্যন্ত যেদিন জাহাজ এল, সেই দিনই দুজন জমাদার আর দুজন পুলিস তাঁকে ভাইপার দ্বীপের কয়েদখানায় নিয়ে গেল।

ভাইপারের কয়েদখানায় পুরা দশটা বছর কাটিয়েছেন নওয়াজ খান। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের আগুনের সঙ্গে থিবোর যুদ্ধের আগুন তিনি মেলাবেন। কিন্তু ইচ্ছাটা ইচ্ছাই রয়ে গেল। কোনদিন পূরণ আর করতে পারলেন না।

দশ বছর পর ভাইপার থেকে পোর্ট ব্লেয়ার এসে শুনলেন, থিবোর যুদ্ধের আসামীদের কেউ কেউ দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দিত্বের জ্বালা জুড়িয়েছে। কেউ কেউ ফরেস্টের কাজে গিয়ে জারোয়াদের তীরে প্রাণ দিয়েছে। কেউ কেউ বুকের আগুন নিবিয়ে চাউঙে গিয়ে ফুঙ্গি হবার তোড় জোড় করছে। (নওয়াজ খান দেখেছেন, এর কয়েক বছর পর পুরাদস্তুর এক ফুঙ্গি হয়ে বসেছে লা ডিন।)

অবুঝ এক ব্যথায় বোবা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ভাবতে ভাবতেই এগুচ্ছিলেন নওয়াজ খান। এক সময় উপসাগরের পার থেকে বাঁ দিকের একটা টিলার উপর উঠতে লাগলেন। হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়ল তাঁর। সে সুন্দর খান। যে আগুন তাঁর বুকে সেই আঠার শ সাতান্ন থেকে জ্বলছে, সেই আগুনেরই একটা ঝলক তিনি সুন্দর খানের মধ্যে দেখেছিলেন।

একটু চমকে উঠলেন নওয়াজ খান। এই মুহূর্তে তিনি সুন্দর খানের কথা ভাবতে চান না। আস্তে আস্তে মন থেকে সুন্দর খানের ভাবনাটাকে সরিয়ে দিলেন নওয়াজ খান।

টিলার মাথায় উঠে পড়েছেন নওয়াজ খান। এর পরেই উতরাই বেয়ে তাঁকে নীচে নামতে হবে। এখান থেকে তাঁর ডিলানিপুরের কুঠিটা দেখা যাচ্ছে। একবার পিছন দিকে মুখটা ঘোরালেন নওয়াজ খান। উপসাগরটা জ্বলছে। বেশীক্ষণ উপসাগরের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখ দুটো ঝলসে যেতে থাকে।

শিরায় শিরায় রক্ত ফুটছে। মাথার মধ্যে আন্দামানের পেনাল কলোনির জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনা ভিড় জমাচ্ছে। চারপাশে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। নিজেকে আর খাড়া রাখতে পারছেন না নওয়াজ খান। মাথাটা ঘুরছে। সত্তর আশী বছরের এই দুর্বল, অশক্ত দেহ একদিনে এতখানি উত্তেজনা, এতখানি ধকল সহ্য করতে পারছে না।

টলতে টলতে নীচের দিকে নামতে লাগলেন নওয়াজ খান। নামতে নামতে তাঁর মনে হল, অনেক বয়স হয়েছে। সামান্য উত্তেজনাতেই আজকাল বড় কাবু হয়ে পড়েন। মনে হল, বেশী দিন তিনি আর বাঁচবেন না। কিন্তু যে কটা দিন বাঁচবেন, তার মধ্যে জীবনের শেষ কাজটা যেমন করে হোক, করে যাবেন। আঠার শ সাতান্নর যে আগুন নিয়ে তিনি আন্দামান এসেছিলেন,

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি তা নিবে যাবে? অনেক, অনেক দিন পর আবার একটা সুযোগ এসেছে। তাঁর জীবনে এটাই সম্ভবত শেষ সুযোগ। থিবোর যুদ্ধের বন্দীদের নিয়ে তিনি যা পারেন নি, এবার তা পারবেন। তাঁকে পারতেই হবে।

এই মাত্র মুন্সীজীর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছেন, বাঙলা মুলুকে ইংরাজদের সঙ্গে আজাদীর জন্য তুমুল লড়াই হয়েছে। সেই লড়াইতে বন্দী হয়ে একদল কয়েদী আন্দামান আসছে। বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যেই তারা এসে পড়বে।

এই বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যেই নওয়াজ খান তাঁর কাজ শেষ করে ফেলবেন। এই বয়সে, এই দুর্বল অশক্ত দেহে কতখানি কাজ করাই বা সম্ভব? তিনি শুধু ভূমিকা করে দিয়ে যাবেন। তার উপর দাঁড়িয়ে নতুন কালের বন্দীরা যাতে প্রেরণা পায়, তার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে নওয়াজ খানের অনেক দায়িত্ব। সে দায়িত্ব তাঁকে পালন করতেই হবে।

তিপান্ন বছর বুকের ভিতর যে আগুন বয়ে বেড়াচ্ছেন, বার বার তা অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন নওয়াজ খান। বার বার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

কিন্তু এবার ব্যর্থ হলে চলবে না।

ছিচল্লিশ

এই পৃথিবীতে কতকগুলি মানুষ শুধু তোষামোদ করতেই জন্মায়।

মাউ খে হচ্ছে সেই জাতের মানুষ।

তোষামুদির মাহাত্ম্য সে পুরাপুরি বোঝে। তার মতে, এই দুনিয়ায় এমন একটা মানুষ নেই, তোষামুদিতে যে কাবু হয় না।

দুনিয়ায় এসে এই শিক্ষাটাই সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছে মাউ খে। কারো কাছ থেকে কিছু বাগাতে চাও? কোন মতলব হাসিল করতে চাও? তবে স্রেফ তোষামোদ করে যাও। এক দিন না এক দিন বাজি মাত করতে পারবেই।

তোষামুদির যে কি মহিমা, সাত দিনের মধ্যেই চান্নু সিংকে বুঝিয়ে দিল মাউ খে।

চাটুকারি এবং তোষামুদির সব রকম কলাকৌশল মাউ খে'র আয়ত্তে।

এমন যে জবরদস্ত পিয়ারীলাল, নিয়ম কানুনের বাইরে যে এক কদমও হাঁটে না, তাকে পর্যন্ত টলিয়ে ফেলেছে মাউ খে।

তিন দিন ধরে ঠিক এই সময়টায় চান্নু সিং আর মাউ খে সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে।

এখন দুপুর। সূর্যটা সিধা মাথার উপর পৌছে গিয়েছে।

কয়েদখানার গা ঘেঁষে একটা নারকেল বাগিচা। সারাদিনের মধ্যে নারকেল গাছের ছায়াগুলো ঠিক এই সময়ে সব চেয়ে ছোট হয়ে যায়। সামনে সিসোস্ট্রেস উপসাগর। বিরাট বিরাট ঢেউগুলি খাড়া হয়ে দুর্জয় বেগে দ্বীপের দিকে ধাওয়া করে আসে। নারকেলের পাতায় পাতায় ঝড়ো বাতাস সাঁই সাঁই করে বেজে যায়।

বাঁ হাতের কনুই দিয়ে চান্নু সিংয়ের পাঁজরে বেশ জোরেই একটা ঠেলা মারল মাউ খে। ডাকল, 'এ চান্নু—'

'হাঁ।'

'তোকে আগেই বলেছিলাম—'

'হাঁ।'

কোন দিকে হুঁশ নেই চান্নু সিংয়ের। একদৃষ্টে সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার ফটকটার দিকে চেয়ে রয়েছে সে। মাউ খে'র কথার জবাবে মাঝে মাঝে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছে।

মাউ খে সমানে বকর বকর করছে, 'তোকে আগেই বলেছিলাম, তোষা-মুদিতে আসমান তুনিয়া টলে যায়।'

'হাঁ।' অন্যমনস্কভাবে চান্নু সিং সায় দিল।

চান্নু সিংয়ের জবাবের জন্য বিশেষ মাথা ব্যথা নেই মাউ খে'র। নিজের মনেই সে বকে যায়, 'আর এ তো পিয়ারীলাল! শালে বড় কান্থনের বন্দা এয়েছে! সাত রোজ তোষামুদি করে কুত্তাটাকে হাতের মুঠায় এনেছি।'

'হাঁ।'

'আরে ছোঃ, এমন কান্থনের বন্দা আমি বহুত দেখেছি! বুঝলি চান্নু, কাম হাসিলের জন্যে লোকের পায়ে ধরবি, ভাই বলবি, বাপ বলবি। তাতেও যদি না হয়, স্রেফ বোনাই বলবি। হিক—হিক—হিক—'

হিক্কার মত অদ্ভুত শব্দ করে খুব এক চোট হাসে মাউ খে। হাসির দাপটে তার কুতকুতে চোখ দুটো বুঁজে যায়।

হাসির তোড় কিছুটা কমলে চান্নু সিংয়ের দিকে তাকাল মাউ খে। সে যে এত হাসল, তবু খেয়াল নেই চান্নুর। একদৃষ্টে কয়েদখানার দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

মাউ খে ডাকল, 'চান্নু—'

'হাঁ—হাঁ—' চান্নু ধড়মড় করে উঠল, 'কি বলছিল শালে?'

'কী ভাবছিস?'

'ভাবছি পিয়ারীলাল তো এখনও বেরুচ্ছে না।'

পিয়ারীলাল সাউথ পয়েন্ট কয়েদখানার কয়েদিনীদের তাঁত বুনতে শেখায়। সকালে কয়েদখানায় ঢোকে ; দুপুরে সূর্যটা যখন মাথার উপর আসে, ঠিক তখন খানাপিনার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তিন দিন ধরে ঠিক এই সময়টায় পিয়ারী-লালকে ধরছে চান্নু সিং।

সমানে তোয়াজ করে, তোয়ামোদ করে, বাপ-ভাই-বোনাই—যখন যা মুখে এসেছে, তা-ই ডেকে পিয়ারীলালকে কাবু করে ফেলেছে মাউ খে। ব্যবস্থা হয়েছে, রোজ দুপুরে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে সোনিয়ার খবর দেবে

পিয়ারীলাল। ব্যবস্থা অনুযায়ী চান্নু সিংরা আজ তিন দিন ধরে কয়েদখানার পাশের নারকেল বাগিচাটায় এসে দাঁড়াচ্ছে।

চান্নু সিং উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'নাঃ, পিয়ারী শালে একটা কুত্তা। হারামীটা এখনও তো বেরুচ্ছে না! কি হল, বল দিকি?'

'ফায়া (বুদ্ধ) মালুম।'

বড় নির্বিকার দেখায় মাউ খে'কে।

'শালের জান তুড়ব।' চান্নু সিং দাঁতে দাঁত ঘষে আর মাটিতে পা ঠোকে।

চান্নু সিংয়ের উত্তেজনার কারণ আছে।

কাল এবং পরশু মাউ খে'কে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছিল চান্নু সিং। পিয়ারীলাল সোনিয়ার যে খবর এনেছিল, তাতে আদৌ খুশী হয় নি সে। সোনিয়া সেই যে রামপিয়ারীর হাতে জখম হয়েছিল, তারপর থেকে মাথাটা না কি বিগড়ে যাচ্ছে। তার মতিগতি বুঝবার উপায় নেই। কখনও বলছে শাদী করবে, কখনও বলছে কয়েদখানা ছেড়ে কোথাও যাবে না। সোনিয়া যে ঠিক কি চায়, হাজার চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারে নি পিয়ারীলাল। চান্নু সিংকে সে বলেছে, 'জোয়ানী ছোকড়ির দিল বড় ঝামেলার ব্যাপার। এই বলে শাদী করব, এই বলে করব না। মালুম হচ্ছে, সোনিয়ার শির বিলকুল খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

এই খবরটা পাওয়ার পর থেকেই চান্নু সিংয়েরই শির খারাপ হতে বসেছে। উত্তেজনা এবং অস্থিরতা একটু একটু করে বেড়েই চলেছে।

সূর্যটা পশ্চিম দিকে হেলতে শুরু করেছে। নারকেল গাছের ছায়াগুলো আবার একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা মিলল। কয়েদখানার ফটক পেরিয়ে লম্বা লম্বা কদমে এদিকেই এগিয়ে আসছে পিয়ারীলাল।

এক রকম দৌড়েই পিয়ারীলালের সামনে এসে পড়ল চান্নু সিং। তার পিছু পিছু এল মাউ খে।

পিয়ারীলাল দাঁত বার করে হাসল। বলল, 'কি রে শালেরা, আজও এসেছিস?'

মাউ খে বলল, 'হাঁ বড়া ভাই।'

হঠাৎ মুখটাকে কাঁচুমাচু করে ফেলল মাউ খে। আবার শুরু করল, 'আপনি তো সবই বোঝেন বড়া ভাই। সোনিয়ার জন্যে চান্নুর দিলটা—'

কথাটা আর পুরা করে না মাউ খে। কথাটা পুরা না করলেও, সে যা বলতে চায়, সেটা পুরাই বুঝে ফেলে পিয়ারীলাল।

বিরাট চেহারার চান্নু সিং এক পাশে দাঁড়িয়ে সমানে দু হাত কচলাচ্ছে। এবার সে বলল, 'আপনাকে তো সবই বলেছি পিয়ারীলালজী। এ্যাদ্দিনে সোনিয়ার সাথ আমার শাদীটা হয়ে যেত। লেকিন রামপিয়ারী কুত্তীটার জন্যে হল না।'

এক পাশে চান্নু সিং, আর এক পাশে মাউ খে, মধ্যে পিয়ারীলাল। এক সময় তিনজনে সিসোস্ট্রেস উপসাগরের পার ধরে এবারডীন বাজারের দিকে চলতে শুরু করল।

পিয়ারীলাল ডাকল, 'এ চান্নু—'

'হাঁ জী—'

দু কদম পিছিয়ে পড়েছিল চান্নু সিং। দৌড়ে পিয়ারীলালের পাশে এসে পড়ল। বলল, 'কি বলছেন জী?'

'তোর নসীবটা বড় ভাল।'

'কেমন, কেমন?' চান্নু সিং পিয়ারীলালের উপর ঝুঁকে পড়ল।

'আরে মুরুখ, সোনিয়া আজ আপনা থেকেই শাদীর কথা বলল।'

'সচ্ (সত্যি)?'

'সচ্।' পিয়ারীলাল বলতে লাগল, 'সোনিয়া তোকে একটা কাম করতে বলেছে। কামটা জলদি জলদি করতে হবে।'

'কি কাম জী?'

'আজই ডিপটি (ডেপুটি) কমিশনারের অফিসে গিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করে ফেলবি। যত তাড়াতাড়ি পারবি সোনিয়াকে কয়েদখানা থেকে নিয়ে আসবি। বুঝেছিস?'

'হাঁ জী—'

'একটা আচ্ছা খবর দিলাম। দিলমর্জি খুশ হল তো?'

'হাঁ জী—'

পাশ থেকে মাউ খে হল্লা করে উঠল, 'পিয়ারীলালজী, আপনি আমাদের সাচ্চা দোস্ত। আপনার মাফিক দিলওয়ালা বড়া ভাই তামাম জিন্দগীতে আর দেখি নি।'

বলেই পিয়ারীলালের পিছন দিয়ে ঘুরে চান্নু সিংয়ের কাছে এল

মাউ খে। তার একটা হাত ধরে টান মারল। বলল, 'আমার সাথ চল চান্নু—'

তাজ্জব হয়ে চান্নু বলল, 'কোথায় যাব?'

মাউ খে খেঁকিয়ে উঠল, 'নালায়েক বুদ্ধু কাঁহাকা! যাবি ডিপটি কমিশনার সাহাবের অফিসে। শাদীর ব্যবস্থা করতে হবে না?'

চান্নু সিং আর কিছু বলল না। বরাবর যা করে আসছে, তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

মনে মনে মাউ খে'র খাসা বুদ্ধিটার তারিফ করতে লাগল চান্নু সিং।

সাতচল্লিশ

বেশ কিছুদিন হল ভুষণাবাদের এই 'বীটে' এসেছে লখাই। ফরেস্ট গার্ড আবর খানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জঙ্গলের চেহারাটা অনেকখানি দেখে ফেলেছে। প্যাডক, ধুপ, মার্বেল উড, টমপিঙ, পেমা, দিদু, জারুল—নানা জাতের গাছ আর লতাও চিনেছে।

কিন্তু জঙ্গলের চেহারা দেখা আর তার স্বরূপ বোঝা এক নয়।

আন্দামানের জঙ্গলের যে কি মহিমা, আজ খানিকটা টের পেল লখাই।

গত দুটো দিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরেছে। মুহূর্তের জন্য সে বৃষ্টি থামে নি।

দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে টুকরা টুকরা মৌসুমী মেঘ এই দ্বীপের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ভারতবর্ষের মেনল্যাণ্ডের দিকে চলে যায়। হঠাৎ কি খেয়াল হল, আন্দামানের আকাশে টুকরা টুকরা মেঘগুলি জমাট বাঁধতে লাগল। বঙ্গোপসাগর থেকে সূর্যের তাপে যে জলকণাগুলি মেঘ হয়ে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়েছিল, প্রকৃতির কোন একটা গূঢ় কারসাজিতে শেষ পর্যন্ত তারা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারল না। আন্দামানের আকাশে দু দিন আটক থেকে অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরাল।

বৃষ্টির জন্য দু দিন কেউ ঝুপড়ি থেকে বেরুতে পারে নি। কাজ কর্ম সব বন্ধ ছিল। এই দুদিন 'ফেলিং' হয় নি।

দু দিন অবিরাম বৃষ্টির পর প্রকৃতির হঠকারিতা অনেকটা কমে এসেছে। মেঘ কেটে যেতে শুরু করেছে। আজ সকাল থেকেই বৃষ্টিটা ধরেছে। মেঘ ভাঙা খানিকটা ঘোলাটে রোদও দেখা দিয়েছে।

কুলী-জবাবদার-ফরেস্ট গার্ড-পুলিসী জমাদার—যে যার ঝুপড়িতে দুদিন আটক হয়ে ছিল। দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়ে হল্লা করতে করতে তারা বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা পরেই 'ফেলিং' এর জন্য তৈরী হয়ে নিল সকলে।

কুড়াল-করাত-গাঁইতি সমেত একদল কুলী নিয়ে লখাই ছুটল।

প্রায় মাস খানেক কাবার হতে চলল, তুষণাবাদের এই 'বীটে' এসেছে লখাই। এর মধ্যে বিরাট একটা পেমা গাছ কাটা আর দুটো হাওয়াই বুটির জঙ্গল সাফ করা ছাড়া 'ফেলিং' এর কাজ বিশেষ এগোয় নি।

আজকের কাজ হল ছোট ছোট জারুল গাছের একটা ঝোপ সাফ করা। জারুল গাছের এই ঝোপটার পরেই বিরাট বিরাট ক'টা গর্জন গাছ আকাশের দিকে খাড়া মাথা তুলে রয়েছে।

দু দিন বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে গাছের পাতাগুলির মসৃণতা বেড়েছে। মেঘ ভাঙা ঘোলাটে রোদে জঙ্গলের মাথাটা চক চক করছে।

লখাইরা জারুল গাছের ঝোপটার কাছে এসে পড়ল।

এমনিতেই জঙ্গলের মাটি স্যাঁতসেঁতে, পিছল। নীলাভ শ্যাওলার পুরু একটি স্তর তার উপর পড়ে রয়েছে। দু দিনের অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সেই মাটি থক থক করছে। পা ফেললেই হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যায়।

এক পাশ দাঁড়িয়ে জবাবদারি করতে লাগল লখাই, 'মারো জোয়ান, মারো কোপ—জোরসে মরদ মারো কোপ।'

'হেঁই—হেঁই—হেঁইও—'

বেঁটে জারুল গাছগুলির গায়ে কুড়ালের কোপ পড়তে লাগল। কোপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের মাথা থেকে থোকায় থোকায় জোঁক ঝরতে শুরু করল। কুলীদের গায়ের উপর পড়ে চামড়া ফুটো করে তারা রক্ত চুষতে থাকে। এক একবার দূরে গিয়ে জোঁক ছাড়ায় কুলীরা, আবার এসে গাছে কোপ মারে।

লখাইর হাতে একটা বর্মী দা বাগিয়ে ধরা। দা'টা দিয়ে গা থেকে জোঁক চেঁছে ফেলছে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, 'মারো জোয়ান—'

কত জোঁক আর চেঁছে ফেলবে লখাই? যেগুলি অলক্ষ্যে থেকে যাচ্ছে, রক্ত চুষে চুষে কচি তেলাকুচের মত ফুলে আপনা থেকেই খসে পড়ছে।

শুধু কি জোঁক! দু দিনের বৃষ্টিতে এই জঙ্গলের সমস্ত গর্ত বুঁজে গিয়েছে। গর্তই যাদের আশ্রয়, সেই লক্ষ লক্ষ পোকা-মাকড়-সরীসৃপ বৃষ্টির দাপটে বেরিয়ে পড়েছে। বৃষ্টির উপর যে আক্রোশ তারা মেটাতে পারে নি, প্রাণভরে মানুষের উপর মিটিয়ে নিচ্ছে।

বাড়িয়া পোকা, গাঁধী পোকা সমানে কামড়াচ্ছে। মাকড়-সরীসৃপ বেয়ে বেয়ে গায়ে উঠছে। এদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে লখাই।

থকথকে কাদার ভিতর হাঁটু পর্যন্ত গাঁড়া। এই অবস্থায় জোঁক আর পোকা মাকড়ের অসহ্য কামড় সয়ে সয়ে জবাবদারি করছে লখাই, 'মারো কোপ—'

হঠাৎ জঙ্গলের মাথা থেকে কুচকুচে কালো রঙের একটা কিং কোব্রা পড়ল লখাইর সামনে। সম্ভবত বৃষ্টির সময় গাছের মাথায় উঠেছিল সাপটা। মাটিতে পড়েই লেজের উপর ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠল। চওড়া ফণাটা দুলতে লাগল। পাতাহীন ক্রূর চোখ দুটো ঝিক ঝিক করছে। সাপটা হিস্ হিস্ করে গর্জাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই নিজেকে সামলে নিল লখাই। এক পা পিছু হটে বর্মী দা'টা দিয়ে একটা কোপ বসিয়ে দিল। কিং কোব্রার ধড় থেকে ফণাটা কেটে বেরিয়ে গেল।

সাপ দেখে কুলীরা 'বীটে'র দিকে দৌড়তে শুরু করেছিল। আবার তাদের ফিরিয়ে আনল লখাই। আবার জবাবদারি শুরু করল, 'মারো জোয়ান—'

মেঘ এখন একেবারেই কেটে গিয়েছে। দুদিন পর ঝকঝকে ধারাল রোদ দেখা দিয়েছে। মেঘ ভাঙা রোদের তেজ বড় সাংঘাতিক।

এর মধ্যেই কুলীরা কয়েকটা জারুল গাছ কেটে ফেলেছে।

লখাইর কোনদিকে খেয়াল ছিল না। কুলীদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে জবাবদারি করে যাচ্ছিল। হঠাৎ হাঁটুর ঠিক উপরে উরুর কাছটায় কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করে উঠল। চমকে নীচের দিকে তাকিয়ে লখাই দেখতে পেল, হাতখানেক লম্বা একটা কানখাজুরা (চেলা জাতীয় সরীসৃপ) সামনের ঝোপটার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে সেই জ্বালাটা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় মনে হল, দম বন্ধ হয়ে যাবে।

চিৎকার করে উঠল লখাই, 'মরে গেলাম, মরে গেলাম—'

থকথকে কাদার উপর টলে পড়ল লখাই।

কুলীরা ধরাধরি করে ঝুপড়িতে নিয়ে এল লখাইকে। কানখাজুরার বিষ শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় ছুটে বেড়াচ্ছে। বেহুঁশ আচ্ছন্নের মত বিকাল পর্যন্ত পড়ে রইল লখাই।

জোঁক-পোকা-মাকড় উৎখাত করে, কানখাজুরা আর কিং কোব্রার মুখ থেকে মাটি ছিনিয়ে নিতে হচ্ছে। অরণ্য কি সহজে মাটির দখল ছাড়তে চায়!

কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের সামনে তাকে মাথা নোয়াতেই হয়। এমন করেই আন্দামানের বসতি বাড়ে। বুঝিবা মানুষের পৃথিবীর পিছনে এই একই ইতিহাস।

বিকালের দিকে আন্দামান জঙ্গলের আর একটা স্বরূপ দেখল লখাই।

এখন এই ঝুপড়িতে কেউ নেই। কুলী-জবাবদাররা 'ফেলিং'এর কাজে বেরিয়ে গিয়েছে।

মাচানের উপর আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছে লখাই। কানখাজুরার বিষের তীব্রতা এখন অনেকটা কমে এসেছে।

ঘোর ঘোর চোখ মেলে একবার তাকাবার চেষ্টা করল লখাই। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার দেখতে পেল না। সব কিছুই কেমন যেন আবছা, ছায়া-ছায়া, ঘোলাটে। এই ঝুপড়ি, ঝুপড়ির ভিতরের মাচান, বেড়ায় গোঁজা একটা বর্মী দা বোঁচকা-বুঁচকি—কোন কিছুই সঠিক আকার নিয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে না।

এতক্ষণ অসহ্য, আকণ্ঠ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছিল লখাই। মাচানের উপর ছটফট করছিল, গোঙাচ্ছিল, কাতরাচ্ছিল। থেকে থেকে শরীরটা বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছিল। হাতে-পায়ে খিঁচ ধরছিল। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ছিল।

এখন যন্ত্রণা অনেকটা মরে এসেছে। আগের সেই তীব্রতা নেই।

কিন্তু আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

শরীরটা যেন বিশ মণ ভারী হয়ে গিয়েছে। সেখানে কোন বোধ নেই, সাড় নেই। শরীরের কোথাও কোন অনুভূতিই কাজ করছে না। যদি একটা কোপও বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলেও হয়ত লখাই টের পাবে না।

মাথার ভিতরটা ফাঁপা, ফাঁকা, শূন্য। ভয়ানক কাহিল লাগছে। তবু লখাই ভাবতে চেষ্টা করল, অনেক দিন আগে আরো একবার কবে যেন ঠিক এই রকম একটা অবস্থা হয়েছিল তার। কোথায়? কবে? ঠিক এই মুহূর্তে এই দুর্বল অনুভূতিহীন দেহে ভেবে উঠতে পারল না লখাই।

কানখাজুরার বিষে বুঁদ হয়ে পড়ে রয়েছে লখাই।

এখন একটা কথাই ভাবতে পারছে সে। ভাবতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। এই ঝুপড়িতে তাকে একা ফেলে রেখে কুলী-জবাবদাররা 'ফেলিং'এর কাজে চলে গিয়েছে। এই নিদারুণ জঙ্গলে এমন একটা মানুষ নেই, 'ফেলিং' এর কাজ

স্থগিত রেখে যে তার পাশে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও এসে বসবে। তার মনে হল, এই সৃষ্টিছাড়া জঙ্গলে সে বড় একা। তার কেউ নেই।

হয়ত সে মরে যাবে। সে জন্য কারো এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। সে যদি মরেই যায়, বড় জোর দুই ঠ্যাং ধরে তাকে কোন একটা খাদে ফেলে দেবে।

হৃদয়হীন এই বর্বর জঙ্গলের স্বরূপটা যেন লখাইর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

যতই ভাবছিল ততই আক্রোশ বাড়ছিল। আক্রোশটা এক সময় অহেতুক একটা অভিমানের রূপ নিল। কিন্তু আন্দামানের এই জঙ্গলে কার উপর অভিমান করবে লখাই ?

লখাইর গলার কাছে অদ্ভুত এক কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। একবার মনে হল, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিন্তু এই দুর্বল জর্জর দেহে কাঁদবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই।

আটচল্লিশ

তখনও দক্ষিণ আন্দামানের জঙ্গলে ম্লান বিষণ্ণ একটু রোদ আটকে ছিল। সে রোদের তাপ নেই, তেজ নেই।

হঠাৎ বুশ পুলিস ক্যাম্পে বিশটা টিকারায় ঘা পড়ল। ডিম-ডিম-ডিম—

কুলী জবাবদাররা জঙ্গলের দিক থেকে চিৎকার করে উঠল, 'জারোয়া—জারোয়া—'

লখাই যেদিন তুষণাবাদের এই 'বীটে' আসে, তার পর দিন রাত্রে জারোয়ারা হানা দিয়েছিল।

বুশ পুলিসরা একটা জারোয়াকে ধরেও ফেলেছিল। আবর খানের সঙ্গে বুশ পুলিস ক্যাম্পে গিয়ে জারোয়াটাকে দেখেও এসেছিল লখাই।

আন্দামানের জঙ্গলে জারোয়া ধরা একটা বিরাট ব্যাপার।

এমনিতে জারোয়াদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যায় না। তাদের কাছে ঘেঁষার উপায়ও নেই। সভ্যতা-ভীরু এই আদিম মানুষগুলি কোনক্রমেই সভ্য মানুষের সংস্পর্শে আসতে রাজী নয়। সভ্যতার আলো যেখানে পৌঁছায় না, সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে।

সেই আদিম মানুষগুলির একজন ধরা পড়েছিল।

কোন রকমে জারোয়াটাকে একবার পোর্ট ব্লেয়ার পাঠাতে পারলে মোটা বখশিস মিলবে। কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ার পাঠাবার আগেই জারোয়াটা পালিয়ে গিয়েছিল।

বুশ পুলিসরা দু দিন জারোয়াটাকে বেঁধেছেদে পাহারা দিয়ে রাখতে পেরেছিল। তিন দিনের মাথায় কোন ফাঁকে যে সেটা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল, কেউ জানে না।

তারপর থেকে বেশ কিছুদিন জারোয়াদের উৎপাত বন্ধ ছিল। আজ তারা আবার হানা দিল।

বুশ পুলিস ক্যাম্পে টিকারার শব্দটা জোরালো হয়ে উঠেছে। ডিম-ডিম-ডিম—

টিকারার এই শব্দে চারপাশ থেকে অদ্ভুত এক ভয় ঘনিয়ে আসে। জঙ্গলের অন্তরাত্মাটা ছম ছম করতে থাকে। মনে হয়, এই জঙ্গল বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক হাজার বছর পিছনে ফিরে গিয়েছে। যেখানে হয়ত দিবারাত্রি বিরাট বিরাট নাকাড়া পিটিয়ে দুই দল উলঙ্গ যূথমানব পরস্পরের সঙ্গে তুমুল লড়াইতে মেতে থাকত।

টিকারার শব্দের সঙ্গে যূথমানবদের সেই কল্পিত নাকাড়ার আওয়াজের যেন অদ্ভুত মিল আছে।

টিকারার শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কুলী-জবাবদাররা চিল্লাচ্ছে, 'জারোয়া-জারোয়া—'

কাল কানখাজুরায় কেটেছিল লখাইকে। এখনও বিষটা মরে নি। রক্তের মধ্যে তার ক্রিয়া চলছে। উরুটা অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

ধরাধরি করে কুলীরা কাল মাচানের উপর রেখে গিয়েছিল। সেই থেকে আর নামে নি লখাই। কিছুই খায় নি। কানখাজুরার বিষে কাল দুপুর থেকে এখন পর্যন্ত আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছে।

কুলীরা ভয়ার্ত গলায় চেঁচাচ্ছে, 'জারোয়া—জারোয়া—'

ঝুপড়ির ঝাঁপটা খোলা পড়ে রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে লখাই দেখতে পেল, কতকগুলো বেঁটে বেঁটে উলঙ্গ মানুষ তীরধনুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বুকের মধ্যটা শিউরে উঠল। মেরুদণ্ড বেয়ে খাড়া ঝিলিক ছুটে গেল। এই মুহূর্তে কি করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না লখাই।

লখাই শুনেছে, জারোয়াদের নজরে পড়লে বাঁচার কোন উপায়ই থাকে না। তীর দিয়ে তারা গেঁথে রেখে যায়।

এই মুহূর্তে মৃত্যুর ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লখাই বুঝতে পারল, বাঁচবার ইচ্ছাটা তার কত প্রবল।

কালো কালো আদিম মানুষগুলোর যত আক্রোশ এই 'বীট'টার উপর।

বেতপাতার চাল, বাঁশের বেড়া, মাচান, পাটাতন—ঝুপড়িগুলোর ভিতর ঢুকে যা দেখছে, সবই ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলছে জারোয়ারা।

এই 'বীট'এর মানুষগুলো জঙ্গল সাফ করে তাদের পৃথিবীকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলছে। খুব সম্ভব এই কারণেই ফরেস্টের এই 'বীট'টার উপর ক্ষেপে উঠেছে জারোয়ারা।

এই 'বীট'টার উপর কেন যে জারোয়াদের এত আক্রোশ, এখন সে কথা একেবারেই ভাবছে না লখাই। তার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা হাজার গুণ জোরে লাফাচ্ছে।

কানখাজুরার বিষে শরীরটা এমনিতেই ভীষণ কাহিল হয়ে রয়েছে। নড়া-চড়ার শক্তিটুকু এখনও ফিরে পায় নি লখাই। মাচান থেকে সে একবার উঠবার চেষ্টা করল; খানিকটা উঠলও। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার টলে পড়ল।

আচমকা ঝাঁপের ফাঁকে দুটো কালো মুখ দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হল। হঠাৎই কেন জানি লখাইর মনে হল, তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচবার এই অদম্য ইচ্ছা তার মধ্যে খানিকটা অস্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়ে আনল।

মাচান থেকে টলতে টলতে কত কষ্টে লখাই যে নীচে নামল, একমাত্র সে-ই জানে। নীচে নেমে গুঁড়ি মেরে মাচানটার তলায় ঢুকল। এটুকু ধকলেই জিভ বেরিয়ে পড়েছে। টেনে টেনে প্রাণপণে হাঁফাতে লাগল লখাই। কিছুক্ষণ হাঁপাবার পর চোখ বুঁজে মড়ার মত পড়ে রইল।

জঙ্গলের দিক থেকে কুলীদের চিল্লানি ভেসে আসছে, 'জারোয়া-জারোয়া—'

টিকারাগুলো এখন বিশগুণ জোরে বাজছে। ডিম-ডিম-ডিম—

একবারই মাত্র ঝাঁপের ফাঁকে দুটো কালো মুখ দেখা দিয়েছিল। তারপর আর তাদের দেখা মেলে নি। লখাইর ঝুপড়ির দিকে আর তারা আসে নি।

আচমকা কোন একটা ঝুপড়ি থেকে যেন প্রাণফাটা চিৎকার উঠল, 'আ-আ আ—মরে গেলাম—মরে গেলাম—'

দক্ষিণ আন্দামানের এই অরণ্য যেন শিউরে উঠল।

মাচানের তলাটা অন্ধকার। সেখানে মড়ার মত পড়ে রয়েছে লখাই। অদ্ভুত এক ভয় তাকে একটু একটু করে ঘিরে ফেলছে। ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন চেতনার মধ্যে হঠাৎ সে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল। বুম্-ম্-ম্—

সম্ভবত বুশ পুলিসরা বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করছে।

বন্দুকের শব্দটা মিলাবার সঙ্গে সঙ্গে দুপ দাপ করে কারা যেন জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাল।

এই পর্যন্ত মনে আছে লখাইর। তারপরেই সে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

কখন যে কুলীরা 'বীটে' ফিরে এসেছে, কখন যে মাচানের তলা থেকে তাকে টেনে বার করে উপরে শুইয়ে দিয়েছে, আর কখন যে পুরা একটা রাত কাবার হয়ে গিয়েছে, লখাইর হুঁশ নেই।

এখন সকাল।

আবর খান ডাকাডাকি শুরু করে দিল, 'এ লখাই—লখাই হো—'

'হাঁ।'

'কাল তো জারোয়ার ডরে বেহুঁশ হয়ে ছিলি, এখন কেমন লাগছে?'

'ভাল।'

রোঁয়াওয়ালা কম্বলে আগপাশতলা ঢেকেঢুকে শুয়ে রয়েছে লখাই। কম্বলের তলা থেকেই আবর খানের কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

আজ সকালে শরীরটা অনেকখানি সুস্থ লাগছে। কানখাজুরার বিষের ক্রিয়া একেবারেই নেই। তবে ফোলা উরুটা এখনও স্বাভাবিক হয় নি। টাটানিটাও একেবারে কমে যায় নি, অল্প অল্প আছে।

তবু বেশ লাগছে। লখাইর মনে হল, আজ মাচান ছেড়ে সে বাইরে বেরুতে পারবে। প্রায় দুটো দিন এই মাচানে আটক হয়ে আছে সে!

আবর খান আবার ডাকল, 'এ লখাই—'

'হাঁ—'

'ওঠ ওঠ, অনেক বেলা হয়েছে।' একটু থেমে কি যেন ভাবে আবর খান। তার পর বলে, 'জলদি ওঠ, জারোয়ারা কাল কি করেছে, দেখবি চল।'

এবার মাথার উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল লখাই। বলল, 'কি করেছে জারোয়ারা?'

'আমার সাথ চল। নিজের আঁখেই সব কুছ দেখবি।'

আবর খানের কাঁধে ভর দিয়ে মাচান থেকে নীচে নামল লখাই। তারপর ফোলা পা-টা টেনে টেনে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঝুপড়িগুলোর সামনে খানিকটা সমতল ঘাসের জমি। সেখানে কুলী-জবাবদাররা গোল হয়ে কি একটা যেন ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কুলীদের ঠেলে গুঁতিয়ে, জটলাটা ভেঙে লখাইকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল আরব খান।

সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল লখাই।

আউটরাম ঘাট থেকে আন্দামান আসার সময় এলফিনস্টোন জাহাজে মণ্ড

চো'কে বারকয়েক দেখেছে লখাই। কিন্তু সেলুলার জেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার পাত্তা মেলে নি।

যেদিন লখাই ভুষণাবাদের এই 'বীটে' আসে, তার পর দিন বিকালে মঙ চো'কে শেষ বারের মত দেখেছিল।

তারপর মঙ চো'র কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল লখাই। কুলী খাটানো, জবাবদারি, উজাগর সিং, আবর খান, এই জঙ্গল, মিমি খিন—নানা ব্যাপারে ডুবে ছিল।

ঘাসের জমিটায় পড়ে রয়েছে মঙ চো। তার সমস্ত দেহে অনেকগুলো তীরের ফলা গেঁথে রয়েছে। একটা তীর চোখে ঢুকেছে। চোখটা ফেটে খানিকটা হলদে চর্বি-মেশানো রক্ত বেরিয়ে এসেছে। বীভৎস দেখাচ্ছে।

এমন যে সাঙ্ঘাতিক লখাই, কোন কিছুতেই যার ডরভয় নেই, সব রকম ভীষণতা এবং বীভৎসতায় যে অভ্যস্ত, সে পর্যন্ত চোখ বুঁজে ফেলল।

চোখ বুঁজে মঙ চো'র সেই কথাগুলোই ভাবছিল লখাই।

মঙ চো তাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বলেছিল।

এ এক নিদারুণ জঙ্গল। এই জঙ্গল ব্যারাম দিয়ে মানুষ মারে। ব্যারামেও যদি মানুষ না মরে, তা হলে বুঝি জারোয়া দিয়েই তাকে খতম করবে।

আন্দামান অরণ্যের মোটামুটি একটা স্বরূপ বুঝতে পারল লখাই।

উনপঞ্চাশ

ভিখন আহীরের হিসাবটা জলের মত সহজ।

সে হিসাবে কোন মারপ্যাচ নাই।

হাত পেতে কিছু নিলে তার বদলে যে কিছু দিতে হয়, অন্তত দেওয়া উচিত—এটা সে বোঝে। শুধু বোঝে না, মেনেও চলে।

ভিখন আহীরের ভুখটা বড় মারাত্মক ধরনের।

কেউ যদি ভিখনকে একখানা রোটি দেয়, সে তাকে কিছু মিঠা কথা শোনাবে। কেউ যদি দুখানা রোটি দেয়, তোষামুদি দিয়ে সে তাকে খুশী করবে। কেউ যদি তাকে তিন খানা রোটি দেয়, সে তার হয়ে হুইল ঘানি টেনে দেবে কি সড়কের পাথর ভেঙে দেবে। কেউ যদি চারখানা রোটি দেয়, সে তাকে ধরম দিয়ে বসবে। কেউ যদি পুরা খানা দেয়, ভিখন বোধ হয় তাকে জানটাই দিয়ে দিতে পারে।

মোট কথা, কারো কাছ থেকে কিছু নিলে, তার বদলে সে কিছু দেবেই। এটা তার কাছে একটা সোজা নিয়ম।

জীবনে এই একটা মাত্র নিয়ম, যা কোনদিন ভাঙে নি ভিখন।

কিন্তু সেই নিয়মটাই এবার বুঝি ভাঙতে হচ্ছে!

ক'দিন ধরে মহা মুশকিলে পড়েছে ভিখন। ভেবে ভেবে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না, কী তার করা উচিত?

রোজ রোজ লা ডিনের খানা থেকে ভাগ বসাচ্ছে ভিখন। অথচ তার বদলে কিছুই দিতে পারছে না। রস্বাস ছেঁচা, ঘানি টানা, নারকেল ছোবড়ার তার বার করা কি সড়ক বানানো—কয়েদখানার কোন কাজই করতে হয় না লা ডিনকে। যদি লা ডিন এ সব করত, তা হলে তার হাত থেকে কাজ ছিনিয়ে নিয়ে করে দিত ভিখন।

কত তোষামুদি করেছে ভিখন। কিন্তু লা ডিন হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, তোষামুদি দিয়ে যাকে খুশী করা যায় না। কাপড়-কুর্তা হলুদ রঙে ছুপিয়ে ফকির হয়ে ধরম দিতে চেয়েছিল ভিখন। কিন্তু তাতেও রাজী হয় নি লা ডিন।

নিজের খানা থেকে ভাগ দিয়ে তার বদলে কিছুই নেয় না, এমন আশ্চর্য মানুষ সারা জিন্দগীতে এই প্রথম দেখল ভিখন আহীর।

রোজ রোজ লা ডিনের খানায় ভাগ বসাচ্ছে, অথচ তাকে কিছুই দিতে পারছে না সে। বিবেকে কোথায় যেন বাধছে।

লা ডিনকে পুরাপুরি বুঝে উঠতে পারে না ভিখন। সবটা বুঝতে পারে না বলেই বোধ হয় এই দুর্জ্ঞেয় মানুষটা সম্বন্ধে হাজার চিন্তা তার মাথায় সর্বক্ষণ চেপে থাকে।

লা ডিন যেন জাদু করেছে। তার টান ঠেকান ভিখনের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফুরসত পেলেই ঘুরে ঘুরে সে লা ডিনের কুঠুরিটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

এখন দুপুর।

অন্য অন্য দিন এই সময়ে সেলুলার জেলের মাথায় আকাশের নীল টুকরাটা ঝকঝক করতে থাকে। আজ কিন্তু আকাশটা আর নীল নেই; পেটানো তামার পাতের রঙ ধরেছে।

খুব সম্ভব বিকালের দিকে ঝড় উঠবে।

আজকাল হার্দুর ওদিকে সড়ক বানাবার কাজ পেয়েছে ভিখন। সকাল থেকে এ পর্যন্ত সড়ক বানিয়ে এই মাত্র সেলুলার জেলে ফিরে এল সে।

কোনক্রমে নাকে মুখে ভাত-ভাজি-ডাল গুঁজে খানাপিনা চুকিয়ে ফেলল। তারপর গুটি গুটি পায়ে লা ডিনের কুঠুরির সামনে এসে বসল।

রোজ একই মতলব নিয়ে ঠিক এই সময়টায় লা ডিনের কুঠুরির সামনে এসে বসে ভিখন আহীর।

ভিখন আসার আগেই আরো অনেকে এসে পড়েছে। মোপলা হারামী বকরুদ্দিন এসেছে, জাজিরুদ্দিনের সাকরেদ ফয়জর আলী এসেছে। জন তিনেক বর্মী কয়েদী এসেছে। আরো কয়েকজন এসেছে, যাদের মুখ চেনে ভিখন কিন্তু নাম জানে না।

সুমাত্রা-জাভা-শ্যাম-কম্বোডিয়া—জীবনে কত জায়গায় ঘুরেছে লা ডিন। কত মানুষ দেখেছে। রসিয়ে রসিয়ে সেই সব মানুষ আর জায়গার কত বিচিত্র কিসসাই না শোনায় লা ডিন। দুনিয়ার কত বিচিত্র খবরই না সে রাখে!

কিসসার টানেই খানাপিনার পর কয়েদীরা লা ডিনের কুঠুরির সামনে ভিড় জমায়।

একবার মুখ তুলল লা ডিন। সঙ্গে সঙ্গে ভিখনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

লা ডিন বলল, 'তুমি এসে গেছ ভিখন, ভালই হয়েছে।'

ভিখন জবাব দিল না। জটলার মধ্যে চুপচাপ বসে রইল।

বড় গম্ভীর দেখচ্ছে লা ডিনকে। অন্য অন্য দিনের হাসিখুশী মিশুকে লা ডিনকে আজ একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। মুখটা থমথম করছে। চাপা কুতকুতে চোখজোড়া ঝিক ঝিক করছে।

মোপলা হারামী বকরুদ্দিন বলল, 'লা ডিনজী, কাল যে কিসসাটা বলবেন বলেছিলেন, সেটা বলুন।'

'কোন কিসসা ?'

'সেই যে যখন আপনি জাভাতে ছিলেন, তখন কেমন করে লাগুন (লেগুন) থেকে অক্টোপাস মারতেন, সেই কিসসাটা বলুন।'

বকরুদ্দিন আগের দিনের গল্পের খেই ধরিয়ে দেয়।

জাজিরুদ্দিনের সাকরেদ ফয়জর আলী বলে, 'না লা ডিনজী, আপনি সেদিন যে মুক্তার চাষের কথা বলেছিলেন, সেটার কথাই বলুন। কয়েদ-খাটা শেষ হলে আমি মুক্তার চাষ করব। ফিকির টিকিরগুলো বাতলে দিন লা ডিনজী।'

আর এক কয়েদী বলে, 'না না লা ডিনজী, আপনি মালয়ের রবার বাগানের কিসসাটা বলুন। সেই যে কুলীরা—'

কয়েদীরা চিল্লাচিল্লি বাধিয়ে দেয়।

কোন দিকে নজর নেই লা ডিনের। পেটানো তামার পাতের মত থমথমে আকাশটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। আকাশের গায়ে কতকগুলো দুর্বোধ্য হরফ যেন পড়তে চেষ্টা করেছে।

হঠাৎ আকশের দিকে থেকে মুখটা নামাল লা ডিন। গরাদের ওপাশে কয়েদীগুলো চিল্লাচিল্লি করছে।

আস্তে আস্তে লা ডিন বলল, 'তোমাদের আজ একটা নয়া কিসসা বলব।'

'কী-কী-কী ?'

কয়েদীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। সকলেই গরাদ ধরে লা ডিনের মুখোমুখি বসতে চায়। একসময় হুড়াহুড়ি চিল্লাচিল্লি থামে। সুবিধামত

জায়গা দখল করে লা ডিনের কিসসা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে কয়েদীরা।

লা ডিন বলে, 'পঁচিশ বছর আগে আমি এই দ্বীপে এসেছিলাম।'

কয়েদীরা সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'হাঁ হাঁ ও কথা তো আমরা শুনেছি। পুরা ইয়াদ আছে।'

'বারো বছর কয়েদ খাটার পর আমার সাজার মেয়াদ শেষ হয়েছিল।'

'হাঁ হাঁ, ও তো আমরা জানি।'

লা ডিন বলল, 'আমি এখানে কেন সাজা খাটতে এসেছিলাম, তা তো তোমাদের বলেছি।'

'হাঁ হাঁ জী, বর্মা মুলুকে ইংরাজদের সাথ আজাদীর লড়াই করেছিলেন। সেই কসুরে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে এখানে এসেছিলেন।'

অনেকক্ষণ আর কিছু বলল না লা ডিন। পেটানো তামার পাতের মত থমথমে আকাশটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যে ভাবল, সে-ই জানে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'কাল রাত্রে আমি একটা খবর পেয়েছি।'

'কি খবর?'

কয়েদীরা গরাদের উপর ঝুঁকে পড়ল।

লা ডিনের গলাটা খাদে ঢুকে গেল, 'বিশ রোজের মাথায় এবার জাহাজ আসছে। বাঙলা মুলুকে ইংরাজদের সাথ একটা ভারী লড়াই হয়েছে। জাহাজ ভরে সেই লড়াইর কয়েদীরা আসছে।'

কয়েদীরা এবার আর কিছুই বলে না।

কয়েদীদের মুখগুলো একবার দেখে নেয় লা ডিন। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'আমার একটা মতলব আছে। তোমাদের সে কথা বলতে চাই।'

'কি মতলব?'

'মতলবটা বলার আগে আর একটা কথা বলি।'

'কি কথা?'

'ইংরাজ বড় দুশমন, এ কথাটা তো মান?'

'আরে বাপ রে বাপ রে বাপ! এ আপনি কি বলছেন লা ডিন জী?'

'ঠিকই বলছি।'

'এ কথা জেলার সাহেবের কানে গেলে জান চৌপট করে দেবে।'

লা ডিন সামান্য হাসল। তার চাপা ছোট ছোট চোখজোড়া জলছে। ভিতরে কোথায় যেন খানিকটা গনগনে আগুন আছে। মুখে চোখে তার তাপ ফুটে বেরিয়েছে। খুব আস্তে লা ডিন বলল, 'আমি তো চাই এ কথাটা জেলার সাহেবের কানে যাক।'

মোপলা হারামী বকরুদ্দিন বলল, 'আপনি এংরাজবালাকে চেনেন নি লা ডিনজী। এংরাজবালার মত বড় মরদ দুনিয়ায় নেই। তারা দরিয়ার মধ্যে কয়েদখানা বানিয়ে সাজা খাটায়, কয়েদীকে ফাঁসির রশিতে লটকায়, বেয়াদবি কি হারামীগিরি করলে পিটিয়ে জান তুড়ে দেয়।'

অন্য অন্য কয়েদীরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, 'ও তো ঠিক কথা।'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল লা ডিন। বলল, 'তুমি বড় খাসা কথা বলেছ বকরুদ্দিন, এংরাজবালাকে আমি চিনি না, তুমি চেন!' একটু থেমে আবার শুরু করে, 'কদ্দিন তুমি কয়েদ খাটছ?'

'দেড় দু মাস।'

'আমি পঁচিশ বছর এই দ্বীপে আছি। এখানে আসার আগে এংরাজবালার সাথ লড়াই করে এসেছিলাম। আমি এংরাজবালাকে চিনি না, তুমি চেন!'

একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল লা ডিন।

বকরুদ্দিন বলল, 'আপনার মতলবটা কি লা ডিন জী?'

'আমার মতলবটা হচ্ছে এংরাজবালাদের সাথ লড়াই করা।'

'লড়াই!' বকরুদ্দিনের গলায় অস্ফুট, অদ্ভুত একটা শব্দ ফুটল।

বলে কি লা ডিন! কয়েদীরা নিজেদের কানগুলোকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। অনেকটা সময় হাঁ করে লা ডিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। তাদের মুখচোখের চেহারা দেখলে মনে হয়, এমন তাজ্জবের কথা সারা জিন্দগীতে আর শোনে নি।

দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। লা ডিন জানে না, যেদিন তাকে সেলুলার জেলে আটক করা হয়েছে, সেদিন থেকেই লোকটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কি বলে, কি করে, সব কিছু লক্ষ্য রাখে।

পা টিপে টিপে লোকটা সিঁড়ির দিকে ছুটল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে সিধা জেলার সাহেবের অফিসে গিয়ে ঢুকল।

বকরুদ্দিন আবার বলল, 'এংরাজবালাদের সাথ লড়াই করতে চান লা ডিন জী ? সচ্ ?'

'সচ্ ?'

কয়েদীগুলো একদৃষ্টে তাকিয়ে লা ডিনকে দেখতে লাগল। তামাশা করছে না তো লা ডিন ! কিন্তু না, তামাশার কোন লক্ষণই ফুটে নেই তার মুখে।

লা ডিন বলতে লাগল, 'ইণ্ডিয়া আর বর্মা মুলুকের ওপর এংরাজবালারা বহুত জুলুম করেছে। আজাদীর জন্যে ইণ্ডিয়াতে সিপাহী লড়াই হয়েছে, বর্মা মুলুকে থিবোর লড়াই হয়েছে। এবার বাঙলা মুলুকে লড়াই হয়েছে।'

একটু চুপ করল লা ডিন। তার মুখের চেহারাটা আজকের আকাশটার মতই থমথম করছে। লা ডিন আবার শুরু করল, 'বিলাত থেকে এদেশে এসে অনেক জুলুম করেছে এংরাজ। আমাদের আজাদী কেড়ে নিয়েছে। আজাদী ফিরে চাইলে গুলি করে মেরেছে। কালাপানি পার করে এখানে পাঠিয়ে কয়েদ খাটিয়েছে। লেকিন আর তাদের জুলুম সইব না।'

বকরুদ্দিন বলল, 'আপনার মতলবটা কি ?'

'এই কয়েদখানায় এংরাজবালাদের সাথ আমি লড়াই করব। তোমরা আমার সাথ সাথ থাকবে।'

ইংরাজ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েদীর মধ্যে অদ্ভুত এক সংস্কার আছে। যে ইংরাজ বিলাইত থেকে বড় বড় দরিয়া পাড়ি দিয়ে এই মুলুকে এসে পৌঁছেছে, যারা ইচ্ছা করলে সবাইকে ধরে ধরে ফাঁসির দড়িতে লটকাতে পারে, দুনিয়ার যে কোন মানুষকে দিয়ে ঘানি টানাতে পারে, তাদের সঙ্গে লড়াই করা আর যাই হোক বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কয়েদীগুলো কিছুক্ষণ হাঁ করে লা ডিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্য অন্য দিনের হাসিখুশী নির্বিরোধ লা ডিন আজ একেবারেই বদলে গিয়েছে। কয়েদীরা এই লা ডিনকে চেনে না। একবার তারা ভাবল, লা ডিনের মাথা বুঝি খারাপই হয়ে গিয়েছে। তা না হলে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করার মত একটা অসম্ভব এবং সাঙ্ঘাতিক কথা সে কেমন করে বলতে পারছে !

হঠাৎ কয়েদীগুলো জটলা ভেঙে উঠে পড়ল। চিল্লাতে চিল্লাতে যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচল, 'মর যায়েগা, মর যায়েগা—জরুর মর যায়েগা। লা ডিন জীর মতলব বড় খারাপ। এংরাজবালা সবাইকে জানে মেরে ফেলবে।'

লা ডিনের চোখের সামনে দিয়ে একে একে সবাই চলে গেল। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে একজনকেও ধরে রাখতে পারল না সে।

লা ডিন জানত, একটা কয়েদীও তার পাশে এসে দাঁড়াবে না। এই দ্বীপে পঁচিশটা বছর কাটিয়ে দিল সে। এই পঁচিশ বছরে এখানে কয়েক হাজার কয়েদী এসেছে। কয়েদীর চরিত্র তার চেয়ে আর বেশী কে বোঝে!

এই মানুষগুলো খুন করতে ডরায় না, রাহাজানি-দুশমনি করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে পেছ-পা হয় না। অথচ তাদের যত ভয় ইংরাজকে!

লা ডিন বিড় বিড় করে বকতে লাগল, 'সবাই পালিয়ে গেল।'

তার গলায় কেমন যেন হতাশা এবং আক্ষেপ ফুটল।

'না জী, এই তো আমি আছি।'

ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে চুপচাপ বসে ছিল ভিখন আহীর। পাছা ঘষটাতে ঘষটাতে এবার সে লা ডিনের মুখোমুখি এসে বসল। ফিস ফিস করে বলল, 'সবাই চলে গেছে, লেকিন আমি যাই নি।'

'ভিখন—তুমি!'

চোখ দুটো চকচক করে উঠল লা ডিনের।

'হাঁ লা ডিন জী, কেউ না থাকলেও আমি আপনার সাথ সাথ থাকব।' একটু থামল ভিখন। কি যেন ভাবল। তারপর আবার শুরু করল, 'কবে লড়াই হবে জী?'

'লড়াই!'

হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল লা ডিন।

কবে, কেমন করে এই কয়েদখানায় ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই শুরু হবে, সে কথা তো একবারও ভেবে দেখে নি লা ডিন। কাল রাত্রে পাকা খবর পেয়েছে সে। বিশ দিনের মাথায় বাঙলা মুলুক থেকে আজাদী লড়াইর কয়েদীরা এই দ্বীপে আসছে। সেই থেকে অদ্ভুত এক উত্তেজনা তার উপর ভর করে বসেছে। মাথাটা গরম হয়ে আছে।

লা ডিন হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, ভাবাবেগে যে চালিত হয়। উত্তেজনা কি ঝোঁকের বশে সে হঠাৎ কিছু করে ফেলতে পারে।

থিবোর যুদ্ধের জ্বালা বুকের মধ্যে পুরে এই দ্বীপে এসেছিল লা ডিন। এখানে প্রথম বারো বছর সাজা খেটেছে সে। পরের বারো তেরো বছর ধরে

তার ফুঙ্গি জীবন চলছে। ফুঙ্গি জীবনের নিরাসক্তিও থিবোর যুদ্ধের সেই জ্বালাটাকে জুড়িয়ে দিতে পারে নি।

উত্তেজনাটা আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। এখন লা ডিনের মনে হচ্ছে, উত্তেজনার মাথায় হঠাৎ কিছু করে ফেলা উচিত হবে না। পরিকল্পনা নেই, প্রস্তুতি নেই—এমন অবস্থায় কয়েদীদের ক্ষেপিয়ে দিলে হঠকারিতাই করা হবে, লাভ কিছু দাঁড়াবে না। তা ছাড়া এই কয়েদীগুলোর মনই তৈরী নেই। ইংরাজ সম্বন্ধে এদের সংস্কারটা না ঘোচাতে পারলে কোনক্রমেই এদের দিয়ে কোন কাজই হবে না।

কাল অনেকটা রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারে নি লা ডিন। জেগে জেগে অদ্ভুত এক লড়াইয়ের কথা ভেবেছে। এই লড়াই সম্বন্ধে এখনও ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তবে একটু সে বুঝেছে, এতে গুলি-বন্দুক লাগে না। খুনখারাপি, উত্তেজনা—এর মধ্যে কিছুই নেই। কিন্তু এর জন্য যে অটুট মনোবল প্রয়োজন, কয়েদীদের মধ্যে তার ছিটে ফোঁটাও নেই।

হঠাৎ লা ডিনের মনে হল, যেমন করেই হোক কয়েদীদের মনগুলোকে তৈরী করে দিতে হবে। দেশ-কাল এবং ইংরাজ সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। মন তৈরী করে দিলেই চলবে না, তাদের মনোবলও যোগাতে হবে। তা না হলে লড়াইর নাম শুনলেই তারা পালিয়ে যাবে।

উত্তেজনার মুখে লড়াইর কথাটা বলে ফেলেছে। নাঃ, বারো তের বছর ফুঙ্গি জীবন কাটিয়েও উত্তেজনা দমাতে পারল না লা ডিন। এজন্য তার বড় অনুতাপ হচ্ছে।

গরাদের ওপাশ থেকে ভিখন ডাকল, 'লা ডিন জী—'

'হাঁ—'

'কবে লড়াই শুরু হবে ?'

'তোমাকে পরে বলব ভিখন। বিকালে কাম থেকে ফিরে একবার এস। তোমার সাথ কথা আছে। তোমাকে আমার খুব দরকার।'

কাজে যাবার সময় হয়েছে। ভিখন উঠে পড়ল।

কয়েদখানার সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে ভিখনের মনটা খুশিতে ভরে গেল। লা ডিন তাকে বিকালে আসতে বলেছে। তাকে খুব দরকার।

হাত পেতে কিছু নিলে তার বদলে কিছু দেওয়াটা ভিখনের দস্তুর।

লা ডিন তার খানা থেকে ভিখনকে ভাগ দিয়ে থাকে। তার বদলে কিছুই নেয় নি লা ডিন। ধরম না, জান না, তোষামুদিও না।

বিকালে তাকে আসতে বলেছে লা ডিন। ভিখন আহীরের মনে হল, এতদিনে খানার বদলে লা ডিনকে সে কিছু দিতে পারবে।

বিকালের দিকে ঝড় উঠল।

পেটানো তামার পাতের মত আকাশটা ফেড়ে কড় কড় শব্দে বাজ গর্জায়। গুর গুর করে মেঘ ডাকে। দরিয়া তোলপাড় করে বিরাট বিরাট হালফা ওঠে।

ঝড়েই মুখেই দৌড়তে দৌড়তে ভিখন আহীরেরা সেলুলার জেলে ফিরে এসেছে।

বিকালের রোটি-ভাজি নিয়ে উপরে এসে চমকে উঠল ভিখন। কুঠুরিতে লা ডিন নেই।

কুঠুরিটার ভিতর পাতি-পাতি করে খুঁজল ভিখন। তারপর গরাদ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পর মোপলা হারামী বকরুদ্দিন, "D" টিকিট মার্কা ফয়জর আলী এবং অন্য কয়েদীরা এসে পড়ল। সবাইকে জিজ্ঞাসা করল ভিখন। কিন্তু লা ডিন যে কোথায় গিয়েছে, কেউ বলতে পারল না।

লা ডিনের খানাই সে নিল, কিন্তু তার বদলে কিছুই দিতে পারল না। এই ভেবেই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল ভিখনের।

পঞ্চাশ

কয়েকটা দিন কানখাজুরার বিষে কাবু হয়ে ছিল লখাই।

আজ পুরাপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে।

এখন জ্বালা, যন্ত্রণা, টাটানি—কিছুই নেই। কানখাজুরার বিষে ডান উরুটা সাঙ্ঘাতিক ফুলে উঠেছিল। ফোলা ভাবটা কমে কমে উরুটা স্বাভাবিক হয়েছে।

এই ক'টা দিন ঝুপড়ির মাচানে আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল লখাই। ছুনিয়ার কোন কিছু সম্বন্ধে ভাবার মত অবস্থাই ছিল না তার। দেহ এবং মন—ছুটোই বিকল হয়ে পড়েছিল।

আজ পুরাপুরি সুস্থ হয়ে প্রথমেই কেন যে সে মিমি খিনের কথা ভাবল, কে জানে? মিমি খিনের কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠল লখাই।

সেই যে উজাগর সিং তাকে মিমি খিনের খুপরিতে নিয়ে গিয়েছিল, তার পর আর পোর্ট মোয়াট যায় নি লখাই। মনে পড়ছে, মাত্র কয়েক পলকের জন্য মিমি খিনের মুখটা দেখতে পেয়েছিল সে। তারপরেই ছুই হাঁটুর ফাঁকে মেয়েটা মুখ গুঁজে দিয়েছিল।

কিন্তু যত অল্প সময়ের জন্যই দেখুক না কেন, মিমি খিনকে ভুলতে পারে নি লখাই। তার শ্যামলা রঙ, নাকের সুঠাম ছাঁদ, তার কান্না, টানা টানা জলভরা ছুটি চোখ—কিছুতেই এগুলি ভুলবার নয়। এই মুখ, এই চোখ, এই নাক—কোথায় যেন দেখেছে লখাই!

অনেক বর্মী মেয়ে দেখেছে লখাই। কিন্তু তাদের মুখের ছাঁদের সঙ্গে মিমি খিনের মুখের ছাঁদ আদৌ মেলে না। এ কথাটা যতই ভাবছে, মাথাটা ততই গরম হয়ে উঠছে লখাইর।

সেই সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে অব্যর্থ নিয়মে মিমি খিনের ভাবনাটা লখাইর মনের মধ্যে এসে হাজির হচ্ছে। তাকে অস্থির করে তুলছে।

বেলা বাড়ছে।

আকাশ বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি উপরে এসে উঠেছে। তীব্র, ধারাল রোদে জঙ্গলের মাথাটা জ্বলছে।

খানিকটা দূরে জঙ্গল 'ফেলিং'-এর কাজ চলছে।

কিছুই ভাল লাগছে না লখাইর। অস্থির মন নিয়ে আর যাই হোক জবাবদারির কাজ চলে না। কিছুক্ষণ পর পর জবাবদারি ছেড়ে ঝুপড়িতে ফিরে আসছে। সরাসরি শিবরাম পাণ্ডের ঝুপড়িতে গিয়ে উঁকি মারছে।

তুষণাবাদের এই 'বীটে' যে পুলিসী জমাদারের খবরদারিতে লখাইরা থাকে, তরে নাম শিবরাম পাণ্ডে। শিবরাম পাণ্ডের হুকুম ছাড়া কুলী-জবাবদার—কারো এই 'বীট' থেকে নড়ার উপায় নেই।

বার পাঁচেক শিবরামের ঝুপড়িতে উঁকি মেরেছে লখাই। কিন্তু গোল গোল দুটো চোখ, অস্বাভাবিক পুষ্ট একজোড়া গোঁফ, চাঁছা মাথাটার পিছনে মোটা একটি টিকি, গলার বাজখাঁই আওয়াজ, বিরাট দেহ—সব মিলিয়ে শিবরামের চেহারাটা এমন সাজ্ঘাতিক যে ভরসা করে আসল কথাটাই বলতে পারে নি সে।

জঙ্গলের দিক থেকে আর একবার ঘুরে এল লখাই। সে স্থির করে ফেলেছে, যেমন করেই হোক, আজ একবার পোর্ট মোয়াটে মঙ ফা'র ঝুপড়িতে যাবেই। মিমি থিন বিচিত্র, দুর্বোধ্য এক আকর্ষণে তাকে ক্রমাগত টানছে।

'বীটে'র সামনে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে শিবরাম পাণ্ডের ঝুপড়িটার সামনে এসে পড়েছিল, হুঁশ নেই লখাইর।

হঠাৎ ঝুপড়ির ভিতর থেকে কর্কশ স্বর ভেসে এল, 'এ শালে লখাই—'

'হাঁ জী—'

লখাই চমকে উঠল।

'অন্দর আয় শালে—'

গুটি গুটি পায়ে ঝুপড়ির ভিতর ঢুকল লখাই।

ঝুপড়িটার ডান দিকে মস্ত এক মাচান। তার উপর জাঁকিয়ে বসে আছে শিবরাম পাণ্ডে। বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি এক গোছা লাল রঙের পৈতা। মোটা মোটা আঙুলে পৈতা জড়াতে জড়াতে সে খেঁকিয়ে উঠল, 'কি মতলব তোর? সেই সকাল থেকে আমার ঝুপড়ির সামনে ঘুর ঘুর করছিস!'

লখাই থতমত খেয়ে গেল। ফস করে বলে ফেলল, 'না জী, আমার কোন মতলব নেই।'

'মতলব নেই?'

দুই চোখে ফাঁদ পেতে কিছুক্ষণ লখাইর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শিবরাম। তারপর মারমুখো হয়ে উঠল, 'উল্লু কাঁহাকা, মতলব না নিয়ে কোন শালে আমার কাছে ভেড়ে! এ্যায়সা এ্যায়সা কোন হারামী কি আমার সাথ পেয়ার করতে আসে! বল কুত্তা, কি মতলবে আমার কাছে এসেছিস?'

লখাই নীচের পাটাতনের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে ছিল। একবার শিবরামের মুখের দিকে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামাল। ভয়-ভয় কাঁপা গলায় বলল, 'একটা মতলবই এসেছি জী।'

'তাই বল শালে। কি মতলব?'

'বলতে ডর লাগছে।'

'ডর নেই, বল।'

'জমাদারজী, পুট মুটে (পোর্ট মোয়াটে) আমার এক দোস্ত আছে। তার খুব ব্যারাম। আপনি মেহেরবানি করে হুকুম দিলে তাকে একবার দেখে আসিতে পারি।'

মোটা মোটা গোঁফের সূক্ষ্ম প্রান্ত দুটো মোচড়াতে মোচড়াতে শয়তানী চালে হাসল শিবরাম। বলল, 'এই বাত! হুকুম মিলবে, লেকিন তার আগে দুটো কথা। তোর কোন বদ মতলব নেই তো?'

'জী না।'

'ভাগবি না তো?'

'এই জঙ্গলে কোথায় ভাগব জী?'

'ঠিক হায়।' এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিল শিবরাম। আবার শুরু করল, 'হুকুম মিলবে, লেকিন এ্যায়সা এ্যায়সা না। হুকুমের জন্যে দাম লাগবে।'

'দাম!'

'হাঁ রে বুদ্ধু, নগদ দুটো রুপেয়া আর দু বোতল শরাব।'

লখাই প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আরে বাপ রে বাপ! কোথায় পাব রুপেয়া? কোথায় পাব শরাব?'

'আঁই কুত্তা—'

লাফিয়ে মাচান থেকে নীচে নেমে পড়ল শিবরাম। লখাইর গর্দানটা ঠেসে ধরে চিল্লাতে লাগল, 'শালে, তুই মনে করেছিস, আমি টের পাই নি! ফরেস্ট

অফসার উজাগর যাবার সময় তোকে তিন বোতল শরাব আর পাঁচটা রুপেয়া দিয়ে যায় নি ?'

'হাঁ জী !'

এবার খোঃ খোঃ করে খুব একচোট হাসে শিবরাম। হাসিটা থামিয়ে বলে, 'মনে করেছিস, এই ঝুপড়িতে থাকি বলে কিছুই টের পাই না! আরে উল্লু, এই যে আমার কান, তামাম আন্দামান ঢুঁড়লে এমন লায়েক কান তুই পাবি না। এই ঝুপড়িতে থেকেই আমি বুঝি, কোন শালে কি বলছে, কি করছে ?'

হঠাৎ ওয়ার্ডার মোহর গাজীর কথা মনে পড়ল লখাইর। মোহরের সঙ্গে শিবরামের আশ্চর্য একটা মিল খুঁজে পেল সে। মোহরের যেমন নাক, শিবরামের তেমনি কান—তুজনের নাক আর কান সাঙ্ঘাতিক তুখোড়।

অনেক কষাকষির পর শেষ পর্যন্ত এক বোতল শরাব আর একটা টাকাতে রফা হল।

পোর্ট মোয়াটে যাবার হুকুম পেল লখাই।

আজ একটু আগে আগেই খানাপিনা সেরে ফেলল লখাই।

পোর্ট মোয়াট রওনা হওয়ার আগে শিবরাম তাকে শেষ বারের মত হুঁশিয়ার করে দিল, 'এখন তুপুর। সন্ধ্যের আগে আগে ফিরে আসবি। বদ মতলব করে ভাগবি না শালে। ভাগতে তো পারবিই না, উল্টে মারের চোটে জান যাবে।' একটু থেমে বলল, 'এখানেও আর থাকতে পারবি না। আবার সেলুলার কয়েদখানায় ফেরত পাঠিয়ে দেব। পেটি অফসারেরা পিটিয়ে পিটিয়ে নানীর বাপের শাদী দেখিয়ে দেবে।'

রামজীর নামে বার দশেক কসম খেয়ে লখাই বোঝাল, তার মনের কোথাও মন্দ মতলব নেই। সে কিছুতেই পালাবে না। এ ব্যাপারে শিবরামজীর ভাবনার কোন কারণ নেই।

পোর্ট মোয়াটে মঙ ফা'র কুঠিতে এসে লখাই যখন পৌছল, তখন বিকাল হয়ে গিয়েছে।

রোদে গলা সোনার রঙ ধরেছে। জঙ্গলের মাথায় এক ঝাঁক হীরামন পাখি পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে।

মঙ ফা'র কুঠির ঠিক সামনেই দুটো গোলমোহর গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠেছে। গোলমোহরের সোনালী পাতাগুলি বিকালের রোদে চিকমিক করছে।

, অন্য অন্য দিন উজাগর সিংয়ের সঙ্গে রাত্রিতে এখানে এসেছে লখাই। তাই গোলমোহর গাছদুটোকে দেখতে পায় নি।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কোথা থেকে যে এই গোলমোহর গাছ দুটো এসে পড়েছে, এখন সে কথা ভাবার মত মনের অবস্থা নয় লখাইর।

এক মুহূর্ত গাছদুটোর দিকে তাকিয়ে রইল লখাই। তারপর চড়া গলায় ডাকল, 'মঙ ফা, এ মঙ ফা'জী—'

'কৌন, কৌন রে—'

ঝুপড়ির ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এল মঙ ফা। খুশিতে তার খুদে খুদে চোখ দুটো চিক চিক করছে। খুক খুক করে একটু হেসে সে বলল, 'আরে তুমি! এস এস ইয়ার। রোজই ভাবি, তুমি আসবে। লেকিন আস না।'

'আমাকে কানখাজুরায় কেটেছিল। ক'দিন মাচান ছেড়ে উঠতে পারি নি।'

চুক চুক করে কেমন এক ধরনের শব্দ করে মঙ ফা। লখাইকে কানখাজুরায় কেটেছে। হয়ত সেজন্য দুঃখই জানায়। মঙ ফা'র মুখ দেখে বুঝবার জো নেই, তার এই দুঃখ জানানো কতটা খাঁটি আর কতটা কপট ?

মঙ ফা এবার খাতির করে ডাকে, 'ওপরে এস ইয়ার।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাঁশের পাটাতনে উঠল লখাই।

হঠাৎ লখাইর কানে মুখ গুঁজে দিল মঙ ফা। ফিস ফিস করে বলল, 'মিমি খিনের জন্যে এসেছ তো ইয়ার?'

'হাঁ।'

আবছা গলায় বলল লখাই।

'একটা রুপেয়া লাগবে জী।'

কোমরের খাঁজ থেকে একটা টাকা বার করে মঙ ফা'র হাতে দেয় লখাই। চক্ষের পলকে টাকাটাকে কুর্তার পকেটে ঢুকিয়ে দেয় মঙ ফা। তারপর বেশ খুশী খুশী গলায় বলে, 'আমার কারবার নগদা। টাকা যেমন দিয়েছ, ফুর্তিও তেমনি পাবে। এস এস ইয়ার।'

ঝাঁপ খুলে লখাইকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল মঙ ফা। বলল, 'যাও, শেষ খুপরিতে মিমি খিন আছে।'

ঝুপড়ির ভিতরটা হিম হিম, ছায়া ছায়া। কোণায় কোণায় কেমন এক ধরনের নীলচে অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে। বেড়ার গায়ে মাকড়সারা কত যে জাল বুনেছে, তার লেখাজোখা নেই।

গুই সাপের চামড়ার গন্ধ, আধা শুকনা মাছের গন্ধ, পচা মাংসের গন্ধ—সব মিলিয়ে একটা বোটকা দুর্গন্ধ মুহূর্তের মধ্যে লখাইর নাকটাকে ধাঁধিয়ে দিল।

বেড়ার গায়ে লম্বা লম্বা বর্মী দা আর বাঁকানো টাঙির ফলাগুলো ঝুলছে। বুকের মধ্যটা কেমন যেন ছম ছম করে উঠল লখাইর।

এইরকম দুর্গন্ধ ভরা, আবছা ঝুপড়িতে থাকার অভ্যাস নেই। তাই ধাতস্থ হতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। ধাতস্থ হয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে শেষ খুপরিটায় এসে পড়ল লখাই।

লখাইর দিকে পিঠ রেখে বসে রয়েছে মিমি খিন। তার মুখটা দেখতে পাচ্ছে না লখাই।

খুপরিটার পিছন দিকে ছোট একটা ফোকর। খুব সম্ভব ফোকরের মধ্য দিয়ে বাইরের আকাশে হীরামন পাখি দেখছে মিমি খিন।

খুব আস্তে লখাই ডাকল, 'মিমি খিন—'

'কে, কে?'

চমকে সাঁ করে ঘুরে বসল মিমি খিন।

'আমি লখাই। তোমার ইয়াদ নেই? সেই যে ফরেস্ট অফসারের সাথ তোমার এখানে এসেছিলাম।'

কাঁপা কাঁপা ভয়াতুর গলায় মিমি খিন বলল, 'কী চাই তোমার?'

লখাই জবাব দিল না। অল্প একটু হাসল। চোখদুটো ধক ধক করছে তার। আর চোখের ধকধকানিতেই লখাইর জবাবটা রয়েছে।

লখাইর মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মিমি খিন, 'তোমর' আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেল। আমি আর বাঁচতে না।'

দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা গুঁজে দিল মিমি খিন। উজাগর সিংয়ের সঙ্গে প্রথম দিন এসে লখাই যেমন দেখেছিল, তেমনি ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটানা কান্নার শব্দ শুনতে লাগল লখাই। শুনতে শুনতে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠল।

শিবরামের কাছ থেকে এখানে আসার হুকুম যোগাড় করতেই আস্ত একটি টাকা এবং এক বোতল শরাব খোয়াতে হয়েছে। তার উপর মঙ ফা নিয়েছে আরো একটা টাকা। মোট দুটি টাকা এবং পুরা এক বোতল শরাবের বদলে শুধু মাত্র মেয়েমানুষের কান্না শুনবার মত মন-মেজাজ শৌখিন নয় লখাইর।

সমানে কাঁদছে মিমি খিন।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লখাই। পয়সা খরচ করে মেয়েমানুষের কান্না শোনার মত দিকদারি বুঝি আর নেই।

মিমি খিনের কান্নাটা দুই কানে ক্রমাগত ঘা মারছে। প্রথমে বিরক্ত হল লখাই। চোখ দুটো কুঁচকে একদৃষ্টে মিমি খিনের দিকে তাকিয়ে রইল। বিরক্তিটা একটু একটু করে অদ্ভুত এক আক্রোশের রূপ নিল। ভয়ানক আক্রোশ হল লখাইর, ভয়ানক রাগ হল।

কিছু দিলে কিছু মিলবে—এটাই এই দুনিয়ার দস্তুর। সোজা, সহজ একটা নিয়ম।

অথচ লখাই শুধু দিলই। বদলে কিছুই পাচ্ছে না। লখাইর মনে হল, এই মিমি খিন যেন কারসাজি করেই কেঁদে কেঁদে একান্ত ন্যায্য এবং সঙ্গত দাবী থেকে তাকে বঞ্চিত করছে। এই কথাটা যতই সে ভাবছে, মেজাজটা ততই ভীষণ হয়ে উঠছে।

কতক্ষণ ধরে যে মিমি খিনের কান্না শুনছে, লখাইর খেয়াল নেই। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়তেই তার হুঁশ ফিরল।

খুপরির পিছন দিকে যে ছোট্ট ফোকরটা রয়েছে, তার মধ্য দিয়ে এক টুকরা আকাশ দেখা যায়। লখাই যখন এই খুপরিতে ঢোকে, তখন সেই আকাশে গলা সোনার রঙ ছিল। এখন সেখানে বেলা শেষের বিষণ্ণ একটু

আলো আটকে আছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। তার আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে।

কতক্ষণ ধরে যে মিমি খিনের কান্না শুনছে, হিসাব করে বলতে পারবে না লখাই!

লখাই হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, নারী-নেশা, দুনিয়ার তাবত ভোগের বস্তু চোখে পড়া মাত্র যে আয়ত্ত করে বসে। আশ্চর্য! মিমি খিনের পাঁচ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিকালটাকে প্রায় সন্ধ্যা করে ফেলল! অথচ এখন পর্যন্ত তাকে ছুঁয়ে দেখল না।

লখাই ভাবতে চেষ্টা করল, তুষণাবাদের সেই নিদারুণ জঙ্গল কি তার মত দুর্দান্ত খুনিয়ারাকে একেবারেই জুড়িয়ে ফেলেছে।

মিমি খিনের কান্না আর থামে না।

মেয়েমানুষের কান্না লখাই খুবই পছন্দ করে। কিন্তু তারা হল অন্য জাতের মেয়েমানুষ। ফুর্তির জন্য যে মেয়েমানুষকে নিয়ে কেনাবেচা চলে, সে হবে একেবারে আলাদা ধরনের। সে হবে ফুর্তিওয়ালী, তামাশাবালী, কপট শরমের রঙে সে রাঙাবে। তার চলায় বলায় বিজুলি চমকাবে। তার চোখে থাকবে ছুরির ধার। কোমরে লছক খেলবে।

কিন্তু এ কোন মেয়েমানুষ!

পয়সার বদলে যে মেয়েমানুষ মেলে, সে যদি ফুর্তির বদলে শুধু কান্নাই শোনায়, তাকে নিয়ে কি করবে লখাই? মোট কথা এই জাতের মেয়েমানুষকে আদৌ বুঝে উঠতে পারে না লখাই। এদের দুর্জ্ঞেয় মন লখাইর নাগালের বাইরে।

এবার এক কাজ করে বসল লখাই। আস্তে আস্তে মিমি খিনের পাশে গিয়ে বসল। তার পিঠে একখানা হাত রেখে খুব নরম গলায় ডাকল, 'মিমি খিন—'

চমকে উঠল মিমি খিন। তার শরীরটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথাটা তুলে ভয়ার্ত অদ্ভুত চোখে লখাইর দিকে তাকিয়ে রইল সে। সে চোখে যে দৃষ্টি ফুটে রয়েছে, তার তুলনা নেই।

এই মুহূর্তে মিমি খিনের দৃষ্টির একটা মাত্র উপমাই মনে পড়ছে লখাইর। তার হাতে এক হাত লম্বা একটা ছোরার ফলা দেখে বিবির বাজারের মোতির চোখে যে দৃষ্টি ফুটেছিল, অবিকল সেই দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রয়েছে মিমি খিন।

লখাই শিউরে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ লখাই বলল, 'ভয় লাগছে?'

'হাঁ।'

'ভয় কি?'

মিমি খিন জবাব দিল না।

লখাই আবার বলল, 'আমাকে ভয় পেয়ো না।'

অনেকটা সময় লখাইর মুখের দিকে চেয়ে রইল মিমি খিন। চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। এক সময় ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে নাড়তে সে বলল, 'সত্যি তোমাকে ভয় নেই?'

'না।'

আবার কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লখাইকে দেখল মিমি খিন। হয়ত তার মনের দ্বিধাটা কাটছে না। এই মানুষটাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়, সঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মিমি খিন। তবে এটুকু সে বুঝেছে, এই দ্বীপের অন্য অন্য দুশমনগুলো যারা মঙ ফ'র মারফত তার খুপরিতে ফুর্তি লুটতে আসে, তাদের সঙ্গে এই লোকটার অনেক তফাত।

দুশমনগুলো কোন কথাই বলে না। তাকে ডলে পিষে কামড়ে ছিঁড়ে শেষ করে দিতে চায়। কিন্তু এই লোকটা কিছুটা আলাদা জাতের। অন্তত নরম গলায় দু চারটে কথা সে বলেছে। তার ভয় লাগে কি না, জানতে চেয়েছে। অন্য শয়তানগুলো তো তাকে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, তার কোন কথাই শুনতে চায় না। তারা চায় ক্ষ্যাপা কুত্তার মত তার দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে।

মিমি খিনের দিকে চেয়ে অন্য কথা ভাবছিল লখাই।

উজাগরের সঙ্গে প্রথম যেদিন সে এখানে এসেছিল, সেদিন কয়েক মুহূর্তের জন্য মিমি খিনের মুখটা দেখতে পেয়েছিল। সেই থেকেই তার মাথার ভিতর অদ্ভুত এক ভাবনা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। মিমি খিনের মুখের ছাঁদ একবারেই বর্মীদের মত নয়। তবে, তবে? মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

লখাইর মাথার ভিতর যে ভাবনাটা তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ মুখ দিয়ে সেটা বেরিয়ে পড়ল। খুব আস্তে সে ডাকল, 'মিমি খিন—'

'কি বলছ ?'

'তোমাকে দেখতে তো বর্মীদের মত না।'

'না।' অস্ফুট একটা শব্দ করল মিমি খিন।

তীক্ষ্ণ গলায় এবার লখাই বলল, 'তুমি কি তবে বর্মী না ?'

'না।'

সুঠাম নাকের ডগাটা তির তির করে কাঁপছে। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে। টানা দীর্ঘ চোখ দুটি জ্বলছে।

প্রায় চিৎকার করে উঠল লখাই, 'তবে তুমি কী ?'

'বাঙালী।'

'বাঙলা দেশের কোন জেলায় তোমার ঘর ?'

'চাটগাঁ।'

এই মুহূর্তে অদ্ভুত এক উত্তেজনা যেন লখাইর উপর ভর করে বসেছে। মিমি খিনের দুটো হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে সে বলল, 'চাটগাঁ জেলায় ঘর। তুমি বাঙালী। তাহলে তোমার নাম মিমি খিন কেন ?'

'আমার নাম মিমি খিন না, বিন্দি।'

'বিন্দি !'

'হাঁ।'

'তবে তুমি মিমি খিন হলে কেমন করে ?'

এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে কথা বলছিল মিমি খিন। হঠাৎ যেন ঘোরটা কেটে গেল। দুই হাতে মুখ ঢেকে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল, 'না না, তা আমি বলতে পারব না। মঙ ফা জানতে পারলে আমাকে কেটে ফেলবে।'

'ভয় নেই বিন্দি। তুমি বল। মঙ ফা জানতে পারবে না।'

'না-না-না—'

সামনে মাথা ঝাঁকাতে লাগল মিমি খিন। মিমি খিন না, বিন্দি। আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। 'মঙ ফা বড় শয়তান, ও না পারে দুনিয়ায় এমন কাজ নেই। ও আমাকে খুন করে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল লখাই। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমিও না পারি, দুনিয়ায় এমন কাজ নেই। তোমার ভয় নেই বিন্দি। আমি বলছি মঙ ফা তোমার কিছুই করতে পারবে না।'

একটু থেমে কি যেন ভেবে নিল লখাই। তারপর আবার শুরু করল, 'তা ছাড়া আমি তোমার দেশের লোক। বাঙলা মুলুকে আমার ঘর। চব্বিশ পরগণা জেলা, হেতমপুর গ্রাম। আমার নাম লখাই। জাতে কৈবোত (কৈবর্ত)।'

'সত্যি ?'

'হাঁ সত্যি। ভগবানের নামে দিব্যি গেলে বলছি, সত্যি। আমাকে দিয়ে তোমার কোন ক্ষেতি হবে না বিন্দি। তুমি তোমার জীবনের কথাটা কও। কেমন করে মিমি খিন হলে, সেই কথাটা কও। শুনে বড় তাজ্জব লাগছে।'

বিন্দি হয়ত বুঝল, এই নিদারুণ দ্বীপে এই প্রথম এমন একটা মানুষের দেখা সে পেয়েছে, যাকে দিয়ে হয়ত তার কোন ক্ষতি হবে না। এই মানুষটা হয়ত কোন বিপদেই তাকে ফেলবে না। কোন বদ মতলব নিয়ে হয়ত এই মানুষটা আসে নি।

প্রতি রাত্রে মঙ ফা যে সব দুশমনগুলোকে তার খুপরিতে ঢুকিয়ে দেয়, তাদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপ এবং অকথ্য আচার আচরণ দেখে মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে বসেছিল বিন্দি। এখানে যারাই আসে, তাদের সকলকেই ঘৃণা করে সে, অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে।

বিন্দি ভাবল, এই দ্বীপে আসার পর এই প্রথম সে এমন একটা মানুষের দেখা পেয়েছে, যাকে ভরসা করে বিশ্বাস করে নিজের দুর্বহ জীবনটার কথা হয়ত শোনানো যায়।

একবার নিজের দেহটার দিকে তাকাল বিন্দি। এই বহুভুক্ত দেহটার মধ্যে অনেক ব্যথা জমে রয়েছে। মঙ ফা'র এই খুপরিতে মুখ বুঁজে থাকতে হয় তাকে। যত দিন যায়, দেহে আর মনে যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। সেই যন্ত্রণার কথা কারুকে বলে যে বিন্দি একটু হালকা হবে, তার উপায় নেই। কাকে সে বলবে ? কে তার ব্যথার কথা শুনবে ? এখানে শোনাবার মত মানুষই বা কোথায় ?

এখানে, বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে মানুষ হয়ত মেলে। ঠিক মানুষ নয়, মানুষের আকৃতির মধ্যে কতকগুলি বর্বর এখানে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ যদিও মেলে, মন মেলে না। দরদ, ভালবাসা তো এখানে একান্ত দুর্লভ।

মানুষ যখন ডুবতে বসে, তখন হাত বাড়িয়ে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে। এখানে আসার পর জীবন-জোড়া অবিশ্বাস আর সন্দেহে ডুবতে বসেছে বিন্দি।

কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরার মত একটা আশ্রয়ও তার নেই। মানুষ যা সম্বল করে বাঁচে, সেই আস্থা-বিশ্বাস-দরদ-মমতা, কিছুই নেই এই দ্বীপে।

এক এক সময় বিন্দির মনে হয়, গলায় রশি দিয়ে সব যন্ত্রণা জুড়োয়।

এমনভাবে আর কিছুদিন চললে মরেই যেত বিন্দি। মঙ ফা'ই তাকে মেরে ফেলত। কিন্তু তার আগেই এসে পড়েছে লখাই।

এই প্রথম এমন একটা মানুষের দেখা পেয়েছে বিন্দি, দেখামাত্রই যে তার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় না।

বিন্দি জানে, তার এই খুপরিতে যে-ই ঢুকুক, তার কাছ থেকেই দাম আদায় করে মঙ ফা। লখাইর কাছ থেকেও নির্ঘাত আদায় করেছে।

বিন্দির দেহের দাম আদায় না করে কারুকেই এই খুপরিতে ঢুকতে দেয় না মঙ ফা।

আশ্চর্য! দাম চুকিয়ে এসেও ফুর্তিটুকু হিসাব করে উসুল করে নেয় না, বরঞ্চ তার দুঃখের কথা ব্যথার কথা গরজ করে জানতে চায়, এমন মানুষ এই দ্বীপে এই প্রথম দেখল বিন্দি।

লখাই আবার বলল, 'বল, কেমন করে মিনি খিন হলে?'

গাঢ় গলায় বিন্দি বলল, 'সত্যিই আমার কথা শুনতে চাও?'

'হাঁ—সত্যি। মনে লাগছে, তোমার খুব দুঃখু। তাই না বিন্দি?'

'হাঁ—খুব দুঃখু।'

সামান্য একটু সহানুভূতির তাপে কেঁদে ফেলে বিন্দি। খানিকটা পর ধরা ধরা গলায় বলে, 'শোন পুরুষ, এই দ্বীপি তুমিই পয়লা মানুষ—'

বলতে বলতে থেমে যায় বিন্দি।

লখাই বলে, 'আমি কী?'

'না, কিছুই না।'

নীচের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিন্দি।

বিন্দির কথা কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে বিমূঢ়ের মত বসে থাকে লখাই। এর পর কতটা সময় যে কেটে যায়, কে তার হিসাব রাখে?

হঠাৎ বিন্দি বলে, 'আমার দুঃখুর কথা শুনতে চাও পুরুষ?'

'হাঁ।'

বিন্দির জীবনের কথা শুরু হল।

বিন্দির বাপের নাম সুখচাঁদ দাস।

শুঁটকী মাছের ফালাও কারবার ছিল সুখচাঁদের। কর্ণফুলির মাছ শুকিয়ে বিরাট বিরাট গাছি নৌকায় ভরে আকিয়াবে পাড়ি জমাত সে। চার পাঁচ দিন আকিয়াবে থেকে আবার চাটগাঁয়ে ফিরে আসত।

প্রথম প্রথম শুকনা মাছের চালান নিয়ে মরশুমে একবার মাত্র ক্ষেপ মারত সুখচাঁদ।

আকিয়াবে শুঁটকী মাছের খুব চল।

দু পাঁচ বছরে কারবার ফেঁপে উঠল। মরশুমে চার পাঁচটা ক্ষেপ মেরেও চাহিদা মেটাতে পারত না সুখচাঁদ।

কর্ণফুলির মাছ নিয়ে আকিয়াবের পাইকারদের কাছে বেচে দিয়ে আসত সুখচাঁদ। এতে তেমন পড়তা থাকত না। পনের বিশ দিন থেকে খুচরা বেচতে পারলে লাভ বেশ ভালই থাকে। অথচ বেশীদিন আকিয়াবে থাকার উপায় নেই। পিছু টান আছে। ঘর সংসার, বউ মেয়ে, সব পড়ে থাকে চাঁটগাঁয়।

পৃথিবীতে এমন একদল মানুষ আছে, ঘর সংসারে যারা আকণ্ঠ মজে থাকে। বউ-ছেলে-মেয়ে ছেড়ে কোথাও গিয়ে তারা টিকতে পারে না। ঘর সংসারের মধ্যেই তাদের জীবনের যত মজা, যত খুশি, যত আনন্দ। এ সবের বাইরে তারা বিশেষ কিছুই বোঝে না। টাকায় পয়সায় দৌলতে না, বউ-ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসারের কাছ থেকে কতটুকু পেল, তাই দিয়েই তারা জীবনের লাভক্ষতির হিসাব কষে। সুখচাঁদ হচ্ছে অনেকটা এই জাতের মানুষ। পেটের দায়ে শুকনা মাছের চালান নিয়ে সে আকিয়াব যায় বটে, মন কিন্তু তার চাটগাঁয়েই পড়ে থাকে। ঘরের টান ঠেকিয়ে বেশিদিন সে আকিয়াবে থাকতে পারে না।

রোজগারের ধান্দায় ঘন ঘন আকিয়াব যেতে হয়। আবার ঘরের টানও আছে। এই দোটানায় পড়ে অস্থির হয়ে উঠত সুখচাঁদ। ভেবে ভেবে একটা উপায় বার করল সে। চাটগাঁর বাস তুলে ঘর সংসার নিয়ে আকিয়াবে গিয়েই থাকবে।

সুখচাঁদের দুই মেয়ে ; বিন্দি আর পাখি। দুই মেয়ে আর এক বউ নিয়ে তার সংসার।

আকিয়াবে সংসার তুলে আনল সুখচাঁদ। ঠিক করল, কর্ণফুলির মাছ আর আনবে না। আকিয়াব নদীর মাছ শুকিয়েই ব্যবসা চালাবে।

ব্যবসা জোর চলতে লাগল।

আট দশ বছর কেটে গেল আকিয়াবে। চাটগাঁর সঙ্গে যোগাযোগটা একরকম ছিঁড়েই গেল। দেশের সঙ্গে শুধু কি যোগাযোগটাই ঘুচল?

আকিয়াবে যে জায়গাটায় সুখচাঁদরা থাকত, সেখানকার আচার-ব্যবহারে রুচিতে পোশাকে, কথায় বার্তায় বর্মী প্রভাব অত্যন্ত প্রবল।

বিন্দি-পাখি বর্মী মেয়েদের মত পোশাক পরত। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল, খানাপিনা, আদব কায়দা, সবই তারা বর্মীদের অনুকরণে করত।

ব্যবসার সুবাদেই মঙ ফা'র সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সুখচাঁদের আড়ত থেকে পাইকারী দরে শুঁটকী মাছ কিনে আরাকানে নিয়ে বেচত মঙ ফা।

আস্তে আস্তে পরস্পরের স্বার্থের খাতিরেই সুখচাঁদের সঙ্গে মঙ ফা'র সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তখন মঙ ফা ছিল বিশ বাইশ বছরের জোয়ান। অন্য অন্য বর্মীদের মত সে লুঙ্গি পরত না। রেঙ্গুন শহরে গিয়ে সাহেব দেখে এসেছিল সে। সাহেবদের মত প্যান্ট পরত মঙ ফা। চুলে ঢেউ খেলিয়ে টেরি কাটত। ফুরফুরে শৌখিন মেজাজের মানুষ ছিল সে।

মঙ ফা'কে খুবই পছন্দ করত সুখচাঁদ। বলত, 'এমন কাজের ছেলে জন্মে দেখি নি। মঙ ফা'র ব্যবসার মাথাটা বড় সাফ।'

আরাকান থেকে যখন মাল কিনতে আসত মঙ ফা, তখন অন্য কোথাও তাকে উঠতে দিত না সুখচাঁদ। সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে তুলত। যদ্দিন খুশি, সুখচাঁদের বাড়িতে থাকত মঙ ফা।

সুখচাঁদের দুই মেয়ে; পাখি আর বিন্দি। পাখি বড়, বিন্দি ছোট। পাখির বয়স তখন ষোল সতের, বিন্দির এগার বার।

সুখচাঁদের আর যাই থাক, কোন রকম সংস্কার ছিল না। ঘরের টান থাকলেও মনটা তার ঘরের মাপের মত ছোট ছিল না। তার কাছে জাত বিজাতের বিচার ছিল না। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতেই সে ভালবাসত।

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল সুখচাঁদ। পাখির সঙ্গে মঙ ফা'র বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ের পর পাখিকে নিয়ে আরাকানে চলে গিয়েছিল মঙ ফা।

বিন্দির হুবহু মনে আছে, বিয়ের পর পাখিকে নিয়ে সেই যে চলে গেল মঙ ফা, তারপর মাত্র দুবার এসেছিল আকিয়াবে।

সুখচাঁদের ধারণা ছিল, মঙ ফা আরাকানেই আছে। শেষ বার আকিয়াব আসার পর বছর খানেক ঘুরতে চলল। আর এল না মঙ ফা। লোক মারফত অনেক খোঁজখবর করল সুখচাঁদ। নিজে আরাকানে গিয়ে দেখেও এল। কিন্তু মঙ ফা কি পাখি—কারোরই খোঁজ মিলল না। তারা যে কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ তার হদিস দিতে পারল না।

প্রথম প্রথম খুব কাঁদত বিন্দির মা। বলত, 'আমার মেয়ে এনে দাও।'

সুখচাঁদ অনেক বুঝিয়েছে, 'মেয়ে আসবে, নিশ্চয় আসবে। মঙ ফা হয়ত ব্যবসার ফিকিরে কোথাও গিয়েছে। তুমি দেখ, ঠিক সে আসবে।'

বিন্দির মা জবাব দিত না। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত।

এর পর আরো দশটা বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু মঙ ফা আর ফিরল না।

মানুষ সম্বন্ধে ধারণাটা তখনও আগের মতই অটুট ছিল সুখচাঁদের। মানুষকে সে অবিশ্বাস করতে শেখে নি।

বিন্দি তখন বড়সড় হয়েছে। একেবারে বিয়ের লায়েক হয়ে উঠেছে।

বিন্দির মা বলল, 'মেয়ের বিয়ে দাও। স্বজাতির মধ্যে থেকে ছেলে দেখ।'

সুখচাঁদের ইচ্ছা কিন্তু অন্য। তার ব্যবসাতে মগেদের একটি ছেলে কাজ করত। তার নাম ফাম চা। ফাম চা যেমন সৎ, তেমনি পরিশ্রমী। ছেলেটিকে হাতে ধরে শুঁটকী মাছের ব্যবসা শিখিয়েছে সুখচাঁদ।

অনেক বয়স হয়েছে সুখচাঁদের। এখন তার ইচ্ছা, ফাম চা'র হাতেই মাছের ব্যবসা আর বিন্দিকে তুলে দেয়।

সুখচাঁদের ইচ্ছার কথাটা শুনে ক্ষেপে উঠল বিন্দির মা, 'না না, পাখির বিয়ে দিয়ে খুব শিক্ষা হয়েছে। বিন্দিরে আমি অজাত-কুজাতের হাতে দেব না। বর্মীর হাতে দিয়ে এক মেয়েকে তুমি মেরেছ। এই মেয়েরে কিছুতেই মগের হাতে দেব না।'

অনেক বোঝাল সুখচাঁদ। ফাম চা খুব সৎ ছেলে। তার সঙ্গে বিয়ে হলে বিন্দি সুখেই থাকবে। তা ছাড়া মঙ ফা'র কথাও তুলল সে। এমন কোন খবর তারা পায় নি, যা থেকে বোঝা যায়, মঙ ফা পাখির ক্ষতি করেছে।

সুখচাঁদ বলল, 'অবুঝ হবি না বউ। মানুষের উপুর বিশ্বাস রাখ। মানুষের

উপুর বিশ্বাস রাখতে পারলেই ভগমানে বিশ্বাস রাখা যায়। এই পিরথিমীতে সব মানুষই সমান।'

সুখচাঁদের সঙ্গে জীবনের পঁচিশ তিরিশটা বছর কাটিয়েও সংস্কার কাটাতে পারল না বিন্দির মা। মানুষকে জাতি-গোত্র-বংশ দিয়ে মেপে মেপে দেখতেই সে ভালবাসে। তা ছাড়া এই বর্মী এবং মগেদের সম্বন্ধে অদ্ভুত এক ভয় আছে তার মনে। সে বলল, 'এক মেয়ের তোমার ইচ্ছামত বিয়ে হয়েছে। এই মেয়ের বেলা আমার সাধটা মিটাতে দাও।'

সুখচাঁদ হচ্ছে সেই মানুষ যে ঘর-সংসার, বউ-মেয়ে খুবই ভালবাসে। কিন্তু সব চেয়ে যেটা বেশী ভালবাসে, সেটা হল তার জিদ। শেষ পর্যন্ত তার জিদটাই বজায় রইল।

দিনের পর দিন কেঁদেও সুখচাঁদকে টলাতে পারল না বিন্দির মা।

ফাম চা'র সঙ্গে বিন্দির বিয়ে হয়ে গেল।

বিন্দিকে নিয়ে ফাম চা কোথাও গেল না। সুখচাঁদের বাড়িতেই রয়ে গেল।

অসম্ভব খাটতে পারে ফাম চা। তার হাতে ব্যবসার সমস্ত ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল সুখচাঁদ। ব্যবসা হাতে পেয়ে মাস ছয়েকের মধ্যে তাকে ফাঁপিয়ে ফেলল ফাম চা।

ফাম চা যেমন সৎ, তেমনি বাধ্য। অন্য মগেদের মত সে নেশা করে না, কথায় কথায় চাকু বার করে না। বড় শান্ত ছেলেটি।

বিন্দির মায়ের মনে মগ বলে যে দ্বিধা, যে সন্দেহ এবং দ্বন্দ্ব ছিল, আস্তে আস্তে তা কেটে গেল। আকিয়াবী মগ যে তার নরম বাঙালী মনটা জুড়ে বসবে, সে কথা কি আগে ভাগে জানত বিন্দির মা?

সুখচাঁদ বলে, 'তোকে আগে বলি নাই বউ, ফাম চা বড় ভাল ছেলে। মানুষের উপুর বিশ্বাস রাখ। মানুষের উপুর বিশ্বাস রাখলে ভগমান খুশী হয়।'

বিয়ের পর ছ সাতটা মাস স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কেটে গেল বিন্দির।

কিন্তু এত সুখ বিন্দির কপালে সইল না। সুখচাঁদ কি বিন্দির মায়ের কপালেও সইল না।

তিন দিনের জ্বর বিকারে ফাম চা মারা গেল।

তারপরও দুটো বছর পার হয়ে গিয়েছে।

সাড়ে বারো বছর পর হঠাৎ এক দিন মঙ ফা এসে হাজির হল আকিয়াবে।

বিন্দি, বিন্দির মা, সুখচাঁদ তিনজনেই তাকে ঘিরে ধরল।

এত কাল কোথায় ছিল? কী করছে? পাখি কোথায়? এতদিন খোঁজ-খবর দেয় নি কেন? তিন জনে এক সঙ্গে হাজারটা প্রশ্ন করে বসল।

জবাবে মঙ ফা যা বলল, তা এক এলাহী ব্যাপার। পোর্টব্লেয়ার শহরে না কি বিরাট কাপড়ের দোকান দিয়ে বসেছে। দুখানা কুঠিবাড়ি কিনেছে। ছেলে পুলে তিনটি। একটি ছেলে, দুটি মেয়ে। এতকাল মাদ্রাজ থেকে মাল নিয়ে বেচত। এবার কলকাতায় এসেছে।

অনেক দিন ধরে শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখার জন্য প্রাণটা আনচান করছিল। অথচ ব্যবসার ঝামেলায় কি আসার যো আছে? এবার যখন কলকাতায় আসাই হল, তখন আকিয়াবে না এসে পারল না মঙ ফা। এই সুযোগে শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখে গেল।

বিন্দির মা বলল, 'পাখি কোথায়?'

'পোর্ট ব্লেয়ার।'

'পাখিরে নিয়ে এলে না কেন?'

মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে খুব আস্তে আস্তে মঙ ফা বলেছিল, 'পাখির ছেলে পুলে হবে এই মাসে। এখানে আসতে জাহাজে পাঁচ দিন লাগে। যদি জাহাজে কিছু হয়ে যায়, সাহস করে তাই আনি নি।'

'ভালই করেছ বাবা।'

বিন্দির মা বলল।

এবার এ দিককার খোঁজখবর নিল মঙ ফা।

এদিকের আর খবর কি? সুখচাঁদ আর বিন্দির মায়ের বয়স হয়েছে। বুড়ো বয়সে নতুন কি খবরই বা থাকবে? এখন তো কোন রকমে ধিকি ধিকি করে টিকে থাকা।

তবে হ্যাঁ, খবর আছে বিন্দির। বড় দুঃখের খবর। বিয়ের পর পুরা সাতটা মাসও তার কপালে সোয়ামী-সুখ সইল না।

শুনে খুব আক্ষেপ করল মঙ ফা।

মঙ ফা আসার পর থেকেই সুখচাঁদ বিন্দির মাকে বলতে লাগল, 'মানুষের

উপুর বিশ্বাস রাখিস বউ। তুই এই মঙ ফা'র সম্বন্ধে কত কুকথা ভেবেছিস! ছাখ, সে কি হয়েছে! মেয়ে তোর সুখেই আছে।'

বিন্দির মা জবাব দেয় না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বুঝতে চেষ্টা করে, সুখচাঁদের কথাটাই বুঝি ঠিক। ভাবে, এবার থেকে সে মানুষের উপর বিশ্বাস রাখবে।

আকিয়াবে তিন দিন মাত্র রইল মঙ ফা। চারদিনের মাথায় বলল, 'আর থাকার উপায় নেই। ব্যবসা আছে, তা ছাড়া পাখির এই অবস্থা।'

সুখচাঁদ বলল, 'তা তো ঠিক।'

মঙ ফা সমানে হাত কচলায়। কি একটা কথা যেন সে বলতে চায়। কিন্তু ভরসা করে বলে উঠতে পারছে না।

সুখচাঁদ মঙ ফা'র মনের কথাটা বুঝল। বলল, 'কিছু বলবে?'

'হাঁ। বলছিলাম, বিন্দির—'একটু ইতস্ততঃ করল মঙ ফা।

'বল, বল।'

গলাটা কেশে সাফ করে নিল মঙ ফা। তারপর শুরু করল, 'ফাম চা মরার পর বিন্দির মনটা তো ভাল নেই।'

বিষণ্ণ স্বরে সুখচাঁদ বলল, 'ভাল আর থাকে কেমন করে?'

'বলছিলাম মাস দুয়েকের জন্যে বিন্দিকে আমার সাথ নিয়ে যাই। একটা নয়া জায়গা দেখে আসবে। মনটাও ভাল হবে। পাখি তো অনেককাল বিন্দিকে দেখে নি। দেখলে খুব খুশী হবে।'

'বেশ, বেশ—'

এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল সুখচাঁদ।

আকিয়াব থেকে বিন্দিকে কলকাতায় নিয়ে এল মঙ ফা। সেখান থেকে পুরা পাঁচটা দিন জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দামান এসেছে।

একটু একটু করে সবই বুঝতে পারল বিন্দি।

পোর্ট ব্লেয়ারে মঙ ফা'র কাপড়ের দোকান নেই, কুঠিবাড়ি নেই। আকিয়াবে গিয়ে মঙ ফা যে ব্যবসা আর কুঠিবাড়ির গল্প ফেঁদে এসেছিল, তা যে কত বড় ধাপ্পা, কত মিথ্যা, আস্তে আস্তে টের পেয়ে গেল বিন্দি।

সরাসরি পোর্ট মোয়াটের এই ঝুপড়িতেই বিন্দিকে এনে তুলেছিল মঙ ফা।

ঝুপড়িতে ঢুকেই বিন্দি বলেছিল, 'পাখি কোথায়?'

কেমন এক ধরনের শব্দ করে যেন হেসে উঠেছিল মঙ ফা। বলেছিল, 'তুই-ই তো পাখি। কি বলিস!'

স্বরটা কঠিন হয়ে উঠেছিল বিন্দির, 'বল শিগগির, পাখি কোথায়?'

সাঁ করে বেড়া থেকে একটা দা টেনে উচিয়ে ধরেছিল মঙ ফা। তার ছোট ছোট কুতকুতে চোখজোড়া ধিকি ধিকি জ্বলছিল। বিন্দির মাথার উপর দা'টা খাড়া রেখে চাপা, তীব্র গলায় সে বলেছিল, 'বাঁচতে যদি চাস মাগী, পাখির কথা মুখে আনবি না।'

ধীরে ধীরে মঙ ফা'র স্বরূপ প্রকাশ পেতে লাগল।

প্রথমেই বিন্দির নামটা বদলে দিল সে। বিন্দি মিমি খিন হল।

তারপর প্রতি রাত্রে একটি করে দুশমন জুটিয়ে এনে তার খুপরিতে ঢুকিয়ে দিতে লাগল মঙ ফা। বিন্দির দেহটা বেচে বেচে সে পয়সা কামাতে লাগল।

ছ'টা মাস এই দ্বীপে কেটে গেল।

এই ছ মাসে হাজার চেষ্টা করেও পাখির কোন খবরই বার করতে পারে নি বিন্দি। তবে এটুকু সে জেনেছে, খুনের দায়ে দশ বছরের দ্বীপান্তরী সাজা হয়েছিল মঙ ফা'র। বিন্দির এক এক সময় মনে হয়, পাখিকেই খুন করে নি তো মঙ ফা?

এই ছ মাসে বার দশেক গলায় রশি দিতে গিয়েছে বিন্দি। দশ বারই তাকে ধরে ফেলেছে মঙ ফা। এক একবার মনে হয়েছে, এখান থেকে পালিয়ে যেদিকে দু চোখ যায়, চলে যাবে। কিন্তু এই ঝুপড়িটার চারপাশে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের চেহারা দেখে বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোথায় যাবে সে?

রাতের পর রাত তার ঝুপড়িতে দুশমন ঢুকিয়ে দেয় মঙ ফা। বিন্দির জীবনটাকে দুর্বহ, অসহ্য করে তোলে।

গলায় রশি দিয়ে যে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে, তারও উপায় নেই। এই ঝুপড়ি থেকে মঙ ফা নড়ে না। সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখে। পাহারা দেয়।

বিন্দির আর বাঁচার সাধ নেই।

দুঃখের কথাটা শুনিয়ে দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গোঁজে বিন্দি। আগের মতই ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

লখাই ডাকে, 'বিন্দি—'

হঠাৎ যেন বিন্দি ক্ষেপে উঠল, 'কী বলছ? আমার দুঃখুর কথা তো শুনলে। এবার ফুর্তি মেরে বিদেয় হও।'

বিন্দির একটা হাত ধরে লখাই বলল, 'ফুর্তি মারার হলে তো অনেক আগেই মারতাম। তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করি। তুমি বাঁচতে চাও?'

হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলল বিন্দি। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচতেই তো চাই পুরুষ, বাঁচতেই চাই।'

গলার স্বরটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বিন্দি কাঁদছে।

তার টানা টানা দীর্ঘ চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। গালের উপর দাগ রেখে রেখে চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নোনা জল ঝরছে। নাকের ডগাটি তির তির করে কাঁপছে। দু চোখে আশা আর হতাশা মেশা বিচিত্র এক দৃষ্টি ফুটে বেরিয়েছে।

এই দ্বীপে আসার পর এই প্রথম বাঁচার কথা শুনল বিন্দি।

বিন্দির মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যটা কেমন যেন করে উঠল লখাইর। গাঢ় স্বরে সে বলল, 'হ্যাঁ, বাঁচতে তোমাকে হবে।'

'কিন্তু কেমন করে?'

অদ্ভুত এক আগ্রহ আর আশা নিয়ে লখাইর মুখের দিকে চেয়ে রইল বিন্দি।

কেমন করে বাঁচবে বিন্দি?

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেছে লখাই। কিন্তু কেমন করে বিন্দি বাঁচতে পারে, সে কথাটা তো একবারও ভেবে দেখে নি।

বিন্দি আবার বলল, 'কেমন করে বাঁচব পুরুষ? তুমি আমাকে এই নরক থেকে আকিয়াব দিয়ে আসবে? আমাকে বাঁচাবে? আকিয়াব না পার, যেখানে খুশি নিয়ে চল। এখানে থাকলে আমি মরে যাব। মঙ ফা'ই আমাকে মেরে ফেলবে।'

চিৎকার করতে লাগল বিন্দি।

বিন্দি কি উন্মাদ হয়ে যাবে?

লখাই জবাব দিল না। চুপচাপ বসে রইল।

আশা আর আগ্রহ নিয়ে লখাইর দিকে তাকিয়ে ছিল বিন্দি। কিন্তু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও যখন জবাব মিলল না, তখন মুখটা বড় করুণ হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল বিন্দি।

এবার লখাই যেন জবাবদিহি করতে লাগল, 'ছ মাস হল এখানে কয়েদ খাটতে এসেছি। সাজার মেয়াদ চোদ্দ বছর। মেয়াদ না ফুরালে এই দ্বীপ থেকে তো যেতে পারব না। এ অবস্থায় কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব?'

মুখ না ঘুরিয়েই বিন্দি বলল, 'ও কথা কে শুনতে চায়? বাঁচার আশা দেখাতেই পার পুরুষ? বাঁচার উপায়টা বলতে পার না?'

একটু থেমে বলল, 'যাও, তুমি যাও। যেদিন বুঝবে, আমাকে বাঁচাতে পারবে, সেদিন এস।'

আশ্চর্য! এখন আর কাঁদছে না।

বিন্দির মুখ দেখতে পাচ্ছে না লখাই। দেখতে পেলে বুঝত, নিদারুণ হতাশা আর ব্যথায় মানুষের মুখের চেহারাটা কেমন হয়ে যায়।

যে নারী গত ছ মাসের ভিতর পৃথিবীর কাছ থেকে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই চায় নি, তাকে প্রথম বাঁচার কথা, আশার কথা শুনিয়েছিল লখাই। তারপরেই তাকে অফুরন্ত হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছে। বাঁচার আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখার মত মনের অবস্থা নয় বিন্দির। সে বাঁচতে চায়। বাঁচার উপায় চায়। কিন্তু সে উপায়টা এই মুহূর্তে লখাই জানে না।

হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরল লখাইর।

খুপরিটার পিছন দিকে যে ফোকর আছে, তার মধ্য দিয়ে ছোট্ট এক টুকরা আকাশ দেখা যায়। আকাশটা অন্ধকার হয়ে আসছে। খুব সম্ভব বাইরে সন্ধ্যা নামার আয়োজন চলছে।

লখাইর খেয়াল হল, এখানে আসার আগে শিবরাম পাণ্ডেকে বলে এসে-ছিল, সন্ধ্যার ঠিক মুখে মুখেই তুষণাবাদ ফিরে যাবে। কিন্তু বিন্দির এই খুপরিতে থাকতে থাকতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। আজ বরাতে যে কি আছে, কে বলবে? সেটা আন্দাজ করতেও ভরসা হল না লখাইর।

বাইরের চেহারাটা দেখবার জন্যই ছুটে ফোকরটার সামনে এসে পড়ল লখাই। বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ভুষণাবাদ ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

শিবরাম পাণ্ডে আর রাত্রি—এই দুটো মিলিয়ে একটা সম্ভাব্য দুর্ভোগের চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল লখাই। পিটিয়ে হাড্ডি খুলে নেবে, না আবার সেলুলার জেলেই টিণ্ডাল পেটি অফিসারদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে—শিবরাম পাণ্ডে যে কি ধরনের দুর্ভোগ ভোগাবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না লখাই। বুঝতে পারছে না বলেই নানা দুর্ভাবনা তার মাথার চেপে বসছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্ধকার দেখছিল লখাই আর ভাবছিল। হঠাৎ তার মনে হল, বাইরে বেড়ার গা ঘেঁষে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

লখাই চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, কে?'

চট করে লোকটা সরে গেল। আবছা অন্ধকারে তাকে ঠিক চেনা গেল না। তবু যতটুকু দেখেছে, তাতে লখাইর মনে হল, মঙ ফা'ই যেন দাঁড়িয়ে ছিল।

ফোকরটার সামনে থেকে বিন্দির কাছে এসে দাঁড়াল লখাই। বলল, 'আজ যাই। সুবিধে পেলেই আবার আসব।'

বিন্দি চুপচাপ বসে রইল।

পর পর পাঁচটা খুপরি পেরিয়ে বাইরে এল লখাই। দেখল, ঝুপড়িটার সামনে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দা দিয়ে এক টুকরা বাঁশ চাঁছছে মঙ ফা।

মঙ ফা মুখ তুলল। বলল, 'ইয়ার চললে?'

'হাঁ।'

মঙ ফা'কে পিছনে রেখে হন হন করে এগিয়ে গেল লখাই।

মঙ ফা ডাকল, 'এ ইয়ার—'

'হাঁ।'

'শোন, তোমার সাথ কথা আছে।'

'কী কথা?'

'শোনই না।'

গুটি গুটি পায়ে মঙ ফা'র কাছে ফিরে এল লখাই। বলল, 'কী বলছ?'

'এত বেকুব কেন তুমি? দামই দিতে জান, আদায় করে নিতে শেখ নি?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লখাই।

মঙ ফা আবার বলল, 'তোমার মাফিক আজব মানুষ আমি দেখি নি ইয়ার। পয়সা খরচ করে তুমি স্রিফ আওরতের কিসসা শুনে চলে যাও!'

মঙ ফা'র গলায় ব্যঙ্গ না ধিক্কার—ঠিক কি যে মিশে আছে, লখাই বুঝে উঠতে পারে না।

মঙ ফা আবার বলে, 'বেকুবের টাকা আমি রাখি না। তোমার টাকা ফেরত নিয়ে যাও।'

একটু আগে যে টাকাটা আদায় করে লখাইকে বিন্দির খুপরিতে ঢুকতে দিয়েছিল, সেটা ফেরত দিয়ে দেয় মঙ ফা। লখাইর কানের ভিতর মুখটা ঢুকিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'ফুর্তির ব্যাপারে তুমি একেবারে নালায়েক, বেকুব। আর তুমি এখানে এস না ইয়ার।'

'কেন?'

প্রায় চিৎকার করে উঠল লখাই।

'যে বেকুব ফুর্তির মতলবে এসে আওরতের কিসসা শুনে চলে যায়, তার সাথ মঙ ফা কারবার করে না।'

লখাইর ইচ্ছা হল, মঙ ফা'র টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু মঙ ফা'র হাতের বাঁকানো বর্মী দা'টা দেখে আপাতত এমন ইচ্ছাটাকে স্থগিত রাখতে হল।

মঙ ফা আর একটা কথাও বলল না। ঝুপড়িটার ভিতর ঢুকে ঝাঁপটা টেনে বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ ভয়ানক চোখে মঙ ফা'র ঝুপড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল লখাই। তার চোখ দেখে মনে হল, এ ব্যাপারের শেষ এখানেই নয়; মঙ ফা'র সঙ্গে আরো অনেক বোঝা পড়া আছে।

একটু পর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ভুষণাবাদের পথ ধরল লখাই।

বাহান্ন

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে লখাই।

এতক্ষণ মাথাটা গরম হয়ে ছিল। কপালের দুপাশে দুটো রগ সমানে লাফাচ্ছিল। মঙ ফা'র কথাটা ভাবতে ভাবতে মেজাজটা আর ঠিক রাখতে পারছিল না লখাই।

এখন জঙ্গলের মাথায় গোল একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে। ডালপালা এবং পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা আলো এসে পড়েছে।

অন্য অন্য দিন এই সময়টায় দমকা বাতাস ছোটে। আজকের বাতাস কিন্তু ভারি মিঠেন চালে বইছে।

ঝিরঝিরে বাতাসে গরম মাথাটা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে এল লখাইর।

কখন যে মন থেকে মঙ ফা মুছে গিয়েছে, তার বদলে বিন্দির ভাবনা সমস্ত মনটাকে জুড়ে বসেছে, লখাইর খেয়াল ছিল না।

তুষণাবাদের দিকে যেতে যেতে আজকের অভিজ্ঞতার কথাই ভাবছিল লখাই।

বার বার বিন্দির সেই ছবিটাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

বিন্দির টানা টানা দীর্ঘ দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছিল; গালের উপর দাগ রেখে রেখে চোখ থেকে উষ্ণ নোনা জল ঝরছিল। নাকের ডগাটি তির তির করে কাঁপছিল। লখাই যখন তাকে বাঁচার কথা শুনিয়েছিল, তখন আশা আর হতাশা মেশা বিচিত্র এক দৃষ্টি ফুটেছিল বিন্দির চোখে।

বিন্দির কথা যতই ভাবছে, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠছে।

জীবনে বহু নারীসঙ্গ করেছে লখাই। মেয়েমানুষ তার চোখে ভোগের জিনিস ছাড়া কিছুই নয়। মেয়েমানুষের চোখের জলের দাম তার কাছে কানাকড়িও নয়।

মেয়েমানুষ চোখে লাগলেই, যেমন করে পারুক তাকে আয়ত্ত করেছে লখাই। ভোগ করেছে। এর জন্য জেল-জরিমানা, খুনখারাপি, কিছুতেই সে পেছ-পা হত না।

মেয়েমানুষ ছিনিয়ে আনার পর যখন সে চিৎকার করে কেঁদেছে, চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে, গালি দিয়েছে, শাপ দিয়েছে, তখন অদ্ভুত এক আনন্দে লখাইর মনটা ভরে উঠেছে।

লখাই হল জালিয়াত-ঠগ-বদমাস-খুনী। কাম-রাগ-মত্ততা-হঠকারিতা-জৈবিক সুখভোগ—স্থূল কতকগুলি প্রবৃত্তির মধ্যেই তার সমস্তটুকু জীবনবোধ ছিল।

কিন্তু আজকাল জীবনবোধটাই বদলে যেতে শুরু করেছে লখাইর। তা না হলে বিন্দির কথা ভেবে বুকটা ধক করে ওঠে কেন? পয়সা খরচ করে ফুর্তির মতলবে এসে বিন্দির দুঃখের কথা শুনে মনটা এত খারাপই বা হয়ে যায় কেন?

লখাই ভাবল, জীবনে অনেক মেয়েমানুষ ভোগ করেছে সে, অনেক মেয়েমানুষের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু বিবির বাজারের মোতি ঢুলানি, আর দরিয়ার সঙ্গিনী সোনিয়া ছাড়া তার মনে আর কেউই বিশেষ দাগ কাটতে পারে নি।

মোতি আর সোনিয়া তার মনে দাগই কেটেছে কিন্তু বিন্দির মত তার সমস্ত মনটাকে তোলপাড় করতে পারে নি।

ভুষণাবাদের দিকে চলতে চলতে বিন্দির কথা ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠল লখাই। তার মনে হল, যেমন করেই হোক বিন্দিকে মঙ ফা'র হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু কেমন করে বিন্দিকে বাঁচাবে?

এই মুহূর্তে বিন্দিকে বাঁচাবার মত সঠিক একটা উপায় খুঁজে পায় না লখাই। আর পায় না বলেই মাথাটা আবার গরম হয়ে ওঠে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ।

কতক্ষণ হেঁটেছিল, হুঁশ নেই লখাইর।

হঠাৎ সামনের একটা প্যাডক গাছের ডাল থেকে কালো মত কি একটা যেন ঝুপ করে নীচে পড়ল।

চমকে তিন পা পিছিয়ে এল লখাই।

প্যাডক গাছের ডাল থেকে নীচে পড়েই সেই কালো মত বস্তুটা সিধা খাড়া

হয়ে উঠল। চিকরি-কাটা আবছা আবছা চাঁদের আলোতে বোঝা গেল, মানুষের মত একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোঝা গেল, কিন্তু চেনা গেল না।

লখাই চিৎকার করে উঠল, 'কে, কে ?'

সামনের মানুষটা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুই কে ?'

'আমি লখাই।'

'আরে আও আও দোস্ত।'

গলার আওয়াজেই চেনা গেল, লোকটা জগদীপ। লখাইর মতই ভূষণাবাদ 'বীট'-এর আর একজন জবাবদার।

এবার লম্বা লম্বা পা ফেলে জগদীপের কাছে এসে পড়ল লখাই। বলল, 'কি রে শালে, এত রাতে এখানে এসেছিলি কেন ?'

'দিল আসতে বল, তাই এসেছি।'

'গাছের মাথায় উঠেছিলি কেন ?'

'দিল উঠতে বলল, তাই উঠেছি।'

'শালা, তামাশা করছিস !'

জগদীপের একটা হাত ধরে ঝাঁকানি দিল লখাই। বলল, 'শিবরামজী জানতে পারলে জান চৌপট করে দেবে।'

'দিক।' ভয়ডরহীন নির্বিকার স্বরে বলল জগদীপ।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে জগদীপের মুখের দিকে চেয়ে থাকে লখাই। তারপর খুব নরম স্বরে ডাকে, 'আঁই জগদীপ—'

'হাঁ।'

'বল না, কি জন্যে গাছের মাথায় উঠেছিলি ?'

'আওয়াবিল পাখির বাসার খোঁজে। (আওয়াবিল পাখির বাসা এক ধরনের মাদক দ্রব্য।)' একটু থেমে কি যেন ভেবে নিল জগদীপ। তারপর আবার শুরু করল, 'জানিস লখাই, দু বছর এগার মাস ধরে ডি-কুনহা সাহেবকে আমি আওয়াবিল পাখির বাসা জুটিয়ে দিচ্ছি।'

ঘাড় কাত করে লখাই বলল, 'জানি।'

'কেন দিচ্ছি জানিস ?'

'জানি। তুই-ই তো বলেছিস, ডি-কুনহা সাহেবকে তিন বছর আওয়াবিল পাখির বাসা দিতে পারলে সে তোকে ছোট একটা মোটর বোট দেবে।'

'হাঁ, তোর পুরা ইয়াদ আছে দেখছি।'

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল জগদীপ, 'ছাখ লখাই, বিশোয়াস (বিশ্বাস) করে এ কথা স্রিফ তোকেই বলেছি। আর কারোকে বলি নি।'

'জানি।'

খানিকটা চুপচাপ।

হঠাৎ জগদীপ বলল, 'ডি-কুনহা সাহেবকে তিন বছর আওয়াবিল পাখির বাসা দিলে একটা মোটর বোট মিলবে। দু বছর এগার মাস দিয়েছি। হিসাব করে বল তো, আর কদ্দিন বাকী?'

'এক মাস।'

'তবে এক মাস পরেই আমি মোটর বোট পাব।'

বিড় বিড় করে বলতে লাগল জগদীপ, 'আর মোটে এক মাস, স্রিফ একটা মাস।'

বিমূঢ়ের মত জগদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লখাই।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কত বিচিত্র ধরনের কয়েদীই না সাজা খাটতে আসে!

লখাই আসার আগে তুষণাবাদের 'বীটে' একজন মাত্র জবাবদার ছিল। সে হল জগদীপ। লখাইও জবাবদার, জগদীপও জবাবদার। জবাবদারির সুবাদে দুজনের আলাপ জমে উঠল। আলাপটাই শুধু জমল না। কয়েক-দিনের মধ্যে দুজনের বন্ধুত্ব এমন পাকা হল, যাতে পরস্পর পরস্পরকে নিজের জীবনের এবং জান-জমানার সমস্ত কথা না শুনিয়ে পারল না।

পুরা বিশ বছরের মেয়াদে এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল জগদীপ। চার বছর সাজা খাটা হয়ে গিয়েছে।

এখানে আসার আগে মেনল্যাণ্ডে (ভারতবর্ষে) মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যবসা করত জগদীপ। বাঙলা, বিহার, পাঞ্জাব, আসাম, বেনারস, ইলাহাবাদ—নানা মুলুক, নানা শহর ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে মেয়েমানুষ যোগাড় করত। তারপর বোম্বাই শহরের রেণ্ডিপাড়ায় চালান দিত। এতে দারুণ মুনাফা থাকত।

কিন্তু নারী ব্যবসা সংক্রান্ত একটা খুনের দায়ে বছর পাঁচেক আগে ধরা পড়ে গিয়েছিল জগদীপ। খুন এবং আনুষঙ্গিক দু চারটে ছোট খাট অপরাধের দায়ে জড়ানো হয়েছিল তাকে।

এক বছর মামলা চলল। আদালতের রায় যখন বেরুল, দেখা গেল, বিশ বছরের দ্বীপান্তরী সাজা পেয়েছে জগদীপ।

জগদীপ বলেছিল, 'জানিস লখাই, খুনের ব্যাপারে কে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল ?'

'কে ?'

'আমার শাদী-করা বিবি। শালীকে বিশোয়াস (বিশ্বাস) করে খুনের কথাটা বলেছিলাম।' দাঁতে দাঁতে ঘষে জগদীপ গর্জে উঠেছিল, 'শালী হারামীর বাচ্চী বলত, আওরত নিয়ে ব্যবসা কর না। দুসরা কিছু কর। তুইই বল লখাই, আওরতের ব্যবসার মত ব্যবসা আছে ?'

'না।'

'আরে পেয়ারে, তুই দশ রোজের দোস্ত হয়ে আমার কথাটা বুঝিস, আর ঐ শালী দশ বছরের শাদী-করা বিবি হয়েও বুঝত না। উল্টে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিলে। শালী আমার বিবি না, দুশমন।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলত জগদীপ।

মাঝে মাঝে জগদীপ বলত, 'আমার বড় আপসোস হয় লখাই।'

'কেন ?'

'বিবিটাকে কোতল করে আসতে পারলাম না। শালী আমাকে কালাপানির কয়েদ খাটালে, লেকিন তার বদলাটা নিতে পারলাম না। তবে তুই দেখিস, যে দিন এখান থেকে ছাড়া পেয়ে মেনল্যাণ্ডে যাব, সেদিন পয়লাই কুত্তীটাকে কোতল করব। জেল-ফাঁসি যা হবার হবে।'

নিজের জিন্দগীর সব কথাই বলেছে জগদীপ।

চার বছর হল এই দ্বীপে এসেছে সে। এখানে আসার পরই ফরেস্টের কাজে পাঠানো হয়েছে তাকে। পাহাড়গাঁও, গারাচারামা, মিঠাখাড়ি, ব্যাম্বুফ্লাট—নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত তুষণাবাদে এসেছে।

চার বছর এই দ্বীপে কাটিয়েও বিবির কথা ভুলতে পারছে না জগদীপ। যখনই সে ভাবে, শাদি করা বিবি তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে, তখন আর স্থির থাকতে পারে না জগদীপ। নিরুপায়, অন্ধ আক্রোশে উন্মাদ হয়ে ওঠে।

বিবিকে কোতল করে শোধ না তোলা পর্যন্ত শান্তি নেই জগদীপের। প্রায়ই সে বলে, 'মাগীকে খুন করবই।'

মাঝে মাঝেই তুষণাবাদের 'বীট' থেকে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায় জগদীপ। সকালে ভাগলে ফেরে রাত্রে। যেদিন রাত্রে পালায়, ফেরে তারপর দিন সকালে। কোথায় যে সে যায়, কেউ বলতে পারে না।

ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে হাড্ডি চুর চুর করে দেয় শিবরাম পাণ্ডে। চামড়া ফেটে দর দর করে খুন ঝরে। তবু স্বভাব শোধরায় না জগদীপের। মাঝে মাঝেই সে পালায়। কোথায় যে সে যায়, হাজার পিটিয়েও সে কথা জানতে পারে নি শিবরাম পাণ্ডে।

একদিন জগদীপকে ধরল লখাই। বলল, 'তুই কোথায় ভাগিস জগদীপ?'

অল্প একটু হেসেছিল জগদীপ। সরাসরি জবাবটা এড়িয়ে একেবারে অন্য কথায় এসেছিল, 'স্থাখ লখাই, এখানে থাকতে আর ভাল লাগে না। শালী, খচরী মাগীটার জন্যে জান আমার খতম হয়ে যাচ্ছে।'

লখাই বুঝেছিল, জগদীপ তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ধমকে উঠেছিল সে, 'এ শালে কুত্তা, তোর মতলব কী? যে কথা জিগ্যেস করছি, তার জবাব দিচ্ছিস না কেন? আমাকে দোস্ত বলে মানিস। বিশ্বাস করে কোথায় যাস, বলতে পারিস না? তবে আর তোর সাথ দোস্তি রেখে কি হবে?'

'স্থাখ লখাই, নিজের শাদী-করা বিবি যেদিন বিশ্বাস ভাঙলে, সেদিন থেকে দুনিয়ার কারুকেই আমি বিশ্বাস করি না। তবু তোকে বলছি। তোকে দোস্ত বলে মেনেছি। এখন বিশ্বাস রাখা না রাখা তোর ধরম।'

একটু দম নিয়ে জগদীপ বলেছিল, 'আমি ডি-কুনহা সাহেবের কাছে যাই।'

'ডি-কুনহা সাহেব কে?'

'ডি-কুনহা সাহেব বড় এলেমদার আদমী। দরিয়ার মত বড় তার দিল। বুকে তার বহুত দরদ।' কি যেন ভেবে নিল জগদীপ। আবার শুরু করল, 'বছর তিনেক আগে গারাচারামার 'বীটে' জবাবদারি করতাম। সেখানেই ডি-কুনহা সাহেবের সাথ জান পয়চান হয়েছিল।'

'হুঁ।'

'ডি-কুনহা সাহেবকে আমার জিন্দগীর সব কথা বলেছি। বিবি আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছে। শুনে খুব আপসোস করেছে কুনহা সাহেব।'

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

আর একদিন জগদীপ বলেছিল, 'ডি-কুনহা সাহেব আমাকে বলেছে তিন

বছর তাকে আওয়াবিল পাখির বাসা যোগাড় করে দিলে একটা মোটর বোট দেবে।'

'মোটর বোট দিয়ে কি করবি?'

জগদীপ জবাব দেয় নি। মোটর বোট দিয়ে সে যে কি করবে, অনেক পীড়াপীড়ি করেও জানতে পারে নি লখাই।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে চিকরি কাটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মনে হয়, এক ঝাঁক রুপালী চাঁদা মাছ চিকমিক করছে।

জগদীপ আর লখাই তুষণাবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে।

জগদীপ বলল, 'দু বছর এগার মাস ধরে আমি ডি-কুনহা সাহেবকে আওয়াবিল পাখির বাসা দিচ্ছি। আর একটা মাস দিতে পারলেই একটা মোটর বোট পাব।'

লখাই বলল, 'যেদিন তোর সাথ পয়লা জান পয়চান হয়েছে, সেদিন থেকেই মোটর বোট মোটর বোট করছিস। কিন্তুক মোটর বোট দিয়ে হবেটা কি?'

জগদীপের যে জবাবটা হাজার চেষ্টা করেও এর আগে পায় নি লখাই, আজ হঠাৎ সেটা পেয়ে গেল।

জগদীপ বলল, 'পালাব।'

'পালাবি!'

'হাঁ হাঁ, পালাব। মাগীকে কোতল করে শোধ তুলতে হবে না?'

অস্ফুট একটা শব্দ করল লখাই। এই মুহূর্তে অন্য এক কয়েদীর কথা মনে পড়ছে তার। সে তোরাব আলী। বিবির কাছে ফিরে যাবার জন্য ছোট একটা জেলে ডিঙি সম্বল করে এই দ্বীপ থেকে চলে গিয়েছিল তোরাব। আশ্চর্য! জগদীপও মোটর বোট ভরসা করে বিপুল দরিয়া পাড়ি দিতে চাইছে। বিবির টানে নয়, তাকে কোতল করে শোধ তুলতেই যাচ্ছে জগদীপ।

লখাই ভাবতে চেষ্টা করল, তোরাব আলী আর জগদীপের মধ্যে কতখানি তফাত!

জগদীপ আস্তে ডাকল, 'এ লখাই—'

'হাঁ।'

'তুই আমার সাথ ভাগবি ?'

লখাই বুঝে উঠতে পারছে না, কি জবাব সে দেবে ?

শুধু শিরায় শিরায় অদ্ভুত এক উত্তেজনায় রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল লখাইর।

তোরাব আলীও একদিন তাকে পালিয়ে যাবার কথা বলেছিল। কিন্তু ঝড়ের দরিয়ার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ছোট ডিঙিতে পাড়ি জমাতে সাহস পায় নি লখাই।

আজ জগদীপ তাকে পালাতে বলছে।

এই মুহূর্তে লখাই ঠিক করে উঠতে পারল না, কি সে করবে ?

তিপ্পান্ন

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটাকে বড় ভালবেসে ফেলেছেন নওয়াজ খান।

এক এক সময় নওয়াজ খানের মনে হত, এই দ্বীপে যে উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, তার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কতকগুলি দুর্দান্ত কয়েদীকে বিচ্ছিন্ন ভাবে রাখলেই তাদের স্বভাব শুধরে যাবে, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না।

প্রয়োজন থাক আর নাই থাক, তবু এখানে উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। এই উপনিবেশের যারা বাসিন্দা, তাদের শতকরা নিরানব্বই জনই জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। দেশ কাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র ধারণা নেই। দেশের ভালমন্দ নিয়ে এদের কোন ভাবনা নেই। কিছু নেশা আর মেয়েমানুষ পেলেই এরা খুশী। জীবনে এই-ই এদের চূড়ান্ত চাওয়া। এর বেশি দাবী এদের নেই। এর বাইরে এরা কিছু বুঝতেও চায় না।

এই কুৎসিত মানুষগুলিকে ঘৃণা করতেন নওয়াজ খান। কিন্তু আজকাল এদের জন্য করুণা হয়। বড় বেদনা বোধ করেন তিনি।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কত বছর কেটে গেল ?

এক একসময় ভাববার চেষ্টা করেন নওয়াজ খান।

স্মৃতিটা কেমন যেন ঝাপসা হতে শুরু করেছে। তবু সেই তারিখ এবং সালটা হুবহু মনে করতে পারেন।

আঠার শ আঠান্নর দশই মার্চ ওয়াকার সাহেবের সঙ্গে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন নওয়াজ খান। এটা উনিশ-শ এগার সাল। মাঝখানে পুরা তিপ্পান্নটা বছর কেটে গিয়েছে।

তিপ্পান্ন বছর এই দ্বীপের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে ফুসফুসে একই নোনা বাতাস টানছেন নওয়াজ খান। অন্য সকলের মত এই উপনিবেশের ভাগ্যের সঙ্গে, এর সুখ দুঃখের সঙ্গে, নিজের ভাগ্য এবং সুখ দুঃখ একাকার করে মিশিয়ে দিয়েছেন।

এই দ্বীপটার উপর কেমন যেন মায়া বসে গিয়েছে।

তিপ্পান্নটা বছর কাটিয়ে আজকাল নওয়াজ খানের মনে হয়, বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ, এর উপনিবেশ, এর বাসিন্দা—সবাইকেই বড় ভালবেসে ফেলেছেন।

আঠার শ আটান্নর দশই মার্চ এই দ্বীপে এসেছিলেন নওয়াজ খান। এটা উনিশ-শ এগার। মধ্যের তিপ্পান্ন বছর এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যান নি। সাজার মেয়াদ ফুরাবার পরও এখানেই থেকে গিয়েছেন।

আগে আগে এক একসময় নওয়াজ খান ভাবতেন, মেনল্যাণ্ডে চলে যাবেন। কিন্তু কোনদিন যেতে পারেন নি। এই দ্বীপটাকে যেমন তিনি ভালবেসেছেন, এই দ্বীপও বুঝি তেমনি তাঁকেও ভালবেসে ফেলেছে। এক একসময় ভেবেছেনই শুধু, কিন্তু এই দ্বীপের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কোনদিন মেনল্যাণ্ডে ফিরতে পারেন নি নওয়াজ খান।

এখানে থেকেই বরাবর মেনল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছেন নওয়াজ খান। যতটা সম্ভব, দেশের চলতি জীবনধারার খোঁজ রেখেছেন।

আঠার শ সাতান্নতে সিপাহী বিদ্রোহ তো নিজের চোখেই দেখে এসেছেন। সে বিদ্রোহে তাঁর অসাধারণ এক ভূমিকাও ছিল।

তিনি জানেন, আঠার শ পঁচাশীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছে। সেই বছরই বর্মা মুলুকে তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। (সেই যুদ্ধের কয়েদীদের তো আন্দমানেই দেখেছেন নওয়াজ খান)। স্বাধীনতার জন্য এই শতকের প্রথম থেকেই আবার সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এই তো সেদিন মুন্সীজীর কাছে খবর পেয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই বাঙলা দেশ থেকে আজাদী লড়াইর বন্দীরা এখানে এসে পড়বে।

মুন্সীজীর মুখে খবরটা পাবার পর থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছেন নওয়াজ খান। অদ্ভুত এক উত্তেজনা তাঁর উপর ভর করে বসেছে।

এই কটা দিন ধরে গারাচারামা, পাহাড় গাঁও, লম্বা লাইন, গোল ঘর, মিঠাখাড়ি, ব্যাম্বু ফ্ল্যাট, ডাণ্ডাস পয়েন্ট—এই উপনিবেশের এক মাথা থেকে আর এক মাথায় উন্মাদের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন।

ভিলানিপুরের কুঠি থেকে ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েন। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। সারাটা রাত ঘুমাতে পারেন না। ছটফট করেন।

দিনরাত বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে কেটে যায় নওয়াজ খানের। এই দ্বীপের কথা ভাবতে ভাবতে কিছুতেই স্থির থাকতে পারেন না।

কি আছে এই দ্বীপের! মহিমা নেই, গরিমা নেই, গৌরব নেই মেনল্যাণ্ডের মানুষের মনে এই দ্বীপ সম্বন্ধে যা আছে, তা হল ধিক্কার, ঘৃণা, ভয়। বিপুল ভারতবর্ষের গৌরবের ইতিহাসে এর কোন ভূমিকা নেই।

জীবনের তিপ্পান্নটা বছর কাটিয়ে এই দ্বীপটাকে বড় ভালবেসে ফেলেছেন নওয়াজ খান। সুখে দুঃখে, আশায় হতাশায় সব সময় এই দ্বীপের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন তিনি। এই দ্বীপের ভাগ্যকে নিজের ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছেন।

নওয়াজ খান ভাবেন, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ তার জঘন্য বাসিন্দা-দের নিয়ে চিরদিনই কি অপমানিত, ঘৃণিত এবং ধিক্কৃত হয়ে পড়ে থাকবে?

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে।

মাথাটা যখন জুড়িয়ে আসে, তখন তাঁর মনে হয়, এই দ্বীপের প্রথম উপনিবেশের প্রথম বাসিন্দা হিসাবে তাঁর অনেক দায়।

তিনি স্থির করে ফেলেছেন, বিপুল ভারতবর্ষের ইতিহাসে আন্দামান দ্বীপের একটা গৌরবময় অধ্যায় যোগ করে দেবেন। সেই আশায় সেই উত্তেজনায় এই উপনিবেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে প্রতিটি মানুষের কাছে তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন।

এখন দুপুর।

সূর্যটা সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে।

জঙ্গলের মাথায় ঘন সবুজ রঙটা জ্বলছে।

আন্দামানের আকাশে এই মরশুমে কোথা থেকে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে হীরামন পাখি এসে পড়েছে। ছোট ছোট পাখিগুলো খুশিতে ডগমগ হয়ে পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে।

কোন দিকে খেয়াল নেই নওয়াজ খানের। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে তুষণাবাদের দিকে চলেছেন।

সারা দেহ বেয়ে দরদর করে ঘাম ছুটেছে। পা আর চলতে চায় না। হাঁটু দুটো ভেঙে আসছে। অসহ্য তৃষ্ণায় বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। চড়াই বেয়ে এগুতে এগুতে মনে হচ্ছে, কোমরটা বুঝি খসেই পড়বে।

কিন্তু নওয়াজ খানকে এগুতে হবেই।

কাল সন্ধ্যায় পোর্ট মোয়াট এসেছিলেন। রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকালে তুষণাবাদের দিকে রওনা হয়েছেন।

সূর্যটা মাথার উপর থাকতে থাকতেই তুষণাবাদের 'বীটে' পৌঁছে গেলেন নওয়াজ খান।

এই উপনিবেশের একটি মানুষকেও তিনি বাদ দেবেন না। কুঠিবাড়ি-ক্ষেতিবাড়ি-টাপু-বিজন-জঙ্গলের 'বীট'—সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে সব মানুষের কাছেই যাবেন নওয়াজ খান। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে তাঁর অনেক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের তাগিদেই ক'দিন ধরে আন্দামান তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন তিনি।

'বীটে' এখন খানাপিনার সময়।

'ফেলিং' এর কাজ আপাতত বন্ধ রেখে কুলী-জবাবদার-ফরেস্ট গার্ড—সবাই ঝুপড়িতে ফিরে এসেছে।

দু চারজন নতুন কয়েদী ছাড়া এই দ্বীপের প্রায় সকলের সঙ্গেই নওয়াজ খানের জান পয়চান।

এই 'বীটে'র যারা তাকে চেনে, হল্লা করতে করতে তারা ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'খান সাহেব এসেছে, খান সাহেব এসেছে—'

ঝুপড়িগুলোর সামনে খানিকটা সমতল ঘাসের জমি। পুলিসী জমাদার শিবরাম পাণ্ডে স্বয়ং সেখানে রশির খাটিয়া পাতল। নওয়াজ খানকে খাতির করে বসিয়ে বলল, 'বসুন, বসুন খান সাহেব। এ্যাদ্দিনে আমাদের কথা মনে পড়ল।'

জবাবে অল্প একটু হাসলেন নওয়াজ খান।

এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল লখাই। নওয়াজ খানকে সে চেনে না। তবুও সুর্মারঞ্জিত দুটি চোখ, পরনে জরিদার তাজ, কামদার শিলোয়ার, কলিদার কুর্তা, শুঁড়তোলা বাহারে নাগরা, ধবধবে ভ্রূ এবং চুলের এই দীর্ঘ পুরুষটিকে দেখে তার মনে সম্ভ্রম জেগেছে। নওয়াজ খান যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, পুলিসী জমাদার শিবরাম পাণ্ডের খাতিরের নমুনা দেখে এটা আন্দাজ করতে কোন কষ্টই হচ্ছে না লখাইর।

লখাইর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জগদীপ।

লখাই জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে?'

'এ তো নওয়াজ সাহেব। বড় খানদানী আদমী। আন্দামানের সবাই চেনে নওয়াজ সাহেবকে। কমিশনার সাহেব খুব খাতির করে।'

শিবরামের রশির খাটিয়াতে বসেই শুয়ে পড়েছিলেন নওয়াজ খান।

এখানে আসার সময় রোদে-উত্তেজনায় এবং চড়াই ভাঙার ধকলে প্রাণটা বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সত্তর আশী বছর বয়স হয়েছে। এমনিতেই শরীরটা খুব দুর্বল। তার উপর কয়েকটা দিন ধরে সমানে অনিয়ম এবং অত্যাচার চলছে।

খানিকটা জিরিয়ে সুস্থ হলেন নওয়াজ খান। তারপর কুলী-জবাবদারদের সঙ্গে রোটি-ভাজি-ডাল দিয়ে খানাপিনা সারলেন।

একটু পর কুলী-জবাবদারেরা আবার 'ফেলিং'এর কাজে চলে গেল।

এবার শিবরাম পাণ্ডে বলল, 'কি ব্যাপার খান সাহেব, এত তখলিফ করে এই জঙ্গলে এলেন—'

'একটু দরকার আছে।'

'কী দরকার খান সাহেব?'

নওয়াজ খান জবাব দিলেন না। এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফেলিং'এর কাজ কখন শেষ হবে?'

'বিকালে। আজকাল সন্ধ্যে হলেই জারোয়ারা ঝামেলা বাধাচ্ছে। এই জন্যে বিকালেই 'ফেলিং' বন্ধ করে দি।'

নওয়াজ খান আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে একটা বুশ পুলিসের ক্যাম্প আছে না?'

'জী খান সাহেব।'

'বিকালে কুলীরা ফিরলে একবার বুশ পুলিসদের ডেকে আনতে পারবে?'

বিকালের দিকে রোদে গলা সোনার রঙ ধরল।

জঙ্গলের মাথায় হীরামন পাখিগুলো এতক্ষণ পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছিল। এখন আর তাদের পাত্তা নেই। আন্দামানের আকাশে বাতাসের খামখেয়ালে কোথা থেকে যেন পেঁজা তুলোর মত সাদা সাদা অসংখ্য মেঘের টুকরা ভেসে এসেছে।

রোদের রঙ বদলালেও তেজটা এখনও পুরাপুরি বজায় আছে।

বেশ খানিকটা বেলা থাকতেই কুলী-জবাবদাররা ঝুপড়িতে ফিরে এল। শিবরাম পাণ্ডে নিজে গিয়ে বুশ পুলিসদের ডেকে আনল। সকলে ঝুপড়ির সামনের ঘাসের জমিটায় বসে পড়ল।

নওয়াজ খান বুঝে উঠতে পারছিলেন না, ঠিক কোন কথা দিয়ে শুরু করবেন।

শিবরাম পাণ্ডে বলল, 'সবাইকে তো জুটিয়ে দিলাম। আপনার কী মতলব খান সাহেব?'

'হাঁ, মতলবের কথাটাই বলব।'

কেশে গলাটা সাফ করে নিলেন নওয়াজ খান। তারপর শুরু করলেন, 'যে কথাটা তোমাদের বলতে এসেছি, সেটা বলার আগে আর একটা কথা বলছি।'

কুলী-জবাবদার-পুলিসরা চুপচাপ বসে রয়েছে। সকলের মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন নওয়াজ খান। তারপর গাঢ়, গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, 'ক'দিন ধরে আমি তামাম আন্দামান চুঁড়ে বেড়াচ্ছি। গারাচারামা, পাহাড়গাঁও, হার্ডু, চৌলদাই, বিগি লাইন, এবারডীন বস্তি—সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে যাকে পাচ্ছি, তাকেই কাথাটা বলছি।'

একটু চুপ করলেন নওয়াজ খান।

শিবরাম পাণ্ডে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'আসলী কথাটা বলুন খান সাহেব।'

'হাঁ হাঁ বলব। একটু সবুর।'

রশির খাটিয়াটার উপর বসে ছিলেন নওয়াজ খান। এবার কুলী-জবাবদার-দের মধ্যে নেমে এলেন। বললেন, 'তামাম মেনল্যাণ্ড জুড়ে ইংরাজদের সাথ লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।'

সামনের লোকগুলো চমকে উঠল।

শিবরাম পাণ্ডে আঁতকে উঠল, 'ইংরাজদের সাথ লড়াই! কাঁহে?'

'আজাদীর জন্যে।'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল শিবরাম পাণ্ডে।

কোন দিকে হুঁশ নেই নওয়াজ খানের। উত্তেজিত চড়া গলায় তিনি বলে যাচ্ছেন, 'মেনল্যাণ্ডের সব লোক ক্ষেপে উঠেছে। সবাই চায়, ইংরাজ আমাদের মুলুক ছেড়ে চলে যাক।'

চোখ জোড়া তাঁর জ্বলছে।

সামনের কুলী-জবাবদাররা শব্দ করছে না। আজাদী যে ঠিক কি বস্তু, সে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। আর ধারণা নেই বলেই নওয়াজ খানের কথাগুলো তাদের কাছে ধাঁধার মত ঠেকছে। অবাক হয়ে কথাগুলো তারা শুনছে কিন্তু বুঝছে না।

নওয়াজ খান বলতে লাগলেন, 'তোমরা সেলুলার জেল দেখেছ। ইংরাজ আন্দামানেই খালি সেলুলার জেল বানায় নি। তামাম মুলুক জুড়ে সেলুলার জেলের মত কয়েদখানা বানিয়েছে। ভারতের সব মানুষকে কয়েদী বানিয়ে রেখেছে।'

শিবরাম পাণ্ডে ফিস ফিস করে বলল, 'কি বলছেন খান সাহেব ?'

'বলছি, বার বার আমি এই দ্বীপের সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। লেকিন কেউ বোঝে নি আমার জ্বালাটা। খুদাতাল্লার নামে বলছি, দুনিয়ার সব কিছুর নামে বলছি, তোমরা আমাকে একটু বোঝ। আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

একটু থামলেন নওয়াজ খান। বুকটা তোলপাড় করে বড় বড় শ্বাস পড়ছে। এক হাতে বুকটা চেপে তিনি আবার শুরু করলেন, 'আমার অনেক বয়স হয়েছে। বেশি দিন আর বাঁচব না। মরার আগে ইংরাজদের সাথ শেষ বুঝাপড়াটা করে যাব। তোমরা খালি আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

শিবরাম পাণ্ডে অস্ফুট একটা শব্দ করল।

নওয়াজ খান বলতে লাগলেন, 'ভারতের সব জায়গায় সব মানুষ আজাদীর জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব ?'

কেউ জবাব দিল না। জবাবটা তাদের জানা নেই।

নওয়াজ খান থামলেন না, 'এক রোজ আজাদীর জন্যে লড়াই করে এই দ্বীপে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম সিপাহী লড়াইর যে আগুন—'

নওয়াজ খানের কথা শেষ হবার আগেই জঙ্গল ফুঁড়ে পোর্ট ব্লেয়ার থানার থানাদার (দারোগা) এবং জন চারেক পুলিস এসে পড়ল।

থানাদার বলল, 'এই যে খান সাহেব, আপনি এখানে ? আপনার খোঁজে তামাম আন্দামান ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি।'

'কেন ?'

'আপনাকে এ্যারেস্ট করার ওয়ারেণ্ট আছে। চলুন।'

একবার অসহায়, হতাশ চোখে সামনের মানুষগুলোর দিকে তাকালেন নওয়াজ খান। তারপর থানাদারের দিকে ঘুরে বললেন, 'চলুন।'

তুষণাবাদের এই 'বীটে' যে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, তা আর শেষ করতে পারলেন না নওয়াজ খান।

সবাই দেখল, নওয়াজ খান নামে দীর্ঘ পুরুষটি থানাদার আর পুলিসদের সঙ্গে সামনের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে আছে লখাইর।

নওয়াজ খানকে এর আগে দেখে নি লখাই। তার কথাগুলিও ঠিক বোঝে নি।

তবু নওয়াজ খান সম্বন্ধে অদ্ভুত এক সম্ভ্রম জেগেছে লখাইর মনে।

জঙ্গলের মাথায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

নওয়াজ খানের কথাগুলিই ভাববার চেষ্টা করছে লখাই। পুলিসী জমাদার শিবরাম পাশে এসে বসল।

লখাই আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা শিবরামজী, পুলিস খান সাহেবকে ধরল কেন?'

লখাইর পিঠে বিরাট এক থাপ্পড় কষিয়ে শিবরাম পাণ্ডে খেঁকিয়ে উঠল, 'মুরুখ কাঁহিকা, আরে উল্লু, খান সাহেব যে আজাদীর জন্যে ইংরাজদের সাথ লড়াই বাধাতে চায়। সেই জন্যেই তো পুলিস ধরল।'

বিড় বিড় করে লখাই বলল, 'আজাদী কী? আজাদী কী?'

খানিকটা বকর বকর করে শিবরাম পাণ্ডে চলে গেল।

লখাই ভাবতে লাগল। এতকাল তার ধারণা ছিল, খুন-খারাপি-রাহাজানি-চুরি-ছেনতাই করলে পুলিসে ধরে। কিন্তু আজ দেখল, আজাদীর জন্য ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করার কথা বললেও পুলিসে ধরে।

লখাইর হঠাৎই মনে হল, খুন-খারাপি-রাহাজানি-চুরি—এ সবের বাইরেও এমন অনেক কিছু আছে, যার জন্য পুলিসের হাতে যেতে হয়। কিন্তু সে জন্য বোধ হয়, এতটুকু অসম্মান কি অগৌরব নেই।

চুয়ান্ন

পেটি অফিসার নসিমুল গণি কেন যে তোষামোদ করে জঙ্গলে পাঠিয়েছিল, এবার একটু একটু টের পেতে লাগল লখাই।

সেই যে কানখাজুরায় কেটেছিল, তারপর থেকে লখাইর শরীরটা আর মজুত নেই।

এবার একটু একটু আমাশা আর পালাজ্বরে ধরল। রোজই বিকালের দিকে পালা করে জ্বরটা আসে, মাঝ রাত্রে ঘাম ছুটিয়ে ছেড়ে যায়।

আমাশা আর পালাজ্বরে দিন কয়েকের মধ্যে লখাই বড় কাবু হয়ে পড়ল। দিনকে দিন শরীরটা শুকিয়ে যেতে লাগল।

এতদিন গ্রাহ্য করে নি শিবরাম পাণ্ডে। কিন্তু যখন দেখল, শুধু লখাই-ই নয়, 'বীটে'র আরো জন দশেক কুলী পালাজ্বরে পড়েছে এবং 'ফেলিং এর কাজ একরকম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, তখন একটু যেন টনক নড়ল।

একদিন জন ছয়েক বুশ পুলিসের খবরদারিতে লখাই আর দশ জন কুলীকে সেলুলার জেলের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল শিবরাম।

সকাল হতে না হতে তুষণাবাদ থেকে রওনা হয়েছিল লখাইরা। সেলুলার জেলে পৌছতে পৌছতে বিকাল হয়ে গেল।

আজ ডাক্তারী পরীক্ষা হবে না।

কাল সকালে আবার জেল হাসপাতালে আসতে হবে।

যে বুশ পুলিসরা লখাইদের খবরদারি করে এখানে এনেছিল, জেল সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তারাই ব্যবস্থা করে ফেলল। আজকের রাতটার মত সকলে ফোনিক্স বে'র 'বিজনে' থাকবে। সকালে জেল হাসপাতালে ব্যারামী কুলীদের দেখিয়ে বিকালে তুষণাবাদে ফিরে যাবে।

ব্যবস্থা অনুযায়ী বুশ পুলিসরা লখাইদের সঙ্গে নিয়ে ফোনিক্স বে রওনা হল।

'বিজন' পর্যন্ত আর পৌছতে হল না। তার আগেই রোজ বিকালের দিকে নিয়ম করে যে পালা জ্বরটা আসে, সেটা এসে পড়ল। ধুঁকতে ধুঁকতে এগুতে লাগল লখাই।

ফেনিক্স বে'র 'বিজনে' এসে ভিখন আহীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

লখাইর চেহারা নমুনা দেখে ভিখন প্রায় আঁতকে উঠল, 'এ লখাই ভেইয়া, চেহারার এমন হাল করেছিস কেমন করে?'

যে লখাই খুনিয়ারা, দুর্দান্ত, সামান্য একটু সহানুভূতির কথায় সে কেঁদে ফেলল। বলল, 'আমাশা আর পালাজ্বরে আমাকে সাবড়ে দিচ্ছে রে ভিখন। বেশিদিন আর বাঁচব না। নিঘ্‌ঘাৎ মরে যাব।'

ভিখন সান্ত্বনা দেয়, 'মরার কথা বলছিস কেন? ঠিকমত দাওয়াই পড়লে রোগ সেরে যাবে।'

লখাইর চেহারা দেখে আর তার মরার কথাটা শুনে খুব দুঃখ করল ভিখন। সহানুভূতি জানাল। মানুষের সহানুভূতির স্বাদ যে কত মিঠা, জীবনে এই প্রথম বুঝল লখাই।

ভিখনের সঙ্গে অনেক কথা হল।

'আন্দামান রিলিজ' পেয়ে ভিখন ফেনিক্স বে'র এই 'বিজনে' এসে আছে। আজকাল হার্ডি'র ব্রিকফিল্ডে সে ইঁট পোড়ায়। অনেককাল লখাইকে ছেড়ে আছে, সে জন্য বড় কষ্ট হয় ভিখনের। লা ভিনের খানা থেকে রোজ রোজ ভাগ নিয়েছে, অথচ তার বদলে কিছুই দিতে পারে নি। এজন্য তার অনুতাপের শেষ নেই। এমনি অনেক কথা হল।

সন্ধ্যার দিকে পালাজ্বরের দাপট অনেকটা কমে এল।

ভিখন বলল, 'চল লখাই ভেইয়া, একটু ঘুরে আসি। তোর সাথ অনেক কথা আছে। সে সব কথা 'বিজনে' বসে হবে না।'

'বিজন'-এর জমাদারের হুকুম নিয়ে লখাইকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ভিখন।

লখাই বলল, 'কোথায় যাবি?'

'হাবরাডীন বাজারে রং তামাশার খেল আছে। খেমটা নাচ হবে। তাই দেখতে যাব।'

বাজার পিছনে ফেলে ভিখন যখন সিধা এবারডীন জেটির দিকে চলতে

লাগল, তখন লখাই বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে শালে? রং তামাশা, খেমটা নাচ কোথায়?'

'ও সব রাত্রে হবে। আগে জেটিতে চল, অনেক কথা আছে।'

পাথরের জেটিটা সোজা উপসাগরে ঢুকে গিয়েছে।

ভিখন আহীর আর লখাই জেটির উপর পাশাপাশি বসল।

জেটিটা অন্ধকার; আশে পাশে একটা মানুষও নেই। উন্মাদ উপসাগর পাথুরে দেওয়ালে অবিরাম মাথা কুটছে। দূরের উঁচু উঁচু টিলাগুলি নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ। নারকেলের পাতায় পাতায় সামুদ্রিক বাতাস সাঁই সাঁই করে বেজে যাচ্ছে।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়ল লখাইর। দেখল, সিসোস্ট্রেস উগসাগরের মাঝখানে বিরাট একটা জাহাজ নোঙর ফেলে আছে। একবার দেখেই লখাই চিনতে পারল, এই জাহাজেই তারা কালাপানির এই দ্বীপে এসেছিল। এটাই সেই এলফিনস্টোন জাহাজ।

আস্তে আস্তে লখাই বলল, 'কবে জাহাজ এসেছে রে ভিখন?'

'কাল।' একটু চুপ করে রইল ভিখন। তারপর ফিস ফিস করে বলতে লাগল, 'জানিস লখাই ভেইয়া, এই জাহাজে আজাদী লড়াইর কয়েদীরা এসেছে।'

'আজাদী লড়াই!'

লখাই চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি একটি দীর্ঘ পুরুষমূর্তির কথা মনে পড়ল তার। সে মূর্তি নওয়াজ খানের। বিড় বিড় করে লখাই বলল, 'আজাদীর লড়াই হয়ে গিয়েছে?'

লখাইর কথাগুলো ভিখনের কানে গিয়েছিল। সে বলল, 'হাঁ, বাঙলা মুলুকে আজাদীর লড়াই হয়ে গিয়েছে।'

'সত্যি।'

'হাঁ সচ্। রামজী কসম।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ লখাই বলল, 'নওয়াজ খান সাহেবকে চিনিস ভিখন?

'হাঁ হাঁ জরুর। আন্দামানবালা কে না চেনে নওয়াজ খানকে?'

গলার স্বরটাকে খাদে ঢুকিয়ে ফেলল ভিখন, 'নওয়াজ খানের মাফিক বড়া মরদ আন্দামানে আর কয়েদ খাটতে আসে নি। আজাদীর জন্যে এংরাজ-

বালাদের সাথ লড়াই করে এখানে এসেছিল খান সাহেব। এখানে এসে বার বার এংরাজবালাদের সাথ লড়াই বাধাতে চেয়েছে। লেকিন কয়েদী কুত্তাগুলো তার সাথ হাত মেলায় নি। এই তো এবারও লড়াইর ইন্তেজাম করেছিল খান সাহেব। বহুত খারাপ নসীব, খান সাহেবকে কমিশনার সাব ঘরে আটক করেছে। মুন্সীজী সেদিন বলছিল, এংরাজবালা খান সাহেবকে নাকি এই দ্বীপে থাকতে দেবে না। মেনল্যাণ্ডে (ভারতবর্ষে) ফেরত পাঠিয়ে দেবে।'

নওয়াজ খানের কথা ভাবতে চেষ্টা করল লখাই।

এক একটা মানুষ আছে, যারা জীবনে একবার মাত্র দেখা দিয়েই মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায়। নওয়াজ খানের সঙ্গে পরিচয় হয় নি লখাইর। কিন্তু একবার মাত্র দেখে কয়েকটা মাত্র কথা শুনে তাঁকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে।

এখন ঘাম ছুটিয়ে জ্বর ছাড়তে শুরু করেছে। জ্বর ছাড়ার সময়টায় মাথাটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। শরীরটা ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল শরীরে, ফাঁকা, শূন্য মাথায় এখন নওরাজ খানের কথা ঠিকমত ভাবতে পারছে না লখাই। তবু কেন জানি তার মনে হল, ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করে কাল যারা এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছে, তাদের সঙ্গে নওয়াজ খানের কোথায় যেন একটা যোগ আছে।

সামুদ্রিক বাতাসে শীত ধরে গিয়েছে।

একটু পর লখাইকে নিয়ে উঠে পড়ল ভিখন। এখন বেশ খানিকটা রাত্রি হয়েছে। এবারডীন বাজারের দিকে চলতে চলতে সে একেবারে ভিন্ন কথা পাড়ল, 'এ লখাই দাদা, একটা বড় খারাপ খবর আছে।'

লখাই বলল, 'আঁই হারামী, কী খবর ?'

'শুনলে তুই গুস্সা (গোসা) হবি।'

'খবরটা বল না শালে !'

'তোকে এক রোজ চান্নু সিংএর কথা বলেছিলাম না !'

'চান্নু কুত্তাটা আবার কে ?'

'পুরানা এক কয়েদী। ইয়াদ করে ছাখ লখাই দাদা, এক রোজ তোকে চান্নু সিংএর কথা বলেছিলাম। সেই যে শালে সোনিয়াকে শাদি করতে চায় ! মনে করতে পারছিস না !'

এবার লখাইর মনে পড়ল। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সেলুলার জেলে আসার কয়েকদিন পরই ভিখন কোথা থেকে যেন খবরটা জুটিয়ে এনেছিল। চান্নু সিং নামে এক পুরানো পাঞ্জাবী কয়েদী নাকি সোনিয়াকে শাদি করতে চায়। শুনে ক্ষেপে উঠেছিল লখাই।

প্রায় দু মাসের মত তুষণাবাদের 'বীটে' কাটিয়ে এসেছে লখাই। এই দু মাসে উজাগর সিং, মিমি খিন, ফরেস্ট গার্ড আবর খান, জগদীপ, মঙ ফা, জারোয়া—বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্রতর ঘটনার মধ্যে ডুবে ছিল সে। আন্দামানের অরণ্য বাকী পৃথিবী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।

তুষণাবাদে থাকার সময় মাঝে মাঝে সোনিয়ার কথা ভাবতে চেষ্টা করেছে লখাই। কিন্তু ভাবনাটা তেমন জমে নি। সোনিয়ার কথা ভেবে মনটা তেমন অস্থির হয়ে ওঠে নি লখাইর।

লখাইর মনে হয়, আন্দামানের জঙ্গল বড় সাঙ্ঘাতিক। সেখানে যে ঢোকে, তাকেই সে গ্রাস করে ফেলে। শুধু গ্রাসই করে না, তার মন থেকে বাইরের সমস্ত স্মৃতিই মুছে ফেলে। শুধু সাঙ্ঘাতিকই নয়, এই অরণ্য নিদারুণ স্বার্থপর। একবার সেখানে যে যায়, নিজের ভাবনা ছাড়া অরণ্য তাকে অন্য কিছুই ভাবতে দেয় না।

লখাইর মুখের দিকে একবার তাকাল ভিখন। তারপর বলতে শুরু করল, 'একেবারে পাক্কা খবর পেয়েছি লখাই দাদা।'

'কী খবর?'

'তিন রোজের মাথায় চান্নু শালের সাথ সোনিয়ার শাদি হয়ে যাবে।'

অনেক, অনেকদিন পর সোনিয়ার খবর পেল লখাই। খবরটা আদৌ সুখবর নয়।

লখাই হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, যখন যেটাকে হাতের সামনে পায়, তাকে নিয়েই মেতে ওঠে। তখন দুনিয়ার বাকী সব কিছু ভুলে যায় সে।

এই মুহূর্তে পালাজ্বর, আমাশা, এবারডীন বাজারে যাওয়ার এই সড়ক, এই অন্ধকার রাত্রি—পৃথিবীর সব কিছু ভুলে ক্ষেপে উঠল লখাই, 'সোনিয়াকে শাদি করবে চান্নু! কক্ষনো না। শালেকে খুন করব।'

ভয়-ভয় গলায় ভিখন বলল, 'লেকিন লখাই ভেইয়া, ডিপটি কমিশনার সাহেব শাদির ব্যবস্থা যে একদম পাক্কা করে দিয়েছে।'

'কে বলল?'

'রোজ রোজ 'রেগুিবারিক' কয়েদখানায় তাঁত বোনা শেখাতে যায় যে পিয়ারীলাল, সে বলেছে।'

পোড়া, বীভৎস মুখটা কাঁচুমাচু করে ভিখন বলল, 'খবরটা একেবারে সাচ্চা।'

আক্রোশে চোখ জোড়া জলছে লখাইর। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্রায় দুটো মাস আন্দামানের জঙ্গল তাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই দুটো মাস সোনিয়ার কথা তেমন করে ভাবে নি লখাই। সোনিয়াকে একরকম বুঝি ভুলতেই বসেছিল। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে অদ্ভুত এক উত্তেজনা আর আক্রোশের মধ্যে লখাই বুঝতে পারল, দরিয়ার সেই সঙ্গিনীকে আজও সে ভুলতে পারে নি।

হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত তারা এবারডীন বাজারে এসে পড়ল।

চীনা রেড্ডির সরাইখানার সামনে রংতামাশার খেল চলছে।

চট বিছিয়ে খেমটা নাচের আসর বসানো হয়েছে। চারপাশে গুটিকতক গ্যাসের বাতি জলছে।

ফোনিক্স বে, ডিলানিপুর, হাডো, চৌলদাই—পোর্ট ব্লেয়ারের সব 'বিজন' আর 'টাপু' থেকে কয়েদীরা রং তামাশার খেলের আসরে এসে জমায়ত হয়েছে। পাহাড়গাঁও, গারাচারামা, ডাণ্ডাস পয়েণ্ট—পেনাল কলোনির নানা বস্তি থেকে অনেক মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে।

এখন পুরাদমে খেমটা নাচ চলছে।

এক মরদানা কয়েদী দাড়ি গোঁফ চেঁছে, মাথায় পরচুলা লাগিয়ে, চোখে মোটা রেখায় সুর্মার টান মেরে, টকটকে একটা লাল ঘাঘরা পরে তামাশাবালী খেমটাওয়ালী সেজেছে। একটা দোপাট্টাও জুটিয়েছে। ঘোমটার আকারে সেটা মাথায় তুলে কোমরে লচক খেলাবার চেষ্টা করছে। কোমরটা কিন্তু নাচছে না। থলথলে মাংসল ভুঁড়িটাই দোল খাচ্ছে।

তামাশাবালী নানা ভঙ্গি করছে। কোমর দুলাচ্ছে, চোখের চাকু মারছে। আর কর্কশ, বাজখাই স্বরটাকে যতটা সম্ভব মুলাইম করে গাইছে—

'আ ভো সৈঁয়া কা করি হাঁয় আঁইয়ে
চৈতো বীতর যাইছে।

পতোয়া লিখা লিখা ভেজ বিদেশোয়া
সৈঁয়া ছোড় দে নোকরিয়া—
ছোড় দে নোকরিয়া—'

তালের মাথায় তামাশাবালী একই সঙ্গে কোমর আর মাথা দোলাচ্ছে।

শুধু কি তামাশাবালীর কোমর আর মাথাই দুলছে, চারপাশের মানুষগুলো সমানে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। থেকে থেকে হল্লা করে উঠছে, 'সাবাস দিলজ্বালানেবালী—'

'সাবাস নাচনেবালী, দিল খুশ করনেবালী—'

'সাবাস খেমটাওয়ালী, জানতুড়নেবালী—'

এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে লখাই। অন্য সময় হলে এই খেমটা নাচ থেকে, এই রংতামাশার খেল থেকে আর সকলের মত সেও মজা লুটত। কিন্তু সোনিয়ার জন্য উত্তেজনা, আক্রোশ এবং হতাশা মেশা বিচিত্র এক মনোভাব তাকে অস্থির করে রেখেছে। কোন ব্যাপারেই এখন তার হুঁশ নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই।

হঠাৎ পাশ থেকে ফিস ফিস করে ভিখন ডাকল, 'লখাই দাদা—'

'আঁই কুত্তা, ডাকছিস কেন?'

'আমার কাছে আয়।'

ভিখনের পাশে ঘন হয়ে এল লখাই। বলল, 'কি কইচিস?'

মুখটা লখাইর কানে গুঁজে দিল ভিখন। ফিস ফিস করে বলল, 'ঐ আখ, ঐ যে চান্নু শালে বসে রয়েছে—'

'কোথায়?' লখাই চমকে উঠল।

হাত বাড়িয়ে ভিখন দেখাল। রংতামাশার খেলের আসরে এক কোণায় বিকট চেহারার চান্নু সিং বসে রয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে খেমটা নাচ আর গানের খুব তারিফ করছে। উৎসাহে মাঝে মাঝে তামাশাবালীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'ছোড় দে নোকরিয়া—'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চান্নু সিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল লখাই। চোখদুটো তার ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। একবার তার মনে হল, লাফ মেরে চান্নুর ঘাড়ে পড়ে টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলে। আক্রোশ, উত্তেজনা এবং অসহ্য হতাশা মেশা আগের সেই মনোভাবটা তাকে অস্থির করে তুলল।

লখাই হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, বিচার-বিবেচনা-চিন্তা—কোন কিছুর ধার

সে ধারে না। উত্তেজনা এবং হঠকারিতার বশে যা তার প্রাণ চায়, তাই করে বসে।

আশ্চর্য! লখাই শুধু ভাবলই, কিন্তু চান্নু সিংয়ের টুঁটিটা ছিঁড়ে আর ফেলতে পারল না। এমন কি লাফ মেরেও তার ঘাড়ে পড়তে পারল না।

লখাই জানে না, অজান্তে, অলক্ষ্যে তার নিজের স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন পরিবর্তন শুরু হয়েছে। পালাজ্বর, আমাশা, কানখাজুরার বিষ, আন্দামানের অরণ্য, আবর খান এবং বিন্দির কান্না একটু একটু করে তাকে জুড়িয়ে ফেলেছে।

আজকাল রাগ হয়ত হয়, উত্তেজনা হয়, কিন্তু ঝোঁকের মুখে হঠাৎ কিছু সে করে ফেলতে পারে না।

চান্নু সিং আর সোনিয়ার শাদির কথা শোনার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। চান্নু সিংকে দেখার পর মেজাজটা ভয়ানক খিঁচড়ে গিয়েছে। এই রংতামাশার খেল, কোমর ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে খেমটা নাচ, চড়া তালের গান—কিছুই ভাল লাগছে না লখাইর।

কনুই দিয়ে ভিখনের পাঁজরে আস্তে একটা গুঁতো মারল লখাই। 'আঁই কুত্তা—'

'কি বলছিস লখাই দাদা?'

'বিজনে' চল।'

'একটু সবুর লখাই ভেইয়া; আগে রংতামাশার খেলটা খতম হতে দে।'

'চল শালে, হাঁকবো এ্যায়সা কোতকা!'

একসময় এবারডীন বাজার পিছনে রেখে ফোনিক্স বে'র দিকে হাঁটতে শুরু করল লখাই। বেজার মুখে ভিখন আহীরও সঙ্গ ধরল।

ফোনিক্স বে'র 'বিজনে' অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতে পারল না লখাই।

ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা জুড়িয়ে এসেছে।

রাগ, উত্তেজনা, আক্রোশ—এখন সব শান্ত হয়ে গিয়েছে।

চোখ বুঁজে সোনিয়ার কথা ভাবছে লখাই। দরিয়ার সেই সঙ্গিনীর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে।

চান্নু সিংয়ের সঙ্গে শাদি হবে সোনিয়ার। ডেপুটি কমিশনারের অফিসে

শাদির পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। ভিখন যে খবর এনেছে, তাতে মনে হয়, এ শাদি কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

সোনিয়ার সঙ্গে চান্নুর শাদির কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। আক্রোশে রাগে শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটছিল।

উত্তেজনাটা আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসছে।

নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল লখাই।

অনেক মেয়েমানুষ এসেছে তার জীবনে। ভোগ করার পরই তাদের সম্বন্ধে আর কোন উৎসাহই থাকে নি লখাইর। ছেঁড়া কানির মত তাদের ছুঁড়ে ফেলে অন্য মেয়েমানুষের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে সে। তার কাছে নারী নেহাতই ভোগের বস্তু। ভোগের বাইরে নারীর অন্য কোন প্রয়োজন কি মহিমা সে বোঝে না, স্বীকারও করে না।

কিন্তু সোনিয়ার কথা একেবারেই ভিন্ন।

এই মুহূর্তে সোনিয়ার কথাই ভাবছে লখাই। পরস্পর সঙ্গতি বজায় রেখে সে ভাবতে শেখে নি। এলেমেলো, ছন্নছাড়া, টুকরা টুকরা কতকগুলো ভাবনা তার মনে জটলা করছে।

দু বার মাত্র সোনিয়াকে দেখেছে লখাই। প্রথম বার এলফিনস্টোন জাহাজে, পরের বার রস দ্বীপে। প্রথম বার পুরা একটা রাত তার সঙ্গে কাটিয়েছে লখাই। তার জান-জমানার কথা কিছু কিছু শুনেছে। কিন্তু পরের বার একটা কথাও হয় নি।

সোনিয়ার মুখেই লখাই শুনেছে, কোতল করে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছে সে।

ঝড়ের দরিয়ায় জাহাজের হোলে প্রথম দেখা হয়েছিল। তখন অসহ্য যন্ত্রণায় বুকটা ছিঁড়ে পড়ছিল লখাইর। আস্তে আস্তে নরম হাতে বুকটা ডলে দিয়েছিল সোনিয়া। যন্ত্রণাটা জুড়িয়ে গিয়েছিল।

লখাই ভাবতে চেষ্টা করল, হাতটা যার এত নরম, দিলটা তার এত কঠিন কেন? কঠিন, কঠিনই তো! কঠিন না হলে সোনিয়া কোতল করে কেমন করে? কোতলই যদি করে এল, তবে দু বছর পর কালা পানির জাহাজে সে কাঁদল কেন?

মানুষ মনের দরদেই তো কাঁদে। যার মনে এত দরদ, সে কোতল করে কেন?

নাঃ, সোনিয়ার মন বড় দুর্জ্ঞেয় বস্তু। সে মনের নাগাল পাওয়া লখাইর সাধ্য নয়।

সোনিয়ার দেহ কোনদিন দখল করতে পারে নি লখাই। তার দিলেরও হদিস পায় নি। দেহ কি মন—কোনটাই দখল করতে পারে নি বলেই সোনিয়ার জন্য দুর্বোধ্য এক আকর্ষণ বোধ করে সে।

কিন্তু না, সোনিয়াকে আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। চান্নুর সঙ্গে তার শাদি হয়ে যাবে।

রাগ না, উত্তেজনা না, আক্রোশ না, এখন বড় কষ্ট হচ্ছে লখাইর। অদ্ভুত এক ব্যথা বুকের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

এই ব্যথার মধ্য দিয়েই জীবনে এই প্রথম একটা বিচিত্র সত্যের চেহারা দেখতে পেল লখাই।

ইচ্ছা-সাধ-লালসা থাকলেও সব সময় সব নারীকে দখল করা যায় না। দুনিয়ার সব কিছু পাওয়া যায় না। এই না পাওয়ার অবুঝ, আকণ্ঠ, অসহ্য ব্যথা নিয়েই বুঝি সারাটা জীবন কাটাতে হয়। এই সোজা, সহজ সত্যটা বুঝতে বড় কষ্ট হচ্ছে লখাইর।

এতকাল যে মেয়েমানুষ চোখে লাগত তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে ভয়ানক রাগ হত লখাইর, আক্রোশ হত, উত্তেজনা হত। কিন্তু জীবনে মেয়েমানুষকে না পাওয়ার জন্য এই প্রথম তার কষ্ট হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে।

এই ধরনের ব্যথার বোধ জীবনে এই তার প্রথম।

পঞ্চান্ন

ভিলানিপুরের কুঠিতে বন্দী নওয়াজ খান অন্তরীণ হয়ে আছেন।

চিফ কমিশনারের নির্দেশে দশজন পুলিস কুঠিটার চারপাশে পাহারা দিচ্ছে। এই কুঠি ছেড়ে যাতে নওয়াজ খান বেরিয়ে পড়তে না পারেন, তার পাকা বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

বাইরে থেকে পুলিসগুলো নওয়াজ খানের উপর লক্ষ্য রাখছে।

এই কুঠিবাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার আর উপায় নেই।

ভিলানিপুরের এই কুঠি থেকে ফোনিক্স উপসাগরটাকে দেখা যায়।

এখন দুপুর।

উপসাগরটা জ্বলছে। ওপারে হ্যারিয়েট পাহাড়ের চূড়াটা জ্বলছে। আকাশে পাটল রঙের খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি জ্বলছে।

উপসাগর, মেঘ কি হ্যারিয়েট পাহাড় দেখছিলেন না নওয়াজ খান। কুর্সির বাজুর উপর মাথাটা রেখে ভাবছিলেন।

আবারও তিনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন। থিবোর যুদ্ধের পর যে আগুন তিনি জ্বালাতে পারেন নি, এবারও তা জ্বলল না। এতকাল তাঁর মনে হত, আন্দামান দ্বীপের এই কুৎসিত, জঘন্য মানুষগুলোকে কোনদিনই দেশ-কাল সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যাবে না। এই বিচিত্র জীবগুলো নারী আর নেশার বাইরে কিছুই বোঝে না। দেশের মাহাত্ম্য, আজাদীর মহিমা—এগুলি এদের কাছে দুর্বোধ্য ধাঁধার মত।

এই দ্বীপের অপদার্থ, হীন মানুষগুলোকে প্রথম প্রথম ঘৃণা করতেন নওয়াজ খান। যখন বুঝলেন ঘৃণা দিয়ে এদের শুধু দূরেই সরিয়ে রাখা হবে, তখন প্রাণ ভরে মিশতে শুরু করলেন। আন্দামান উপনিবেশের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত প্রতিটি গাঁও-এ, প্রতিটি 'বিজন' আর 'টাপুতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন।

এতকাল মনে মনে তাঁর অভিযোগ ছিল, এই উপনিবেশের মানুষগুলো তাঁকে বুঝতে চায় না। কিন্তু আজ একেবারেই ভিন্ন কথা মনে হচ্ছে। এদের

সঙ্গে মিশেছেন, এটা খুবই সত্য। কিন্তু তাঁর আর এই মানুষগুলোর মধ্যে কোথায় যেন বিরাট একটা ফারাক ছিল।

আজ নওয়াজ খানের মনে হচ্ছে, এতকাল এই দ্বীপে কাটিয়েও এই মানুষ গুলোকে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন নি। যে ভাষা এরা বোঝে, সেই ভাষাটা শিখে নিতে পারেন নি।

নিজের ভাষায় নিজের নিয়মে তিনি এই মানুষগুলিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষা তাঁর বক্তব্য এরা বুঝতে চায় নি। সে সব বোঝার মত মনই নয় এদের।

যে মন আদৌ তৈরী নয়, সে মনের উপর আজাদী, ইংরাজের জুলুম এবং দেশকাল সম্বন্ধে বিরাট বিরাট তত্ত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন নওয়াজ খান। মানুষগুলো তো এসব বোঝেই নি, উপরন্তু ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করার কথা শুনেই ভয় পেয়েছে।

বড় দুঃখ হচ্ছে নওয়াজ খানের, ভয়ানক আপসোস হচ্ছে।

এতকাল একসঙ্গে কাটিয়েও এই মানুষগুলোর মন তিনি তৈরী করে দিতে পারলেন না। এদের অজ্ঞতা এবং সংস্কার ঘোচাতে পারলেন না। এ জন্য তিনি বার বার ব্যর্থ হয়ে গেলেন। সিপাহী বিদ্রোহের যে আগুন নিয়ে তিনি আন্দামান এসেছিলেন, বার বার চেষ্টা করেও তিনি এদের মধ্যে তা জ্বালিয়ে তুলতে পারলেন না।

ডিলানিপুরের এই কুঠিতে অন্তরীণ থেকেও নওয়াজ খান খবর পেয়েছেন। পরশু দিন এখানে জাহাজ এসে ভিড়েছে। বাঙলা দেশ থেকে এবার আজাদী লড়াইর বন্দীরা এসেছে। নওয়াজ খানের ইচ্ছা ছিল, এরা এসে পড়ার আগেই তিনি ভূমিকা তৈরী করে রাখবেন, যার উপর দাঁড়িয়ে নতুন কালের আজাদীর সৈনিকরা এই দ্বীপে কাজ করতে পারে।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে তাঁর অনেক দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন করতে পারলেন না নওয়াজ খান।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটাকে বড় ভালবেসে ফেলেছেন নওয়াজ খান। খুনী ঠগ-জালিয়াতের এই ঘৃণিত, ধিক্কৃত আন্দামানকে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটা গৌরবময় অধ্যায় যোগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন।

নিজের ব্যর্থতার কথাটাই ভাবছিলেন নওয়াজ খান।

ব্যর্থতার কারণটা যতই খতিয়ে যাচিয়ে দেখছিলেন, ততই দুঃখ হচ্ছিল তাঁর। এতকাল এই দ্বীপে থেকেও এখানকার মানুষগুলোর মন তিনি তৈরী করে দিতে পারলেন না। এই কথাটা বুঝতে বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে এই মানুষগুলোর মধ্যে গিয়ে যে দাঁড়াবেন, তার আর উপায় নেই। তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। শুধু অন্তরীণই নয়, আজ সকালেই নওয়াজ খান খবর পেয়েছেন, এই দ্বীপ থেকে তাঁকে চলে যেতে হবে।

দিন পাঁচেকের মধ্যেই এখান থেকে জাহাজ ছাড়বে। সেই জাহাজেই নওয়াজ খানকে মেনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কুর্সির বাজুর উপর মাথাটা রেখে নওয়াজ খান ভাবছিলেন। নানা ভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

'আব্বাজান—'

খুব নরম গলায় কে যেন ডাকল।

কুর্সির বাজু থেকে আস্তে আস্তে মাথাটা তুললেন নওয়াজ খান। দেখলেন, দরজার কাছে রোশন দাঁড়িয়ে আছে।

রোশনকে দেখলেই নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় নওয়াজ খানের। তখন অন্য কিছু আর ভাবতে পারেন না তিনি। ভাববার শক্তিটাই কেমন যেন বিকল হয়ে যায়।

নওয়াজ খান ডাকলেন, 'আয় রোশন, কাছে আয়।'

কুর্সির পাশে এসে দাঁড়াল রোশন।

রোশনের মুখটা দেখেই চমকে উঠলেন নওয়াজ খান। চোখ দুটো লাল লাল, গালের উপর চোখের জল শুকিয়ে দাগ পড়েছে। মনে হল, এই ঘরে আসার আগে রোশন কাঁদছিল।

রোশনের একটা হাত ধরে আরো একটু কাছে টানলেন নওয়াজ খান। বললেন, 'কাঁদছিলি রোশন?'

রোশন জবাব দিল না। জানালার ফাঁক দিয়ে দূরের উপসাগরটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল।

বুকটা তোলপাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়লেন নওয়াজ খান। বললেন, 'তোর জীবনটা আমিই বরবাদ করে দিলাম রোশন! সব কসুর আমার।'

এবারও কোন কথা বলল না রোশন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

রোশনকে দেখলেই সব কিছু ভুলে যান নওয়াজ খান। অস্থির হয়ে ওঠেন। রোশনের বিষণ্ণ, করুণ মুখটার কাছে আজাদীর চিন্তা, দেশকাল সম্বন্ধে বিরাট বিরাট ভাবনাগুলি নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়।

রোশনের বিষণ্ণ, করুণ মুখটার জন্য নওয়াজ খানই দায়ী। তিনিই তো অনেক আশা নিয়ে সুন্দর খানের সঙ্গে রোশনের শাদি দিয়েছিলেন। কিন্তু আশাটা মিটল কই ?

সিপাহী বিদ্রোহের যে আগুন বুকের মধ্যে নিয়ে এই দ্বীপে এসেছিলেন নওয়াজ খান, তারই একটা ঝলস সুন্দর খানের মধ্যে দেখেছিলেন তিনি। সুন্দরের সাজার মেয়াদ ফুরাবার পর রোশনের সঙ্গে শাদি দিয়ে তাকে এই দ্বীপে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এই সুন্দর খানকে নিয়ে এই দ্বীপের বাসিন্দাদের মনে সিপাহী বিদ্রোহের সেই আগুনটা জ্বালিয়ে তুলবেন।

রোশনের সঙ্গে সুন্দরের শাদি হয়ে গেল।

শাদির কিছুদিন পর একবার মেনল্যাণ্ডে গেল সুন্দর খান। যাবার আগে বলল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে আসবে। কিন্তু আর ফিরল না।

তারপর কয়েকটা বছরই তো কেটে গেল। এই দ্বীপে যতবার জাহাজ এসেছে, আশায় আশায় ততবারই জাহাজ ঘাটায় গিয়েছেন নওয়াজ খান। কত মানুষই না এসেছে কিন্তু সুন্দর খান আর আসে নি। বেদরদী, বেইমান।

বার বার রোশনকে স্তোক দিয়েছেন, এই জাহাজেই সুন্দর আসবে। কিন্তু বার বার তিনি নিরাশ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সাহস করে রোশনের মুখের দিকে তাকাতে পারেন নি নওয়াজ খান। এই শান্ত, বিষণ্ণ মেয়েটির মুখে কোথায় যেন ক্ষমাহীন অভিযোগ আঁকা রয়েছে।

হঠাৎ রোশন বলল, 'আব্বাজান, চিফ কমিশনার তো আপনাকে মেনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবে ?'

'হাঁ, তাই তো শুনছি।'

'আব্বাজান, আমিও আপনার সাথ যাব।'

রোশনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন নওয়াজ খান। মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললেন, 'হাঁ রোশন, তুইও যাবি। মেনল্যাণ্ডে গিয়ে বেদরদী বেইমানটাকে খুঁজে বার করতে হবে। করতেই হবে।'

লখাইরা যেদিন পোর্ট ব্লেয়ার এসেছিল, তার পর দিনই তাদের তুষণাবাদ ফিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু রোগ পরীক্ষা করে ডাক্তার সাহেব লখাই আর দু জন কুলীকে তুষণাবাদ যেতে দিল না। পোর্ট ব্লেয়ারে পুরা দুটো দিন আটক থেকে ইঞ্জেকসন নিতে হল লখাইদের।

অন্য কুলীদের নিয়ে চারজন বুশ পুলিস আগেই তুষণাবাদ চলে গিয়েছে। আজ সকালে লখাই আর দুটো কুলীকে নিয়ে বাকী পুলিস দু জন রওনা হল।

এখন বিকাল।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা সড়ক যেখানে দুভাগে ভাগ হয়ে বাঁয়ে পোর্ট মোয়াট এবং ডাইনে তুষণাবাদের দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে এসে পড়েছে লখাইরা।

দু দিন ইঞ্জেকসন নিয়েও সুরাহা হল না। অন্য অন্য দিনের মত যথারীতি পালাজ্বরটা এসে পড়ল।

ভোরবেলায় লঙ ফেরিতে ডাণ্ডাস পয়েণ্টে এসে হাঁটতে শুরু করেছে। এখন বিকাল। জ্বরের দাপটে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে লখাই। পা আর চলতে চায় না। গাঁটে গাঁটে খিঁচ ধরে গিয়েছে। সড়কটা যেখানে দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, সেখানে এসে বসে পড়ল লখাই।

বুশ পুলিস দুটো খেঁকিয়ে উঠল, 'কি রে কুত্তা, বসে পড়লি যে?'

কাঁপা কাঁপা দুর্বল গলায় কোনক্রমে লখাই বলতে পারল, 'আর হাঁটতে পারছি না সিপাইজী। জ্বরটা বড্ড কায়দা করে ফেলেছে।'

'শালে হারামীর বাচ্চা, তোর জন্যে আমরা বসে থাকব নাকি?'

জবাব দেবার শক্তিটুকু পর্যন্ত লখাই হারিয়ে ফেলেছে। জ্বরের ঘোরে আগেই বসে পড়েছিল। এবার শুয়ে পড়ল।

বুশ পুলিস দুটো কি যেন একটু ভেবে নিল। তারপর বলল, 'আমরা এগুচ্ছি। একটু জিরিয়ে চলে আসবি। বদ মতলব নেই তো রে কুত্তা?'

এবারও জবাব দিল না লখাই। চুপচাপ পড়ে রইল।

কুলী দুটোকে নিয়ে বুশ পুলিসরা তুষণাবাদ চলে গেল।

অনেকক্ষণ বেহুঁশ, আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল লখাই। জ্বরের প্রথম দাপটটা সামলে যখন সে উঠে বসল, তখন বিকালের রোদের তেজ মরে গিয়েছে। জঙ্গলের মাথায় বিষণ্ণ একটু আলো আটকে রয়েছে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল লখাই। এখনও জ্বরটা একেবারে ছেড়ে যায় নি। মাথাটা টলছে। চোখদুটো জ্বালা জ্বালা করছে।

একবার তুষণাবাদের পথটার দিকে তাকাল লখাই। আর একবার ঘুরে বাঁ দিকে যে সড়কটা পোর্ট মোয়াটের দিকে চলে গিয়েছে, দৃষ্টিটাকে সেখানে এনে ফেলল।

হঠাৎই বিন্দির কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠল লখাই।

আশ্চর্য! দুটো দিন পোর্ট ব্লেয়ার গিয়ে সোনিয়া ছাড়া দুনিয়ার আর কারো কথা ভাবে নি লখাই। বিন্দিকে একরকম ভুলেই ছিল সে।

লখাই হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, হাতের সামনে যখনই যাকে সে পায়, তাকে নিয়েই মেতে ওঠে।

বিন্দির কথা ভাবতে ভাবতে পোর্ট মোয়াটের পথটা ধরে এগিয়ে চলল লখাই।

কখন যে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে, আর কখন যে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে মঙ ফা'র ঝুপড়ির সামনে এসে পড়েছে, লখাইয়ের খেয়াল ছিল না।

মঙ ফা'র ঝুপড়ির সামনে সেই গোলমোহর গাছদুটোর পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল লখাই। মঙ ফা তাকে এখানে আসতে বারণ করে দিয়েছিল। সেই কথাটা একবার ভাবল। একটু ইতস্ততঃ করল। কি করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল লখাই। তার পরই মরিয়া হয়ে ডাকল, 'মঙ ফা, মঙ ফা রে—'

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল।

চমকে সামনের দিকে তাকাল লখাই।

ঝাঁপটা খুলে লণ্ঠন হাতে যে বেরিয়ে এসেছে, সে মঙ ফা নয়, বিন্দি।

এক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বিন্দি। তারপর বলল, 'তুমি এসেছ?'

'হাঁ।'

'আমাকে বাঁচাবার উপায়টা খুঁজে পেয়েছ?'

ফস করে নিজের অজান্তেই লখাইয়ের মুখ থেকে কথাটা ছুটে গেল, 'হাঁ।'

'ভেতরে এস।'

বিন্দি যেন জাদু করেছে। আচ্ছন্নের মত তার পিছন পিছন ঝুপড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল লখাই।

বিন্দি বলতে লাগল, 'ভালই হয়েছে। মগু ফা শয়তান মাইনে আনতে ডাণ্ডাস পয়েণ্ট গিয়েছে। ফিরতে অনেক রাত হবে।'

লখাই জবাব দিল না। জ্বরের প্রথম দাপটটা সামলে এতটা পথ হেঁটে এসেছে সে। এখন মনে হচ্ছে, জ্বরের উপর আবার জ্বর আসছে।

মাথাটা আর খাড়া রাখতে পারছে না লখাই। সামনের একটা মাচানের উপর শুয়ে পড়ল সে।

লণ্ঠনটা মুখের কাছে এনে আঁতকে উঠল বিন্দি। লখাইর মুখটা টস টস করছে, চোখদুটো টকটকে লাল। কেমন যেন ঘোর ঘোর দৃষ্টি ফুটে রয়েছে সে চোখে।

লখাইর কপালে একটা হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠল বিন্দি, 'ইস, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। ওঠ ওঠ, ভাল করে শোও।'

মাচানের উপর লখাইকে শুইয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল বিন্দি। তারপর কপালে জলপটি দিতে বসল।

ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও বিন্দির নতুন একটা স্বরূপ দেখতে পেল লখাই।

শিয়রের পাশে বসে জলপটি দিচ্ছে বিন্দি। জ্বরের তাপ পটির জলটুকু মুহূর্তে শুষে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পটিটা ভিজিয়ে দিচ্ছে বিন্দি।

একবার জলপটি দিচ্ছে। একবার সরু সরু আঙুলগুলো চুলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে মাথাটা আস্তে আস্তে টিপে দিচ্ছে। আবার কখনও পাখা দিয়ে বাতাস করছে।

জীবনে নারীর একটি মাত্র স্বাদই পেয়েছে লখাই। সে স্বাদ তীব্র, উত্তেজক, ঝাঁজালো। যে নারী কামান্ধ দেহ দিয়ে পুরুষকে মাতিয়ে তোলে, একমাত্র সেই জাতের মেয়েমানুষের আস্বাদই সে পেয়েছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে নারীর অন্য একটা স্বাদ পেল লখাই।

এই প্রথম তার মনে হচ্ছে, শুধু ভোগ আর উত্তেজনার জন্যই নয়, জীবনে নারীর অন্য প্রয়োজনও আছে।

বিন্দির সেবায় লখাইর জ্বরতপ্ত দেহটা যেন জুড়িয়ে আসছে।

প্রত্যেক মানুষের বুকের মধ্যেই বুঝি একটা স্পর্শাতুর প্রাণ আছে। অজস্র ভোগের মধ্যেও সেই প্রাণটা একটু মমতা, একটু স্নেহ, সামান্য একটু সেবার জন্য কাঙাল হয়ে থাকে।

এমন যে পাষণ্ড, দুর্দান্ত লখাই, তার বুকের ভিতরও সেই প্রাণটা বুঝি এতকাল ঘুমিয়ে ছিল। বিন্দির শুশ্রূষায় এই প্রথম সেটা জেগে উঠেছে।

এখন আর জলপটি দিচ্ছে না বিন্দি। আস্তে আস্তে কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ বুঁজে বিন্দির সেবার আস্বাদ নিচ্ছে লখাই। বড় ভাল লাগছে। বিচিত্র এক সুখ তার দেহ আর মনের উপর ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত ঝরছে। সুখের অনুভূতিটুকু তার সমস্ত উন্মুখ চেতনাকে ছেয়ে আছে।

জীবনে এক একটা সময় আসে, মানুষ যখন জুড়োতে চায়; জিরিয়ে নেবার জন্য একটু আশ্রয় খোঁজে; একটু শান্তি, একটু স্নেহের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে।

এতকাল উত্তেজনা, ভোগ এবং মত্ততার খাত ধরেই জীবনটাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে লখাই। এখন বিন্দির হাতের মিঠে সেবাটুকু নিতে নিতে তার মনে হল, একটু জুড়ানো দরকার। বিন্দির সেবা তার কাছে জীবনের নতুন একটা স্বাদ, নতুন একটা অর্থ এনে দিয়েছে। মনে হল, শুধু নেশা আর উত্তেজনাই নয়, মত্ততা আর উদ্দাম ভোগই নয়, এ সবের বাইরেও জীবনের অন্য মহিমা আছে।

এতক্ষণ চোখ বুঁজে ছিল লখাই। এবার তাকাল। দেখল, কপালে হাত বুলাতে বুলাতে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বিন্দি। বিন্দির দু চোখের কালো মণিতে গভীর উদ্বেগ ফুটে রয়েছে।

লখাইকে চোখ মেলতে দেখে একটু ঝুঁকল বিন্দি। বলল, 'এখন কেমন লাগছে?'

লখাই জবাব দিল না। বিন্দির মুখের দিকে তাকিয়ে আগের কথাটাই ভাবছিল লখাই। হঠাৎই তার মনে হল, বিন্দিই তো তার জীবনে নতুন একটা স্বাদ এনে দিয়েছে। বিন্দিকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করলে কেমন হয়?

বিন্দি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল।'

আস্তে আস্তে মাচানের উপর উঠে বসল লখাই। জ্বরের তাড়সটা অনেক কমে এসেছে।

বিন্দি বলল, 'জ্বরের গতিক দেখে আমার বড় ভয় ধরে গিয়েছিল। খুব ভাবনা হচ্ছিল।'

'ভাবনা হচ্ছিল? কেন?'

'বেশ কথা বলেছ! ভয়-ভাবনা হবে না! যা জ্বর, যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়!'

টানা টানা দুটি সরল চোখে উদ্বেগ এবং ভাবনা ফুটিয়ে লখাইর মুখের দিকে তাকাল বিন্দি।

কেউ যে তার জন্যে ভাবে, তার জ্বরের গতিক দেখে কেউ যে অস্থির হয়ে ওঠে, সে কথা জীবনে এই প্রথম জানল লখাই।

দিনকয়েক আগে লখাইকে কানখাজুরায় কেটেছিল। বেহুঁশ আচ্ছন্নের মত পড়েছিল লখাই। 'বীটে'র ঝুপড়িতে তাকে ফেলে রেখে কুলী-জবাদার ফরেস্ট গার্ডরা চলে গিয়েছিল। সেদিন লখাইর মনে হয়েছিল, সে মরে যাবে। সে মরুক বাঁচুক, সেজন্য কারো মাথা ব্যথা নেই। মরে গেলে দু ঠ্যাং ধরে জঙ্গলের একটা খাদেই হয়ত ফেলে দিত তাকে। জীবনের একটা নিষ্ঠুর, নিদারুণ চেহারা দেখে সেদিন কেঁদে উঠতে চেয়েছিল লখাই। তার মনে হয়েছিল, সে বড় একা। এত বড় পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই।

কিন্তু আজ সে প্রথম জানল, তার ভালমন্দ ভাববার মত মানুষ পৃথিবীতে অন্তত একজনও আছে। এটা ভেবেই মনটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেল লখাইর।

অনেকক্ষণ পর লখাই বলল, 'আমার জন্যে ভেব না, ভয় নেই, আমি মরব না।'

বিন্দি জবাব দিল না।

হঠাৎ লখাই বলল, 'আমি তোমার কে যে ঘরে ঢুকিয়ে এমন যত্ন করলে?'

শান্ত, কঠিন স্বরে বিন্দি বলল, 'তুমি আমার কেউ না। তবে এই তুমিই পেরথম (প্রথম) মানুষ, যে আমাকে বাঁচার কথা শুনিয়েছে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

খানিকটা চুপচাপ।

এবার বিন্দিই বলতে শুরু করল, 'তোমাকে সেদিন একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে ?'

'কী কথা ?'

'আমাকে বাঁচাবার কথা।'

'হাঁ, কথাটা মনে আছে।'

অনেক আশা নিয়ে এবার লখাইর মুখের দিকে তাকাল বিন্দি। গলাটা তার কেঁপে উঠল, 'আমাকে বাঁচাবে পুরুষ ?'

ফস করে লখাই বলে ফেলল, 'বাঁচাব।'

অনেকক্ষণ সব কথা হারিয়ে অদ্ভুত এক উত্তেজনার ঘোরে বসে রইল বিন্দি। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এই নরক থেকে কবে আমাকে বাঁচাবে ?'

'শিগগির।'

লখাই জানে না, কেমন করে, কবে মঙ ফা'র হাত থেকে সে বিন্দিকে বাঁচাবে। তবু সে বিন্দিকে বাঁচাবার কথা বলল। যে নারী জীবনে নতুন স্বাদ নতুন অর্থ এনে দিয়েছে, বুঝি বা তাকে হতাশ করতে লখাইর মন সায় দিল না।

ফিস ফিস করে বিন্দি বলল, 'সেদিন তোমাকে আমি সারা জীবনের কথা বলেছি। আড়ি পেতে মঙ ফা সব শুনেছে। তুমি যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে আমাকে বাঁচাও। নইলে মঙ ফা খুন করে ফেলবে।'

বেশ রাত করেই মঙ ফা ফিরল। ঝুপড়ির ভিতর লখাইকে দেখে তার মাথায় খুন চেপে গেল। বেড়ার গা থেকে একটা টাঙি নামিয়ে চিল্লাতে লাগল, 'শালে, কুত্তার বাচ্চে, তোকে বলেছিলাম না, এখানে আর আসবি না। ভাগ্, হারামী, আভী ভাগ্—'

নিরুপায় ভঙ্গিতে একবার মঙ ফা আর একবার বিন্দির মুখের দিকে তাকাতে লাগল লখাই।

একসময় লখাইর গলার কাছে টাঙির ফলাটা স্থির রেখে লাথি মারতে মারতে তাকে ঝুপড়ির বাইরে বার করে দিল মঙ ফা। তারপর ঝাঁপটা এঁটে দিল।

আশ্চর্য! আজ আর রাগ, উত্তেজনা কি আক্রোশ কিছুই হল না লখাইর। ভুষণাবস্তির দিকে চলতে চলতে অন্য একটা কথা ভাবছিল সে।

ভাবছিল, দরিয়ার সঙ্গিনী সেই সোনিয়াকে কোনদিনই পাওয়া যাবে না। চান্নু সিংয়ের সঙ্গে তার শাদি হবে।

সোনিয়াকে পাবে না। এজন্য এখন আপসোস কি দুঃখ নেই। যেমন করে পারুক বিন্দিকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবে লখাই।

বিন্দির কাছে একটু আগে জীবনের বিচিত্র একটা স্বাদ পেয়েছে। বেঁচে থাকার নতুন একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে। সে কথা ভাবতে ভাবতে ভূষণাবাদের দিকে এগিয়ে চলল লখাই।

সাতান্ন

পিয়ারীলালের মারফত সোনিয়া খবর পাঠিয়েছিল। সেই খবর অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারের অফিসে গিয়ে চান্নু সিং শাদির ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে।

ঠিক হয়েছে, আজ বিকালে এসে সোনিয়াকে নিয়ে যাবে চান্নু সিং।

সকাল থেকেই সোনিয়ার পিছনে লেগেছে এতোয়ারী। তাকে ঘষে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে খুবসুরত করে তুলেছে।

আজ সোনিয়ার শাদি। এর আগে সোনিয়ার শাদি আর একবার ঠিক হয়েছিল কিন্তু রামপিয়ারীর হাতে জখম হওয়ার ফলে শাদিটা ভেঙে যায়।

কোথা থেকে খানিকটা সাজিমাটি যোগাড় করেছে, তা এতোয়ারীই জানে। সাজিমাটি দিয়ে সোনিয়ার মাথা ঘষে দিয়েছে। লম্বা লম্বা চুলে একটা মোগলাই খোঁপা বেঁধে হাওয়াই বুটির ফুল গেঁথে দিয়েছে। চোখের কোলে সুর্মার সরু টান মেরেছে। শুকনা কাপড় দিয়ে সোনিয়ার মুখখানা ঘষে ঘষে লাল করে ফেলেছে।

শাড়িটা আগেই ধুয়ে রেখেছিল সোনিয়া। কুঁচি দিয়ে দুটো ফেরতা মেরে সেটা নিজেই সে পরে ফেলল।

সোনিয়ার মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল এতোয়ারী। দেখতে দেখতে তার গলায় মুগ্ধ স্বর ফুটল, 'সুরত যা খুলেছে, চান্নু কুত্তাটার শির আবার খারাপ হয়ে যায়!'

সোনিয়া অস্ফুট একটা শব্দ করল।

এতোয়ারী নিজের খেয়ালেই বলে যায়, 'তোকে পেলে চান্নুটা একেবারে ভেড়ুয়া বনে যাবে।'

সোনিয়া জবাব দিল না। কি যেন সে ভাবছে।

এবার এতোয়ারী আস্তে আস্তে ডাকল, 'এ সোনিয়া—'

'হাঁ।'

'কী ভাবছিস ?'

'কুছ্ না।'

'জরুর কুছ্ ভাবছিস। আমি জানি কী ভাবছিস ?'

'কী ভাবছি ?'

'চান্নুর কথা।'

মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইল সোনিয়া।

সোনিয়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এতোয়ারী। বলল, 'শরম কি বহীন! আজ তো তুই চান্নুর কথা ভাববিই। আমিও এক রোজ চান্নুর কথা ভেবেছিলাম।'

গলার স্বরটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল এতোয়ারীর। চোখে ব্যথাতুর দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল এতোয়ারী। কেশে ভারী গলাটাকে স্বাভাবিক করে ফেলল, 'শোন বহীন, পুরানা কথাটাই আবার বলছি। নিজের জিন্দগীতে অনেক ঠেকে আমি এটা শিখেছি। কী শিখেছি জানিস ?'

'কী ?'

'শিখেছি, পুরুষ ছাড়া আওরতের গতি নেই। শোন বহীন, চান্নুকে ভালবাসবি, তাকে পুরা দিলটা দিয়ে দিবি। দেখবি, জিন্দগী সুখের হবে।'

দুপুর পার হয়ে গিয়েছে। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু করেছে। দুপুরের তেজ সইতে না পেরে যে পাখিগুলো আকাশ ছেড়ে দ্বীপের দিকে উড়ে গিয়েছিল, আবার তারা আকাশে ফিরে এসেছে।

একটু পরই বিকাল হয়ে যাবে। আর বিকাল হলেই সোনিয়াকে নিতে আসবে চান্নু সিং।

আজ সোনিয়ার শাদি।

কয়েদিনীরা নানা ধরনের যৌতুক দিয়েছে সোনিয়াকে। কেউ পুঁতির মালা দিয়েছে, কেউ চুলের কাঁটা দিয়েছে, কেউ একটু সুর্মা দিয়েছে। মেনল্যাণ্ড থেকে আসার সময় লুকিয়ে চুরিয়ে কেউ খানিকটা আতর এনেছিল। তার থেকে কিছুটা দিয়েছে সোনিয়াকে। হাবিজা দু মাস পেটি অফিসারনীগিরি করে আড়াই টাকা মাইনে পেয়েছিল। তার থেকে আট আনা দিয়েছে। এতোয়ারী পুরা পাঁচটা টাকাই দিয়ে দিয়েছে। আরো কে যে কি দিয়েছে, অত শত দেখেও নি সোনিয়া।

এতোয়ারীই সমস্ত যৌতুক একখানা কাপড়ে বেঁধে পুঁটুলি করে দিয়েছে।

বিকলে হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত চান্নু সিং এসে পৌছায় নি।

সাউথ পয়েণ্ট জেলের সব কয়েদিনী সোনিয়াকে ঘিরে বসে আছে। রং তামাশার কথা বলছে। দিল্লাগী করছে। কেউ আবার সোনিয়ার সঙ্গে চান্নু সিংয়ের নাম জড়িয়ে অশ্লীল রসিকতা করছে।

কোন দিকে খেয়াল নেই সোনিয়ার। বিকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

বিকালের দিকেই সেই ব্যথাটা ওঠে। রস দ্বীপের সিকমেনডেরায় গিয়ে সুঁই (ইঞ্জেকসন) নিয়ে নিয়ে তলপেটের যে যন্ত্রণাটা দাবাতে পারে নি, যে যন্ত্রণাটা দাবাবার জন্য চান্নু সিংয়ের সঙ্গে তার শাদির ব্যবস্থা হয়েছে, এখন সমস্ত তলপেটটা জুড়ে সেই যন্ত্রণাটাই চিন চিন করে উঠল। শক্ত ইঁটের মত মাংসের একটা ডেলা নরম তলপেটটাকে তোলপাড় করে ওঠানামা করতে লাগল।

যন্ত্রণাটা আস্তে আস্তে বাড়ছে।

সোনিয়া জানে, ব্যথার দাপটে একটু পরই তার দেহটা বেঁকে দুমড়ে যাবে। কাটা কবুতরের মত দাপাতে দাপাতে বেহুঁশ হয়ে পড়বে সে।

রোজই বিকালের দিকে সমস্ত তলপেটটা জুড়ে যখন যন্ত্রণাটা শুরু হয়, তখনই রামপিয়ারীর কথা মনে পড়ে সোনিয়ার। আজও মনে পড়ল।

আশ্চর্য! সকাল থেকে এখন পর্যন্ত রামপিয়ারীর সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি সোনিয়ার। সাউথ পয়েণ্ট জেলের সব কয়েদিনীই তার কাছে বসে আছে। একমাত্র রামপিয়ারীই আসে নি।

সকাল থেকে শাদির ব্যাপার নিয়ে মেতে ছিল সোনিয়া। দেহখানা ঘষামাজা করা, সাজগোজ করা, কয়েদিনীদের তামাশা-ঠিসারা, রং-রসিকতার জবাব দেওয়া—এই সব নানা ব্যাপারে ডুবে ছিল। রামপিয়ারীর কথা মনেই ছিল না তার।

যন্ত্রণা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতাও বাড়ছে সোনিয়ার। হঠাৎ সে উঠে

পড়ল। তারপর উন্মাদের মত কয়েদখানাটার এক মাথা থেকে আর এক মাথায় ছুটে বেড়াতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত তাঁত ঘরের পিছনে এসে রামপিয়ারীকে খুঁজে পেল সোনিয়া। রামপিয়ারীর কোলের মধ্যে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ছু হাতে সোনিয়ার মুখটা তুলে শান্ত গলায় রামপিয়ারী বলতে লাগল, 'কাঁদছিস কেন মাগী? ফুর্তি কর। আজ না চান্নুর সাথ তোর শাদি!'

'না, না, আমার শাদি না।'

'এত সাজগোজ করেছিস, কয়েদানীদের সাথ এত হল্লাগুলা, তামাশা-দিল্লাগী করছিলি, আর এখন বলছিস, শাদি না। যা যা, আমার কাছে কী!'

সোনিয়াকে ঠেলে সরিয়ে দিল রামপিয়ারী।

ছু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল সোনিয়া, 'বেদরদী, তোমার দিলে আমার জন্য একটু মহব্বত নেই। আমি যে পেটের দরদে মরে যাচ্ছি, তোমার হুঁশ নেই।'

'আমি কী করব? শাদি হবে তোর। শাদি হলেই পেটের দরদ সেরে যাবে।'

'না না—'

যন্ত্রণাটা সাজ্যাতিক বেড়েছে। সেই নিরেট মাংসের ডেলাটা তলপেট জুড়ে ছোটাছুটি করছে। যন্ত্রণার দাপটে সোনিয়ার দেহটা ধনুকের মত বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল।

সোনিয়া গোঙাচ্ছে, ককাচ্ছে,কাতরাচ্ছে, ছটফট করছে। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, 'দরদে মরে গেলাম টিণ্ডালান। এট্টুস আফিং দাও।'

নির্বিকার বসে আছে রামপিয়ারী। আস্তে আস্তে সে বলে, 'চান্নুর সাথ শাদি হলেই দরদ সেরে যারে।'

'না না, চান্নুর সাথ শাদি হবে না।'

'সচ্?'

'জরুর সচ্। রামজী কসম।'

আফিম নিয়েই বসে ছিল রামপিয়ারী। আফিমের ছোট একটা ডেলা পাকিয়ে সোনিয়ার মুখে গুঁজে দিল সে।

আফিমের নেশায় তলপেটের যন্ত্রণার বোধটা আস্তে আস্তে ভোতা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল সোনিয়া।

সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রামপিয়ারী। তার মুখে দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম এক হাসি ফুটে বেরিয়েছে। রামপিয়ারী জানত, সোনিয়া তার কাছে আসবেই।

আজও চান্নু গাড়ি নিয়ে এসেছে।

এর আগেও একদিন এসেছিল চান্নু সিং। সেদিন রামপিয়ারীর হাতে জখম হওয়ার জন্য সোনিয়াকে নিয়ে যেতে পারে নি। আজ সোনিয়া নিজেই তাকে ফিরিয়ে দিল।

আটান্ন

এখন বিকাল।

জঙ্গলের দিকে এখনও 'ফেলিং'এর কাজ চলছে।

লখাই জবাবদারি করছিল। একটা হাত ধরে টানতে টানতে তাকে একেবারে ঝুপড়িতে এনে ফেলল জগদীপ। বলল, 'তোর সাথ কথা আছে লখাই।'

'কী কথা?'

'তোকে হামেশাই একটা কথা বলি। কথাটা হল, তিন বছর ডি-কুনহা সাহেবকে আওয়াবিল পাখির বাসা দিতে পারলে একটা মোটর বোট মিলবে। ইয়াদ আছে?'

'হাঁ হাঁ—'

'কাল তিন বছর পুরা হয়েছে। আমি একটা মোটর বোট পেয়েছি।'

'সত্যি।'

'হাঁ হাঁ জরুর।' একটু থেমে ফিস ফিস করে জগদীপ বলল, 'আমি আর এক রোজও এখানে থাকব না। আজই ভাগব। সেই শাদি করা কুত্তীর বাচ্চাটাকে কোতল না করা পর্যন্ত দিল আমার জুড়োবে না।'

'সত্যি বলছিস, ভাগবি?' লখাই চমকে উঠল।

'হাঁ হাঁ সচ্।'

ঝুপড়ির বাইরে গিয়ে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে এল জগদীপ। তারপর বলতে শুরু করল, 'তুই চল আমার সাথ। তুই সাচ্চা দোস্ত, তাই তোকে নিতে চাইছি। চল—'

'আমি!' প্রায় আঁতকে উঠল লখাই।

'হাঁ হাঁ তুই। তামাম জিন্দগীতে এমন সুবিধে আর পাবি না লখাই। এখন না ভাগলে সারা জিন্দগী কয়েদ খেটে মরবি।'

কপালের দু পাশে তামার তারের মত সরু সরু রগগুলি উত্তেজনায় যেন ছিঁড়ে পড়ছে। হৃৎপিণ্ডটা হাজার গুণ জোরে লাফাচ্ছে। কপালে ফোঁটা

ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে। কি যে করবে, লখাই বুঝে উঠতে পারল না। ক্ষীণ গলায় একবার সে বলল, 'ভাগতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাই ?'

'আন্দামানে এমন কোঈ শালে নেই, যে আমাদের ধরতে পারবে।' একটু দম নিয়ে জগদীপ বলল, 'এখনই আমাদের পালাতে হবে ঝুপড়িতে কেউ নেই। শিবরাম শালা বুশ পুলিসের ক্যাম্পে গিয়েছে। ফরেস্ট গার্ড আর কুলীরা জঙ্গল সাফ করছে। চল লখাই—'

সাড়াশীর মত কঠিন থাবায় লখাইর একটা হাত ধরে টানতে টানতে সামনের একটা হাওয়াই বুটির জঙ্গলে ঢুকল জগদীপ।

লখাইর উপর তার নিজের কোন ইচ্ছাই এখন কাজ করছে না। জগদীপ যেন তাকে জাদু করেছে। জগদীপের সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ, আচ্ছন্নের মত ছুটে চলেছে লখাই।

অনেকটা যাবার পর সন্ধ্যা নামল।

এবার অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে লখাই। একটু দাঁড়িয়ে টেনে টেনে হাঁপাতে লাগল সে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলতে লাগল, 'তা হলে আমরা ভেগেই যাচ্ছি ?'

পাশে দাঁড়িয়ে জগদীপও হাঁপাচ্ছিল। সে খেঁকিয়ে উঠল, 'ভাগছিস আর শালে বুঝতে পারছিস না ? কুত্তা কাঁহাকা !'

জগদীপের গালিটা গায়ে মাখল না লখাই। সে অন্য কথা ভাবছে। যে নারী তার জীবনে নতুন স্বাদ এবং অর্থ এনে দিয়েছে, তার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ লখাই বলল, 'ভাগতেই যদি হয়, বিন্দিকে নিয়ে ভাগব।'

জগদীপ চমকে উঠল, 'বিন্দি আবার কে ?'

'শুনে কি হবে ? আমার সাথ চল। নিজের চোখেই দেখবি।'

'কোথায় যাব তোর সাথ ?'

'পোর্ট মোয়াট।'

পোর্ট মোয়াটে মঙ ফা'র ঝুপড়ির সামনে লখাইরা যখন এসে দাঁড়াল, রাত তখন বেশ গাঢ় হয়েছে।

ঝুপড়ির সামনে এক টুকরা বাঁশ পড়ে ছিল। সেটা হাতে তুলে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল লখাই। তারপর ডাকল, 'আঁই মঙ ফা, আঁই কুত্তা—'

ক্যাঁচ করে ঝুপড়ির ঝাঁপটা খুলে গেল। এক হাতে একটা বর্মী দা, আর

এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মঙ ফা। এক চোট অশ্রাব্য গালি দিয়ে সে বলল, 'হারামীর বাচ্চে, আবার এসেছিস! আজ তোকে খতমই করে ফেলব।'

দা'টা বাগিয়ে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল মঙ ফা।

মঙ ফা কিছু করবার বা বুঝবার আগেই বাঁশের খণ্ডটা দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড একটা ঘা বসিয়ে দিল লখাই। খুলিটা চড়াত করে ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। অস্ফুট একটা চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মঙ ফা। তার হাতের লণ্ঠনটা হাত পাঁচেক দূরে ছিটকে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

মঙ ফা'র গালিগালাজ আর চেঁচামেচিতে আগেই খোলা ঝাঁপটার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল বিন্দি।

মঙ ফা'র হাতের লণ্ঠনটা চুরমার হয়ে গিয়েছে। চারপাশটা কেমন যেন আবছা, অন্ধকার। আকাশ থেকে মরা মরা খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে বিন্দিকে চিনে ফেলতে এতটুকু অসুবিধা হল না লখাইর।

লখাই ডাকল, 'শিগগির এস বিন্দি।'

'কোথায় যাব?'

'বাঁচতে চেয়েছিলে না?'

'হাঁ।'

'তবে চলে এস।'

আর একটা কথাও বলল না বিন্দি। তর তর করে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে লখাইর পাশে এসে দাঁড়াল।

এক দৃষ্টে বিন্দির দিকে তাকিয়ে রয়েছে জগদীপ। জগদীপের চোখ জোড়া যে ধক ধক করছে, মরা মরা চাঁদের আলোতে লখাই বুঝতেও পারল না।

জগদীপ বলল, 'চল।'

লখাই, জগদীপ এবং বিন্দি—মঙ ফা'র ঝুপড়িটা পিছনে রেখে তিন জনে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল।

আগে আগে চলেছে জগদীপ। সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে রাত্রিটা কাবার করে আনল তিনজনে।

ভোরবেলায় লখাইরা একটা খাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। সমুদ্র এখানে ছোট একটা উপসাগরের আকারে দ্বীপের ভিতর ঢুকে গিয়েছে।

কুয়াশা আর অন্ধকারের একটা গাঢ় স্তর দ্বীপ, অরণ্য এবং সমুদ্রকে জড়িয়ে আছে।

সমুদ্র ফুঁড়ে হিম হিম বাতাস উঠে আসছে।

জঙ্গলের মধ্যে একদল বকরা হরিণ ডেকে উঠল।

একটু পরই সকাল হবে। খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। সিন্ধু-শকুনগুলো ডানা ঝাপটাচ্ছে। কোথায় কোনদিকে আজ পাড়ি জমাবে; বুঝি বা ডানা নেড়ে নেড়ে সে কথাই ভেবে নিচ্ছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তিনজনে সারা রাত দৌড়েছে।

সারাটা রাত পেটে কিছু পড়ে নি। তা ছাড়া যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয় আছে।

ভয়ে, উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে হাঁপ ধরে গিয়েছে। একখণ্ড পাথরের উপর বসে তিনজনে সমানে হাঁপাচ্ছে; টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে।

খানিকটা জিরাবার পর জগদীপ বলল, 'আর জিরিয়ে দরকার নেই। এবার ওঠ লখাই। আন্ধার (অন্ধকার) থাকতে থাকতেই পালাতে হবে। একবার দরিয়ায় গিয়ে পড়লে, যত পারিস জিরোবি।' হঠাৎ গলাটা খাদে ঢুকিয়ে বিড় বিড় করতে লাগল জগদীপ, 'একবার মাঝ দরিয়ায় পৌঁছতে পারলে কোন শালেকে এ জিন্দগীতে আমাকে আর ধরতে হবে না।'

বিন্দি আর লখাই উঠে পড়ল। জগদীপের পিছন পিছন পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে একেবারে জলের কিনারে নেমে এল।

লখাই কি বিন্দি এতক্ষণ দেখতে পায় নি। অন্ধকার আর কুয়াশায় দেখার উপায়ও ছিল না। এবার তারা দেখতে পেল। খাড়ির কিনার ঘেঁষে ছোট একটা মোটর বোট বাঁধা রয়েছে।

প্রথমে বিন্দিকে মোটর বোটে তুলে দিল জগদীপ। তারপর নিজে উঠল।

লখাইও পিছু পিছু উঠে আসছিল। জগদীপ তাকে উঠতে দিল না। বলল, 'মোটর বোটের কাছিটা খুলে উঠবি।'

মোটর বোটটাকে পারের একটা গাছের সঙ্গে কাছি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

লখাই কাছিটা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর বোটে স্টার্ট দিল জগদীপ। ভট্ ভট্ শব্দ করে বোটটা দরিয়ার দিকে এগিয়ে চলল।

লাফ মেরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল লখাই। দুই হাতে বোটটাকে ধরে বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু উপরে উঠবার আগেই লাথি মেরে তাকে জলে ফেলে দিল জগদীপ।

মোটর বোট লখাইকে এই নির্জন খাড়িতে রেখে দরিয়ার দিকে ছুটে চলেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে লখাই।

মোটর বোট থেকে বিন্দির চিৎকার ভেসে আসছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও—'

চোখের সামনে দিয়ে মোটর বোটটা বিপুল সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। অন্ধকার আর কুয়াশায় তাকে আর দেখা গেল না।

দু চোখে অফুরন্ত হতাশা আর বুকের ভিতর অদ্ভুত এক ব্যথা নিয়ে যেদিকে মোটর বোটটা চলে গিয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে রইল লখাই।

মঙ ফা'র কাছ থেকে বিন্দিকে ছিনিয়ে এনেছিল লখাই। লখাইর কাছ থেকে বিন্দিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল জগদীপ।

এমন করেই বুঝি এই বর্বর দ্বীপের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে।

তোরাব আলীর সঙ্গে একদিন এই দ্বীপ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল লখাই। কিন্তু ঝড়ের সমুদ্রের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সেদিন পালাতে পারে নি সে। বিন্দিকে নিয়ে পালাবার জন্য আজ এখানে এসেছিল লখাই। কিন্তু আজও পালাতে পারল না।

এই দ্বীপই বুঝি দুবার কারসাজি করে লখাইকে পালাতে দিল না।

দ্বীপের মনে কি আছে কে জানে?

উনষাট

একসময় সকাল হয়ে গেল।

অগাধ সমুদ্র থেকে উঠে এসে সূর্যটা আকাশ বাইতে শুরু করেছে। রোদের ঘা লেগে লেগে কুয়াশা আর অন্ধকার ছিঁড়ে গিয়েছে।

সামনের দিকে যতদূর তাকানো যায়, বিপুল সমুদ্র। অফুরন্ত কালাপানির পার নেই, কূল নেই, সীমা নেই। অনেক, অনেকদূরে যেখানে আকাশটা ধনুরেখায় সমুদ্রে নেমে গিয়েছে, সেখানে ধূ ধূ একটা রেখা নজরে পড়ে।

সকালের আলোতে সমুদ্রে যতদূর নজর চলে, পাতি পাতি করে খুঁজতে লাগল লখাই। কিন্তু কালকের মোটর বোটটার চিহ্ন নেই কোথাও।

বিন্দিকে নিয়ে জগদীপের মোটর বোট এই নিঃসীম সমুদ্রে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে, কে তার হদিস দেবে ?

বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্যতা পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। বিচিত্র, অবুঝ এক ব্যথায় বোবা হয়ে গিয়েছে লখাই।

বিন্দি তার জীবনে নতুন একটা স্বাদ, নতুন একটা অর্থ এনে দিয়েছিল। বিন্দিকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল লখাই। কিন্তু জগদীপ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল লখাই। নারীর জন্য জীবনে এই প্রথম কাঁদল সে।

এতকাল মেয়েমানুষকে শুধুমাত্র ভোগের জিনিষ হিসাবেই ব্যবহার করেছে লখাই। প্রয়োজন মিটে গেলে তাকে ছেঁড়া কানির মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে তার বাধে নি। একটু দুঃখ, একটু অনুতাপ কি সামান্য একটু ব্যথাও বোধ করে নি সে।

বিন্দিকে হারিয়ে জীবনে এই প্রথম ব্যথার স্বাদ বুঝল লখাই।

কেঁদে কেঁদে বুকের ব্যথাটা খানিকটা হালকা করে ফেলল সে।

বেলা চড়তে শুরু করেছে। সূর্যটা আকাশ বেয়ে অনেকখানি উপরে এসে উঠেছে।

এতক্ষণে লখাইর হুঁশ হল। ভুষণাবাদের 'বীটে'র কথা মনে পড়ল তার।

কাল সারা রাত ভয়ে, উদ্বেগে, উত্তেজনায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়ে এসেছে। পেটে এক টুকরা রুটি কি এক ফোঁটা জলও পড়ে নি। অসহ্য খিদেতে এবং আকণ্ঠ তৃষ্ণায় সমস্ত শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

চারদিকে একবার তাকাল লখাই। এই খাড়িটা আশ্চর্য নির্জন। এখানে একটা মানুষও নেই। চারপাশ থেকে ম্যানগ্রোভ বনগুলি খাড়িটার উপর ঝুঁকে রয়েছে।

একটা কথা মনে পড়তেই লখাই চমকে উঠল। এই খাড়িটা সে চেনে না, এর আগে কোনদিন সে এখানে আসে নি। কাল রাত্রে কোন পথ দিয়ে যে জগদীপ তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, লখাই জানে না।

চারপাশটা ভাল করে দেখে একটা আন্দাজ করে নিল লখাই। মনে হল, কাল রাত্রে উত্তর দিক থেকেই তারা এসেছে।

সমুদ্রের উপকূল ধরে উত্তর দিকে এগুতে লাগল লখাই।

সমুদ্রের পারে নিবিড় ম্যানগ্রোভ বন। তার ভিতর দিয়ে চলা দুষ্কর। মাঝে মাঝে উপকূল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকছে লখাই।

চলতে চলতে কাঁটার ঘায়ে, ডালপালার খোঁচায় চামড়া ছিঁড়ছে। খাবলা খাবলা মাংস উঠে যাচ্ছে। রক্ত ঝরছে। জোঁকের পেটে কত রক্ত যে যাচ্ছে, মেপে কে তা বলবে? প্যাণ্ট-কুর্তা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে।

এক সময় জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল লখাই। উপকূলটা আর খুঁজে পেল না। একবার পুবে একবার পশ্চিমে, ডাইনে বাঁয়ে উন্মাদের মত ঘুরতে ঘুরতে একটা জাহাজ নজরে পড়ল লখাইর।

জাহাজটাকে নিশানা করে টলতে টলতে ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে লখাই পৌছল, সে জায়গাটা তুষণাবাদ নয়, এবারডীন জেটি। এতক্ষণ যে জাহাজটাকে নিশানা করে হাঁটছিল, এবার সেটাকে চিনতে পারল লখাই। সেটা এলফিনস্টোর জাহাজ।

এখন বিকাল।

এবারডীন জেটিতে আজ খুব ভিড়। সমস্ত আন্দামান দ্বীপটা যেন ভেঙে পড়েছে জেটিটার উপর।

একপাশে কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল লখাই। তারপর একটু ধাতস্থ

হয়ে জেটির ভিড়ে গিয়ে মিশল। পাশের একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'জেটিতে আজ এত ভিড় কেন?'

লোকটা বলল, 'আজ নওয়াজ খান সাহেব মেনল্যাণ্ডে চলে যাচ্ছে।'

'মেনল্যাণ্ডে যাচ্ছে কেন খান সাহেব?'

'আরে বুদ্ধু, তুই কি আন্দামানে ছিলি না! আন্দামানের সবাই এ কথাটা জানে, লেকিন তুই জানিস না!' লোকটার গলায় করুণার সুরই যেন ফুটল, 'আরে নালায়েক হারামী, নওয়াজ খান সাহেব যে এই দ্বীপে এংরাজবালার সাথ লড়াই বাধাতে চায়! এই কসুরেই চিফ্ কমিশনার সাহেব তাকে মেনল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল লখাই। একটি কথাও বলল না।

একটু পর পুলিসের গাড়িতে রোশনকে সঙ্গে নিয়ে নওয়াজ খান এসে পড়লেন।

চারপাশের লোকগুলো বলতে লাগল, 'আদাব, আদাব—'

করুণ, ব্যথাতুর চোখে একবার সবগুলো মানুষের দিকে তাকালেন নওয়াজ খান। তারপর বললেন, 'আদাব, আদাব—'

জেটির পাশে একটা মোটর বোট বাঁধা ছিল। রোশনকে নিয়ে মোটর বোটে উঠলেন নওয়াজ খান।

মোটর বোটটা তৈরীই ছিল। নওয়াজ খান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা স্টার্ট দিল। শব্দ করতে করতে এলফিনস্টোন জাহাজের পাশে গিয়ে ভিড়ল।

কড় কড় শব্দে এলফিনস্টোন জাহাজের নোঙর উঠল। আরো খানিকটা পর দুলতে দুলতে বিরাট জাহাজটা উপসাগর থেকে খোলা দরিয়ার দিকে চলে গেল।

আঠার শ আটান্নতে যে কারণে এই দ্বীপে এসেছিলেন নওয়াজ খান, তিপান্ন বছর পর ঠিক সেই কারণেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন।

নওয়াজ খানকে একদিন মাত্র দেখেছে লখাই। তবু তাঁর এই চলে যাওয়ার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে।

বিন্দিকে হারিয়ে কষ্ট পাবার কারণ আছে। কিন্তু নওয়াজ খানের চলে যাওয়াতে লখাই কেন যে কষ্ট পাবে তা সে নিজেই জানে না। তবে এটা সে বুঝতে পেরেছে, বিন্দিকে হারাবার পর যে দুঃখ, আর নওয়াজ খান চলে

যাওয়াতে যে দুঃখ—এই দুটো দুঃখ মিলে তার বুকের মধ্যে এক অবুঝ ব্যথার জন্ম হয়েছে। এ হচ্ছে সেই ব্যথা, মানুষ প্রিয়জনকে হারিয়ে যা পায়।

জীবনে প্রথম প্রিয়জন হারাবার স্বাদ পেল লখাই।

এবারডীন জেটির একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে লখাই।

হঠাৎ কে যেন কাঁধের উপর হাত রাখল। চমকে পিছন দিকে ঘুরল লখাই। দেখল, ভিখন আহীর দাঁড়িয়ে আছে।

ফিস ফিস করে ভিখন বলল, 'বিলকুল সব্বনাশ হয়ে গেছে। পুলিস তোকে ধরবার জন্যে তামাম আন্দামান টুঁড়ে বেড়াচ্ছে।'

'কেন ?'

'তুই নাকি কাল বিকালে তুষণাবাদের 'বীট' থেকে ভেগেছিলি ?'

'হাঁ।'

'আরে বাপ রে বাপ, এটা কি করেছিস লখাই দাদা! তুই জানিস না ভাগোয়া কয়েদী ধরা পড়লে জেলার সাহেব তার জান তুড়ে দেয়।'

'জানি।'

শান্ত গলায় লখাই বলল। বলেই সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

ভিখনও পিছন পিছন আসছে আর বলছে, 'কোথায় যাচ্ছিস লখাই দাদা ?'

'ধরা দিতে।'

'আরে বাপ রে বাপ রে বাপ! জরুর তোকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।'

ভিখন কেঁদেই ফেলল।

আর একটা কথাও বলল না লখাই। ভিখনের দিকে একবারও তাকাল না। সিধা সেলুলার জেলের দিকে এগুতে লাগল।

বাট

এই দ্বীপ থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল লখাই। সেই হিসাবে সে ভাগোয়া কয়েদী। আইনত ভাগোয়া কয়েদীর যা সাজা, তা লখাইর প্রাপ্য। কিন্তু নিজে ধরা দেওয়ার গুণেই হোক, আর যে কোন কারণেই হোক, সাজাটা তেমন মারাত্মক ধরনের হল না।

দু দিন খানা বন্ধ রাখা হয়েছিল। দু দিন ডাণ্ডাবেড়িতে রাখা হয়েছিল, আর 'টিকটিকি'তে (বেত মারার স্ট্যাণ্ডে) চড়িয়ে পঁচিশ ঘা বেত মারা হয়েছিল। এতেই নিস্তার পেয়ে গিয়েছে লখাই। তবে তার 'আন্দামান রিলিজ'টা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে দু মাস বিশ দিন তাকে সেলুলার জেলে আটক থাকতে হবে।

দু দিন ডাণ্ডাবেড়িতে ঝুলে, দু দিন বিনা খানায় থেকে আর পঁচিশ ঘা বেত খেয়ে শরীরের হাল এমন হয়েছিল যে পুরা পনরটা দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি লখাই।

আজ অনেকটা সুস্থ হয়েছে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে।

রোদে এখন আর তেজ নেই। সেলুলার জেলের মাথায় খানিকটা মরা মরা ফ্যাকাসে আলো আটকে আছে।

এটা ছ নম্বর ব্লকের পনের নম্বর সেল। সেলটা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

সেলটার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লখাই।

পাশের সেলের দেওয়ালে দুম দুম শব্দ হচ্ছে। লখাই জানে, বাঙলা দেশ থেকে যারা আজাদীর লড়াই করে এই দ্বীপে সাজা খাটতে এসেছে, তাদেরই একজন পাশের সেলটায় রয়েছে। বিশ পঁচিশ দিন আটক রয়েছে কয়েদীটা।

দুম দুম শব্দটা ক্রমাগত বাড়ছে। বেশ বুঝতে পারছে লখাই, পাশের সেলের কয়েদীটা দেওয়ালে কপাল ঠুকছে। এই বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যেই বন্দিত্বের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠেছে তার।

এখন পাশের সেলের কয়েদীটার কথা ভাবার মত মনের অবস্থা নয় লখাইর। উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়েই আছে সে।

সেণ্ট্রাল টাওয়ারের চূড়ায় একটা সাগরপাখি বসে রয়েছে। থেকে থেকে পাখিটা ডানা ঝাপটায়। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এক সময় আকাশের দিকে উড়ে যায়। উড়তে উড়তে বুঝি বা আকাশই ছুঁয়েছে পাখিটা।

সাগরপাখিটা দেখছিল লখাই। পাখিটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। আরো ছোট হতে হতে কখন যেন সেটা আকাশে মিশে গেল।

লখাই ভাবছিল, ঐ পাখিটার মত মানুষও কি দেহ মনের সব ভার মুক্ত হয়ে উড়তে উড়তে আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না? সুন্দর, সুষ্ঠু, সুন্দর ভাবে ভাবতে শেখেনি লখাই। যেমন ভাবেই ভাবুক, হয়ত সে এই কথাটাই ভাবছিল। মানুষ কি বর্বরতা এবং পশুত্ব মুক্ত হয়ে পাখির মত হালকা হতে পারে না?

একসময় পাখির ভাবনাটা ছেড়ে দিল লখাই।

অন্য একটা ভাবনা তার মনটাকে জুড়ে বসল।

এখন এই অলস, উদাস মনে নিজের জীবনের কথা ভাবতে লাগল লখাই। আজকাল একটু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেই আগাগোড়া নিজের জীবনটার কথা ভাবতে থাকে সে।

জীবনে কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র ঘটনাই না সে দেখল। ভিখন আহীরকে দেখল, জাজিরুদ্দিন-বিরসাকে দেখল, লা ডিন, নওয়াজ খান, সোনিয়া, বিবির বাজারের মোতি ঢুলানি, পরাঞ্জপে, কপিল প্রসাদ, শরীয়তুল্লা—কত মানুষই না এসেছে তার জীবনে। অনেককে আবার চোখেও দেখে নি লখাই। পরোক্ষে থেকেও তারা তার জীবনে প্রভাব ফেলেছে।

কত মানুষ দেখেছে, কত ঘটনা দেখেছে! লখাই ভাবতে চেষ্টা করল, জীবন কি শুধু মাত্র এই সব ঘটনা আর মানুষের সমষ্টি? মন ঠিক সায় দিল না।

জীবনে বহু নারী ভোগ করেছে লখাই। প্রচুর নেশা করেছে। লালসা-উত্তেজনা-নেশা এবং ভোগের খাত ধরেই জীবনটাকে ছুটিয়ে এনেছে সে।

লখাই ভাবছে, উত্তেজনা-ভোগ-লালসা—শুধু এইগুলির মধ্যেই কি জীবন রয়েছে? এবারও মনের সায় মিলল না।

লখাইর মনে হল, অসংখ্য মানুষ, অজস্র ঘটনা, কাম-লালসা-মত্ততা—এ সবের বাইরে আর একটা কি যেন আছে। যেটা না হলে জীবনের স্বাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না।

সেটা যে কি, আজকের লখাই জানে না। কিন্তু অনেক দিন পরের অনেক পরিণত আর এক লখাই জেনেছিল। সেটা হল উপলব্ধি। বিন্দির কাছে গিয়ে নিজের অজান্তে উপলব্ধির স্বাদ পেয়েছিল লখাই।

বিন্দিকে সে পায় নি। জগদীপ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বিন্দিকে হয়ত সে ভুলে যাবে। তাকে না পাওয়ার ব্যথাটাও হয়ত একদিন আর থাকবে না। কিন্তু বেঁচে থাকার যে স্বাদটা সে রেখে গিয়েছে, সেটা বার বার পাবার জন্য নতুন করে জীবনটাকে শুরু করবে লখাই।

জীবনের অন্য একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে সে।

জীবন কী ?

উপলব্ধিই তো জীবন।

লখাইর মনে সেই উপলব্ধিই জন্মাতে শুরু করেছে।

সমাপ্ত